“হে নবী !
লোকদের বলে দাও,
তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রতি
ভালবাসা পোষণ কর
তবে আমাকে অনুসরণ কর,
তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন
এবং
তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন।
তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান”
(আল কুরআন -৩ ঃ ৩১)

ওগো আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা,
জীবিকাদাতা, পালনকর্তা, আমাদের সব
কাজের পর্যবেক্ষক, আমাদের মালিক!
আমরা তোমার কাছে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ
করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।
এই বইয়ের সমস্ত পাঠকদের তুমি আলোর
পথে চলতে সাহায্য কর।
আমাদের সবাইকে কিয়ামতের সেই ভয়াবহ
দিনে সাহায্য কর, যে দিন তোমার দয়া ও
ক্ষমা ছাড়া কোন পথই থাকবে না
মুক্তির জন্য।

হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর !

আমাকে অনুসরণ কর

আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন

মুহাম্মদ (সাঃ) সকলের জন্য

সংকলন

সাইয়েদ হামিদ মহসিন

অনুবাদ

শেখ নাসিরউদ্দিন আহমেদ

সালাম সেন্টার

(কুরআনের বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তৎপর)

www.salaamcentre.in

FOLLOW ME, God Will Love You (Bengali)
FOLLOW ME, God Will Love You (English)
Copyright © 2014 SYED HAMID MOHSIN.

ISBN: 978-81-928089-1-1

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author, except for the situation below which is permitted.

For Reprinting

Reprinting or reproducing this book on the condition that absolutely no change, addition, or omission is introduced is permitted free of charge. To make high quality reprints, you may contact the author / Salaam Centre to obtain free copies of the soft copy or printing files of this book.

The Web Site of This Book :

This e-book is available on the Web, World Wide at:

www.muhammadforall.in - www.salaamcentre.in

Price: 300/-

Printed and Published by :
SALAAM CENTRE
65, Ist main, S.R.K. Garden, Jayanagar, Bangalore – 560041
Branch: #5, Rich homes, Rochmond road, Bangalore - 560025
Contact: +91 99451 77477

E mail: salaamcentrebangalore@gmail.com

ঃ সূচীপত্র ঃ

১। **কাবা আল্লাহর ঘর** 1-7
মহা নবীর জন্ম, মরুময় পরিবেশ, প্রকৃতির কোলে শিক্ষা, অনাথ এবং তার শিক্ষক, মেষের রাখাল যুবক

২। **নবুয়্যতের চিহ্নসমূহ** 9-20
শান্তি সংঘ, সততার বিমূর্ত প্রতীক, বিশ্বস্ততা, বিবাহ, দত্তকপুত্র যায়েদ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্তি, অসৎ কর্মনীতি, সত্যের সন্ধানে, প্রথম প্রত্যাদেশ বাণী, খ্রীষ্টান পণ্ডিত ওরাকা

৩। **প্রত্যাদেশের ধারা** 21-25
প্রত্যাদেশ গ্রহণ, প্রত্যাদেশ এক স্বর্গীয়বার্তা, পরিশুদ্ধি ও প্রার্থনা

৪। **অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টীম রোলার** 27-36
প্রকাশ্য জনসমক্ষে সত্যের আহ্বান, প্রস্তাব ও দাবী, কুরাইশদের নির্মম নিপীড়ন প্রতিক্রিয়া, মিডিয়া আক্রমণ- মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সৎ ও অসদ্ব্যবহার, জাদুকর বলে গুজব রটনা, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সত্যের পথ দেখান, ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ

৫। **সমাজ বিপ্লবের সাথে মনোবিপ্লব** 37-41
তিনটি প্রশ্ন, রসূলের ভুল ‘ইনশাল্লাহ’-‘আল্লাহ যদি চান’ না বলা

৬। **আবিসিনিয়ায় হিজরত** 43-51
রাজা নাজ্জাসী, মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ), ঝুঁকি এবং সত্যতা, মনোবল ও সাহসী হামজা (রাঃ), উমার (রাঃ), হৃদয়ের বিপ্লব

৭। **বয়কট** 53-62
বাতিল হল বয়কটের চুক্তিপত্র, শোকের বছর, খাদিজা (রাঃ), তায়েফ, একজন দাস, মদিনায় ইসলাম, ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

৮। **হিজরত** 63-66
অত্যাচারিত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গমন, বিশ্বস্ততার এক চরম পরীক্ষাঃ হিজরত

৯। **মদিনা** 67-82
মসজিদ নির্মাণ, আস্‌সালামু আলাইকুম, ইহুদীদের সাথে সন্ধি প্রস্তাব, কপটতা, চূড়ান্ত ভ্রাতৃবন্ধন, আযান, কল্যাণ রাষ্ট্র, কুরাইশদের সাথে বিরোধ, জিহাদ এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কিতাল –সশস্ত্র প্রতিরোধ, জিহাদঃ ব্যক্তির সর্বোত্তম প্রচেষ্টা, মহত্তর জিহাদ

১০। **প্রথম যুদ্ধ ঃ বদর** 83-94
পারস্পরিক পরামর্শ, বুদ্ধিদীপ্ত রণকৌশল, বদর যুদ্ধের প্রাক্ মুহুর্ত, মক্কায় প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা, মদিনায় জয়োচ্ছাস ও বেদনার সুর, হৃদয়ের আহ্বান

১১। **উদারতা ও ভালবাসা** 95-103
আহ্‌লে সুফ্‌ফা, নবী কন্যা ফাতিমা (রাঃ), আদর্শ স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)

১২। **বিশ্ব জগতের করুণা রসূল (সাঃ)** 105-144
পশুপাখির উপর রসূল (সাঃ)এর দয়া,
প্রকৃতি ও পরিবেশ, মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধি ছাড়া কিছু নয়, হারাম ও হিমা, মদিনার চারপাশে সবুজ অঞ্চল, সবুজ পৃথিবী, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের প্রতি করুণা, পিতামাতা, মাতা, পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বয়োজেষ্ঠ্য, শিশু, প্রতিবেশি, দরিদ্র ব্যক্তি, দাসদাসী ও চাকরবাকর, প্রতিবন্ধী, অনাথ, অসহায়, অসুস্থ, নারী, ইসলামে নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ইসলামী বিধানে নারীর উত্তরাধিকার অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন? ইসলামে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলামে হিজাব ব্যবস্থা, হিজাব হল সভ্যতার চরম বিকাশ

১৩। **উহুদের যুদ্ধ** 145-158
উহুদ প্রান্তরের দিকে অভিযান, বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা, প্রতিহিংসা, তীরন্দাজদের আনুগত্যের অভাব, শূরা বা পরামর্শ সভা, বিনয়, আমি তো কেবল পথিক মাত্র, সদয় মন, ছিলনা কোন বিশেষ ব্যবস্থা, ভেদাভেদের উর্দ্ধে, অসাধারণ ধৈর্য্য, রসূল (সাঃ)এর ছিল হৃদয়ভরা হাসি, নবী (সাঃ)এর সদয়তা, শান্ত পরিবেশ তিনি পছন্দ করতেন, মানবতার মুক্তি দূত, তিনি ছিলেন কেবল আল্লাহর দাস

১৪। **খন্দক যুদ্ধ** 159-182
বিদ্রোহ ও কৌশল অবলম্বন, যুদ্ধে বিদেশী কৌশল গ্রহণ, পরিখা, প্রাজ্ঞ কমাণ্ডার, মদিনায় প্রবেশ করায় বাধা, বিশ্বাসঘাতকতা, এক দক্ষ কৌশল, মুসলিমদের উদারতার নজির, ইসলামে বক্তব্য পেশের স্বাধীনতা, ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের সম্মানের আর এক নজির, ইসলামে মানব সেবা, আল্লাহর করুণা, সেবা সকলের জন্য, সেবার কাজ মূলত ইবাদত, কৃতজ্ঞতা

১৫। **হুদায়বিয়া** 183-204

শান্তি যখন যুদ্ধকে জয় করে, পবিত্র রমজান ও একটি স্বপ্ন, উভয় সংকটে কুরাইশরা, আনুগত্যের সাফাই, স্রষ্টা বনাম সৃষ্টির উপাসনা, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত, দুই শত্রুপক্ষের চাপে মদিনা, হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ মহাবিজয়ের বিশেষ ঘোষণা, উম্মে সালামা (রাঃ)-রসমাধান সূত্র, দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে, হুদায়বিয়ার বড় শিক্ষা, সীমান্তের বাইরে ইসলাম প্রচার, নবী (সাঃ) এর সময় ভারতীয়দের উপর ইসলামের প্রভাব, ইসলামের নৈতিক দিক, প্রকৃত হতভাগা, আত্মত্যাগ, হাসিমুখে কথা বলাও দান, সামাজিক সুবিচার, সহমর্মিত

১৬। **অমুসলিমদের সাথে নবী (সাঃ)** 205-226

অমুসলিম ব্যবসায়িক অংশীদার, ব্যবসায়ী সূত্র, বৈবাহিক সম্পর্ক, সম্মিলিত সরকার গঠন, সামাজিক আত্মীয়তায় রসূলের কাছে ভোজ সভার গুরুত্ব, দাসদের মুক্তিদানের মধ্যদিয়ে ইসলামের প্রচার, সর্বোত্তম শ্রদ্ধা প্রদান, আত্মপ্রত্যয়, সততা, বিশ্বস্ততা, মহানুভবতা, নমনীয়তা, মদিনার অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক: সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান, পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, বিশ্বাস ও আনুগত্যপরায়ণতা, অমুসলিম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব- শত্রু দমনে যারা রসূলের সাথি হয়েছিলেন, জঘন্য পাপ, মহানুভবতা ও ধৈর্য, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা বোধ, ধর্মগ্রহণে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বহুত্ববাদ

১৭। **খায়বার** 227-237

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে রসূল (সাঃ) বিষ খেলেন, রসূলের পরার্থপর মানসিকতা, নীতি ও নীতিবিজ্ঞান, পরচর্চা, অহেতুক সন্দেহ পোষণ, মিথ্যা কথা বলা, ধারণা ও অনুমান পাপ, বিনোদন ও অবকাশ যাপন

১৮। **উমরা** – অনির্দিষ্ট সময়ে তীর্থযাত্রা 239-247

আলোর ছোঁয়ায় দীপ্ত হল হৃদয়, সিরিয়া অভিযান, প্রিয়জনদের জন্য শোকাশ্রু, ভেঙে গেল হুদায়বিয়ার সন্ধি শর্ত, মক্কা বিজয়

১৯। **গর্বিত মহাবিজয়** 249-269

ক্ষমার দিন, আত্তাবের ইসলাম গ্রহণ, সাফওয়ান, হাবার, আবু সুফিয়ান, হিন্দাহ, ইকরামা, হৃদয়ের পুনর্গঠন–যা প্রয়োজন ছিল ইসলামি নেতৃত্বের জন্য, ওগো আল্লাহ আমি তো এ বিষয়ে কিছুই জানিনা, আদর্শ সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), রাজা প্রজা সবার জন্য একই আচরণ, আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে জীবন, শাসকের গুণ, ধনী গরীবের মধ্যে ভারসাম্য, আধুনিকতার

ভারসাম্যতা, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, ইসলামে মদ-জুয়ার স্থান নেই, লোভ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ

২০। **হুনায়নের যুদ্ধ** 271-281

যুদ্ধ প্রাপ্ত সম্পদ, দাতার হাত গ্রহীতার হাতের উপর অবস্থান করে, সেরা আনুগত্যের প্রকাশ, কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ, এক বেদুইন ও মুহাম্মদ (সাঃ)-র কথোপকথন

২১। **মদিনার প্রতি রসূলের ভালবাসা** 383-304

হৃদয়ের গোপনীয়তা, তাবুক অভিযান, প্রতিনিধি দল, মানুষের অধিকার– নবী (সাঃ)এর উচ্চ ধারণা, কুরআন ও মানুষের মর্যাদা, ইসলামের সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ, মাঠের চাষা ও রাজা দু'জনই আল্লাহর কাছে সমান, হজ্বের ময়দান- এর উজ্জ্বল সাক্ষী, বর্ণবাদ- কালোদের উপর সাদাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যুবশক্তিকে উৎসাহ দান, যুদ্ধে নৈতিকতা

২২। **যুদ্ধ সম্বন্ধে নবী (সাঃ)এর ধারণা** 305-316

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ– আল্লাহর পথে নিরাপত্তা লাভ, বিংশশতাব্দীঃ বিধবংসীতম শতাব্দী, তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ,

২৩। **বিবাহ দর্শনঃ বহু বিবাহ ও এক বিবাহ** 317-331

পাশ্চাত্যের অস্ত্র, ইহুদীবাদে বহুবিবাহ, খ্রীষ্টানদের মধ্যে বহু বিবাহ, হিন্দু মতবাদে বহু বিবাহ, পাশ্চাত্য সমাজে বহুবিবাহ, ইসলামের বিবাহ দর্শন, ইসলামে বিধবাদের পুনঃবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা, বিবাহে মহিলাদের সম্পত্তি ও ইসলাম

২৪। **নবী (সাঃ)এর স্ত্রীগণ** 333-352

খাদিজা (রাঃ), সওদা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), হাফসা (রাঃ), জয়নাব (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), জুয়াইরিয়া (রাঃ), উম্মে হাবিবা (রাঃ), সাফিয়া (রাঃ), মারিয়া (রাঃ), মায়মুনা (রাঃ), নবী (সাঃ)এর বহু বিবাহের কারণ সমুহ

২৫। **আদর্শ শহর মদিনা** 353-375

রাষ্ট্র ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান, জ্ঞানের উন্নতি, আল সুফফা – ইসলামি জগতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, নারী শিক্ষার ব্যবস্থা, সচিবালয়, সরকারি চিঠিপত্র ও শীলমোহর, বিদেশী ভাষা ও অছি পরিষদ, গণমানচিত্র ও লোক গণনা, শহর ও সড়ক পরিকল্পনা, গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, অতিথিশালা, চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা, মদিনার বাজার পরিকল্পনা, অবৈধ ও পাপ কাজের সাথে জড়িত ব্যবসা নিষিদ্ধ, পুরুষ তদন্তকারী নিয়োগ,

মহিলা তদন্তকারী, পুরুষ ব্যবসায়ীগণ, মহিলা ব্যবসায়ী, ব্যবসা, ব্যবসায়ী চুক্তিপত্র, সামরিক প্রশাসন, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক দপ্তরঃ বাইতুলমাল বা জাতীয় কোষাগার, পেনশান ও ক্ষতিপূরণ প্রথা, ন্যায় বিচার সকলের জন্য, পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত নবী (সাঃ), গ্রহন হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মেই

২৬। **বিদায় হজ্ব** 375-382

বিদায় হজ্বের ভাষণ, ওগো দয়ালু প্রভু! পরিবর্তন কর আমাদের হৃদয়

২৭। **স্বর্গীয় জীবনে এক মহামিলন** 383-389

নবী (সাঃ) এর অসুস্থতা, শেষ প্রস্থান, ভালবাসা ও শূন্যতা

২৮। **আল্লাহর রসূল এক চমৎকার উদাহরণ** 391-402

একটি আলো যা আলোকিত করতে পথ দেখায়, বিশ্বখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিতে নবী (সাঃ)

স্বীকারোক্তি

আমি আশা করছি এই বই থেকে মুসলিম ও অমুসলিম সবাই উপকৃত হবেন। এটা একটি এমন প্রচেষ্টা যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন থেকে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে এনেছে যা দেশবাসীদের জীবনে স্বস্তি ও মুক্তির স্বাদ উপহার দিয়ে থাকবে। সমসাময়িক বিশ্বের দরবারে দেশকে উন্নীত করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতেও এটি সহায়ক বলে আমি মনে করছি। পাঠকদের কাছে আমার বিনীত আবেদন তারা যেন কেবল এটাকে নবী (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ না ভেবে এটাকে নিজেদের জীবনে একটি চলার পথের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেন।

প্রথাগতভাবে এটি মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি জীবনী লেখার প্রচেষ্টা নয়। এটি নবী (সাঃ) এর জীবনী গ্রন্থ লেখার উপর কোন বিশেষ আগ্রহ যেমন নয় তেমন মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও মিশন সম্বন্ধে বোঝাপড়ার কোন অবকাশও নয়। বরং "কুরআন সবার জন্য" নামক প্রচার অভিযানে আমার হৃদয়ে যে সত্য আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছিল এটি তার বহিঃপ্রকাশ। তখনই আমি মনে করেছিলাম যে কি করে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের মানবীয় গুণাবলী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছুরিত হয় তাই আমার এ প্রচেষ্টা। কয়েক বছর আগে আমি "কুরআন সবার জন্য" প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিলাম। সেই সময় আমি আমার এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একেবারে স্থির থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী সাহাবানা ও কন্যা সুফিয়া আমাকে এ প্রজেক্টের উপর কাজ করবার জন্য উৎসাহ দেয় এবং আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলে। এরা দুজন আমার পাশে সব সময় এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি মুহুর্ত এরা আমাকে নানান বিষয়ে যেমন পরামর্শ দিয়েছে তেমনি অন্যান্য কাজেও সহায়তা করেছে। যার ফলে আমি সফলতার সাথে এ কাজ করতে পেরেছিলাম। আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর প্রতিদান প্রদান করুক। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না "কুরআন সবার জন্য" প্রজেক্টটি মানুষের অন্তরাত্মায় যে পর্দা পড়ে গিয়েছিল তা অপসারণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আমি তো মনে করিনা দেশবাসীর কাছে স্বর্গীয় অহী বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে আর বড় অন্য কিছু প্রাণোদ্দীপক বিষয় থাকতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বড় উদাহরণ আমাদের ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে বড় বড় সম্পদ পাই তার মধ্যে এটি একটি বড় সম্পদ বলা যেতে পারে। আর এর বড় উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে কুরআনের জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা যে সকল প্রোগ্রাম করেছিলাম তাতে জজ, উকিল, পুলিস, অফিসার, শিক্ষানুরাগী নানান শ্রেণির মানুষদের উপস্থিত হওয়ার মধ্য থেকে। এরা সবাই আমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন আমার এ ধরনের কাজের জন্য। এরা আমাকে এজন্যই শ্রদ্ধা করেছিল যে আমি দেশবাসীদের কাছে পবিত্র স্বর্গীয় বার্তাকে তুলে ধরার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি যে আমার একাজের জন্য আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিনে যথেষ্ট প্রতিদান পাব। আর এ কাজ আমাকে অনন্ত শান্তির দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবে। সেই অনন্ত জীবনের সফলতার জন্য এ কাজ আমার সহায়ক।

যে সকল ব্যক্তিবর্গ একাজে আমাকে সহায়তা করেছে আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। তাদের উৎসাহ আমার কাছে চির স্মরণীয় হয়ে রইল, বিশেষ করে ব্যাঙ্গালোরের সিটি মসজিদের ইমাম মরহুম মওলানা রিয়াজুর রহমান রশিদির প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

দেশ বিদেশের বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে জড়িত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, ম্যাঙ্গালোর ও গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন চ্যান্সেলার বি. শেখ আলি। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার আলামে রাবিতা আদাব-ই-ইসলামী (রিয়াদ)-র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ রব্বি হাসান নাদভী এবং জামিয়া মিল্লিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মুহাম্মদ রাফাত সাহেব। আল্লাহ এদের সবাইকে উত্তম প্রতিফল দান করেন। তাঁদের উপদেশপূর্ণ উৎসাহ আমাকে একাজে বড়ই সাহায্য করেছে। ওগো আল্লাহ তুমি আমার ও তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মঞ্জুর করে নাও।

আমি www.karnatakamuslims.com-এর চিফ এডিটর সম্মানিত সাইয়েদ তানবীর আহমেদের কাছে ঋণী থাকলাম। তার অনবরত সাহায্য সহযোগীতা আমার একাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আমি আন্তরিকভাবে সকল শিক্ষানবীশের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম, যাদের গ্রন্থ থেকে আমি এটি রচনা করার সাহায্য পেয়েছি। বইটি রচনা করার জন্য আমি প্রচুর আকর গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। এরা কেউই ব্যবসায়িক সুবিধা আমার কাছে দাবি করেননি। সবাই চেয়েছেন যাতে করে নবী (সাঃ) এর আন্দোলন ধারা যেন বিশ্বের সমস্ত মানুষের দরজায় পৌঁছে যায়। আর উপকৃত হয় পথভ্রষ্ট কোটি কোটি মানুষ। আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষত: আমার মা যিনি আমার ইসলাম প্রচারের প্রজেক্টকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে এসেছেন এবং এর সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। ১৯৭০ সালে আমার পিতা সাইয়েদ আবদুস সালাম শহীদ হওয়ার পর থেকে আমার মা আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যাতে আমরা ইসলামী আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়ে পড়ি। আল্লাহ আমার পিতামাতাকে সুখী করুন। বর্তমানে আমি আমার মায়ের খুশিকে আমার জীবনের এই চলার পথে সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করছি। তার চরম আকাঙ্খার ফলেই নবী (সাঃ) এর এই জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ বলা যেতে পারে।

বইটির বাংলা অনুবাদ করেছেন ভাই সেখ নাসিরুদ্দীন আহমদ। চরম ব্যাস্ততা সত্ত্বেও জামাআতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার আমীর, বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক সাংবাদিক মুহাম্মদ নূরুদ্দীন সাহেব বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা করেছেন। আমি তাঁদের উভয়ের জন্য দোওয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করেন।

সবশেষে আমি সেই মহান আল্লাহর অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যিনি আমাকে এই বিরাট কাজ করার শক্তি সাহস অর্থ সমস্ত কিছু প্রদান করেছেন।

ব্যাঙ্গালোর

জানুয়ারী-২০১২ **সাইয়েদ হামিদ মহসিন**

প্রাক্‌কথন

কুরআনে যে সকল মৌলিক কথার আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রিসালাত বা নবুয়্যতের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ন আলোচনা। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন নবীদের মধ্য দিয়েই মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। নবীদের দেখানো পথ না পেলে মানুষ বুঝতেই পারতনা কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা ঠিক আবার কোনটা বেঠিক, কোন পথে চললে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হতে পারবে, আবার কোন পথে চললে মানুষ তার অভিশাপে পতিত হবে। আল্লাহর নবীরা মানুষের জন্য বহন করে আনে পথনির্দেশিকা, যাতে মানুষ জানতে পারে তার চলার পথ, জানতে পারে তার উন্নতির ও মর্যাদার উপায়টা কিসে আছে। নবীদের মধ্য দিয়েই মানুষ জানতে পারে সেই ভ্রষ্টপথের কথা, যে পথে হাঁটলে একজন মানুষ চরম অজ্ঞতায় ডুবে যেতে পারে। এখান থেকে তার বাঁচার কোন পথই তখন থাকে না। নবীদের কাজ হল মানুষকে উন্নত ধরনের অনুভূতিশীল করে তোলা এবং ঐশ্বরিক সান্নিধ্য দান করা। নবুয়্যতের কাজ তাই কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ সাধন নয়। বরং তাঁর দয়া যাতে মানুষের উপর বর্ষিত হয় তাও।

কুরআন থেকে জানা যায় যে রসূল প্রেরণ একটি বিশ্বজনীন স্থায়ী ব্যবস্থা। "আমরা প্রতিটি জাতির জন্য রসূল পাঠিয়েছি"(কুরআন)। "আমি তাদের কাউকে কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (কুরআন)। মুসলমানরা অহী বা আসমানী গ্রন্থকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মানে। নবী রসূলগণ কেবল অহী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হন না বরং অহীকে যাতে মানুষরা যথাযথভাবে পালন করেন তার ট্রেনিং ও শিক্ষা নিজের জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়ে যান। সুতরাং বলা যেতে পারে অহীবার্তার সামগ্রিক ব্যাখ্যা হল নবীদের জীবনাচরণ। আর সেজন্যই নবী রসূলগণ হলেন মানব সত্ত্বা বিশিষ্ট।

রসূলগণ যেমনভাবে মানবজাতির পথ প্রদর্শক তেমনিভাবে জাতির নেতাও

বটে। তাঁরা নির্ভয়ে আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং তা প্রচার করতে গিয়ে যে সকল বাধা এসেছিল তা অতি ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন।

"তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছে যে তোমাদের মধ্যে একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত। তা সত্ত্বেও যদি তোমার দিক হতে মুখ ফেরায় তবে হে নবী তাদেরকে বল, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তাঁরই উপরে ভরসা রাখছি এবং মহান আরশের মালিক তিনিই।"

(কুরআন ৯ ঃ ১২৮-১২৯)

রসূলগণ যেমনভাবে সমস্ত মানবজাতির পথপ্রদর্শক তেমনিভাবে জাতির নেতাও বটে। তাঁরা নির্ভয়ে আল্লাহর বাণীকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং তা প্রচার করতে গিয়ে যে সকল বাধা এসেছিল তা অতি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন।

সমস্ত মানব সমাজে যত নবী রসূল এসেছেন তাঁদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে একটি অতি সাধারণ বিষয় পরিলক্ষিত হবে, তা'হল তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা ও তার বাস্তবায়িত করার আমরণ প্রচেষ্টা।

মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই আল্লাহ অসংখ্য নবী রসূলকে তাঁর বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তারা সবাই আল্লাহ আছেন এ সর্তকবাণী জানিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহর ভালবাসা ও ভরসার কথাও মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন।

আর এই নবী ও রসূল আসার ধারাবাহিকতায় প্রথম ছিলেন হজরত আদম (আঃ) ও শেষ হলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। এদের মধ্যবর্তী সময়ে আরোও তেইশ জন নবীর কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এদের বেশিরভাগ নাম বাইবেলেও উল্লেখিত।

এই সকল নবী রসূলগণ সবাই ছিলেন একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা সবাই আল্লাহর তৌহিদবাণী মানব জাতির জন্য বয়ে এনেছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নুহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়েত আমি ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে

দিয়েছিলাম; এই তাকিদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেও না। এই কথাই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে তুমি এই লোকেদেরকে আহ্বান করছ। আল্লাহ যাকে চান আপন করে নেন এবং তাঁর দিকে যাবার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন, যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে।"

(কুরআন ৪২ ঃ ১৩)

মহান আল্লাহ, যিনি মানবজাতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সাথেই রয়েছেন। আর এই সেই তৌহিদ বার্তা সকল মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে। আর এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলে থাকি,

"আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব।"

(কুরআন ২ ঃ ১৫৬)

মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আর তাঁরই মাধ্যমে তাঁর অহীর ধারাকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। আর বর্তমান সময়ে ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল আগত মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়ে চলেছে ও চলবে, এই শেষবার্তা মহাগ্রন্থ কুরআন। কিন্তু কি এই অহী? কুরআন নিজেই তার উত্তর প্রদান করেছে।

"কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনা সামনি কথা বলবেন, তার কথা হয় অহী রূপে কিংবা পর্দার পিছন হতে অথবা তিনি কোন পয়গাম বাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তার নির্দেশে যা কিছু চান অহী করেন। তিনি মহান সুবিজ্ঞানী। আর এমনিভাবে আমি আমার নির্দেশে একটি রূহ দ্বারা তোমার দিকে অহী পাঠিয়েছি। তুমি কিছুই জানতে না, কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক সোজা দিকে লোকদেরকে পথ দেখাচ্ছ।"

কুরআনের এই ঘোষণা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি? এর দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আল্লাহ কোন নবী বা রসূলের সাথে সরাসরি কথা বলে যোগাযোগ রাখেন না বরং তিনি তাঁর সামনে অহী অবতীর্ন করেন। আর এই অহী বহন করে আনেন বার্তাবাহক ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)। তিনি বিশ্বস্ত। শয়তান তাকে স্পর্শ

করতে পারে না। এইভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)এর উপর যে অহী বার্তা এসেছে তা হল পূর্ণ কুরআন। আর এই অহীই বার বার করে মুহাম্মদ (সাঃ)কে পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছে। নবী (সাঃ) যে আল্লাহর মনোনীত শেষ রসূল, তাও বলে দেওয়া হয়েছে পরিস্কারভাবে এই অহী মারফত। তিনি আল্লাহর অহীর আলোচনা দিয়েই সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা পর্যালোচনা করেছিলেন এবং তা দিয়েই তার সমাধান করেছিলেন। আর এই অহী বার্তা যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছিল তাই এ ছিল নির্ভেজাল সঠিক পথ। এক প্রদর্শনী আলোকবর্তিকা। নবী (সাঃ) অতীতে যেমন মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ছিলেন আজও সমস্ত মানুষের জন্য সমানভাবে আছেন।

মুসলমানরা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানবসমাজ ও আল্লাহর সাথে সংযোগকারী মাধ্যম বলে মনে করে না। তবে এটা মনে করে যে নবী (সাঃ) এর পুরো জীবনটা আল্লাহর দেখানো পথেই পরিচালিত, তাই তাঁর অনুসরণ করে চলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে। নবী (সাঃ) মানুষকে সরাসরি আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করতে বলেছিলেন যার সমকক্ষ কেউ নেই আবার যিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কারোর কাছ থেকে জন্মলাভও করেন না। তিনি তার সাহাবাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে আল্লাহ মানুষের খুব কাছে থাকেন। এমনকি তার একেবারে ঘাড়ের শিরারও নিকটবর্তী। তাহলে একজন কেমন করে পারবে সেই মহান আল্লাহকে এড়িয়ে থাকতে? এ সময় তার পাশের মানুষগুলো তার কাছে অলৌকিক কোন কিছু ঘটানোর জন্যও দাবি তুলেছিলেন কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে কুরআন ঘোষণা দিল,

“হে মুহাম্মাদ! বল, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তোমাদেরই মতো। আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের মা’বুদ শুধুমাত্র এক ও একক।

(কুরআন ১৮ ঃ ১১০)

“প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি করে আল্লাহর স্মরণ করে।”

(কুরআন ৩৩ ঃ ২১)

এই আয়াতগুলো মুসলমানদের এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবন আদর্শ এক চিরন্তন সত্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছে সর্বযুগের মানুষদের জন্য।

আর নবী (সাঃ) তো সেই জন্যেই 'মুস্তাফা'–আল্লাহর বাছাইকৃত ব্যক্তি।

"আমাকে অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন" নামের এই বইটি অতি সাধারণ এক বই যা নবী (সাঃ)এর জীবনের মিশন মানুষের কাছে তুলে ধরে। বিশেষত: ভারতবাসীর কাছে। আশাকরি বইটি পড়ার পরে পাঠকদের জীবনে পরিবর্তন আসবে। যেমনভাবে নবী (সাঃ) এর ছোঁয়া পেয়ে সারা আরব উপদ্বীপের মানুষদের জীবন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। আর তার ফলে সারা আরব জুড়ে এসেছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা, মানুষের জীবনে এসেছিল উন্নতির জোয়ার।

আমরা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি প্রধানত নবী (সাঃ) এর জীবনের সেইসব ঘটনা যেগুলোর দ্বারা তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে এবং তা সমগ্র মানবজাতির উপর প্রভাব ফেলে। কিভাবে আমাদেরকে সমাজে নানা স্তরে শিক্ষনীয় বিষয় দান করে। নবী (সাঃ) এর শিক্ষা এই বইতে যথেষ্ট উদাহরণসহ পেশ করা হয়েছে। নবী (সাঃ)এর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)কে, তিনি কোন প্রকার ইতস্তত না করেই উত্তর দিয়েছিলেন "তাঁর চরিত্রই হল কুরআন।" তাঁর জীবনের যা কিছু আদর্শ তার সবটুকুই ছিল কুরআন থেকেই নেওয়া। কুরআনের এই প্রেরণাদায়ী আদর্শ নবী (সাঃ)কে সীমাহীন আধ্যাত্মিকতায় ডুবিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রকারের যে শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে তা হল মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনের ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতা। ঐতিহাসিক বহু ঘটনা এমন রয়েছে যা চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সপ্তম শতাব্দীতে একটি বিশেষ সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নানান দিকের এক চিত্ররূপ ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। নবী (সাঃ)এর ইসলামী আন্দোলন, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কেমন ধরনের ছিল এবং সমগ্র মানব সমাজে এর কতটা প্রভাব পড়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এখানে। আর সব কিছু বিচার করা হয়েছে ইসলামের আলোকে। তাঁর কথা ও আদর্শ থেকে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে আমাদের চেতনা নাড়া পায়। যেগুলো মানবতার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা যা কিনা মানুষের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, ন্যায় বিচার, আইন, যুদ্ধ, সম্প্রীতি– সব কিছুকেই পরিব্যপ্ত করে আছে। সেজন্য এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি, চলমান সময়ের নানান সমস্যাকে কেমনভাবে ইসলামী চিন্তায় সমাধান করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের আলোচনা থেকে এটাও আমরা সহজে বুঝতে পারি যে নবী (সাঃ) তৎকালীন সময়ে যে বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা সমাজ থেকে

উৎখাত করতে পেরেছিলেন সে রকম আজও সমাজের সকল সমস্যা দূরীভূত হতে পারে তাঁরই জীবন অনুসরণের মধ্য দিয়ে।

পাঠক মুসলিম অমুসলিম যাই হোক না কেন সবাইয়ের কাছে এ গ্রন্থ নবী (সাঃ) -এর জীবন অনুসরণের আমন্ত্রন জানায়। এই গ্রন্থের অসংখ্য ঘটনা ঐতিহাসিক সত্যতায় পেশ করা হয়েছে, যা না-অনুসরণ করে আমাদের উপায় নেই। বর্তমান যুগের সমস্যার সাথে তার সামঞ্জস্য টানা হয়েছে এবং নবী (সাঃ) সে যুগে কিভাবে তা সমাধান করেছিলেন তারও চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। প্রতিটি অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাঠক কুরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর ও আন্দোলনের আধ্যাত্মিক সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক প্রভৃতির সাথে প্রাসঙ্গিক আধুনিক জগতের হাজার সমস্যার তুলনামূলক আলোচনার সুন্দর চিত্র দেখতে পাবেন এবং যেগুলো সবই ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে আলোচিত।

আমাদের মূল লক্ষ্য হল রসূল (সাঃ)কে আরোও বেশী করে চেনা। তাঁর দয়া, তাঁর রুচি, তাঁর মনোনিবেশ সব কিছু খুব গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে বইটিতে। একজন বিশ্বাস করুক আর নাই করুক একজন ব্যক্তি নবী (সাঃ)-র কার্যক্রম ও আন্দোলনের অর্থ বুঝতে অপারগ হবেন, এটা হতে পারে না। আমরা মনে করি এটা আমাদের প্রাথমিক কাজ। নবী (সাঃ)এর জীবন আমাদের জীবনে দর্পণের মত। আমরা যা কিছু করব নবী (সাঃ)এর আদর্শ দ্বারা তা প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আমাদেরকে সমাজের বর্তমান সমস্যাকে নবী (সাঃ)এর দেওয়া সমাধান সূত্র দিয়েই মোকাবিলা করা দরকার। সবকিছুর মধ্যে একটা সামাজিক ও নৈতিক সামঞ্জস্যতার প্রয়োজন আছে।

নবী (সাঃ) এমন ধরনের একজন শিক্ষক ছিলেন যে, যদি কেউ তাঁর শিক্ষা পেয়ে থাকে তবে তাকে অবশ্যই গভীরভাবে কিছু ভাবতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবে সে যেন এক মহাসত্যের আমন্ত্রন অজান্তেই পেয়ে যায়।

এ বই লেখা হয়েছে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে। এতে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা অতি সহজ, তা বুঝতেও যেমন সহজ, মানতেও তেমনি সহজ। নবী (সাঃ)এর এই ঐতিহাসিক কার্যকলাপ এত পরিস্কার যে কোটি কোটি মুসলিম এর শ্বাসত অনুশাসন মেনে চলছে অহরহ। তাই এই বই ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য একটি জীবন্ত মাধ্যম বলা যেতে পারে।

নবী (সাঃ)এর সাহাবাগণ তাঁকে অতি ভালবাসতেন। আর তাঁর কাছ থেকেই তারা সবসময় আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়ে ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈন্যদের মত। তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন আল্লাহকে ভালবাসতে এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন শিক্ষা দিয়েছে,

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" (কুরআন ৩ ঃ ৩১)

মুসলমানরা যা কিছু করবে তা সমস্ত কিছুই রসূলকে অনুসরণ করেই করবে। আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা যে আল্লাহকে ভালবাসি তার প্রমাণ মিলবে। যে যত রসূল (সাঃ)কে ভালবাসে সে ততই আল্লাহকে ভালবাসে।

রসূলের প্রতি এ ভালবাসা কখনও ম্লান হওয়া উচিৎ নয়। আর এর বাস্তব উদাহরণ মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই। প্রকৃত মুসলমানরা নবী (সাঃ)কে কোন সময় ভালবাসা থেকে দূরে সরায় না। কারণ কুরআনের ঘোষণা,

"আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর শান্তি বর্ষণ করে থাকেন। হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার প্রতি শান্তি বার্তা প্রেরণ কর, তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর।" (কুরআন ৩৩ ঃ ৫৬)

কুরআনের এই আদেশ মুসলমানরা কিভাবে পালন করে থাকে তা দেখলে আমাদের অবাক হতে হয়। একজন মুসলিম দৈনিক কমপক্ষে আট দশবার শান্তিবার্তা প্রেরণ করে থাকে রসূলের উদ্দেশ্যে।

এই বই নবী (সাঃ)কে ভালবাসা জানানোর একটি প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। মুহাম্মদ (সাঃ)এর জীবন আমাদের কাছে একটি উৎসাহ। আমাদের জীবনে সুখ দুঃখ ব্যাথা বেদনায় নবী (সাঃ)এর জীবন এক সমাধান সূত্র। এক অগ্নি পরীক্ষা! আমাদের বর্তমান জীবনে যে সকল প্রশ্ন অনবরত উদ্ভুত হয় তার যথাযথ উত্তর আমরা নবী (সাঃ)এর জীবন থেকে পেতে পারি। তবে এটা সহজ সত্য কথা যে আমরা যদি তাঁকে চিনতে না পারি তবে তাঁর প্রতি ভালবাসা আমরা কিভাবে দেখাতে পারি– এই গ্রন্থ সেই সমস্যার সমাধান করে। আমি নবী (সাঃ)এর জীবনের ঘটনাগুলো যথাসাধ্য গবেষণামূলক পড়াশোনার পর সংগ্রহ করেছি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে আমি কাতর আবেদন করি আমার এই প্রচেষ্টা মঞ্জুর করে নেওয়ার জন্য। আমি যাতে সহজ পথের পথিক হতে পারি তার জন্য তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যা কিছু করেছি

সেই মহান আল্লাহর জন্য করেছি। আমার অসংখ্য ভুলের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, ওগো আল্লাহ! তুমি আমার সাহায্যে সব সময় থেকো, আমার প্রচেষ্টাকে তুমি গ্রহণ করে নাও।

"......এই যা কিছু আমি করতে চাই তা সব কিছু আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

(কুরআন ১১ ঃ ৮৮)

ব্যাঙ্গালোর

জানুয়ারী-২০১২ — সাইয়েদ হামিদ মহসিন

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/

I

কাবা

আল্লাহর ঘর

ইসলামি ঐতিহ্যধারায় কাবা ঘরের গুরুত্ব অপরিসীম। আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যে স্রষ্টার ঘর ও একত্ববাদের প্রচারকেন্দ্র হিসাবে কাবা'র গুরুত্ব ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) মিলিতভাবে এই কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত নবী রসূলের প্রভু ও মানব জাতির স্রষ্টা একমেবা দ্বিতীয়মের প্রচার প্রসার। অতীতের বহু শতাব্দী ধরে এই কাবা বেষ্টিত শহর মক্কা বিভিন্ন জাতির তীর্থ স্থান ও পরে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিশেষ ভূমিকা বহন করে এসেছিল। আর সেই সূত্রে বিভিন্ন জাতির আনাগোনায় গড়ে উঠেছিল এক মিশ্র সংস্কৃতি। সময়ের ধারাবাহিকতায় এই সকল জাতি নিজেদের একক স্রষ্টার কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের মত করে আলাদা আলাদা দেবদেবীদের পূজা অর্চনার সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে। এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে বহুত্ববাদের ফল্গুধারা। ইসলামি ইতিহাস আমাদের জ্ঞাত করায় যে, যখন কুরআনের বাণী অবতীর্ন হচ্ছিল তখন একত্ববাদের পীঠস্থান কাবাগৃহে অনুষ্ঠিত হত তিনশত ষাটেরও অধিক কল্পিত দেবদেবীর পূজা-অর্চনা। এমনকি ওই দেবদেবীরা ওই গৃহেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি জাতি কেবল এক স্রষ্টার পূজারী হিসাবে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তারা নিজেরা 'হানিফ' অর্থাৎ পবিত্র নামে পরিচয় দিতেন। কুরআন এই ধরনের মানুষদেরকেও 'হানিফ' বা পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছে। এরা ছিল ইব্রাহিম (আঃ)-এর প্রচারিত একত্ববাদের অনুসারী সৎ ও পবিত্র মানবজাতি।

কুরআনে বলা হয়েছে,

“বস্তুত যে ব্যাক্তি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততার সাথে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহিমের পথ অনুসরণ করে - সেই ইব্রাহিমের পথ যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন – তার অপেক্ষা উত্তম জীবনযাপন পন্থা আর কার হতে পারে ? ”
(কুরআন - ৪ ঃ ১২৫)

মহানবী (সাঃ)-এর জন্ম

আরবের বিখ্যাত গোষ্ঠী বনু হাসিম গোত্রে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল হজরত মুহাম্মদ (সা:) জন্মগ্রহণ করেন। মক্কার অন্যান্য গোষ্ঠী বনু হাসিমদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখত। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ হজরতের জীবনের শৈশব বেদনাদায়ক ঘটনা প্রবাহে জর্জরিত। তিনি যখন মাতৃগর্ভে মাত্র দু মাসের, তখন তার পিতা আব্দুল্লাহ পরলোক গমন করেন। আর এ অঘটন ঘটেছিল যখন তিনি বাণিজ্য উপলক্ষ্যে মক্কার উত্তরে অবস্থিত ইয়াসরেবে যাত্রা করছিলেন। জন্মেই মুহাম্মাদ (সা:) পিতৃহারা আবার তিনি আরবের এক স্বনামধন্য গোত্রের সন্তান-এ যেন আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলা।

‘মুহাম্মদ’ এমন একটি শব্দগুচ্ছ যার অর্থ ‘যিনি প্রশংশিত হন’। সারা আরবে এরকম নাম খুঁজে পাওয়াই যেত না তখন। মাতা আমিনা যখন থেকেই তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন থেকেই যেন তার মনের মধ্যে এ নামের আনাগোনা। এ নামের গুঞ্জন যেন চারিদিক থেকে তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করত। আর মুহাম্মাদ (সা:)-এর জন্মলগ্নে তিনি যেন শুনতে পেলেন এক মনোরম শ্রুতিমধুর ঝংকারধ্বনি ‘মানব কূলের নেতা’। তাই তিনি শত্রুদের নির্যাতনের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন এক আল্লাহ, অহিদ-এর কাছে। এতেই পরিতৃপ্ত হল মাতা আমিনার দেহমন। এমনকি এতে তার গর্ভ যন্ত্রণাও যেন মিলিয়ে গেল আনন্দমধুর ধরাধামের খোশ আমদিদ মলয় সঞ্চারণে।

মরুময় পরিবেশ

আরব গোত্রীয় বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী প্রথার নিয়মে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) লালিত পালিত হওয়ার জন্য প্রেরীত হলেন বনু সাদ নামে এক বেদুইন গোত্রে। এই গোত্রের হালিমা নামে এক ধাত্রীর কাছে দীর্ঘ চার বৎসর ধরে তিনি লালিত পালিত হলেন। আর এখানেই তাঁকে অভ্যস্ত হতে হয়েছিল এক যাযাবরিয় জীবনযাত্রায়। চারিদিক শুধু

বালির সমুদ্র, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকের দিগন্ত কেবল বালি সমুদ্রকেই আলিঙ্গন করে। রুক্ষ পরিবেশ, কঠিন বাস্তব কিন্তু একে নিজেকে চেনার, নিজের স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার, ভাবার উপযুক্ত পরিবেশ। তিনি নিজেই জানেন না যে তাঁর নবী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি পর্বের এটাই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তাঁর পরম প্রভু রব যে তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষক, তাঁকে বাছাই করে এনেছেন নবী পদে অভিষিক্ত করার জন্য - তা নিজেই জানেন না।

পরে কুরআন প্রত্যাদিষ্ট আয়াতে তার অনাথ অসহায় অবস্থা ও তাঁকে চরম ও পরম ঐশী শিক্ষা প্রদানকে নিচের ভাষায় ব্যক্ত করেছে ঃ

> "তিনি কি তোমাকে অনাথরূপে পাননি এবং পরে আশ্রয় দান করেননি ? এবং তোমাকে পথ অনভিজ্ঞরূপে পেয়েছেন, পরে হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি অনাথদের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবেনা এবং প্রার্থীকে ধিক্কার তিরস্কার করবেনা আর তোমার প্রভুর নেয়ামত (দানকে) প্রকাশ করতে থাক।" (কুরআন - ৯৩ ঃ ৬-১১)

কুরআনের এই বাক্যগুলি বহুবিধ শিক্ষাই আমাদের কাছে তুলে ধরে, তিনি ছিলেন অনাথ আবার দরিদ্র অসহায়, আর ভবিষ্যতে যে নবী হতে চলেছেন এটা তার অন্তর্নিহিত লক্ষণ, নবী হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রেরণাপূর্ণ কঠোর অবস্থা তার মধ্যে দরকার ছিল। কমপক্ষে দুটি কারণে তার এই বাস্তব অবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনের কথা বলে, প্রথমত বিনয় ও উদারতার জন্য যে নমনীয়তা ও কোমলতার প্রয়োজন তা তার নিজের জীবনের শৈশব থেকেই আত্মস্থ হয়েছিল। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তিনি পিতাকে হারিয়েছিলেন, আবার ছয় বছর বয়েসে তিনি মায়েরও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁকেও হারালেন। এ ব্যাথা পিতৃ বিয়োগান্ত ব্যাথাকে আরো মথিত করে তুলেছিল। আর এই চরম অবস্থা একেবারেই আল্লাহর আশ্রয়ের প্রার্থী বানিয়ে তুলেছিল তাঁকে। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে তাঁর অনুভূতিতে তিনি অনাথ-এতিম, দরিদ্র অসহায় মানুষের অনেক কাছাকাছি হতে পেরেছিলেন। চারপাশের দুদর্শাগ্রস্থ মানুষগুলির ব্যাথাকে তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতে শিখেছিলেন নিজের ব্যাথার সুরের মধ্য দিয়ে। আর তার নবীজীবনের ধারাবাহিকতায় তিনি যাতে তার নিজের অবস্থা ভূলে না যান সে কারণে কুরআনে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তো নিজেই একটা অনাথ অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন তাই তার কোন দিনই ভুলে গেলে চলবে না যে, তাঁর পারিপার্শ্বিক ব্যাথা বেদনা দূর করাই তাঁর অন্যতম মিশন। সারা বিশ্বের হাত পাতা মানুষের জন্য অবশ্য তাঁকে কিছু করতে হবে।

দ্বিতীয়ত এটা থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, কারোর অতীত অবস্থা

কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তার গোত্র বংশ,পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশাচার, কৃষ্টি সংস্কৃতি সব কিছুর ভালো মন্দ বিচার করে জীবনের সঠিক পথ অতিক্রান্ত করা একান্ত ভাবে দরকার। একমাত্র মহান প্রভু এ কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে উত্তম শিক্ষার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি যদি বাস্তব কঠোর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন শৈশবে না হতেন তাহলে পরবর্তীতে নবীত্বের কঠোর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না। তাই এই শিক্ষার চেয়ে আর বড়ো শিক্ষা তিনি অন্য কোন কিছু থেকে পেতেন না। আর এটাও সত্য যে একমাত্র মহান আল্লাহই তাঁকে শৈশবেই এমন অভিজ্ঞতা দান করে ভবিষ্যতের সফলকাম ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন।

প্রকৃতির কোলে শিক্ষা

মরু জীবনের স্পর্শধারায় একজন মানুষ সন্ধান পেলেন সৃষ্টি জগতের নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য রহস্য। বিশ্ব সৃষ্টির উপায় উপাদানের সাজুয্য ও সামঞ্জস্যতা, প্রকৃতি রহস্য মেলে ধরল তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। একজন তরুণ যুবক মরু পরিবেশে জীবন কাটালেন। বেদুইনদের কাছে শিক্ষা নিলেন ভাষা সাহিত্যের ছন্দময়, ঐতিহ্যবাহী সারল্য ও সুলালিত্ব। যে ভাষা ছিল একজন দক্ষ শাসকের শাসনতান্ত্রিক, ক্রিয়াকলাপের উপযোগী কথ্য ভাষার প্রাঞ্জলতা। পরবর্তীকালে নবী (সাঃ)-এর এই শৈশব ভাষা চিরসত্য ইসলামী মিশনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল। এ ভাষার ছিল নিজস্ব বাকধারা, ভাবগাম্ভীর্য ও হৃদয় স্পর্শকারী আহ্বান।

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলো প্রকৃতির উদারতার স্নিগ্ধতায় শীতল ছিল। তিনি প্রকৃতির সাথে তাঁর হৃদয়কে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, প্রকৃতিকে তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। প্রকৃতির আত্মীয়তায় তিনি ছিলেন নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। প্রকৃতির যে দিকেই তাকানো যাক না কেন তা ছিল বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণকারী এক একটি নথিপত্র। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও মরুভূমির শিক্ষা এবিষয়ে আলাদা মাত্রা যোগ করে। স্রষ্টাকে অনুভব করার জন্য ভাবগম্ভীরে নিয়ে যাওয়াও মরুভূমির মত এরকম আর কোন প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নেই বললেই চলে, প্রকৃতির এই উদারবক্ষে মানুষের হৃদয় না খুলে পারে না, এখানে মনুষত্বের বিকাশ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এখানেই মানুষ অনুভব করতে শেখে তার জীবনের সার্থকতা। মরুভূমির নানান উপাদান জীবন মৃত্যুর প্রতীক হয়ে মানুষের জীবনে বার বার আসে। এগুলো থেকে এক অর্থপূর্ণ জীবনের মৌলিক সত্যতার জ্ঞান সাধারণভাবেই এসে

পড়ে। এর থেকে জীবন মরণের অলৌকিকতা অস্বীকার করা যায় না। কুরআনের উদাত্ত ঘোষণা,

> “যাদের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি রয়েছে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী সমুদ্রে ভাসমান চলমান নৌকা সমূহে, উপর হতে বর্ষিত বৃষ্টি ধারায় ও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ুর প্রবাহে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।” (কুরআন ২ ঃ ১৬৪)

নিঃসন্দেহে এটা বলা যায়, জীবনের প্রাথমিক ধারায় তাঁকে একজন প্রকৃতি অনুভাবী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রকৃতির পরতে পরতে যে বিস্ময়, যে রহস্য, যে সামঞ্জস্যতা তা অনুধাবন করার জন্য তাঁকে প্রকৃতির কোলে একান্তভাবে লালিত পালিত হওয়ার সুযোগ সরবরাহ করা হয়েছিল।

অনেক বছর পরে যখন তিনি মদিনায় দিন কাটাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক পানি গড়িয়ে গেছে – একদিন রাত্রিতে তার উপর অহি বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হল। আর এতে তিনি অনুভব করলেন জীবন চিন্তায় নতুন এক দিগন্ত।

> “নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাত্রির আবর্তনে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী।”
> (কুরআন ৩ ঃ ১৯০)

কুরআনের এই বাক্যগুলি যখন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হল, তিনি সারা রাত্রি ধরে কাঁদলেন, সকালে যখন মুয়াজ্জিন বিলাল আযানের জন্য আসলেন এবং রসূলের কান্না অবলোকন করলেন তখন তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাঁর দুঃখ বর্ণনা করে বললেন,

> *“বেদনা সেই ব্যক্তির জন্য যে কুরআনের এই বাণী শুনল কিন্তু চিন্তা ভাবনা করল না”*

অনাথ এবং তার শিক্ষক

ধাত্রী হালিমার গৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে এলেন বালক মুহাম্মদ (সা:)। মা আমিনার সাথে বাস করলেন মাত্র দু বছর। বয়স যখন ছয় ছুঁইল তিনি হারালেন মাকে। মা-ই

তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন মদিনায় আত্মীয়দের সাথে তার পরিচয় করাতে। সেখান থেকে ফেরার পথে আবা নামক স্থানে মা আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং মৃত্যুর করাল গ্রাস তাকে তার সন্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। সেখানেই সমাধিস্থ হলো মা আমিনা। এখন চারিদিক অন্ধকার, মাও নেই, বাপও নেই, চারিদিকের ব্যাথা বেদনার পরিবেশ তাকে ঘিরে ধরল। সঙ্গে সাথি রাখাল বারাকা কোনরকম মক্কায় ফিরিয়ে আনলেন বালক মুহাম্মাদ (সা:)কে। দাদা আব্দুল মুত্তালিব কালবিলম্ব না করে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। বালক মুহাম্মদ (সা:)-কে যেমনভাবে পরম ভালবাসার বন্ধন দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন দাদা মুত্তালিব ঠিক তেমনই শ্রদ্ধার সিংহাসনে তিনি আসীন হলেন নাতি মুহাম্মদের (সা:)। সমস্যাবহুল জীবন নিয়েই জীবন প্রবাহ গড়িয়ে চলল হজরতের। তার এই জীবন সমস্যায় স্বান্তনা দিতেই কুরআনের প্রত্যাদেশ,

> *“কষ্টের মধ্যে রয়েছে স্বস্তি, নিশ্চয় কষ্টের মধ্যে রয়েছে স্বস্তি।’*
> *(কুরআন ৯৪ ঃ ৫-৬)*

আট বছর বয়সে তাঁকে ঘিরে ধরল ব্যাথা, বেদনা ও দারিদ্রের করাল গ্রাস। মাকে তো হারিয়েছেন এখন দাদা মোত্তালেবও তাঁকে রেখে ওপারে পাড়ি দিলেন। তাঁর জীবন চলার পথে নানান বিপত্তি বাধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাঁর চলার পথের সব বাধা বিপত্তিকে তিনি অনুভবের বিশেষ নিদর্শন হিসাবে মেনে নিলেন। এগুলো যেন বিশেষ এক জ্ঞানের নির্দেশক হিসাবে তাঁর বিবেকে সাড়া দিল।

দাদা মোত্তালেব আবু তালিবকে ডেকে নাতি মুহাম্মদ (সা:)এর ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি ছিলেন তার কাকা, মৃত্যু শয্যার এই উপদেশ বাণী কাকা আবু তালিব মাথা পেতে নিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সন্তানতুল্য ভালবাসা দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) কে লালন পালন করেছিলেন। আর তাঁকে সমভাবে ভালবাসা দিয়েছিলেন কাকী আসাদ কন্যা ফাতিমাও। “কষ্টের মধ্যে স্বস্তি রয়েছে” কুরআনের এই আশ্বাস বাণীর বাস্তব প্রমাণ হজরতের নিজের জীবনের এই অবস্থা।

তাঁর জীবনের চড়াই উৎরাই নানা কষ্টের মধ্যে কাটলেও তিনি সবসময় মহান স্রষ্টা আল্লাহর করুণার ছায়াতলে স্থান পেয়েছিলেন। আল্লাহ ছিলেন তাঁর সবসময়ের সাথী ও শিক্ষক। তাঁর মক্কা জীবনের ইতিহাসে এটাই উদ্ঘাটিত হয় যে, তিনি ছিলেন সবরকম অপবিত্র কাজকর্ম থেকে পবিত্র মানুষ। নাচ গান হৈ হুল্লোড়ের পঙ্কিলতা থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। তিনি কোন দিন মদের আসরে বসেন নি, জুয়া-সাট্টার কালিমাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, ভুরিভোজের লালসায়ও তাঁর জীভের জল গড়িয়ে পড়তো না কোন সময়ে। তিনি ছিলেন সংযমী জীবনের মূর্ত প্রতীক।

উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা, একদিন সন্ধ্যায় তিনি এক বিয়ে বাড়ির উদ্যাম পার্টি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। মক্কার এরকম অনুষ্ঠান ছিল কেবল মদ-নারীর বেলেল্লাপনা। রুচিশীল কোনকিছু ছিল না এরকম অনুষ্ঠানগুলিতে। সাধারণত তিনি এইরকম অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু একদিন তিনি এই পার্টিতে পা বাড়ালেন। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ পথিমধ্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পা ওঠাতে পারলেন না সামনের দিকে, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন সেখানেই। সারারাত্রি ঘুমিয়ে রইলেন, সকালের তীব্র রোদ যখন তাঁর গায়ে পড়ল তখন তাঁর ঘুম ভাঙল। এ ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় মহান স্রষ্টা যাকে সারা বিশ্বের নবী হিসাবে মনোনীত করবেন তাঁকে কীভাবে সমস্তরকম পঙ্কিলতার মধ্য থেকে স্বতন্ত্র পবিত্রভাবে গড়ে তোলেন। মুহাম্মাদ (সা:) পাশবিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি কোনদিন মদ স্পর্শ করেননি। ব্যাভিচারের ছয়লাপ যখন সারা আরব জুড়ে তখন তিনিই ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। সমস্ত আরব যুবকের এই অনাচার ও কদাচার জীবনশৈলী ফ্যাশান হলেও তিনি এগুলো বর্জন করেছিলেন একেবারে ঘৃণায়। কেবলমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহই বাঁচিয়ে ছিলেন পঙ্কিলজীবনের শতকরা একশভাগ সম্ভাবনা থেকে। স্রষ্টার দয়া যদি তাঁর উপরে না থাকত তাহলে বর্বর এই সমাজ ব্যবস্থায় তিনিও (নাউযুবিল্লাহ) বর্বরই হয়ে যেতেন। উপরের ঘটনায় তাঁর হঠাৎ করে নিদ্রা যাওয়া আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্রষ্টার সাহায্য পেয়েছিলেন বলেই তিনি নিজের পা'কে রুখতে পেরেছিলেন অন্যায় পথ থেকে। অন্যায়ের পথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল এক অব্যক্ত মরুঝড় তুল্য সাইমুম। আর এ চেতনাই ছিল তাঁর সারা জীবনের পথ চলার সাথি।

মেষের রাখাল যুবক

এর পরের বছরগুলোতে তিনি মেষের রাখাল হিসাবে জীবন কাটালেন আর তাঁকে এ পেশা নিতে হয়েছিল জীবিকা অর্জনের জন্যই। নিজের জন্য দুমুঠো অন্ন। এক টুকরো বস্ত্র তো দরকার। ছাগল, ভেড়া আর উটের পাল নিয়ে তিনি মক্কার নিকটবর্তী উপত্যকাগুলোতে চরিয়ে বেড়াতে লাগলেন। মরুভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁকে সময়ে সময়ে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল এই গবাদি পশুগুলোকে নিয়ে। এটা তাঁকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার বিরাট সুযোগ করে দিয়েছিল। আর এর থেকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন বিশ্ব স্রষ্টাকে। আর এ জন্যই তিনি তাঁর জীবনের এই অধ্যায়কে খুব গর্বের চোখে দেখতেন। এটা তাঁর কাছে মোটেই মামুলী ব্যাপার নয়, তিনি প্রায়শই এ কথা বলতেন - "আল্লাহ কোন নবীকে মেষের রাখাল ছাড়া প্রেরণ

করেননি। নবী মোজেস বা মুসা ছিলেন একজন মেষ পালক, নবী দাউদও(ডেভিড) ছিলেন একজন মেষ পালক।”

গরু ছাগল উটের পালকে নিজের বশে আনা খুবই শক্ত কাজ। ভাল মন্দের বোধহীন পশুগুলোকে আয়ত্বে আনতে গেলে ধৈর্য ও সবরের একান্ত প্রয়োজন। পশুদের একগুঁয়েমী সম্বন্ধে আমাদের কমবেশী সকলের জানা আছে। একবার একগুঁয়েমীর বদখেয়াল চেপে বসলে এদের কিছুতেই আয়ত্বে আনা যায় না।

জীবনের এই অধ্যায়ে নবী (সাঃ) পেয়েছিলেন ধৈর্যের শিক্ষা। বিচক্ষণতার শিক্ষা। সদা সতর্কতার শিক্ষা। কোন কিছু করতে গেলে যে দৃঢ়তা দরকার হয় তিনি তাও শিখেছিলেন জীবনের এই অধ্যায় থেকে। আর এধরনের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর ভবিষ্যতে নবী হওয়ার জন্য। তাঁর নবীত্বের পূর্ণতার জন্য। কারণ নবীদের কাজ'ই হল পথভোলা মানুষগুলোকে চালিয়ে আল্লাহর পথের পথিক বানানো। তাদেরকে আল্লাহর দেয়া শান্তিপূর্ণ পথে নিরাপত্তা দান করাই তো নবী রসুলদের একমাত্র মিশন। আমরা দেখেছি একেবারে শৈশব থেকেই তিনি নানারকম ট্রায়ালের সম্মুখীন হন যা তাঁকে ইসলামী মিশন প্রচার ও বাস্তবায়ন করার জন্য একেবারে যোগ্য করে তুলেছিল।

2

নবুয়্যতের চিহ্নসমূহ

হজরতের পিতামহ একটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, তার জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার আর্থিক অবস্থা দিন দিন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল, এবং পুত্র আবু তালিব যিনি পরে হজরতের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তারও আর্থিক অবস্থার নানান অবক্ষয় দেখা দিল। তাই আবু তালিব হজরতের জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপার্জনের রাস্তা দেখিয়েছিলেন শৈশবের শুরু থেকেই। আর তাঁর এই উপার্জন পরিবারের অন্যান্যদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল।

আবু তালিব নিজেই ছিলেন একজন বণিক। এক সময় তিনি সিরিয়ায় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে যেতে আগ্রহী হলেন। সেই সময় হজরত মুহাম্মদ (সা:)ও এই বাণিজ্য কাফেলায় স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এ বাণিজ্য যাত্রা মোটেই সুখকর কাজ নয়। এর জন্য নানারকম অসুবিধা অপেক্ষা করে। কিন্তু বালক নবী নাছোড় বান্দা; তিনি সব কষ্ট স্বীকার করেও এ বাণিজ্য যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। তাই আবু তালিব তাকে বাধা দিতে পারলেন না। কারণ তিনি খুবই ভালবাসতেন হজরতকে। সঙ্গে নিলেন স্নেহের ভ্রাতৃস্পুত্রকে।

সিরিয়ার বুসরা নামক স্থানে তাদের এ বাণিজ্য কাফেলা অবস্থান করল। এখানেই সাক্ষাৎ হল প্রখ্যাত খৃষ্টান সন্ন্যাসী বাহিরার সাথে। প্রাচীন প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থগুলিতে শেষ নবী আগমনের বার্তা তিনি জানতেন। এমনকি শেষ নবীর নানান চিহ্নের কথাও তিনি জানতেন।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় আরব উপদ্বীপের হানুফা, খ্রীষ্টান ও ইহুদী পন্ডিতদের মত বাহিরাও শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। নবীর বিভিন্ন চিহ্নও তিনি জানতেন। আর নবী হওয়ার এ চিহ্ন সমূহ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

খুব গভীর মনোযোগের সাথে খৃষ্টান সন্ন্যাসী বাহিরা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন

যে, যখন এ বাণিজ্য কাফেলা তাদের নগরে পৌঁছাচ্ছিল তখন মরুভূমির তপ্ত বালিতে একখণ্ড মেঘ তাদেরকে ছাতার মত আড়াল করে আসছিল।

এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি ভেবেছিলেন যে, এ কাফেলার কাছ থেকে তার অনেক পাওয়ার আছে, অনেক জানার আছে। তাই তিনি সুযোগ হারালেন না। পুরো কাফেলাকে ভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। ভোজ সভায় তিনি প্রত্যেক সদস্যকে খুব সর্তকতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে চললেন। অবশেষে তিনি হাজির হলেন যুবক মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে। ভুল করলেন না তিনি, চিনে ফেললেন তাঁকে। আলাদা করে পাশে ডেকে নিলেন। তারপর একে একে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন পরিবারের নানান কথা। তাঁর সমাজের পরিপ্রেক্ষীত নানান অবস্থা। তারপর তাঁর স্বপ্নের কথা। যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে একে একে উত্তর শুনে অবাক হলেন খৃষ্টান সন্ন্যাসী বাহিরা, অবশেষে হজরতের কাছে একটি অনুমতি চাইলেন তার পবিত্র পিঠ-মোবারক অনাবৃত অবস্থায় দেখার জন্য। বাহিরার এই আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন। বাহিরার সামনে তিনি অনাবৃত করলেন তাঁর পৃষ্ট মোবারক। চমকে উঠলেন বাহিরা! যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর দুই কাধের হাড়ের মাঝে তিনি দেখতে পেলেন শেষ নবী হওয়ার শীলমোহর, যা চামড়ার উপর ফুলে উঠে স্পষ্ট হয়েছে। তিনি তো পূর্ব থেকেই ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জেনেছিলেন যে শেষ নবীর পৃষ্ঠ মোবারক শেষ নবী হওয়ার শীলমোহর অঙ্কিত থাকবে। সন্ন্যাসী বাহিরার আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না।

এরপর বাহিরা আবু তালিবকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তার কে হন ? আবু তালিব বললেন "আমার পুত্র"। কিন্তু আশ্চর্য হলেন বাহিরা, তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, এর পিতা বেঁচে থাকতে পারে না। আবু তালিবও অবাক হলেন বাহিরার দৃঢ়তার জন্য। তিনি বাহিরাকে খুলে বললেন যে তার পিতা তার জন্মের আগেই পরলোক গমন করেছেন। সব কিছু শোনার পর বাহিরার কোন সন্দেহের অবকাশই রইল না। আবু তালিবকে তিনি জানিয়ে দিলেন মহা সত্য কথাটি। তিনি বললেন "তিনি হলেন সমগ্র মানব কূলের নেতা, আল্লাহ তাঁকে নবী করে পাঠাবেন আর তিনি হবেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য আশীর্বাদ।" অবাক বিস্ময়ে আবু তালিব সন্ন্যাসী বাহিরাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি করে জানলেন ?" বাহিরা ভাব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন "যখন আপনি আকাবায় আসলেন তখন সমস্ত পাথর ও গাছপালা প্রনতি জানিয়েছিল আর এটা কেবল একজন নবীর জন্যই করেছিল। আমিও তাকে চিনে ফেললাম তার দুই কাঁধের মাঝে পিঠে অবস্থিত আপেল সদৃশ শীলমোহার পর্যবেক্ষণ করে।" এখন বাহিরা আর কাল বিলম্ব না করে তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তার কণ্ঠে দৃঢ়তা ঝরে পড়ছিল, "আল্লাহর কসম, তিনি যদি পরিচিত হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত হবেন"। আবু তালিব সন্ন্যাসী বাহিরার কথা উপলব্ধি করলেন। শীঘ্রই বাণিজ্য কাফেলার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন স্বদেশ অভিমুখে। না জানি প্রাণপ্রিয় পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতৃস্পুত্রের যদি কোন কিছু অঘটন ঘটে যায়।

শান্তি সংঘ

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স তখন পনেরো'র কোঠায়। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল হজের মৌসুম। কুরাইশ ও হাওয়াজীন গোত্রের মধ্যে বেঁধে গেল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সাধারণত মক্কায় হজের মৌসুমে এ ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে নিষেধ ছিল। তাই এই সময়কে পবিত্র মাস বলেই অভিহিত করা হত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা স্বত্ত্বেও এই যুদ্ধবিগ্রহ নিজেদের মধ্যে চার বছর ধরে চলতে লাগল। উভয়পক্ষের লোকেদের জীবনযাত্রায় অনেক ক্ষতি সাধিত হল। অর্থ সামগ্রী ফল ফলাদী সব কিছুই নষ্ট হতে রইল নির্বিচারে। উভয়পক্ষের বহু মানুষের প্রাণ হারাতে রইল অনবরত।

যুবক মুহাম্মাদ (সাঃ) এর হৃদয়ে বড় আঘাত হেনে চলল এই অবিবেচিত বর্বর অযৌক্তিক যুদ্ধ লীলা। রক্তঝরা এ যুদ্ধের তিনি কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না , কেবল তাঁর মনে নয় বরং আরোও অনেক যুবকের হৃদয়েও ব্যাথা অনুভূত হল একইভাবে। সবাই ভাবল এ অরাজকতা বন্ধ হওয়া একান্তভাবে দরকার। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সকলের বুকে একটি আকুলি বিকুলি দেখা দিল।

বিখ্যাত অর্থশালী সুগন্ধী ব্যবসায়ী জুদান পুত্র আব্দুল্লাহ-এর সমাধানের জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি সমভাবাপন্ন কিছু মানুষদের তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। এরা সবাই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। সবাই মিলে যুদ্ধ বন্ধ করে একটি শান্তি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তারা একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তিতে এটাই স্বীকৃতি লাভ করল যে, যে পক্ষেরই হোক না কেন এ যুদ্ধে আর্তদের পাশে তাঁরা থাকবেন। তাঁরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। আর একাজে তাঁরা একেবারে ঐকান্তিকভাবে নিরপেক্ষ থাকবেন। তাঁরা কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না। ন্যায় ও সততার মূর্ত প্রতীক হিসাবে এই সংঘ কাজ করবে। যুবক আব্দুল্লাহর মত আরোও অনেকেই এই সংঘের কাজে এগিয়ে এলেন উদার হৃদয় নিয়ে।

অনেক বছর পর যখন মুহাম্মদ (সা:)এর উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হচ্ছিল তখনও তিনি ভুলেননি এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির কথা। তিনি এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে ফেলেছিলেন,

"জুদান পুত্র আব্দুল্লাহর বাড়িতে যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আমি তার কোন অংশ পরিবর্তন করতে পারি না। এটা ছিল অতি চমৎকার, এমন কি মহামূল্যবান একপাল লাল উটের বিনিময়ে হলেও। এমনকি আজ ইসলাম কায়েম হওয়ার পরও আমি এ চুক্তির প্রতি খুশি।"

এ চুক্তি যে কেবল দুটি যুযুধান গোষ্ঠীর ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য দাওয়াই

ছিল তা নয়, বর্তমান ইসলামী যুগেও তার গুরুত্ব খুবই, এ চুক্তির সারকথার প্রতি তিনি দীর্ঘ দিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এরকম মহৎকাজে তিনি সব সময়ই তৎপর। মূল কথা হল সত্য ইনসাফপূর্ণ নিয়মনীতি যেখান থেকেই আসুক না কেন তিনি তা গ্রহণ করতে কোন সময় ইতস্ততায় ভুগতেন না। সত্যের মূল্য তার কাছে অনেক ছিল। সত্যের পাশে দাঁড়ানো ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের মৌলিক গুণ হওয়া দরকার। সত্যকে আঁকড়ে ধরা দরকার। সত্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে সত্যকে বর্জন করা উচিত নয় এটা তিনি অনুভব করেছিলেন হৃদয় থেকে।

সততার বিমূর্ত প্রতীক

মেষ পালকের জীবন গত হওয়ার পর যুবক মুহাম্মদ (সা:) প্রবেশ করলেন ব্যবসায়ী জীবনে, একাজে তার সততা, দক্ষতা তাকে সম্মানিত করে তুলল আশেপাশের সমগ্র এলাকায়।

কৈশরের প্রারম্ভে আল্লাহ নিজেই তাকে রক্ষা করলেন অজ্ঞতার ওই পরিবেশ থেকে, যে অজ্ঞতা বিরাজ করছিল সারা আরব জুড়ে। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর, সাধাসিধে, মিথ্যে গর্ব অহংকার তাঁর মোটেই ছিল না। দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর ছিল উদার হৃদয়। সব সময় তিনি দয়ার হাত নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন অনাথদের। বিধবাদের জন্যও তিনি কম ভাবতেন না। সততা, ভদ্রতা, নমনীয়তা, উদারতা সমস্ত মানবিক গুণ তাঁকে ঘিরে থাকত সব সময়।

সমস্ত কু অভ্যাস থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। মদের গ্লাস তাঁকে নিতে কেউ দেখেনি, জুয়ার আসরের আশে পাশেও তিনি কখনও যেতেন না। কারোর সাথে ঝগড়া বিবাদেও তিনি লিপ্ত হওয়া পছন্দ করতেন না। চরম শত্রু হলেও তিনি কাউকে গালাগালি করেননি কখনও, মিথ্যা কথার ধার ধারতেন না। সর্বদা সত্য কথা বলতেন তিনি। তাই তিনি 'আস সাদিক' বা 'সদা সত্যবাদী' নামে পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বস্ততা

ব্যবসা কাফেলার নেতা হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন নূতন উপাধি। সবাই তাঁকে আল আমীন হিসাবে চিনল। আল আমীন অর্থাৎ চির বিশ্বাসী, তার বিশ্বস্ততা এতটাই প্রগাঢ় ছিল আরবীয় মনে যে তারা দলে দলে নারী-পুরুষ, ধনী গরীব সবাই ধনসম্পদ গচ্ছিত রেখে দিত তাঁর কাছে। তারা এটা বুঝে ছিলেন তাদের কষ্টে উপার্জিত ধনসম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখলে তা কোন দিন আত্মসাৎ হওয়ার ভয় নেই। নির্বিঘ্নে যথা

সময়ে চাওয়া মাত্রই তারা তা পেয়ে যাবে। বিশ্বস্ততার মহান এই গুণ তাঁকে মর্যাদার সিংহাসনে আরোহিত করেছিল আরব জাহানে। বিবাদমান দুটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যখনই তাঁর কাছে আসত তখনই তারা তাঁকে বিশ্বস্ত ভেবে নিজেদের ঝগড়া মিটিয়ে বাড়ি ফিরত। আবু তালিবের পুত্র আলি তাই বলেছিলেন "সবাই যারা কাছে এসেছিলেন তারা একান্ত আপন হয়ে গিয়েছিলেন ও তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিলেন।"

বিবাহ

আরবের প্রখ্যাত ধনীদের মধ্যে একজন ছিলেন বিধবা মহিলা খাদিজা (রাঃ), খৃষ্টান সন্ন্যাসী ওরাকা ছিলেন তাঁর কাকা, খাদিজা সব সময় মুহাম্মাদ (সাঃ)এর সৎ ও মহৎ ব্যক্তি হওয়ার কথা অনেকের কাছে শুনতেন। এমন কি ব্যবসা চালনায় তার দক্ষতার কথাও তার কানে পৌঁছে ছিল, তার এই সকল মহৎ গুণকে যাচাই করে দেখার জন্য তিনি বড়ই আগ্রহী ছিলেন, তাই খাদিজা (রাঃ) এক সময় তাঁর কাছে প্রতিনিধি পাঠালেন। তারা তাঁর কাছে খাদিজার (রাঃ) কিছু পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য করার জন্য অনুরোধ জানালেন। খাদিজা প্রতিশ্রুতি দিলেন ব্যবসায়ের লভাংশে সাধারণত যা কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে তিনি তার ডবল কমিশন প্রদান করবেন মুহাম্মাদ (সা:)কে। তিনি রাজি হয়ে গেলেন। সিরিয়ায় বাণিজ্য অভিযানে পণ্যসামগ্রীর কাফেলা চলল বাণিজ্য অভিমুখে। খাদিজা সঙ্গে পাঠালেন বিশ্বস্ত এক সেবিকা মাইসারাকে, পণ্য সামগ্রী সিরিয়ায় বেচাকেনা করে যা লাভ হল তা কোনদিন প্রত্যাশা করেননি খাদিজা (রা:)। এ বাণিজ্যে তাঁর লাভ হল। তিনি যা আশা করেছিলেন তার দ্বিগুণ।

বাণিজ্য কাফেলা ফিরল বিরাট সাফল্য নিয়ে। মাইসারার কাছে সকল কথা শুনলেন খাদিজা ধীরস্থির ভাবে। মাইসারার কাছে তিনি কেবল ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা শুনলেন না বরং হজরতের বিশ্বস্ততা, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি মানবিক গুণের কথা শুনলেন খুব আগ্রহ সহকারে। মাইসারা আরোও বললেন যে পঁচিশ বছরের এ যুবকের মধ্যে বাণিজ্য যাত্রায় তিনি আরোও অনেক কিছু দেখেছেন যাতে করে তাকে সাধারণ মানুষ বলে মনেই হয় না। হজরতের এ সকল গুণাবলীর কথা শোনার পর খাদিজা (রাঃ) বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি তার প্রিয় বান্ধবী নাফিসাকে দিয়ে হজরতের কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠালেন। নাফিসার কাছে খাদিজার বিবাহ প্রস্তাব শুনে তিনি তার অসামর্থের কথা জানালেন। নাফিসা তাঁকে জানালেন যে তিনি যাঁকে বিয়ে করবেন তার অর্থ সামগ্রীতো তাঁরই হবে। অতএব তাঁর না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি রাজি হলেন কিন্তু খাদিজার স্ট্যাটাসের কাছে তিনি অনেকটা অসহায় বলে নিজেকে প্রকাশ করলেন। এতে করে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কোন অসুবিধা হতে পারে বলে তাঁর আশংকা রয়ে গেল। নাফিসা তাঁকে বোঝালেন যে হতে পারে ওটা সম্পূর্ণ খাদিজার ব্যাপার। ওদিকে সমস্ত দিকটা খাদিজাই (রা:) দেখবেন, ও নিয়ে

তাঁকে ভাবতে হবে না। সাংসারিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব খাদিজা (রা:) নিজেই সামলে নেবেন বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। এই পর্যন্ত বলেই নাফিসা খাদিজা (রা:) এর কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিলেন হজরতের বিবাহ সম্মতির কথা, খাদিজা (রা:)কে আমন্ত্রণ জানালেন নিজ বাড়িতে। এখানেই সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতে বিবাহের পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ইতিহাস থেকে জানা যায় এই সময় খাদিজা (রা:)-র বয়স ছিল চল্লিশ বছর অপরপক্ষে হজরতের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন দুজনে। তাদের প্রথম সন্তান ছিলেন কাসিম। মাত্র দু-বৎসর জীবিত ছিল এই সন্তান। তার পর একে একে খাদিজা গর্ভে ধারণ করেন যয়নব, রোকাইয়া, উম্মেকুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহকে। অবশ্য আব্দুল্লাহও দু-বছর বয়স হওয়ার আগে মারা গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ ক্রীতদাস হারিস বিন যায়েদকে মুক্ত করে নিজের সন্তান হিসাবে দত্তক নেবেন। খাদিজা (রাঃ) তাকে উপঢৌকন হিসাবে হজরতকে দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। আব্দুল্লাহের মৃত্যুতে তিনি শোক ভুলতে আবু তালিবের পুত্র আলিকে তাঁর সংসারের সাথে জুড়ে দিলেন। আবু তালিবের পুত্র আলি তারি সংসারের সদস্য হলেন। পরে নিজ কন্যা ফাতিমার সাথে বিবাহ হয়েছিল আলির।

দত্তকপুত্র যায়েদ

কোন এক যুদ্ধে বন্দী হিসাবে যায়েদ বিক্রি হয় দাস হিসাবে। বেশ কয়েক জনের কাছে দাস হিসাবে থেকে শেষে তিনি খাদিজা (রাঃ) কাছে আসেন, পরে খাদিজা (রাঃ) তাকে উপহার স্বরূপ হজরতকে প্রদান করেন। আর এইভাবে তিনি হজরতের সেবায় বেশ কয়েক বছর কাটালেন। এক সময় পিতা ও চাচা যায়েদের খবর পেয়ে তাকে নিজ গোত্রে ফিরিয়ে নিতে এলেন। তারা তাদের ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে প্রস্তাব পাড়লেন হজরতের কাছে। তাদের এ প্রস্তাব শুনে হজরত সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ণ অনুমতি প্রদান করলেন। কোন রকম অর্থও তাদের কাছে দাবী করলেন না তিনি, যদিও তারা পুনরায় অর্থ দিয়ে যায়েদকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। হজরতের উদার হৃদয় দেখে তারা অবাক না হয়ে পারলেন না। কিন্তু মুশকিল ঘটল যায়েদ পিতৃটানের চেয়ে মুহাম্মাদ (সা:) এর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন না। যায়েদ তার পিতা ও চাচাকে জানিয়ে দিলেন যে তার কাছে অধিক প্রিয় হজরতের সাথে বসবাস করা। মুহাম্মদ (সা:)এর কাছে দাস হয়ে থাকা তাঁর মুক্ত জীবন পেয়ে নিজের পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অধিক বেশি সম্মানের। পিতা ও চাচা হজরতের কাছ থেকে তাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না।

অবশ্য এখন থেকে যায়েদ (রাঃ) হজরতের কাছে স্বাধীনভাবে থেকে গেলেন, জন সমক্ষে হজরত যায়েদকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি তার পুত্র বলেও

ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাই তারপর থেকে তাকে মুহাম্মাদ পুত্র যায়েদ বলে ডাকা হত। আর এই পরিচয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তার সম্পর্কে কুরআনের আয়ত অবতীর্ন হয়েছিল। এ ঘটনা তখনকার যখন মুহাম্মদের দাস হিসাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এই দাসত্ব জীবনে কোনরকম স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার কারোর অধিকার থাকে না। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকমের। তিনি তো উদারতার সাগর। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত দুঃখ, ব্যাথা, বেদনাকে অনুভব করতে জানতেন। যায়েদের হজরতের কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ হজরতের মাহাত্মকে আরো বেশি উঁচু করে ধরে। কুরআনের বাণী কিন্তু তখনও তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়নি, তবুও তিনি কিন্তু বৈষয়িক জ্ঞানের মত নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ, তখন থেকেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত নরনারী, দাস-দাসী, জীবজন্তু, গাছপালা সবাইকে ভালবাসতে জানতেন। তাঁর ভালবাসা সবাই পেতো সমানভাবে। তাইতো তিনি ছিলেন “আস-সাদিক” চরম সত্যবাদী বা বিশ্বস্ত। তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ মানবীয় গুণাবলীতে ভরপুর। তাঁর এ সকল গুণাবলী তাঁর চোখেমুখেই ধরা পড়ত।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্তি

তাঁর জীবনে অন্য একটি জিনিস তাঁর বুদ্ধিদীপ্ততার প্রমাণ বহন করে। তিনি মানুষের মধ্যে সবসময়ে শান্তির বার্তাবাহক ছিলেন, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় তার চিরন্তন চেষ্টাই তিনি চালিয়ে যেতেন সব সময়।

একসময় কুরাইশরা কাবা ঘরের সংস্কারের জন্য কিছু মেরামতির কাজ করছিলেন। কোন এক বন্যায় তা প্লাবিত হয়ে ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দেওয়ালের মধ্যে ফাটলও দেখা দিয়েছিল বড় ধরনের। তাই তারা সংস্কারের কাজ করতে করতে এগিয়ে এলেন “হাজারে আসওয়াদ” যেখানে অবস্থিত ছিল সেখান পর্যন্ত। এই পর্যন্ত কাজে কোন ঝামেলা কুরাইশদের মধ্যে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু গোল বাঁধল এই কালো পাথর “হাজারে আসওয়াদ” বা “কালো পাথর” -কে সরানো নিয়ে। এটি ছিল ইসলামের নানান বিষয়ের ঐতিহাসিক সাক্ষী। কলহ ক্রমশ প্রসার লাভ করল কুরাইশদের সকল গোষ্ঠীতে। নিজ নিজ গোষ্ঠীর সকল মাতব্বররা চেয়েছিল তারাই কেবল ওই পাথরের সংস্কারের অধিকারী। এই কাজের মধ্যে সকলে তাদের নিজ নিজ আত্মমর্যাদার কথা ভাবছিলেন। অনেকেই যুদ্ধ প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিলেন। চরম এই পরিস্থিতিতে একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিই এগিয়ে এলেন এর সমাধান সূত্র খুঁজতে। তিনি গোষ্ঠীর সকলের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, কাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি ওই জায়গায় প্রথমে আসবেন তার সিদ্ধান্তই আমরা সকলেই মেনে নেব। সবাই রাজি হলেন এই প্রস্তাবে। ঐ সময়ের জন্য সবাই অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন, খুবই আশ্চর্যের বিষয়

হজরতই সেদিন সবার আগে ওই স্থানে এলেন, সবাই আনন্দে ফেটে পড়লেন। নিশ্চয় সবাই ন্যায় বিচার পাবেন। নিশ্চিত এক যুদ্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন সবাই, তাই তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাদের বির্তকের সব কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনলেন যুবক মুহাম্মদ (সাঃ)। সব শোনার পর তিনি "হাজরে আসওয়াদ"-এর কাছে গেলেন এবং নিজের হাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিলেন সেখানে, এরপর তিনি "হাজরে আসওয়াদ" - কালো পাথরটিকে নিজ হাতে রাখলেন ওই চাদরের উপর। তারপর তিনি প্রতিটি গোত্রের প্রধানদের ঐ চাদরের কিনারা ধরে উপরে ওঠাতে বললেন, সবাই তাঁর কথা মেনে নিয়ে পাথরটিকে বয়ে নিয়ে চললেন যথাস্থানে, তারপর তিনি পুনরায় নিজের হাতে তুলে নিয়ে সবাইয়ের আকাঙ্খিত স্থানে রেখে দিলেন, খুশিতে সবাইয়ের হৃদয় ভরে গেল। সমাপ্ত হল এক বিরাট বিবাদের।

একের পর এক বুদ্ধিদীপ্ততার প্রমাণ পেয়ে আশেপাশের সকল গোত্রের কাছে তিনি এক সম্মানের পাত্র হয়ে উঠলেন। পরের দিকে এই সকল বিচক্ষণতা তাকে তার মিশনে বড়ই সাহায্য করেছিল। আর এই সকল বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিদীপ্তির কারণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন এই রকম বিচ্ছিন্ন এক জাতিগোষ্ঠীকে ইসলামী ঐক্যের এক মেলবন্ধনে বাঁধতে।

শান্তি সন্ধানে তিনি ছিলেন সদা সর্বদা সচেষ্ট। আর এজন্যই তিনি আঘাত হেনেছিলেন কুরাইশদের কঠিন মগজগুলিতে তাঁর বুদ্ধিদীপ্তিতার প্রভাব খাটিয়ে, কুরাইশদের হৃদয়গুলোকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন। কেবল একগুঁয়েমী গর্ব অহং দিয়ে নয় তাদের ভাবাবেগকে তিনি বিচার বিশ্লেষণের আয়ত্বে এনেছিলেন। তখনও তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু বিচক্ষণ স্রষ্টা আল্লাহ তাঁকে আগে থেকে সরবরাহ করেছিলেন বুদ্ধিদীপ্তির শিখা, যা দিয়ে তিনি অনুভব করতে পারতেন বাস্তব পরিস্থিতি ও তার সমাধান।

যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর তখন তাঁর গোত্রের মানুষেরা তাঁর বিচক্ষণতার কথা স্মরণ করে তাঁকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলেন। তারা নিজেরাই ভাবছিলেন যে তিনিই তাদের বংশীয় কৌলিন্যকে তুলে ধরতে সমর্থ হবেন। কেবল তিনিই পারবেন বংশের নেতা হতে।

বিয়ের পর থেকে তাঁর আত্মমর্যাদা এত উন্নত হল যে সব দিকে তিনি সম্মানের অধিকারী হতে থাকলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল হতে লাগল। এমনকি তাঁর মর্যাদা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁর কন্যাদের বিবাহ করার জন্য আরবের ধনাঢ্য-সভ্রান্ত পরিবারগুলোও প্রস্তাব পাঠাচ্ছিল।

এমনকি আবু লাহাব প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তার পুত্র উতবাহ ও উসাইবাহর বিয়ের কন্যা হিসাবে রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে। জাতির নেতা হতে গেলে জাতি-

গোষ্ঠীকে বাঁধতে হয় আত্মীয়তার বন্ধনে।

অসৎ কর্মনীতি

মুহাম্মদ (সা:) নবী হওয়ার পূর্বে সমগ্র আরব জুড়ে চলছিল যুদ্ধবিগ্রহের লুডুখেলা। নিজেদের বড়াই, অহংকার বজায় রাখার জন্য সবাই নিজ নিজ অভিসন্ধিতে ব্যাতিব্যাস্ত। সামান্য ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে তারা নিজেদের রক্ত বহাতে কখনই পিছিয়ে আসতোনা, তাই বর্বরতা বিরাজ করছিল চারিদিকের পরিবেশে।

অত্যাচার ও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল অলিতে গলিতে। মানবতার সূর্য ডুবতে বসেছিল অজ্ঞতার অন্ধকার সাগরে। চারিদিক শুধু জুলুম অত্যাচার, না ইনসাফির সয়লাব। আর এই অপরাধ প্রবণতার জন্য কি ঘটতে পারে তা কুরআন নিচের ভাষায় ব্যক্ত করেছে,

> *"স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে লোকেদের নিজেদের কর্মফলের জন্যে। যেন তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন।" (কুরআন ৩০ ঃ ৪১)*

এই সময়ে ঈসা (ক্রাইস্ট) ও মূসা (মোজেস)-র আনীত একত্ববাদ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যে তার দ্বারা মানবীয় আর কোন কল্যাণ সাধিত হওয়ার ছিল না। কোন রকম যুক্তিতর্কের স্থান এ ধর্মগুলোতে আর ছিল না। আর এই ধর্মগুলির বিকৃত সাধনের জন্য পুরো মাত্রায় দায়ী ছিল পাদ্রী পুরোহিতরা। অপর দিকে মক্কার কুরাইশরা নিজেদের হাতে নির্মিত দেবদেবীদের পূজা অর্চনা শুরু করে দিয়েছিল। এই সকল দেবদেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হুবল, লাত ও উজ্জা। সমস্ত আরব উপদ্বীপের মানুষ এই সকল মূর্তিগুলির কাছে তাদের ভেট প্রদান করত। তাদের কাছে চাইতো সাহায্য সহানুভূতি, তাদের জন্য যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত থাকত।

দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উপর সাধারণ মানুষের কোন দয়া ও সহানুভূতি ছিল না একেবারে। নারী জাতির উপরেও আচরণ করা হত তদ্রুপ। নিরীহ নারী জাতিরা পথে ঘাটে লাঞ্ছিত হত যখন তখন। ধর্ষিতা হত পুরুষের দ্বারা। কন্যা সন্তানের জন্মকে অতীব কু-লক্ষণ বলে ভাবা হত সমাজে। তাদের জন্য সমাজের কোন স্থানে মর্যাদা থাকবেনা বলে মনে করা হত। তাই তার জন্মানোর পর নিজেদের হাতে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রথাও সমাজের সর্বত্র বিরাজ করত। কুরআনের বর্ণনা–

> "অথচ যখন এদের কারো কন্যা সন্তান জন্মানোর সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। আর তখন সে শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে।" (কুরআন ১৬ ঃ ৫৮)

সত্যের সন্ধানে

আরবের এই অরাজকতার সময়ে সত্যের কোন আলো পাওয়া যায় কিনা সেই আশা নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী এক গুহার কাছে গিয়ে হজরত মুহাম্মাদ (সা:) নিয়তই গভীরভাবে ভাবতেন। যখন পবিত্র রমজান মাস আসত তখন তিনি ওই গুহায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে বলে কিছু খাদ্য পানীয় নিয়ে সেখানে গেলেন, আর রমজানের একমাস তিনি গুহাকন্দরে সময় কাটাবেন বলে মনস্থির করলেন।

গুহা কন্দরে পৌঁছতে তাঁকে চড়তে হয়েছিল ছোট্ট একটি পাহাড়ে। আর অন্য দিকের একটি সুড়ঙ্গ বেয়ে তাঁকে উঠতে হয়েছিল শৃঙ্গে। গুহার মুখ থেকে যে কেউ দেখতে পেত নিচের কাবা শরীফের দৃশ্য, একটু দূরেই তা বিস্তার লাভ করে আছে। অনুর্বর সমতলভূমি, যতদূর চোখ যায় একই দৃশ্য বিরাজমান।

মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির শান্ত কোলে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন শান্তির সন্ধানে। তিনি কখনও মূর্ত্তি পূজা করেননি। কুসংস্কার ও অনৈতিকতা থেকে তিনি সব সময় দূরে অবস্থান করতেন। মিথ্যে দেবদেবীর পূজা অর্চনা থেকে তিনি সুরক্ষিত ছিলেন। সেই সময়ে অর্থ ও শক্তির প্রতীক হিসাবে নানান দেব-দেবী পূজিত হত মানুষের দ্বারা।

বিভিন্ন সময়ে তিনি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখতেন যেগুলো বাস্তবে ঘটত। স্ত্রী খাদিজার কাছে এগুলো তিনি ব্যক্তও করতেন। এগুলোর প্রভাব তাঁর নিদ্রাভঙ্গের পরেও দেখা যেত। এগুলো প্রকৃতপক্ষে সত্য খোঁজার প্রথম লক্ষণ। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ পৌঁছল তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে পদার্পন করলেন। আর এটা তাঁকে পরবর্তী ধাপগুলোতে বিচরণ করার শক্তি সাহস যুগিয়ে ছিল।

তিনি একাই হেরা গুহায় অবস্থান করে রইলেন জীবনের অর্থ খোঁজার উদ্দেশ্যে। তিনি পৃথিবীতে নিজের আগমনের কারণও খুঁজে চললেন। আর তাঁর কাছে যে বিশেষ চিহ্নসমূহ আছে তারও বা কি রহস্য তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন। এখন তাঁর বাইরের সমস্ত পরিবেশ তাঁকে তাঁর শৈশবের নানান ঘটনা স্মরণ করে দিতে থাকল। তখন চতুর্দিকে যে পরিবেশ তখনও তা ছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, এখন সমস্ত পূর্ণতার সাথে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) খুঁজে চলেছেন মহাসত্যকে। আর এই আধ্যাত্মিক সন্ধান তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এক সত্য আহ্বানের দিকে। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের এক রমজান মাসে তিনি যখন গুহায় আরোহন করছিলেন তখন তিনি কোন এক সম্ভাষণ বাণী শুনতে পেলেন।

“হে নবী ! তোমার উপর বর্ষিত হোক শান্তিধারা ”

প্রথম প্রত্যাদেশ বাণী

হজরত একাই গুহার ভিতরে বসে ধ্যান করে যাচ্ছিলেন জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য। এমন সময় হাজির হলেন জিব্রাইল (আঃ)। পড়ার জন্য আদেশ করলেন তাঁকে। তিনি উত্তরে বললেন 'আমি পড়তে জানি না'। এই মুহূর্তে জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনবার বললেন 'পড়'। হজরত উত্তর করলেন যারা পড়তে পারে আমি তাদের দলে নয়। সেই অবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) পড়ে উঠলেন,

> "পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন, জমাটবাঁধা এক পিণ্ড রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড় আর তোমার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান যেটা সে জানত না" (কুরআন ৯৬ ঃ ১-৫)

এই কটা বাক্যই তাঁর প্রতি অবতীর্ন প্রথম প্রত্যাদেশ যা বয়ে এনেছিল জিব্রাইল (আঃ)। এই বাণী ক'টি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রত্যাদেশ করে তাকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ফেলে চলে গেলেন। তক্ষুনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মুহাম্মাদ (সাঃ) ফিরে এলেন নিজ গৃহে খাদিজার (রাঃ) কাছে এবং ভয়ার্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন আমাকে কম্বল ঢাকা দিয়ে দাও। খাদিজা (রাঃ) দেরি করলেন না। তাড়াতাড়ি একটা কম্বল নিয়ে তাঁকে ঢাকা দিয়ে দিলেন এবং কি ঘটনা ঘটেছে জানতে চাইলেন। মুহাম্মদ (সাঃ) সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর কাছে খুলে বললেন। বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর সমস্ত কথা শোনার পর বুঝে নিলেন যে নিশ্চয় এটা কল্যাণকর ঘটনা। অতএব ভয় পাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। তিনি স্বামীকে স্বান্তনা দিতে রইলেন। নিজের হৃদয় দিয়ে বললেন,

"তোমার ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না, এখন বিশ্রাম নাও ও শান্ত হও। আল্লাহ তোমাকে অবমাননায় ফেলতে পারেন না। কারণ তুমি তো তোমার আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল। তুমি তো সত্য কথা বলো, তুমি অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করো আর তুমি তো সত্য কথা বলো। তোমার অতিথিদের সাথে উদারতা দেখাও। এক কথায় তুমি সমাজের সবরকম কল্যাণকর কাজ করে থাকো।"

খ্রীষ্টান পন্ডিত অরাকা

তখনই খাদিজা (রাঃ) ছুটলেন চাচা অরাকার কাছে। তিনি ভাবলেন যে তাঁর পণ্ডিত চাচা ঘটনার ব্যাখা ভাল দিতে পারবেন। সব কথা একে একে খাদিজা (রাঃ) ব্যক্ত করলেন অরাকার কাছে। অরাকা যে সকল চিহ্ন মুহাম্মদ (সাঃ)এর মধ্যে দেখেছিলেন ও বর্তমানে যে ঘটনা শুনলেন তাতে তিনি সবকিছু বুঝতে পারলেন, তাই তিনি কোন প্রকার ইতস্তত না করে বলে ফেললেন,

“যার হাতে অরাকার প্রাণ তার কসম, এ আর কেউ নয় এ হল নামুস (প্রত্যাদেশ বহনকারী দূত) যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) -এর কাছে এসেছেন। একইভাবে তিনি এসেছিলেন ঈসা (আঃ) (ক্রাইষ্ট) এর কাছে ও মুসা বা (মোজেস) আঃ-এর কাছে। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এই লোকগুলির নবী। ”

পরে একদিন কাবাগৃহের কাছে অরাকার সাথে যখন মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন,

“তোমাকে একজন মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেওয়া হবে, তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হবে। তোমাকে নির্বাসিত করা হবে, তোমাকে আক্রান্ত করা হবে। আর তখনও পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমি তোমার সমর্থন করব। ”

আয়েশা (রাঃ)-র বর্ণনা থেকে জানা যায় অরাকা আরোও বলেছিলেন “লোকেরা তোমাকে এড়িয়ে থাকবে” অরাকার এই কথা শুনে মুহাম্মদ (সাঃ) বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন “তারা আমাকে এড়িয়ে থাকবে ? অরাকা বললেন “অবশ্যই তুমি যা এনেছ কোন লোকই এমন জিনিস আনেনি তাই তোমার সাথে তারা শত্রুর মত ব্যবহার করবে।”

এখান থেকেই নবীর মিশন শুরু হল। সবেমাত্র তিনি প্রত্যাদেশের কিছু মৌলিক বিষয় আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে চলেছেন, সেই সঙ্গে তিনি কিছু মহাসত্য যা ইতিহাসের পাতায় বার বার পুনরাবৃত্তি হয় তিনি তা মানুষের কাছে ব্যক্ত করলেন।

খাদিজা (রাঃ) কাছে কোন কিছু বুঝতে বাকি রইল না। তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী সাহায্যকারী তাঁর, সব সময়ে সব কিছুতে খাদিজা (রাঃ) তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন নবীর প্রতি। আর যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সকল সময় তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর এ মিশনে সর্বপ্রকারের সাহায্য ঢেলে দিয়েছিলেন।

3

প্রত্যাদেশের ধারা

আল্লাহর নবীর উপর প্রথম দিকে যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হচ্ছিল তা মূলত চারটি মৌলিক ধারায় আসছিল। প্রথমতঃ আল্লাহর একত্ববাদ, দ্বিতীয়তঃ কুরআনের মর্যাদা ও গুরুত্ব, তৃতীয়তঃ নামাজ ও প্রার্থনা ও চতুর্থতঃ মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা বা আখিরাত সংক্রান্ত আয়াতমালা।

প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের একটি আধ্যাত্মিক যুক্তিতর্কের দিকে আহ্বান জানানো হয়। আর এগুলো বিরুদ্ধবাদীরা ভালভাবে জেনেছিলেন। আর এগুলো তারা নিজ নিজ গোত্রীয় বিশ্বাস থেকে কম বেশী জানতেন। এ গোত্রের লোকেদের কাছে ইসলামের উত্থান ভয়ের কারণ ছিল।

প্রত্যাদেশ গ্রহণ

রসূলের প্রতি অবতীর্ন প্রত্যাদেশ সর্বপ্রথম যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন নিজ স্ত্রী খাদিজা (রাঃ)। ইসলামী মিশনের প্রথম দশ বৎসর তিনি রসুলের এ মিশনের একেবারে সহকারী হিসাবে ছিলেন। তার মত বিশ্বস্ত আর সাথী ছিল না। খাদিজার পর এ প্রত্যাদেশ যারা গ্রহণ করেছিল তারা হলেন সেই সব ব্যক্তি যারা রসূল পরিবারের একেবারে কাছাকাছি ছিলেন। একে একে আবু তালিবের পুত্র আলি, দত্তক পুত্র যায়েদ, উম্মে আয়মান যিনি ছিলেন তার অপর এক ধাত্রী। চার বছর বয়সে তিনি যখন মক্কায় ফিরে এসেছিলেন তিনি এই ধাত্রীর কাছে কিছু দিন লালিত পালিত হয়েছিলেন, তারপর সারা জীবনের বন্ধু আবুবকর (রাঃ) এরা সবাই সর্বপ্রথম রসূলকে চিনতে পেরেছিলেন আর চিনেছিলেন তার প্রতি প্রত্যাদেশের গুরুত্বকে। তারা ইসলামকে গ্রহণ করে ঘোষণা দিয়েছিলেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু বা শাসক নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহরই প্রেরীত দূত। এরপর দিনে দিনে বাড়তে থাকল ধর্মান্তরিত মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা।

কারণ রসূলের প্রচার ছিল খুবই তাত্ত্বিক। আর আবুবকর (রাঃ) ইসলামের মৌলিক তত্ত্বগুলি সকলের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছিলেন। তিনি নিজে বহু পয়সা খরচ করে মালিকদের কাছ থেকে তাদের দাসগুলোকে কিনে নিতেন এবং মুক্ত করে দিতেন, কারণ তিনি ইসলামের আদর্শ দাসত্ব মুক্তির গুরুত্বকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। ইসলামের ঘোষণা প্রতিটি মানুষ ভাই ভাই কারোর উপর কারো আধিপত্য নেই-এই নীতি আবু বকর (রাঃ) কে প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে। মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মক্কায় অবস্থান করার সময় তার সদাচার বহু মানুষকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছিল সেজন্য নারী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ইসলামের পতাকাতলে ভীড় জমিয়েছিল। প্রত্যাদেশের প্রথম তিন বছরে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন কুরাইশ বংশ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সবাই ধর্মান্তরিত এক মুসলিম সাথীর বাড়িতে রসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য একত্রিত হতেন। আর সেখান থেকেই তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। নতুন কোন প্রত্যাদেশ বার্তা এলেই তারা সেখান থেকে সবাই জেনে নিতেন আর নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ শুরু করে দিতেন। কিন্তু দিনের পর দিন চারিপাশের পরিবেশে ইসলাম মানা ও প্রচারে নানা রকম বাধার সৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। এই সময় মুসলিমদের দলে যারা বেশী করে ভিড়ছিল তারা হল যুবক ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা।

প্রথম থেকেই নবী (সাঃ) সংখ্যাধিক্যের উপর চাপ না দিয়ে বরং ইসলামী কর্মীদের গুণাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছিলেন। তার ভক্তদের হৃদয়ের দৃঢ়তা ও হৃদয়ের অকপটতা ছিল তার কাছে অধিক প্রিয়। মানুষের হৃদয়ের প্রকৃতি অনুসারেই আল্লাহর কাছে বিচার হবে। এটা তিনি তার ভক্তদের বুঝিয়েছিলেন। তার এই মিশনের উপর কোন বিপদ কখন ও কিভাবে আসছে সে ব্যাপারে তিনি সব সময় সতর্ক ছিলেন। আর তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। তাই ছোট ছোট দলে তার ভক্তদের মধ্যে তিনি শিক্ষা আলোচনা বহাল রেখেছিলেন। তিনি এটা ভালভাবে জানতেন যে তাঁর এই মিশনারী কাজে অনেক সমালোচনার ঝড় আসবে আর তা মোকাবিলা করার জন্য অনেক যুক্তিতর্কের প্রয়োজন। আর শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করে থাকে। এইভাবে তিনি একটি উন্নত কষ্ট সহিষ্ণু বোধ সম্পন্ন দৃঢ় চেতনায় বিশ্বাসী একদল নাগরিক গড়ে তুলেছিলেন। যারা তাদের ইসলামী আদর্শের বিজয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আর সেই কারণে এই মিশনের অনেক কঠিন পরিস্থিতিকে তুড়ি মেরে পাশে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন তারা।

প্রথম তিন বৎসরে তিনি এমন একটা দল গড়ে তুললেন যারা ইসলামের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখেছিল। তাই তারা সমস্ত গোত্র থেকে এক ডাকে নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ সবাইকে একত্রিত করার সামর্থ রেখেছিল।

প্রত্যাদেশ এক স্বর্গীয়বার্তা

প্রথম প্রত্যাদেশেই হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে জানানো হয়েছিল আল্লাহর চরম সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে। তারপর শিক্ষার বিষয়ে তখন থেকে রসূলকে 'রাব্বিকা' তোমার প্রভু বলে এক পরম ও চরম সার্বভৌম সত্তার প্রতি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তো ছিলেন রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শিক্ষাদাতা। বার্তাবাহক দূত জিব্রাইল (আঃ) যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তাতে ইসলামের মূল কথা প্রভু আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছিল। আর রসূলকে তিনি এ ব্যাপারে সচেতন করলেন। আর স্রষ্টাকে চিনতে গেলে দরকার লেখা পড়া উভয় বিষয়ই। প্রথম প্রত্যাদেশে তাই পড়ার কথা বলার সাথে কলমের সাহায্যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এখানেও লেখার প্রসঙ্গ এসে যায়। আর মানুষের সৎ আচরণের প্রসঙ্গে লেখাপড়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভাল আচরণের ঘোষণার সাথে সাথে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের নানা বাধা বিপত্তির ব্যাপারে। কারণ কোন মিশনই ক্রোধ, ঘৃনা, মিথ্যারোপের হাত থেকে রেহাই পাইনি। এমনকি নিজেদের একদম নিকট আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকেও তা হতে পারে।

বার্তাবাহক জিব্রাইল (আঃ) একাধিকবার প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছেন। নবী (সাঃ) জানিয়েছেন নানান বিষয়ে। কোন সময় এসেছেন মানুষের রূপ নিয়ে, কোন সময় ঘন্টা ধ্বনির মত শব্দ হয়ে আবার অনেক সময় মৌমাছির গুঞ্জন নিয়ে। আবার অনেক সময় ভারী বোঝার মত যখন তিনি শ্বাস ফেলতে কষ্ট অনুভব করতেন। শেষ রূপে আসাটা তাঁর কাছে খুব কষ্টের বলে মনে হত। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রত্যাদেশ হয়েছিল আর এই দীর্ঘ তেইশ বছর জিব্রাইল (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন। সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী ধীরে ধীরে প্রতাদেশ অবতীর্ন হত রসূলের প্রতি। আর তার সমষ্টিই হল পবিত্র কুরআন, বর্তমান কুরআন যেভাবে গ্রথিত সেভাবে কিন্তু প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হয়নি। বরং তা সজ্জিত হয়েছে জিব্রাইল (আঃ) যেভাবে প্রতি রমজান মাসে নবীকে পড়িয়ে শোনাতেন সেইভাবে। সেই পরম্পরা বজায় রেখে বর্তমান কুরআন সজ্জিত।

পরিশুদ্ধি ও প্রার্থনা

একদিন হজরত মক্কার আশেপাশে কোন জায়গায় পথ চলছিলেন এমন সময় তার কাছে হাজির হলেন জিব্রাইল (আঃ)। তিনি তার গোড়ালী দিয়ে পাথুরে মাটিতে আঘাত করলেন। ফলে সেখান থেকে উৎসারিত হল একটি ঝর্না প্রবাহ। তাতে তিনি নির্দিষ্ট নিয়মে অযু সারলেন রসুলকে শেখানোর জন্য। তারপর তিনি নামাযের ভঙ্গি কেমন হবে তা দেখালেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রুকু করলেন, সিজদা দিলেন এবং বসলেন। প্রতিক্ষেত্রে তিনি 'আল্লাহ আকবর' বলে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ

করছিলেন শেষে তিনি সম্ভাষণ বাক্য 'আসসালামু আলাইকুম' – আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত করুক বললেন। আল্লাহর রসুল একের পর এক নিয়ম অনুসরণ করে নামায সমাপ্ত করলেন। নামায শিখিয়ে বার্তাবাহক দূত জিব্রাইল (আঃ) ফিরে গেলেন সেখান থেকে। পরিশেষে আল্লাহর রসূল যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি স্ত্রী খাদিজাকে নামাযের সকল বিষয়ে শিক্ষা দিলেন এবং উভয়ে একসঙ্গে নামায সম্পাদন করে চললেন। এখন ইসলাম ধর্মে কিছু শরীয়তি নিয়ম সংযোজিত হল। ইসলামী শরীয়তে নামায ও অজু শিক্ষার পর একে একে তা অনুশীলন করতে এগিয়ে এলেন প্রথমে খাদিজা (রাঃ), তারপর আলি (রাঃ) তারপর যায়েদ, তারপর আবু বকর (রাঃ)। রাসুলের মক্কায় অবস্থানকালে নামায প্রতিদিন দু-বার করেই পড়া হত বা সম্পাদন করা হত সকাল আর সন্ধ্যায়। তারপর এটি প্রতিটি মুসলমানদের জন্য দিনে পাঁচবার ধার্য করা হল।

মক্কায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েও নারী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধা একে একে ইসলামকে আলিঙ্গন করে চলল। আর তারা প্রশিক্ষণ পাচ্ছিল শান্ত ধৈর্যশীল হওয়ার জন্যও। তারা প্রতিদিন প্রভাতেই শয্যা ত্যাগ করত। আর রাত্রিতেও উঠে হৃদয় দিয়ে অবতীর্ন প্রত্যাদেশ কুরআন আবৃত্তি করতেন। আর এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ তায়ালা বান্দা ও নিজের মধ্যে এক দয়ার সেতুবন্ধন টেনেছিলেন। যার ফলে রসুলের এই ভক্তেরা পেয়েছিলেন এক উন্নত চরিত্র ও আল্লাহর অশেষ করুণা। তারা হয়ে গেলেন সৎ, ধার্মিক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অনুসারী। তারা মহান প্রভু আল্লহর কাছে সব সময় ক্ষমা, দয়া, শান্তি প্রার্থনা করত কুরআনের আবৃত্তির মাধ্যমে। আর এগুলি সবই ছিল শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা। প্রত্যাদিষ্ট বাণীগুলি বারবার করে আবৃত্তি করার ফলে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে তাদের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারা তাদের চাওয়া পাওয়া সব কিছুর উৎস আল্লাহকে একেবারে কাছে পেয়েছিলেন, আর আল্লাহই নবী (সাঃ) কে বাছাই করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে করে আমরা উন্নত আদর্শের প্রতীক হজরতকে অনুসরণ করে ধন্য হই। প্রত্যাদিষ্ট তিনটি আয়াত এ শিক্ষার একেবারে বাস্তব উদাহরণ।

> *"হে নবী আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে, আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং উত্তর দিয়ে থাকি।"*
> *(কুরআন ২ ঃ ১৮৬)*

আল্লাহর সাথে নিবিড় সংযুক্ত হৃদয়ের রসূল আমাদের জন্য পথ খুলে দিয়েছেন, কুরআনের ঘোষণা -

> "বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ।" (কুরআন ৩ ঃ ৩১)

যারা অফুরন্ত স্বর্গীয় জীবনের আকাঙ্খা করে থাকেন তিনি তাদের কাছে আদর্শের অনুপম প্রতীক।

> "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমূনা বর্তমান, এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করে।" (কুরআন ৩ ঃ ২১)

4

অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিম রোলার

প্রত্যাদেশের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা রপ্ত করার পর রসূল (সা:) প্রচার শুরু করলেন। তিনি প্রথমে প্রচার করতেন নিজের কাছের লোকগুলোর কাছে। এতে তার সামনে যে প্রচুর বাধা অপেক্ষা করছে তা তিনি আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আর তিনি প্রত্যাদেশ পেলেও তা কেমনভাবে প্রচার করতে হবে তার কোন রকম নির্দেশ তখনও পাননি।

প্রকাশ্য জনসমক্ষে সত্যের আহ্বান

তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ আবার দীর্ঘ তিন বৎসর পর এবার তিনি প্রচার করার নির্দেশ পেলেন। কুরআনের ঘোষণা –

> "নিজের নিকটম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও"
> (কুরআন - ২৬ ঃ ২১৪)

এখন রসূলের কাছে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে তাঁর কাছে পরম প্রভু আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ এসেছে তা অপরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ করে প্রথমে তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্বজনের কাছে। আরবে সেই সময়ে একটি ঐতিহ্য ছিল কোন কিছু ঘোষণা করার জন্য পর্বতের মাথায় উঠে গোষ্ঠীর প্রধানেরা একের পর এক তাদের বক্তব্য উচ্চস্বরে পেশ করত। নবী (সাঃ) ও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে সাফা পর্বতের মাথায় উঠলেন তারপরে প্রত্যেক গোষ্ঠী প্রধানদের নাম ধরে একের পর এক ডাক দিলেন। অতঃপর এই ডাক শুনে তারা এটাকে একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয় ভেবে জড়ো হল পাহাড়ের তলদেশে। যেখানে জড়ো হয়েছিল সেখান থেকে তারা রসূলকে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু পাহাড়ের অন্য দিকে তাদের দৃষ্টি যাচ্ছিল না। রসূল পাহাড়ের উপরে থাকার কারণে অবশ্য দু'দিকই সমানভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন।

রসূল (সাঃ) কুরাইশ বংশের সবাইকে সম্বোধন করে বললেন,

“আমি যদি আপনাদের বলি এই পাহাড়ের পেছন দিকে অস্ত্র সজ্জিত অসংখ্য অশ্বরোহী সৈন্য আপনাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে তাহলে সেটা কি আপনারা বিশ্বাস করবেন।” তারা সমস্বরে বলে উঠল “নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করব আপনি বিশ্বস্ত, আমরা তো আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি।”

নবী মুহাম্মদ (সা:) বলে চললেন,

“আমি আপনাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সতর্কবার্তা নিয়ে এসেছি। আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন আমার প্রতিবেশীদের সংশোধিত করার জন্য। এই জীবনে আমি তোমাদের কোন রকম সাহায্য করতে পারছি না। আর পরকালেও আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারব না যদি তোমারা এক আল্লাহকে প্রভু হিসাবে মেনে না নাও। আমিও সেই ব্যক্তির মত যে দেখতে পায় তার শত্রুকে আর তক্ষুনি লোকদের কাছে ছুটে এসে বিপদের কথা বলে তাদেরকে সতর্ক করে”।

হজরতের চাচা আবু লাহাব এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে গেলেন। অভিশাপ দিয়ে বললেন “তুমি ধ্বংস হও, এই জন্যই আমাদের ডেকে এনেছ” – এই বলে তিনি সমস্ত গোত্র প্রধানদের ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। এইভাবে আবু লাহাবের সাথে রসূলকে যারা বর্জন করেছিল তারা একত্রিত হয়ে একটি বিরুদ্ধ দল গঠন করল।

আবু লাহাব ফিরে গিয়ে চুপ করে রইলেন না, তিনি ও তাঁর স্ত্রীসহ অন্যান্য গোত্রপতীরা রসূলকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করতে চাইলেন। রসূলকে প্রস্তাব দেওয়া হল বিপুল ধন-সম্পদ দেওয়ার। তাদের রাজা হওয়ার। বিনিময়ে তারা রসূলকে তাঁর মিশনকে বন্ধ করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এতে যখন কাজ হল না তখন তারা তাঁর উপর দোষ চাপাল এই বলে যে, সে পাগল হয়ে গেছে অথবা তাঁর উপর জিন আসর করেছে। তারপর রসূল (সাঃ) দু’টি ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। প্রথমটা ব্যর্থ হয়েছিল এই কারণে পূর্বের মত আবু লাহাব এমন সব অবাঞ্ছিত বিষয় নিয়ে গন্ডগোল সৃষ্টি করেছিল যাতে করে রসূল কোন প্রকার কথা বলার সুযোগই পাননি। দ্বিতীয় ভোজ সভার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এই সভায় রসূল প্রত্যাদেশের সারমর্ম তুলে ধরতে পেরেছিলেন আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কাছে। এখন কিছু আমন্ত্রিত ব্যক্তিও গোপনে প্রত্যাদেশের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।

কোনও পরিস্থিতিতেই রসূল (সাঃ) তাঁর মিশন থেকে পিছিয়ে আসেননি। তিনি সর্বদাই তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর এ কাজ অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না কুরআনের আর একটি নতুন প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হত ততক্ষণ পর্যন্ত। কুরআনের এই প্রত্যাদেশে সরাসরি দৃঢ়তা অবলম্বনের কথা বলা হল।

> "কাজেই হে নবী, যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেওয়া হচ্ছে তা জোরে- শোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও, আর শিরককারীদের (অংশবাদীদের) বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।"
> (কুরআন - ১৫ ঃ ৯৪)

নবীর (সাঃ) ইসলামী মিশন এখন অন্য মাত্রা গ্রহণ করল। নতুন ধারায় চলল এর প্রবাহ। এ প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর এটা একেবারে জনসমক্ষে আরব তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ করা হল। আর প্রচারের দুটি বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। প্রথমত এটা জানিয়ে দেওয়া হল যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই, মালিক নেই, শাসক নেই, জীবিকাদাতা নেই। তিনিই সর্বেসর্বা। তাঁর সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মহাবিশ্বে কল্পনাও করা যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে এই মহাসত্য প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়নের জন্য যারা বিরুদ্ধবাদী তাদের চোখ রাঙানীকে কোনপ্রকার ভয়েরও দরকার নেই। কুরাইশদের বহুত্ববাদী ধর্মের কাছে এ এক বিরাট ধরনের চ্যালেঞ্জ। রসূলের এই আহ্বানে তাঁর পাশে জড়ো হল অনেক বিশ্বস্ত দৃঢ়চেতনার মানুষ। তারা ছিল তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই আবার আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন ধর্মীয় মতের মানুষেরা। আর এই মানুষগুলির উপর শ্রীঘ্রই নেমে এল নানারকম অত্যাচারের স্টিম রোলার। তাদের জীবন যাত্রায় নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হল। স্বাভাবিকভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো মক্কার দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ থেকে।

প্রস্তাব ও দাবী

ইসলামের আহ্বান আর পিঁজরাবদ্ধ হয়ে থাকল না। তা স্বাধীনভাবে ডানা মেলতে শুরু করল। যারা ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল তারা আল আরকামের বাড়িতে জমায়েত হল। এখানে প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ের প্রচার কিভাবে হবে তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রত্যেক প্রতিবেশীদের কাছে এটা যেমন জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তেমনি ভাবে পাশাপাশি অনান্য লোকেরাও এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল। আরব গোত্রপতিরা শীঘ্রই অনুভব করল যে এটা মোটেই মামুলী ব্যাপার নয়। এটা একদিন মহীরূহের আকার ধারণ করবে। এবং তাদের জাঁকিয়ে বসে থাকা ধর্মের বিনাশ করবে তা আর তাদের কাছে অজানা রইল না। আর এর ফলে তাদের যে রসম-রেওয়াজ এতদিন ধরে চলে আসছে তাও ধুলায় লুটিয়ে যাবে। গোত্রপতিরা আরোও অনুভব করল, ইসলামের প্রসার ঘটলে তারা যে জনসাধারণের উপর মাতব্বরী করে আসছে তাও লোপ পাবে। তাছাড়া মক্কার ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু নির্ভর করছে মিথ্যা পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করে ও নানান ধরনের উৎসব মেলাকে নিয়ে। আর এইসব মেলা

উৎসবে আশেপাশের সমস্ত গোত্রের মানুষেরা প্রায় সারাবছর ধরে আনাগোনা করে থাকত। ইসলাম প্রসার লাভ করলে স্বাভাবিক কারণে এই সকল ব্যাবসা বাণিজ্য লাটে উঠবে। নানান গোত্রের তীর্থ যাত্রীদের আগমনের জন্য মক্কার পণ্য-সামগ্রী বেচা কেনার ফলে আরব কুরাইশদের হাতে অনেক পয়সা আসত। ইসলামের উত্থানের ফলে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে গোত্রপতিরা সিরিয়াসভাবে অনুভব করল।

কুরাইশ নেতারা সবাই একত্রিত হয়ে একটি সিদ্ধান্ত করলেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হোক। দীর্ঘদিন ধরে আবু তালিবের কাছেই হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) লালিত পালিত হয়েছিলেন। আবু তালিবের কাছে প্রতিনিধিগণ কুরাইশের পক্ষ থেক বললেন, তিনি যেন তার ভ্রাতৃষ্পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকতে বলেন, কারণ তারা তার এই প্রচারকে তাদের নিজেদের ধর্মের সর্বনাশ বলে ভাবত। কিন্তু আবু তালিব তাদের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না, বাধ্য হয়ে তারা ফিলে চলে গেলেন। কিন্তু কুরাইশ নেতারা নাছোড় বান্দা। অল্প কয়েকদিন পরে তারা আবার একই আবেদন নিয়ে ফিরে আসলেন আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব বাধ্য হয়ে ভ্রাতৃষ্পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বুঝিয়ে তাকে বললেন যে তিনি কিন্তু তার কোন সাহায্য করতে পারবেন না। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,

> *"ওহে আমার চাচা, আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শপথ করে বলছি যদিও তারা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে তা হলেও আমি এ কাজে বিরত থাকতে পারব না, যতক্ষণ না তিনি এর বিজয় দান করবেন অথবা আমার মৃত্যু এনে দেবেন।"*

ভ্রাতৃষ্পুত্রের এরকম দৃঢ় সংকল্প দেখে তিনি অবাক হলেন এবং তাঁকে আর এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। বরং তাকে এ কাজে সব সময় সমর্থন করে যাবেন বলে আশ্বাস জানালেন। এর পরেও কুরাইশরা তার পিছু ছাড়লেন না, তারা পরে আরো এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়েদিলেন। তারা হজরতকে টাকা পয়সা ধন সম্পদ এমন কি ক্ষমতাও প্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি সেগুলোকে নিতে অস্বীকার করলেন আর দৃঢ়তার সাথে বলে দিলেন তিনি কেবলমাত্র মানুষের কাছে ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য আগ্রহী এছাড়া আর কোন কিছুতে তার কোন প্রকার মোহ নেই, যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে তাদের একমাত্র শাসক, প্রভু মালিক আল্লাহই।

"*আমি* তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ ক্ষমতা কিছু চাইছি না। আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আমার প্রতি এ সতর্কতার কথা জানাতে বলেছেন। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বার্তা বয়ে এনেছি এবং ভাল

উপদেশ দিচ্ছি। যদি তোমরা এটা গ্রহণ কর তাহলে ইহজীবনে তোমরা কল্যাণ পাবে এবং পরকালেও পাবে কল্যাণ। আর যদি তোমরা একে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে আমি অপেক্ষা করতে থাকব যতক্ষণ আল্লাহ আমাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে না দেন।”

এই কথাগুলোর দ্বারা রসূল সম্ভাব্য সকল বিবাদ নিষ্পত্তির কথা তুলে ধরলেন। তিনি থেমে থাকলেন না তাঁর মিশনের কাজে আর আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পরিস্থিতির অপেক্ষা করে চললেন। বাধার মরু ঝড় উঠল। এবার কুরাইশ প্রধানরা তাঁকে পাগল, ম্যাজিসিয়ান, ভুতগ্রস্ত ইত্যাদি বলে সমাজে খাঁটো করার চেষ্টা চালাল।

কুরাইশদের নির্মম নিপীড়ন প্রতিক্রিয়া

নির্যাতনের নানান বাধা বিপত্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঘিরে ধরল। তিনি শিকার হলেন অপমান ও অবমাননার। কুরাইশরা তাঁর কাছে নানা রকম অলৌকিক কাণ্ড ঘটানোর দাবী উত্থাপন করল। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা কথা অতি সহজে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে “আমি নবী ছাড়া কিছু নই”। কিন্তু চাপ কমল না। বিক্ষোভ অত্যাচার দিন দিন বাড়তে শুরু করল। যে ধারায় কুরাইশরা তার সাথে দুর্ব্যবহার চালাল ও মিশনের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করল তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে অসম্ভব। কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হল সংক্ষেপেঃ

● একেবারে দরিদ্র মুসলিম যারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীদ্বারা রক্ষিত নয় তারা আক্রান্ত হল প্রথমেই। এর প্রথম শিকার হলেন বিলাল (রাঃ)। উমাইয়া ছিলেন তার মালিক। উমাইয়া তাকে বেঁধে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিতেন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালি কি ভয়াবহ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত বড় বড় পাথরের খণ্ড। এইভাবে বার বার তাঁকে ইসলাম পরিত্যাগের জন্য পীড়া দেওয়া হচ্ছিল নানান কায়দায়। কিন্তু নির্ভিক বিলাল (রাঃ) এই রকম কঠিন কষ্টের সন্মুখীন হয়েও একটিই জবাব দিচ্ছিলেন “আল্লাহ এক! আল্লাহ এক!” আবু বকর (রাঃ) এর নজরে এল বিলাল (রাঃ) এর এই নিপীড়নের কথা। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিলালকে উমাইয়ার কাছ থেকে কিনে নিলেন। তারপর একেবারে তাকে স্বাধীন করে দিলেন। আর এই বিলালই একদিন মদিনার মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন। সবাই তাকে সম্মান জানাতেন তার আন্তরিক ঈমান, ত্যাগ ও সুন্দর কণ্ঠস্বরের জন্য।

● ইসলামের চিরশত্রু আবু লাহাব নিত্য নতুন অত্যাচারের ফরমুলা প্রয়োগ করতেন নব দীক্ষিত মুসলিমদের উপর। এমন কি রসূলকে পাথর ছুঁড়তেও দ্বিধাবোধ করত না। আবু লাহাবের দুই পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিল। আবুলাহাব তার দুই পুত্রকে তাদের তালাক দেওয়ার জন্য দারুনভাবে

চাপ দিলেন। এই সময় রসূলের দ্বিতীয় পুত্র মারা যায়, ঠিক এই চরম বেদনা বহুল সময়ে রসুলকে 'আবতার' নির্বংশ বলে গালাগালি দিতেও পিছপা হয়নি আবু লাহাব। আবদুল্লাহ পুত্র তারিক বর্ণনা করেছেন যে আবু লাহাব রসূলকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রুপই করত না বরং তাঁর পায়ে পাথর মেরে চলত যতক্ষণ না রক্ত ঝরে পড়ে পা থেকে।

● উম্মে জামিলা ছিলেন আবু লাহাবের স্ত্রী। তিনিও রসূলের মিশনকে নিভিয়ে দিতে কম চেষ্টা করেন নি। নানা রকম নিত্য নতুন যন্ত্রণাদায়ক আচরণ তিনি হজরতের সাথে করতেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনিও তার স্বামীর চেয়ে শত্রুতায় মোটেই কম নন। নবী সাঃ-কে তিনি দৈহিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য কাঁটার বোঝা বয়ে আনতেন আর সেই সকল বিষাক্ত কাঁটা নবীর (সাঃ) চলার পথে লুকিয়ে রাখতেন যাতে করে পথ চলতে নবী (সাঃ) ঐ কাঁটা দ্বারা বিদ্ধ হন। নবীকে দেখলে তিনি এত অশ্রাব্য গালাগালি দিতেন যে কানে আঙুল দিয়ে চলতে হত নবী (সাঃ)-কে। অবশ্য এ সব গালাগালি থেকে শত্রুরা ইন্ধন পেত নবী (সাঃ)-কে মারার জন্য। তাই কুরআনেও এই নারীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়েছে।

● রসুলের উপর নির্মম অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছিল, যেগুলো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একদিন রসূল সাঃ কাবা চত্বরে নামায আদায় করছিলেন। দূরে দুরাচার কুরাইশদের নেতা আবু জেহেল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। রসূলের নামায পড়া যখন তারা অবলোকন করল তখন নিজেদের মধ্যে আবু জেহেল বলল "কে ওই পচা উটের ভূঁড়িটা ওর ঘাড়ে তুলে দিয়ে আসতে পারবে?" হতভাগা উকবা এ কাজে রাজি হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে উকবা এগিয়ে এলেন রসূলের কাছে। উটের সেই ভারী ভূঁড়িটা নিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। যেইনা রসুল নামাযের সিজদার জন্য মাথা ঠেকালেন মাটিতে, তখন উকবা তার কাজ সমাধান করলেন নির্লিপ্তভাবে। দূরে আড্ডাখানায় হো হো করে হাসির অট্টোরোল উঠল। এই অবস্থাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাটি থেকে মাথা ওঠাতে পারলেন না, কষ্টে হাঁপাচ্ছিলেন। এ ঘটনা জানতে পেরে নবী কন্যা ফাতিমা রাঃ দৌড়ে এলেন সেখানে, বহু কষ্টে পিতার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলেন এই নোংরা আবর্জনা।

● আর একদিনের ঘটনা, নবী (সাঃ) এই কাবায় নামায পড়তে এসেছিলেন। সেই সময় কুরাইশ দুর্বিত্তরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন আর সেই উকবাই তার সামনে গিয়ে নিজের চাদরে ফাঁস লাগিয়ে রসুলের গলায় দিয়ে তা হেঁচকা টান দিলেন। ফাঁস আটকে গেল রসূলের গলায়। এই সময় কোন একজন চেঁচিয়ে "আবু বকরকে বলল, তোমাদের রসূলের দিকে তাকিয়ে দেখ"। আবু বকর (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। দেরি না করে উকবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রসূলকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। আর বললেন "তোমরা কি এমন একজন মানুষকে মেরে ফেলতে চাও শুধু এই কারণে যে সে একমাত্র আল্লাহকেই তার প্রভু বলে মানে।"

● একদিন উকবা রসুলের সামনে খুব ঔদ্ধত্যভাবে আসল এবং নির্লজ্জের মত চিৎকার করে বলল "আমি কুরআন বিশ্বাস করি না।" তারপর তার আচরণ আরোও চড়া হল। এমনকি তার উদ্ধত হাত চড়াও হল রসূলের প্রতি। এ ঘটনায় রসূলের জামা ছিঁড়ে গেল। কিন্তু তার চপটাঘাত রসূলের পবিত্র মুখমণ্ডল স্পর্শ করল না।

● ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জেহেল তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বলল, "ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা, এটা মনে হচ্ছে মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের ভুল ভ্রান্তি খুঁজতে চাচ্ছে। আমাদের আচার আচরণের ত্রুটি খুঁজতে চায় ও। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এতদিন ধরে যা করে আসছে ও ওগুলো মানছে না। আমি আমাদের ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি আমি একটি বড় পাথর ওর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ওর মাথা থেঁতলে দেব। এইভাবে ওর খপ্পর থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারব।"

হতভাগ্য শ্রোতারা তার এই দূরাচারমূলক কাজের অনুমোদন দিল ও শীঘ্রই কাজ যাতে বাস্তবায়িত হয় সেজন্য তাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল।

দেরি করলেন না আবু জেহেল। পরের দিনেই একটা ভারী পাথর বয়ে নিয়ে চললেন মক্কা চত্বরে। তারপর অপেক্ষা করে রইলেন নবী (সাঃ) -এর জন্য। দূরে অন্যান্য দুর্বিত্তরা অপেক্ষা করছিল আবু জেহেলের এই হীনকাজের খবর পাওয়ার জন্য। নবী (সাঃ) কাবা ঘরে এলেন ও নামাজে সেজদায় যখন গেলেন আবু জেহেল ভারী পাথর নিয়ে এগিয়ে গেলেন তার কাজ সমাধা করার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য ! এক ভয়ার্ত চিৎকার করে বিবর্ণ হয়ে পেছন দিকে দৌড়ে গেল আবু জেহেল। পাশে অপেক্ষারত কুরাইশরা দৌড়ে গেল তার কাছে। কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। কোন রকমে আবু জেহেল উত্তর করল "আমি যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন অস্বাভাবিক দেখতে একটি উট বড় বড় দাঁত বের করে বিকট ভঙ্গিতে আমার পথ আটকে দিল এবং আমাকে গিলে ফেলতে চাইল"। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন এ প্রসঙ্গে নবী সাঃ বর্ণনা করেছেন যে ওটা ছিল জিব্রাইল আঃ। আবু জেহেল যদি আর একটু এগিয়ে যেত তা হলে ওকে মেরে ফেলত।

মিডিয়া আক্রমণ

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সৎ ও অসদ্ব্যবহার

রসূলের যুগে আজকের মত যোগাযোগ ব্যবস্থার এতটা উন্নতি ছিল না। বরং বর্তমান অত্যাধুনিক যে সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন সহজলভ্য -এর কল্পনাও তখন মানুষ করতে পারেনি। তখন ছিল না কোন ছাপাখানা বা বৈদ্যুতিক মিডিয়া। কিন্তু ইসলামের নিন্দাবাদ করতে থেমে থাকেনি দুর্বিত্তদের সংগ্রাম। তারা নানাভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের মিশনের উপর আঘাত হেনে চলছিল। মক্কার আশেপাশে এমন কোন কবি

ছিল না যে রসূল ও ইসলামের অবমাননামূলক প্রচার চালায় নি। এই সকল কবি লেখকদের নানান রসোদ্দীপক কবিতা বাছাই করা হত রসূলকে অবমাননার জন্য। ইতিহাসে এই সকল কবিদের বিরাট তালিকা পাওয়া যায়। তাদের কয়েকজন হলেন জুহাইর পুত্র কাব, সালাতিন পুত্র হারিস, আবদুল্লাহ পুত্র নাকিদা এবং হানজালার পুত্র জনৈক কবি।

কুরাইশ মাতব্বররা এই সকল কবিদের নিয়ে সভার আয়োজন করতেন। সেখানে তারা নানান ভঙ্গিমায় মুহাম্মদ সাঃ, ইসলাম ও আল্লাহকে নিয়ে নানাপ্রকার ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা ও পাঠ করতেন। এমনকি প্রতিযোগিতা পর্যন্ত হত কবিদের মধ্যে। আর এখানে জড়ো হত যত রাজ্যের মদ-মাতাল চরিত্রহীন লোকেরা। এমনকি এইসব কবিতা রচিত হত মুহাম্মদ সাঃ ও তাঁর সাথী সাহাবাদের চরিত্রের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করে। আর এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানসিকভাবে রসূল তথা তার সঙ্গী সাথিদের মনোবলকে ভেঙ্গে দেওয়া। এছিল তাদের এক মনস্তাত্ত্বিক চক্রান্ত। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও হজরত মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর সাথীরা ধৈর্য্য ধরেছিলেন। তারা জানতেন "কষ্টের পরে শান্তি স্বস্তি রয়েছে।" মাত্র কয়েক বছর পরেই এই সকল কবিদের অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাব এবং সাবিতপুত্র হাসান। কবি হাসানের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে রসূল (সাঃ) খুবই খুশি হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহনের পর কবি হাসানকে আল্লাহর রসূল কবিতা লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল কবিতা আগে লেখা হয়েছিল এবং তখনও যা লেখা হচ্ছিল হাসান সেগুলোর যথাযথ জবাব এই সকল কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এজন্য আল্লাহর রসূল তাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি আল্লাহর রসূলের জন্য একটি মিম্বার (বক্তৃতা মঞ্চ) তৈরী করে দিয়েছিলেন যাতে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের কথা জনসমক্ষে ঘোষণা দিতেন। ইসলামি সাহিত্য যে ইসলাম প্রচারের জন্য কত বড় ভূমিকা পালন করতে পারে তা রসূলের কথা থেকে জানতে পারা যায়। তিনি মন্তব্য করেছিলেন কবির রচিত কবিতাগুচ্ছ শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। এক সময় তিনি আরোও বলেছিলেন "একজন মুসিলম তরবারী দিয়ে যেমন যুদ্ধ করতে পারে তেমনি পারে তার কথা দিয়েও"।

আজও একই কথা প্রযোজ্য সারা পৃথিবীজুড়ে নচ্ছার দুষ্ট লোকেরা কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি হয়েও বাক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ইসলাম, কুরআন, মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত রসূলের যুগের মত মিডিয়ার সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগিয়ে ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করা। সাহিত্য জগতে, মিডিয়া জগতে আজ যে মিথ্যা অশ্লীলতার সয়লাব চলছে তার মোকাবিলা করতে এখুনি মাঠে নামতে হবে, দেরি করলে চলবে না।

তবে এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের কবি প্রতিভা বা সাহিত্য প্রতিভা যেন কোন সময়েও খারাপ পথে পরিচালিত না হয়। আমাদের প্রতিভা যেন সমাজ গড়ার কাজে লাগে। সমাজ ধ্বংসের কাজে যেন না ব্যবহার হয়। কারণ আমরা সন্তুষ্ট করব একমাত্র আল্লাহকে আর অনুসরণ করব একমাত্র তাঁকেই। সারা পৃথিবীর মানুষেরা কে কি করল তা আমাদের জানার দরকার নেই। সারা পৃথিবীর মানুষের অনুসরণ করার চেয়ে আল্লাহকে অনুসরণ করা, নবীকে অনুসরণ করা, কুরআনকে অনুসরণ করা ইহকাল ও পরকালের জন্য মঙ্গলদায়ক। কুরআনের ঘোষণা -

> *"হে মুহাম্মদ (সাঃ) তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারাতো নিছক ধারণা অনুমানের উপর চলে এবং কেবল ধারণা অনুমানই করতে থাকে।"*

জাদুকর বলে গুজব রটনা

কুরাইশ নেতারা হজরত মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর মিশনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নানানরকম কৌশল অবলম্বন করেছিল। তারা নিজেরা টিটকারি, ঠাট্টা বিদ্রুপ তো করতই সেই সঙ্গে এই জঘন্য কাজে অপরকেও উৎসাহিত করতো। যার ফলে রসূল ও তার সাথি সঙ্গীদের রাস্তাঘাট হাটে বাজারে বের হওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপকে উপেক্ষা করেও যখন ইসলামী মিশনের গতিরোধ করা যাচ্ছিল না তখন তারা রসূলের উপর অন্য এক অপবাদ নিয়ে গুজবের জাল বুনলো, তারা সবাইকে এ কথা বলা শুরু করল যে রসুল একজন জাদুকর। আর জাদুকরেরা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। তারা পিতা থেকে পুত্রকে আলাদা করে দেয়, স্বামী স্ত্রী-র বিচ্ছেদ ঘটায়। অতএব এর থেকে সবাই সাবধান।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সত্যের পথ দেখান

হজরত মুহাম্মাদ সাঃ ও তাঁর সঙ্গী সাথিরা যখন ইসলামের মিশনকে জীবনের মূল্য দিয়েও আঁকড়ে ধরে চলল তখন কুরাইশ শত্রুরা ভয় পেয়ে গেল তার বিস্তার সম্বন্ধে। আর এই সময়ে এসে গেল মক্কার বার্ষিক বাণিজ্য উৎসব। তাদের মনে এই শঙ্কা কাজ করছিল, পাছে এই বাণিজ্যিক মেলায় দূর থেকে আগত বণিকদের কাছে হজরত মুহাম্মাদ সাঃ ইসলামের কথা বলে ফেলেন। তাই তারা এই সম্ভাবনাকে রুখতে সর্বোপরি সমস্তরকম ব্যবস্থা নিল তক্ষুনিই। দূর থেকে আগত মানুষদেরকে তারা আগে থেকেই

হজরত মুহাম্মদ সাঃ ও ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন নানারকম মিথ্যা গুজব দিয়ে। এ গুপ্ত নীতি দারুনভাবে প্রভাব ফেলেছিল মেলায় আগত লোকেদের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষের উপর এই অভিসন্ধির কোন প্রভাব পড়েনি বরং তারা উল্টে ইসলামের উপর আস্থা এনেছিলেন। বনু গিফার বংশের আবু জর গিফারও ছিলেন আশির্বাদপুষ্ট লোকেদের দলে। প্রকাশ্য রাজপথে তিনি ছিনতাই করে বেড়াতেন। বুকে তার ভয়-ডর বলে কিছু ছিল না। যখন সে শুনল যে মুহাম্মাদ সাঃ নামে একজন লোক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য বার্তা এনেছেন তখন সে তাঁর কাছে গেলেন। যদিও কুরাইশরা আগাম সতর্কতা তাকে দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি তাদের বাধা অমান্য করে নবী সাঃ এর কাছে গেলেন। এই সময় তিনি শুয়েছিলেন। আবু গিফার তাঁর নাম ধরে ডাকলেন আর জানতে চাইলেন রসূল যে বার্তা এনেছেন তার সম্বন্ধে। রসূল ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন ইসলামের মহাসত্যের বার্তা। হৃদয় নড়ে গেল আবু জর গিফারী রাঃ-র। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। অবাক হলেন নবী সাঃ বলে ফেললেন "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান" পরবর্তীতে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের একজন।

ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ

আম্মার রাঃ ছিলেন ইয়েমেন গোত্রীয় এক যুবক। ইসলামের প্রথম লগ্নে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসূলের কাছে প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন আল-আরকামের ঘরে। অল্পদিন পরে তার পিতা ইয়াসির রাঃ এবং মাতা সুমাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা। ইসলামের শত্রু আবুজেহেলের সহ্য হল না। প্রতিশোধ নিতে এই পরিবারটিকে নিশানা বানালেন। সে তাদের প্রতি অত্যাচার শুরু করল। বেঁধে ফেলে দেওয়া হল তাদেরকে দিনের উত্তপ্ত বালিতে। এইভাবে অত্যাচার চলল দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু এরকম অত্যাচার উপেক্ষা করেও তারা ইসলাম ত্যাগ করতে পারল না। সুমাইয়া একসময় চিৎকার করে আবুজেহেলকে আক্রমণাত্মক ভৎসনা জানালো তার কাপুরুষসম আচরণের জন্য। হিংস্র আবুজেহেল সঙ্গে সঙ্গে নিজের অস্ত্র খাপ থেকে বের করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুমাইয়ার আত্মা জান্নাত অভিমুখে পাড়ি দিল। তখনও রাগ পড়ল না আবু জেহেলের। সে সুমাইয়ার স্বামী ইয়াসিরকেও মেরে ফেললো। ইসলামের ইতিহাসে শহীদের খাতায় প্রথম নাম লেখালেন এক মহিলা।

দিন দিন করে মুসলিমদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁচাচ্ছিল। রসুলের নিরাপত্তার ব্যাপারে চাচা আবু তালিব ও হামজা কিছুটা ভেবেছিলেন বটে কিন্তু তাদের এই সাহায্য সহানুভূতি অন্যান্যদের প্রতি ততটা পৌছায়নি নানান সামাজিক কারণে।

5

সমাজ বিপ্লবের সাথে মনোবিপ্লব

কুরাইশরা কেবল একটি মানুষের বিরোধী ছিল তা নয়। সমস্ত রসূলগণই-এ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের সবাইকে করা হয়েছিল লাঞ্ছিত। বঞ্চিত করা হয়েছিল নিজের বাড়ি-ঘর, দেশ থেকে। আর তাদের অবস্থার জন্য দায়ী ছিল তাদেরই সমাজ। কারণ ছিল একটাই, নবী রসূল যে মিশনের বার্তা এনেছিলেন তা ছিল যুক্তিপূর্ণ, তা হৃদয় নাড়িয়ে দিয়েছিল সকলের। আর তা ছিল দীর্ঘদিনের প্রথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত। এ মিশনগুলো সমাজের পরিবর্তন চাইত।

বিভিন্ন সময়ে নবীগণ যখন তাঁদের চারপাশের মানুষের কাছে তাঁদের মিশন নিয়ে এসেছেন তখন তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল তা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসা (আঃ) ও তাঁর ভ্রাতা হারুন যখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে বলছিলেন তখন তাদের যে প্রতিক্রিয়া ছিল তা কুরআনে বলা হয়েছে নিচের ভাষায়,

> "তারা বলল ঃ তুমি কি এজন্য এসেছো যে, তুমি আমাদেরকে সেই পথ ও পন্থা থেকে ফিরিয়ে নেবে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। আর জমীনের উপর তোমাদের দুজনের প্রাধান্য ও কতৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে ? তোমাদের কথাতো আমরা মেনে নেব না।" (কুরআন ১০ঃ৭৮)

মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের ডাকছিলেন এই বলে যে, তোমরা তোমাদের এই প্রতিমাগুলিকে বর্জন কর এবং এক আল্লাহকেই তোমাদের প্রভু বলে মেনে নাও। প্রকৃতপক্ষে রসূল (সাঃ) যে মিশন চালিয়েছিলেন তা সমাজের বিরুদ্ধে। সমাজের মধ্যে শত শত বছর ধরে চলে আসা নিয়মনীতির যে ধারা চলছিল তাঁর সেই আন্দোলনের কাছে তা ভেসে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। শুধু সমাজে নয় মানুষের

হৃদয় রাজ্যেও দারুণভাবে দোলা দিয়েছিল কুরআনের বাণী। তাঁর মিশনের সারবস্তু ছিল তাওহীদ তথা একত্ববাদের সাথে আখিরাত - পারলৌকিক জীবনের চিরস্থায়ী ভালমন্দের পথ ও পন্থা বাতলে দেওয়া। আর দুনিয়ায় মানুষের কর্মনীতির উপর নির্ভর করছে পারলৌকিক জীবনের ভালমন্দ – এই চিন্তা চেতনাই রসূলের মিশনকে দৃঢ় করেছিল দারুণভাবে। মহান স্রষ্টার গুণাবলীতে চিরন্তন হওয়ার চেতনা মুসলিম মানসকে স্বচ্ছ করে তুলেছিল দারুণভাবে। তারা এই আধ্যাত্মিক চেতনার ভেলায় চড়ে দূর্গম বিপদ সমুদ্রে অনায়াসেই পাড়ি দেওয়ার সাহস পেয়েছিলেন। আর কুরাইশরাও এটা জেনে নিয়েছিলেন যে তাদের এই আল্লাহ-র একত্ববাদের মধ্যে বিরাট শক্তি নিহিত। কুরআনের ঘোষণা,

> *“বল আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি জাতকও নন, জনকও নন। কোন কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়।”* (কুরআন-১১২)

রসূলের মিশন কোন চাপিয়ে দেওয়ার বা সমঝোতার বিষয় ছিল না। একেবারে নির্ভেজাল তওহীদ – একত্ববাদের আহ্বান।

> “বলে দাও, হে অবিশ্বাসীরা! আমি সেই প্রভুর ইবাদত করিনা যার ইবাদত তোমরা কর। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত কর আমি যার করি। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই, তোমরা যাদের করছ আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদত আমি করছি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।” (কুরআন ১০৯)।

এই আয়াতগুলো তখনই অবতীর্ন হয়েছিল যখন কুরাইশরা তাদের বাপ-দাদা থেকে মেনে আসা বহুত্ববাদী দেবদেবীর ধর্মের সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) আনীত ধর্ম একত্ববাদের মধ্যে একটি সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কুরাইশরা মুহাম্মদ (সাঃ) আনীত ইসলামের কিছুটা মেনে নেবেন তার বিনিময়ে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে মেনে নেবেন, কিন্তু ইসলামের ঘোষণা একেবারেই কাটছাঁট। এরকম মিশ্র কোন নীতি দ্বারা সমাজ পরিবর্তন করা যায় না এবং আল্লাহও সেটা পছন্দই করেন না। তাই তিনি নবীকে প্রত্যাদেশ করে জানিয়ে দিলেন সবকিছু।

তিনটি প্রশ্ন

এখন কুরাইশরা রসূলের মিশনকে আটকানোর জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাতে লাগল। কোন দিক থেকে কোন কিছু হচ্ছে না বরং দিন দিন ইসলামে প্রবেশ করা লোকসংখ্যা

বেড়েই চলছিল। তাই তারা মদিনার ইহুদী পন্ডিতদের কাছে দূত পাঠালেন যাতে করে এই নতুন প্রত্যাদেশের সত্যতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। মদিনার ইহুদী পন্ডিতেরা এই নতুন ধর্মের প্রভু হিসাবে আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। আর মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায়শই পূর্ব নবী মোজেস বা মূসার কথা বার বার বলতেন। তাই তারা তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। আর বললেন যদি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি বলতে পারেন তা হলে তিনি সত্যিকারের নবী। প্রথম প্রশ্নটার বিষয় ছিল একটি কাহিনীর সাথে যাতে একদল যুবক তাদের পাশের লোকেদের দ্বারা নির্বাসিত হয়েছিল, সে ব্যাপারে। দ্বিতীয়তঃ সেই পরিব্রাজকের সম্বন্ধে যিনি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের প্রান্তে পৌঁছেছিলেন, তৃতীয়ত আত্মা কি জিনিস সে সম্বন্ধে। আর এগুলো ঠিকঠাক হলে তাঁকে অনুসরণ করার জন্যও ইহুদীদের পন্ডিতেরা বলে দিলেন কুরাইশদের।

কুরাইশ প্রতিনিধিরা ফিরে গেলেন নিজ গোত্রের প্রধানদের কাছে। তারপর তারা মুহাম্মদ (সাঃ) -এর কাছে ইহুদীদের শেখানো প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাইলেন। আর মনে মনে ভাবলেন এবার তারা অনায়াসেই রসূলকে পাকে ফেলতে পারবেন। সব কিছু শোনার পর রসূল (সাঃ) তাদেরকে বললেন “আমি তোমাদেরকে আগামীকাল তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব।”

কিন্তু পরের দিন রসূলের কাছে জিব্রাইল ((আঃ)) এলেন না। আর কোন প্রত্যাদেশও আসল না, পরদিনও জিব্রিলের (আাঃ) দেখা মিলল না। এইভাবে একদিন দু-দিন করে চৌদ্দটা দিন কেটে গেল। এখন অবস্থা যা হওয়ার তাই হতে শুরু করল। কুরাইশদের আনন্দের মাতামাতিতে চারদিকের পরিবেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। এতদিন পরে রসূলের মিশনকে স্তব্ধ করা যাবে। রসূল (সাঃ) এই ঘটনায় দুঃখিত হলেও আল্লাহর প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস তখনও বজায় রাখলেন এবং নিজের মধ্যে কোন ভুল হয়েছে কিনা তার আত্ম- সমালোচনায় মনোনিবেশ করলেন।

‘ইনশাল্লাহ’ যদি আল্লাহ চান’ না বলা

দু’সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আল্লাহর তরফ থেকে রসুলের ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য প্রতাদেশ অবতীর্ন হল,

“আর মনে রেখো কোন জিনিস সম্পর্কে কখনও একথা বলো না যে, আমি কাল এই কাজ করব। (তুমি আসলে কিছুই করতে পার না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলবশত মুখ হতে এরকম কথা বের হয়ে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রভুকে স্মরণ কর। আর বল আশা আছে আমার আল্লাহ এ ব্যাপারে সত্যিকার হেদায়াতের নিকটবর্তী

কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।" (কুরআন ১৮ঃ২৩-২৪)

এই প্রত্যাদেশ আল্লাহর রসূলকে তাঁর ভুল শুধরে দিয়ে এক বড় শিক্ষা দান করল। এর দ্বারা রসূল এটা পরিস্কারভাবে বুঝলেন যে তাঁর নিজের মর্যাদা নিজের জ্ঞান সব কিছুই আল্লাহর উপর নির্ভর করছে। আর আল্লাহ নির্ভরতা না থাকলে সবকিছু বরবাদ। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কাছে মাথা নত করে দেওয়াই ইসলামী মিশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে, এমনকি নবীদেরও একথা স্মরণ রাখতে হয়েছিল। একথা পরিস্কার করে দেয় যে সামনের পেছনের সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কারোর কোন-কিছু করার নেই। সকল ক্ষমতায় একচ্ছত্র মালিকই হলেন তিনি। এ এমন দার্শনিক সত্য যা এড়িয়ে থাকতে পারা যায় না।

তারপর রসূল (সাঃ) কুরাইশদের কাছ থেকে উত্থাপিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর পেলেন। উত্তর দেরিতে পেয়ে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। রসূল যে ব্যর্থ হবেন তাদের এই ভুল বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে অবশেষে তাদের হতাশায় ফেলে দেওয়াই ছিল এই বিলম্বের কারণ। আর একটা জিনিসও পরিস্কার হয়ে গেল যে মুহাম্মদ (সাঃ) কোন কিছু করতে পারেন না। তার সমস্ত ক্ষমতা নিহিত রয়েছে পরম প্রভু একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহ যে কুরআন অবতীর্ন করছেন তার রচয়িতা আল্লাহ নিজেই। মুহাম্মদ (সাঃ) এর রচয়িতা নন।

আত্মা সম্বন্ধে কুরাইশরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল তারও জবাব দিতে মুহাম্মদ (সাঃ) অপারগ ছিলেন। এর জ্ঞান সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারে। আত্মা সম্বন্ধে কুরআনের ভাষ্য, *"এই লোকেরা তোমার নিকট রুহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলঃ এই রূহ আমার প্রভুর হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের কম অংশই পেয়েছ।" (কুরআন ১৭ ঃ ৮৫)*

আর প্রথম দুটি প্রশ্ন। ১) সাতজনের গুহায় ঘুমিয়ে পড়ার কাহিনী। ২) জুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণের কাহিনী। এই দুটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা কাহাফে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরাইশ ও ইহুদীদের জটিল এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মুহাম্মদ (সাঃ) কখনই দিতে পারবেন এটা তারা আশা করেননি। নবী (সাঃ) কোন ইতিহাস পড়েননি। আর তার পক্ষে এরকম ঘটনা জানার পূর্বসুযোগ একেবারেই ছিল না। তাই ইহুদী ও কুরাইশদের সবরকম মিথ্যা জল্পনা কল্পনার উপর এই প্রত্যাদেশ জল ঢেলেই দিয়েছিল। ওই সূরাতেই মুসা (আঃ)-র ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে খেজের (আঃ) এর সঙ্গে তাঁর ভ্রমণ করিয়ে। ক্ষণিকের জন্য মুসা (আঃ) তাঁর নবী হওয়ার স্টাটাসকে আল্লাহর নির্ভরতা থেকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে অবশ্য খেজের (আঃ) এর সাথে ভ্রমণের সময় যে সকল ঘটনা ঘটেছিল তা

অবলোকন করে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন যে আল্লাহর তরফ থেকে জ্ঞান পাওয়ার জন্য কোন সময় মুখ ঘুরিয়ে থাকা চলবে না, তাঁর কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকার মত মুর্খতা আর কোন কিছু হতে পারে না।

এই ঘটনা থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) বড় ধরনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সত্যানুরাগীরাও এর থেকে চলার পথের পাথেয় পেয়ে থাকবে। এর দ্বারা প্রতিটি মুসলিম এ শিক্ষা পেয়ে থাকে যে, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা আল্লাহ নির্ভর হওয়া উচিৎ। মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য যত উন্নত হোক না কেন তার গর্বে আল্লাহকে ভুলে গেলে চলবেনা। এই সূরার এই বিশাল গুরুত্ব থাকার কারণে রসূল (সাঃ) প্রতি শুক্রবার এই সুরা পাঠ করার বিশেষ মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আর এই সূরা পাঠ করে মানুষ যেমন তার অসহায়ত্বের কথা অনুভব করে তেমনভাবে মহান আল্লাহর গুরুত্ব সম্বন্ধেও বুঝতে পারে।

6

আবিসিনিয়ায় হিজরত

নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর দিন দিন লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে লাগলো। যত কুরআনের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতে লাগলো কুরাইশদের হিংসা ততই প্রবল হয়ে উঠল। কেবলমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথিরা এখন এর শিকার থাকলো না বরং যারা এই আন্দোলনকে বিভিন্ন দিক থেকে সুরক্ষা করছিল তাদেরকেও নির্যাতনের জ্বালা সহ্য করতে হচ্ছিল অসহায়ের মতো। আর এদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) ও আবু তালিবের মতো ব্যক্তিত্বও জুড়ে গেল। এ সবকিছু বিবেচনা করে মুহাম্মদ (সা:) সঙ্গী-সাথীদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন,

"যদি তোমরা আবিসিনিয়ায় চলে যাও তাহলে সেখানকার রাজার সহানুভূতি পাবে। কেউ তোমাদের উপর অত্যাচার করার সাহস পাবে না। ধর্মের প্রতি ওই দেশ নমনীয়। তোমরা সেখানে ততদিন অবস্থান কর যতক্ষণ না পরবর্তী এ সংক্রান্ত অহী-প্রত্যাদেশ না আসে।"

রসূল মুহাম্মদ (সা:) আবিসিনিয়ার খ্রীস্টান রাজা নাজ্জাসীর কাছে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। নাজ্জাসী তার প্রজাদের উপর ভাল ব্যবহার করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের এই কাফেলা পৌঁছানোর আগে প্রায় একশ'জনের মতো অপর একটি দল আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এদের মধ্যে বিরাশি কিংবা তিরাশি জন পুরুষ ও প্রায় কুড়ি জনের মতো মুসলিম মহিলা ছিলেন। ঐতিহাসিক এই ঘটনা ঘটেছিল ৬১৫ খ্রীস্টাব্দে। এখন প্রত্যাদেশের ধারা চলছে পাঁচ বছর ধরে। আর এ দু'বছর আগে থেকে প্রত্যাদেশের বাণী প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছিল। পরিস্থিতি সত্যিই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য মক্কা থেকে এটা নির্বাসনের নামান্তরই ছিল।

কুরাইশ নেতারা প্রমাদ গুনলো। মুসলিম দল তো তাদেরকে একপ্রকার

কাঁচকলা দেখিয়ে পালিয়েছে। তারা তাদের যতটা দুর্বল ভেবেছিল তারা তো ততটা দুর্বল নয়। কুরাইশদের কপালে ভাঁজ পড়লো। তারা এই আশঙ্কা করলো যে মক্কার খ্যাতি সম্মান যা এতদিন ধরে চলে আসছিল তা এখন মাটিতে মিশে যাবে। তাছাড়া তারা যদি এমন কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়, যেখানকার প্রশাসন এক আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি সন্ধি প্রস্তাব আনতে পারে। তাই কুরাইশ নেতারা নাজ্জাসীর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠাতে মনস্থ করলেন। আল আসের পুত্র আমর এবং রবিয়ার পুত আব্দুল্লাহ দূত নিযুক্ত হল। তারা নাজ্জাসীর দরবারে গিয়ে পৌঁছালো। তাদের সঙ্গে ছিল প্রচুর অর্থ-সামগ্রী, যেগুলোর প্রতি নাজ্জাসীর আগ্রহ থাকবে বলে তারা মনে করেছিল। দূতেরা দেশত্যাগী মানুষরা যাতে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য না পায় এবং তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হয় তার দরবার করলেন নাজ্জাসীর মন্ত্রীপরিষদের কাছে। বিপুল উপহার পেয়ে তারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল কুরাইশদের দূতদের কাছে। তারা প্রায় সায় দিয়ে ফেলেছিল দূতদের আবেদনে।

রাজা নাজ্জাসী

কুরাইশ দূতেরা চেয়েছিলেন যে, মক্কা থেকে দেশত্যাগী মুসলিমদের কোন কথা শোনার আগে তাদেরকে ফেরত পাঠানো হোক মক্কায়। কিন্তু নাজ্জাসী কুরাইশ দূতদের কথা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি কুরাইশ দূত ও দেশত্যাগী মুসলমানদের মুখোমুখি ডাকলেন। মুসলিমদের মধ্যে আবু তালিবের পুত্র সু-বক্তা সাহসী জাফর ((রাঃ)) উঠে এলেন প্রতিনিধি হিসাবে। নাজ্জাসী জানতে চাইলেন তারা কি জন্য দেশত্যাগ করেছেন এবং আরো জানতে চাইলেন মুহাম্মদ (সাঃ) এমন কি বার্তা এনেছেন যাতে করে তারা দলে দলে এতকষ্ট সহ্য করেও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। জাফর (রাঃ) নাজ্জাসীর কাছে ইসলামের মূল কথা, আল্লাহর একত্ববাদ ও দেবদেবীদের অসারতা বর্ণনা করলেন আর আল্লাহকে এক বলে মেনে নেওয়াতে তাদের উপর যে হামলা এসেছে তাও বর্ণনা করলেন। জাফর (রাঃ) বলে চললেন :

"আমরা বর্বরতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে ছিলাম। আমরা দেবদেবী পূজা করতাম। মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম। মানবীয় সমস্ত গুণকে আমরা অবমাননা করতাম। কখনই আমরা প্রতিবেশিদের সাথে ভালো ব্যবহার করতাম না। আমরা কোন আইন মানতাম না। কেবল শক্তিই ছিল আমাদের সবকিছু। এই সময় আল্লাহ আমাদের কাছে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, প্রতিশ্রুতি পালনকারী একজনকে পাঠালেন। তিনি আমাদের এক আল্লাহর উপাসনা করার কথা বললেন এবং পরস্পর সাহায্যের কথা বললেন। তিনি নিষেধ করলেন দেবদেবীর পূজা করতে। সত্য কথা বলতে, দয়াশীল হতে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে উপদেশ দিলেন। তিনি নারী জাতিকে অসম্মান করতে নিষেধ করলেন। বিরত থাকতে বললেন খারাপ কাজ থেকেও।

নামায কায়েম করতে, যাকাত দিতে ও রোজা রাখতে আদেশ করলেন। আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশকে মান্য করেছি। আর এই কারণে আমাদের এলাকার লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা আমাদের নির্যাতন করছে। এক আল্লাহর উপসনা ছেড়ে পুনরায় কাঠ, পাথর, দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা আমাদের উপর অত্যাচার করছে। আমাদেরকে আঘাত দিয়েছে এবং এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আপনার কাছে নিরাপত্তার আশ্রয়ে এসেছি, আপনার দেশে। আমরা আশা করি আপনি আমাদেরকে ওদের অত্যাচারের হাত থেকে নিরাপত্তা দেবেন।"

আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী সব শোনার পর অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতে চাইলেন কুরআনের কোন অংশ তার কাছে আছে কি-না অথবা কুরআনের কোন অংশ পড়ে শোনাতে পারবে কি-না। আবু জাফর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ কুরআনের সূরা মারইয়ামের নিচের অংশটি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

"আর হে নবী! এই কিতাবে মারইয়াম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা কর। যখন সে আপন লোকজন হতে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নি:সম্পর্ক হয়ে থেকেছিল এবং পর্দা টাঙিয়ে তার পেছনে লুকিয়ে বসেছিল। এই অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে পাঠালাম। আর সে তার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করলো। মারইয়াম সহসা বলে উঠলো, তুমি যদি সত্যই কোন আল্লাহভীরু হয়ে থাকো তবে আমি তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। সে বলল, "আমি তো তোমার রবের প্রেরীত। আর এ জন্য প্রেরীত হয়েছি যে, তোমাকে এক পুত পবিত্র পুত্র দান করবো। মারইয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আর আমি কোন চরিত্রহীনা নারীও নই। ফেরেশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার আল্লাহ বলেন যে, "এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। আর আমি এটা করবো এই কারণে যে, এ পুত্রকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন বানাবো।" *(কুরআন ১৯ ঃ ১৬-২১)*

রাজা নাজ্জাসী ও তার সভাপরিষদ সবাই মোহিত হয়ে গেল জাফরের (রাঃ) এই কুরআন পাঠ শুনে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এটা অনুবাদের ব্যবস্থা করলো। আর এটাও তারা জানলেন যে কুরআনের এই প্রত্যাদেশে ঈসা আঃ অর্থাৎ যীশু-র অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। নাজ্জাসী বলেই ফেললেন যে, যীশু ঈসা (আঃ) যেখান থেকে প্রত্যাদেশ এনেছিলেন সেখান থেকেই এ কুরআন অবতীর্ণ। তৎক্ষণাৎ তিনি কুরাইশ দূতদের দিকে ফিরলেন এবং তাদের অনুরোধকে নাকচ করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে যে আগত মুসলিমরা আশ্রয় নিয়েছেন তিনি তাদেরকে ফেরত দিতে পারেন না।

মারইয়াম পুত্র ঈসা (আঃ)

কুরাইশদের দূত আমর ও আব্দুল্লাহ খুবই হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন নাজ্জাসীর দরবার থেকে। আমর ছিলেন বিচক্ষণ। আমর একটি ফন্দি আঁটলেন। এখুনি তাদের ফিরে যাওয়া দরকার নাজ্জাসীর কাছে এবং এটা জানানো দরকার যে যীশু সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হল তার সাথে খ্রীস্টানদের যীশু সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তা থেকে ভিন্ন। পরের দিন আমর নাজ্জাসীর দরবারে আবার গেলেন এবং বিষয়টা নাজ্জাসীকে বললেন। নাজ্জাসী সমস্ত কথা শ্রবণ করার পর মুসলিম প্রতিনিধি জাফরকে ডাকলেন এবং যীশু সম্পর্কে মুহাম্মদ (সাঃ) কি বলেন তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে বললেন। মুসলিমরা স্বাভাবিক কারণে চিন্তায় পড়ে গেলেন। যদি যীশু সম্বন্ধে দু'টি ধর্মের বিবরণ দু'রকম হয় তাহলে নাজ্জাসী কোনটাকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করবেন তার কোন ঠিক নেই। আর এই বিষয়ে তিনি নতুন চিন্তা করে নিরাপত্তা না দিয়ে তাদের মক্কায় তো ফিরিয়েও দিতে পারেন। তবুও কিন্তু তারা যা সত্য ঘটনা তাই বর্ণনা করতে দৃঢ় সংকল্প থাকলো। মুসলিম প্রতিনিধি জাফরকে নাজ্জাসী যীশু সম্বন্ধে মুহাম্মদ (সাঃ)-র বক্তব্য পেশ করতে বললেন, "তুমি কি যীশুকে মেরীর পুত্র বলে স্বীকার কর?" জাফর (রাঃ) দেরি না করে বললেন, "আমরা তাই বলি আমাদের নবী যা শিখিয়েছেন। যীশু হচ্ছেন আল্লাহর দান তাঁর রসূল। তিনি তাকে কুমারী মেরীর গর্ভে ফুঁকে দিয়েছেন। এখানে তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র তার কোন প্রমাণ নেই।" এই কথা শোনার পর নাজ্জাসী কুরাইশদের দূতদের ফিরে যেতে বললেন। তাদের উপঢৌকনগুলিও ফিরিয়ে দিলেন। অপরপক্ষে মুসলিমদের তিনি ভালো করে আপ্যায়ন করলেন এবং তার দেশে নিরাপত্তা দান করলেন।

ঝুঁকি এবং সত্যতা

এটা ছিল মক্কার কুরাইশদের কাছে বড় ধরনের এক বাধা। শীঘ্রই তারা প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে। যখন তাদের দূত মক্কায় ফিরে এসে সমস্ত কিছু অবগত করলেন, তারা বললেন জাফর এবং তাদের মুসলিম সাথিরা আবিসিনিয়ার সাধারণ খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বরং রসূলের উপর প্রত্যাদিষ্ট বাণীর উপর গুরুত্ব দিয়ে হাজার বিপদের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেও সত্য কথাটি বলেছেন, যদিও তারা নির্বাসিত হয়েছেন কিন্তু তারা সেখানে আপ্যায়িত, নিরাপত্তার বলয়ে সুরক্ষিত। মুসলমানরা প্রশ্নের সত্যতাকে এড়িয়েও যায়নি এবং মিথ্যাও বলেনি। তারা হাজার বিপদ সত্ত্বেও সত্য কথাটি বলেছিলেন। সত্য বলা ব্যতিত তারা ছল-চাতুরির কোন আশ্রয়ই নেয়নি।

পরবর্তীতে রাজা নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূলের সাথে

নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। রসূল (সাঃ) তার মৃত্যুতে গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছিলেন। দেশান্তরিত এই সকল মুসলিমদের বেশিরভাগই পনের বছর ধরে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন খাইবারের যুদ্ধ পর্যন্ত। ওই সময় তারা মদিনায় রসূলের সাথে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর অনেকেই মক্কা বিজয়ের আগাম খবর পেয়ে মক্কা ফিরে গিয়েছিলেন। তারা নাজ্জাসীর দ্বারা কোনপ্রকার কষ্ট পাননি।

মনোবল ও সাহসে হামজা (রাঃ)

একটা অন্যায় ও অবিচারের পরিবেশ চারিদিক বিরাজ করছিল। অস্বস্তির এই গুমোটভাব কেটে একদিন বিরাট আশার আলো দেখা দেয়। ঘটনাটি হল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা হামজা (রাঃ)-র ইসলাম গ্রহণ। প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার ছ'বছর পর এ ঘটনা ঘটেছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায় মুহাম্মদ (সাঃ) একদিন মক্কার কাছাকাছি সাফা পর্বতের কাছে একটি পাথুরে ভূমির উপর বসেছিলেন। এই সময় আবুজেহেল মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে যাচ্ছিলেন আর নবী (সাঃ) কে গালাগালি করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল (সাঃ) বিরূপ মন্তব্য করলেন না। নরাধম আবুজেহেল থামলেন না বরং একটি পাথর নিয়ে নবী (সাঃ) কে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলেন। ঝরঝর করে রসূলের মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। তারপর আবুজেহেল ফিরে এলেন তার আড্ডাখানায়। এই সময় হজরতের চাচা বীর হামজা শিকার থেকে ফিরে আসছিলেন সেই পথ ধরে। তখনও পর্যন্ত তার কাঁধে ঝুলছিল তীরধুনক। এক দাসী বালিকা তাকে জানালেন হজরতের আহত হওয়ার কথা। আবুজেহেলের এ রকম জঘন্য কাজ যে নিজের চোখেই দেখেছিল, তাই তার হৃদয় রসূলের জন্য কেঁদে উঠেছিল।

এই কথা শুনে হামজার মনে খুব আঘাত লাগল। তিনি সরাসরি পবিত্র মক্কা গৃহে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আবুজেহেলকে তার সাথিদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলেন। হামজা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলেন সজোরে আর বললেন, তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)কে গালি দিয়েছ, তিনি যে ধর্ম প্রচার করছেন আমি তার অনুসরণ ও স্বীকার করছি। তারপর হামজা (রাঃ) সোজা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন, দেখ মুহাম্মদ আবুজেহেলের প্রতি আমি তোমার প্রতিশোধ নিয়েছি। হামজার এই কথা শুনে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি উত্তরে বললেন, 'প্রতিশোধ নেওয়াতে কোনকিছু আসে যায় না বরং তুমি যদি একজন মুসলিম হতে, এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করতে তাহলে আমি খুশি হতাম।' হামজা উপলব্ধি করলেন রসূলের কথা। তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন। তিনি

নিজেকেই মুসলিম বলে ঘোষণা করার পর রসূলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন বলেও সবাইকে জানিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পর আবুজেহেল রসূলের উপর অবমাননা ও নির্যাতন আপাতত বন্ধ রাখে। রসূলের সঙ্গী-সাথিরাও সাময়িক স্বস্তি পেলেন কুরাইশদের হাত থেকে।

প্রাথমিকভাবে হামজা রসূলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এই কারণে যে তারই বংশের কেউ অপমানিত হবেন তা তার নিজেরই অপমান। পরে অবশ্য আল্লাহ তার হৃদয়কে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে দিয়েছিলেন পূর্ণ জ্যোতিতে।

উমার (রাঃ)

ইসলামী মিশন শক্তিশালী হওয়ার আর একটি ঘটনা হল হযরত উমার (রাঃ)-র ইসলাম গ্রহণ। প্রত্যাদেশ শুরু হওয়ার ছ'বৎসর পর হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিনদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল খাত্তাব। তিনি যেমন সাহসী ছিলেন তেমনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। তখনও পর্যন্ত তিনি নতুন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় একদিন মুহাম্মদ (সাঃ) মহান প্রভু আল্লাহর নিকট দু'হাত উত্তোলন করে দোওয়া করেছিলেন,

"হে আল্লাহ খাত্তাব বিন উমার অথবা হিসাম বিন আবু জেহেল
যাকে তুমি বেশি ভালবাস তার দ্বারা ইসলামী শক্তি বৃদ্ধি কর।"

মক্কায় দিন দিন ইসলামী শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য উমার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কোন দিক দিয়েই মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্মপ্রচার ঠেকানো যাচ্ছিল না। তাই তাকে নির্মুল করার জন্য একমাত্র পন্থাই হল মূল কেটে দেওয়া অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেওয়া। তাহলেই সমাজ থেকে সব রকম গন্ডগোল রক্তপাত সবকিছুই বন্ধ হয়ে যাবে, এই ছিল তার ধারণা।

হাতে উম্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর হতে। মনে তার দৃঢ় সংকল্প হযরতের শিরোচ্ছেদ করে তবেই ঘরে ফিরবেন। পথে দেখা হল নঈমের সাথে। ইতিমধ্যে তিনিও গোপনে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। উমরের উদ্দেশ্য শোনার পর তিনি চমকে গেলেন। এখন পরিস্থিতি কি হবে তিনি সহজে বুঝতে পারছেন। তাই নঈম উমরের পরিকল্পনা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। জোরের সাথে বললেন, আগে ঘর সামলাও তারপর মুহাম্মদকে হত্যা করবে। তোমার বোন ফাতিমা ও তার স্বামী সাঈদ উভয়েই তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন।' একথা শুনে উমর যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ক্ষিপ্র সিংহের মতো গর্জে উঠলেন। এক মুহুর্তও দেরী না

করে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন তিনি। উমর দ্রুত বোনের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। বাড়িতে ফাতিমা, সাঈদ ও যুবক খাব্বাব এক সাথেই বসে কুরআন পাঠ করছিলেন। তারা যখন কারো আসার শব্দ অনুমান করলেন তখন তাড়াতাড়ি করে যুবক খাব্বাব কুরআনের পাতাগুলো লুকিয়ে ফেললেন। নিজেকেও আড়াল করলেন উমারের কাছ থেকে। বাড়ির ভিতরে গিয়ে বজ্রের মতো আওয়াজ করে জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়ছিলে এক্ষুনি বল। তারা বিষয়টাকে অস্বীকার করল। কিন্তু উমার ছাড়বার পাত্র নয়, জোর করে জানতে চাইল। তিনি বললেন, আমি এক্ষুনি আমার নিজের কানেই শুনেছি। উমর যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে যাচিছল। বোন ও ভগ্নিপতি যতই অস্বীকার করল বিষয়টাকে, ততই ক্ষিপ্র হয়ে উঠলেন তিনি। রাগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভগ্নিপতি সাঈদের উপর। হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা। বোন ফাতিমা চুপ করে বসে থাকতে পারলো না, উমরকে থামাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু উমার তাকেই আঘাত করলো। ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো বোন ফাতিমার শরীর হতে। বোনের মুখের উপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখে তিনি একটু থমকে গেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে বোন ফাতিমা যেন কোথা থেকে একটা শক্তি অর্জন করে চেঁচিয়ে বলল, হ্যাঁ সত্যিই আমরা মুসলিম। আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং তাঁর রসূল (সাঃ)কেও বিশ্বাস করি। এখন তুমি যা খুশি করতে পারো। উমার হতভম্ব হয়ে গেলেন। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বোনের এই স্বীকারোক্তি শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি বোনের কাছে কুরআনের অংশগুলি চাইলেন, যেগুলি তারা এইমাত্র পড়ছিলেন। বোন ফাতিমা প্রথমে তাকে গোসল করে আসতে বললেন। তার হৃদয় যেন অন্য কোন জগতের শীতলশান্তি বাতাস স্পর্শ করে প্রফুল্ল হল। ফাতিমা তার সামনে কুরআনের পাতা তুলে ধরলো। উমরের কণ্ঠ থেকে কুরআনের বাণী ইথার তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

> "ত্ব-হা-, আমি এ কুরআন তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করিনি যে তুমি কোন কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। এ তো একটি স্মারক- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে। অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই মহান সত্তার তরফ হতে যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনকে ও উচ্চ বিশাল আসমানকে। তিনি রহমান, সিংহাসনে আসীন। তিনি মালিক সেইসব জিনিসের যা আসমান ও যমীনে আছে এবং যা আছে আসমান ও যমীনের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। তুমি নিজের কথা সোচ্চারেই বল না কেন, তিনি তো চুপে চুপে বলা কথাও বরং তা হতেও গোপন ও নিশব্দের কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমুহ।" (কুরআন ২০ ঃ ১-৮)

প্রথমবার উমর এই বাক্য ক'টি পড়লেন। তারপর তিনি পাঠ করলেন নিচের বাক্যগুলি। আর এগুলির প্রসঙ্গ আল্লাহ যে মুসা আঃ কে সিনাই পাহাড়ে ডেকেছিলেন সেই ব্যাপারে ছিল। তিনি থামলেন চৌদ্দ নম্বর আয়াতে এসে।

"তুমি কি মুসার খবর পেয়েছ? যখন সে এক আগুন দেখতে পেয়েছিল। তাঁর নিজের পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি এক আগুন দেখেছি। সম্ভবত তোমাদের জন্য দু-একটি অঙ্গার নিয়ে আসবো। কিংবা এই আগুনে আমি কোন নির্দেশ লাভ করবো। সেখানে পৌঁছলে ডাক দিয়ে বলা হল, হে মুসা! আমি তোমার রব। জুতা খুলে ফেল। তুমি তো তুয়া নামক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত। আর আমি তোমাকে বাছাই করে পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি শোন যাকিছু অহী করা হয়। আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী কর এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।" (কুরআন ঃ ৯-১৪)

এখানেই এসে থেমে গেলেন উমার। কুরআনের মধুর এ বাণী পড়ে তিনি অভিভূত হলেন। এই সময় লুকিয়ে থাকা খাব্বাব (রাঃ) বেরিয়ে এলেন বুকে বল নিয়ে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন উমারের এই পরিবর্তন। তিনি জানালেন যে তিনি রসূল (সাঃ)কে এই বলে দোওয়া করতে শুনেছেন, "হে আল্লাহ তুমি উমার অথবা আবুজেহেল-যাকে বেশি পছন্দ কর তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী কর।"

এই কথা শুনে হযরত উমার তার কাছে জানতে চাইলেন বর্তমানে নবী (সাঃ) কোথায় আছেন। খাব্বাব (রাঃ) জানালেন তিনি আরকামের (রাঃ) গৃহে অবস্থান করছেন। কাল বিলম্ব না করে উমার (রাঃ) চাইলেন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে। শীঘ্রই উমার (রাঃ) সেখানে পৌঁছালেন। বাড়ির লোকেরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। কেন না উমারের কাঁধে তখনো তলোয়ার ঝুলছিল। নবী (সাঃ) তাকে সহজে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিতে বললেন। আর উমার ঘরে প্রবেশ করেই তার মুসলিম হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন দৃঢ়তার সাথে। আল্লাহর রসূল 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও মাহাত্ম প্রকাশ করলেন।

হৃদয়ের বিপ্লব

মুহাম্মদ (সাঃ) জানতেন কারোর হৃদয়ের উপর হাত দেওয়ার কারোর হাত নেই। নির্যাতনের মুখেও তিনি আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন এই আশা নিয়ে যে আল্লাহ উমর অথবা আবুজেহেল দুজনের একজনকে দিয়ে ইসলামের সাহায্য করবেন। তিনি এটা ভাল করেই জানতেন যে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনকারীর একমাত্র স্রষ্টা হলেন মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন।

হজরত উমার (রাঃ) ঘর থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিলেন। যে তিনি হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করবেন। তিনি এক আল্লাহর ব্যাপারে অন্ধভাবাপন্ন ছিলেন। কোন দিন এসব কথা মানতেন না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভূমিকা নিলেন অন্য। ইসলাম গ্রহণ করলেন কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে। সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথিদের একজন হয়ে গেলেন। মুসলমানদের কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে উমর ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে পারে। কারণ যে এত তীব্রভাবে ইসলামের বিরোধিতা করতে পারে, তার পক্ষে মুসলমান হওয়া কখনই সম্ভব নয় বলে অন্যরা ভাবত। হৃদয়ের এই পরিবর্তনের চিহ্ন দু'ধরনের শিক্ষা বহন করে। প্রথমত আল্লাহর দ্বারা কোন কিছু অসম্ভবই নয় দ্বিতীয়ত কাউকে বা কোন কিছুর উপর একেবারে শেষ কথা বলা যায় না।

উমার (রাঃ) তার হৃদয় দিয়ে চেয়েছিলেন, তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা কোনরূপ লুকানো অবস্থায় না থাক বরং তিনি সবার সামনে এটা প্রকাশ করে দিতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবু জেহেলের বাড়িতে গেলেন তাকে এই নতুন খবর বলতে। আরো তিনি এটা ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে সবাই কাবা ঘরে প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন। আর এর দ্বারা এটা সহজেই প্রমাণ হবে কুরাইশ নেতাদের কাছে, যে- উমার (রাঃ) ও হামজা (রাঃ)-র মত বীরপুরুষরা মুসলমান হয়ে গিয়েছে আর তারা নামাজ পড়ছে কাবাগৃহে প্রকাশ্যে। এর ফলে মুসলমানদের আর পীড়া দেওয়া যাবে না।

7

বয়কট

পরিস্থিতি আপাতত খারাপ দিকে গড়াল না। কিন্তু উত্তেজনা দিন দিন বেড়েই চলল। ইসলামের বিস্তার রোধ করার সমস্ত প্রচেষ্টা বুঝি কুরাইশদের শেষ হয়ে গেল। তারা তাদের বুদ্ধিকে আর একটু খাটালো। কুরাইশ নেতাদের সবাই একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) এর গোত্র বনু হাসিম গোত্রকে সর্বদিক থেকে বয়কট করল। ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন, বৈবাহিক সম্পর্ক সব কিছুর একটা বিচ্ছেদ ঘটল বনু হাসিম গোত্রের সাথে। প্রায় চল্লিশজন কুরাইশ নেতাদের নিয়ে একটি সন্ধি করে তার বিবরণ কাবা ঘরের দরজায় টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল। আবু লাহাব নিজেই বনু হাসিম গোত্রের হয়েও এই বয়কট সমর্থন করে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে সই দিলেন। এই বয়কট যখন চলছিল বনু হাসিম গোত্রের লোকেরা তখন খুব দুরাবস্তার মধ্যে পড়ল। রসুলের চাচা আবু তালিবও নিরাশ্রয়ের মত একটি ছোট উপত্যকায় দিন কাটাতে বাধ্য হলেন। মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার সঙ্গী সাথিরা প্রায় তিন বৎসর ধরে কাটিয়ে ছিল এই অবস্থাতে। এখানে তারা প্রতিকূল আবহাওয়ায় খাদ্য বস্ত্রের অভাবে জীর্ন-শীর্ণ হয়ে গেলেন। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করার জন্য গাছের পাতা শেকড় এমন কি শুকনো চামড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেতে হয়েছে তাদের। আর্থিক ক্ষতিও কম হয়নি। আবুবকর (রাঃ) -র মত ধনী মানুষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। শুধু তাই নয় মানসিক চাপেও তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এতটা কষ্টের মধ্যে পড়েছিল যে তাদের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল দারুনভাবে।

বাতিল হল বয়কটের চুক্তিপত্র

কুরাইশদের মধ্যে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এই বয়কটের সমাপ্তি হওয়ার জন্য। কেউ কেউ বলেই ফেলল যে, এটা অনর্থক। আবার অনেকে চুক্তি ভেঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখল। অনেকে ইচ্ছে করে এই চুক্তি ভেঙ্গে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মত মাতব্বররা বয়কটের চুক্তি ভাঙ্গতে দিলেন না

কাউকে। তাদের অনেকে এটাই বলল যে এ বয়কট ততদিন চলবে যতদিন না স্বাভাবিকভাবে ওটা ছিঁড়ে লেখাগুলো দুষ্পাঠ্য হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে আবার এ ধরনের অমানবিক চুক্তি ভেঙ্গে নিজেদের হাতেই ছিঁড়ে ফেলতে চাইলেন। এমন পরিস্থিতিতে আবু তালিব একদিন এসে জানালেন, আল্লাহ রসূলকে জানিয়েছেন যে, সন্ধিতে যে অবিচারমূলক কথাগুলো লেখা হয়েছিল তা নষ্ট করা হয়েছে পোকা দিয়ে। কিন্তু কেবলমাত্র বাকি থেকে গেছে আল্লাহর নাম লিখিত অংশ। তিনি আরোও বললেন যে আমি এই মনোস্থির করেছি, যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা ঠিক হয় তাহলে আমি এই বয়কটের চুক্তি বাতিল করার প্রচেষ্টা নেব এবং যদি তার কথা সত্য প্রমাণিত না হয় তাহলে আমি তাকে ত্যাগ করব। কুরাইশ নেতা মুত'ঈম দৌড়ে গেলেন কাবা প্রাঙ্গনে চুক্তিপত্রটি দেখার জন্য। আশ্চর্য! তিনি অবাক হলেন, আবু তালিবের কথা ঠিক, প্রায় পুরো অংশটি পিঁপড়ে নষ্ট করে দিয়েছে কেবল বাকি রয়েছে 'বি ইসমিকা'–আল্লাহ নামে–শব্দটি ছাড়া। এইভাবে বয়কট চুক্তি উঠে গেল স্বাভাবিকভাবে। কট্টোরবাদীরা প্রতিবাদ করার আর কোন সুযোগও পেলেন না। রসূলও তাঁর সাথিরা সবাই বাড়ি ফেরার অনুমতি পেলেন। কুরাইশ নেতারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবী হওয়ার বড় একটা প্রমাণ হাতেনাতে পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তারা অবিশ্বাসের ঘোর কাটাতে পারল না। আর এভাবেই মানুষ বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হাবুডুবু খেয়ে অতলে তলিয়ে যায় যা থেকে কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না। কুরআন তাদের মানসিক অবস্থাকে এইভাবে বর্ণনা করেছে,

> *"যদিও তারা নিদর্শনসমূহ দেখে, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে এতো যাদু" (কুরআন - ৫৪ ঃ ২)*

শোকের বছর

বয়কট উঠে গেছে। মাত্র কয়েক মাস কেটেছে। মুসলমানদের অবস্থা কিছুটা উন্নত এখন, তারা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা বিবাহ শাদি লেনদেন সব কিছুর অধিকার পেয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উপর যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হচ্ছে তা সকলের কাছে প্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু কুরাইশরা তাদের উপেক্ষা অবহেলা বন্ধ করল না। অপরপক্ষে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থাও এখন মোটামুটি ভাল কারণ রসূল (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) তার বিপুল ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য দান করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি ছিলেন আরব ধনী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম বড় ধনী, কিন্তু বয়কট ওঠার অল্প দিন পরেই তিনি মারা যান। এই সময় রসূল (সাঃ) অনেকটা একাকী হয়ে পড়লেন। প্রত্যাদেশের প্রথম থেকেই তো খাদিজা (রাঃ) তাঁর ইসলামী আন্দোলনের একজন

নিবিড় সাথি। এতদিন স্ত্রীর এই সান্নিধ্য মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে আল্লাহর অশেষ দান, নিরাপত্তা হিসাবে মনে হয়েছিল। এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন আগে হজরত তথা মুসলমানেরা আরোও এক দুঃখ সাগরে ভেসেছিলেন। তা হল হজরতের চাচা আবু তালিবের মৃত্যু। তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায়। তার চারিদিকে মক্কার কুরাইশ গোত্রের নেতারা ঘিরে আছেন। এমন সময় মুহাম্মদ (সাঃ) চাচার শয্যাপাশে গেলেন এবং বললেন "চাচা এই মুহুর্তে আপনি স্বীকার করে নিন, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ-প্রভু নেই, আমি আল্লাহর কাছে এর সাক্ষী হব।" সঙ্গে সঙ্গে আবু উমাইয়া ও আবু জেহেল আবু তালিবকে ধমকের সুরে বললো "তা হলে তুমি কি বাপদাদার ধর্মকে পরিত্যাগ করলে ?" অপর দিকে মুহাম্মদ (সাঃ) বারবার অনুরোধ করলেন আবু তালিবকে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ' পড়ার জন্য। আবু জেহেল ও আবু উমাইয়া একইভাবে আবুতালিবকে পীড়া দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব তারপূর্ব ধর্মে বহাল থাকলেন ও *"আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই"* এই কথা বলতে সম্মতি জানালেন না। সেই মুহুর্তে রসূল বললেন–

"আল্লাহর কসম আমি তোমার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে যাব, যতক্ষণ না আমাকে আল্লাহ নিষেধ করবেন।"

জমায়েত লোকেরা আর বেশী কিছু বলল না। চাচা আবু তালিব চলে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। যে লোকটা ইসলামের জন্য এত সাহায্য করলেন, যুবকদের জন্য উৎসাহ দিলেন, এমন কি ঘোর বিপদের দিনগুলিতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে সমব্যাথা নিয়ে দাঁড়ালেন কিন্তু শেষ মুহুর্তে ইসলামের মহামন্ত্র লা-ইলাহা-ইল্ল্যাল্লাহ স্বীকার করলেন না, মুহাম্মদ (সাঃ) চাচা আবু তালিবকে ভালবাসতেন প্রান দিয়ে। তার প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি ছিলেন অন্তপ্রাণ, আর সেই চাচা তাকে চিরদিনের মতো বিদায় দিয়ে চলে যাবেন কলেমা না পড়ে – তা যেন অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হল তার কাছে। আর এই রকম এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ প্রত্যাদেশ পাঠালেন তাঁর উপর ঃ

"তুমি যাকে ভালবাস তাকে পথ দেখাতে পার না কিন্তু আল্লাহ তাদের পথ দেখান যাকে ইচ্ছা করেন। আর তিনি বেশি জানেন কে হেদায়েত গ্রহণ করবে।" (কুরআন - ২৮ ঃ ৫৬)

কুরআনের এ প্রত্যাদেশ এক চিরন্তন শিক্ষা বহন করে। হৃদয়ের একমাত্র মালিক তো আল্লাহই, তাঁর উপর কথা বলার কারোর অধিকার নেই। তিনি সব কিছু জানেন যা আমরা প্রকাশ করি ও যা গোপন করি।

খাদিজা (রাঃ)

ইসলামি আন্দোলনে খাদিজা (রাঃ)-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম যিনি রসূলের চরিত্র, সততা, ন্যায়নীতি, উদারতা, বিশ্বস্ততা বিভিন্ন গুণাবলী অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণে অপ্রচলিত প্রথায় তিনি রসুলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের এই বিবাহ জীবন যেমনভাবে সুখ-শান্তি দেখেছিল তেমনিভাবে দেখেছিল দুঃখ বেদনা ভারাক্রান্ত পরিবেশ। ইতিমধ্যে তারা হারিয়েছিল আবদুল্লাহ ও কাসিম নামে দুই পুত্রকে। বেঁচে ছিলেন চার কন্যা। আর আরব জাহিলিয়াতের এই যুগে কন্যা সন্তানদের স্থান ছিলো খুব নীচুতে। যে পরিবারের কন্যা সন্তান জন্মাতো সেই পরিবারকে সবাই অকল্যাণকর বলে ভাবতো। লজ্জায় যেন তাদের মাথা কাটা যেত কন্যাদের জন্ম সংবাদ শুনলে। আরব ইতিহাসের পাতায় এরকম অনেক নজীর বিদ্যমান। কিন্তু রসূলের এই পরিবারে সবসময় শান্তি বিরাজ করত। কন্যা সন্তানদের নিয়ে তারা আনন্দে দিন কাটাতেন। কন্যাদের নিয়ে কোন ঝামেলায় তারা আছেন- তা তাদের মুখ থেকে কেউ শোনেন নি।

রসূলের (সাঃ) যখন চল্লিশ বছর বয়স তখন তাঁর উপর কুরআনের বাণী প্রত্যাদিষ্ট হয়। হেরা গুহা থেকে তিনি এই অবস্থায় দৌড়ে প্রথমে গিয়েছিলেন পত্নী খাদিজা রাঃ এর কাছে। তিনিই তাকে সান্তনা দিয়েছিলেন। তার গায়ে চাদর জড়িয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন সবরকম ভয়ের আশঙ্কা থেকে। প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল অসাধারণ এক উপহার আবার ভয়ানক পরীক্ষা। স্বাভাবিকভাবে রসূল (সাঃ) ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আর এই সময় থেকে রসূল কেবল একাই নন বরং পত্নী খাদিজা (রাঃ)ও সমভাবে নানান আশা আকাঙ্খায় ও আশঙ্কায় চিন্তিত ছিলেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে খাদিজা রাঃ ছিলেন আল্লাহর তরফ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয় নিরাপত্তা ও মহাপরীক্ষা। ইসলামে প্রথমে দীক্ষা নিয়েছিলেন খাদিজা রাঃ এবং প্রত্যাদেশের প্রথম দশটি বছর তিনি ছিলেন রসূলের একদম কাছের সাথি। নবী জীবনে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। স্ত্রী হিসাবে খাদিজা (রাঃ) নবী (সাঃ) এর সাথে কাটিয়েছিলেন পঁচিশটা বছর। এই পঁচিশ বছরে নানান উৎপীড়ন নির্যাতনের সময়েও তিনি ছিলেন রসূলের পাশে। যদিও তাকে ছাড়তে হয়েছিল অনেক আত্মীয় স্বজনকে। রসূল (সাঃ) খাদিজাকে ভালবাসতেন প্রগাঢ়ভাবে। মুহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহ মনোনীত নবী সে কথা খাদিজা (রাঃ) প্রথমেই মেনে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন। উন্নত, মর্যাদাশীল ও শ্রদ্ধেয়। তার দৃঢ়তার তুলনা করা যায়না। খাদিজাকে পেয়ে রসূল (সাঃ) কেবল একাই ছিলেন না বরং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে প্রত্যাদেশ প্রচারের বড় এক সাথী। এই দৃষ্টিতে সমগ্র নারী জাতির মর্যাদা অনেক উপরে উঠে যায়। তাই তো পরবর্তীতে কুরআন অবতীর্ন হয়ে জানায়,

"তারা তোমাদের পোষাক যেমন তোমরা তাদের পোষাক।"
(কুরআন - ২ ঃ ১৮৭)

সত্যিই খাদিজা (রাঃ) রসূল (সাঃ) এর কাছে পোষাকের মতই ছিলেন। তিনি তাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। আর তাঁর লজ্জা নিবারণের মত দুর্বলতাকে ঢেকেছিলেন এবং তাঁকে সাহস, নির্ভিকতা, দৃঢ়তা প্রদানে উৎসাহ দিয়েছিলেন। খাদিজা (রাঃ)-র মৃত্যুতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দারুনভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তার শোক রসূল ((সাঃ))-র হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

"সে তো আমার উপর বিশ্বাস করেছিল যখন লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করত না এবং আমাকে সাহায্য করেছিল, সান্তনা দিয়েছিল। আমাকে সম্পদ দান করেছিল যখন কেউ আমাকে দেয়নি, আর তার গর্ভেই তো আমি আমার সন্তানদের পেয়েছিলাম।"

তায়েফ

ইত্যবসরে কয়েকমাস গত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে রসূলকে অস্বাভাবিক দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। আর তাতো হবারই কথা, একই বছরে তিনি চাচা আবু তালিবকে হারিয়েছেন, আবার হারালেন পত্নী খাদিজাকে (রাঃ)। এই মুহুর্তে তার উপর বড় দায়িত্ব হল নব দীক্ষিত মুসলিমদের নিরাপত্তার সার্বিক ব্যবস্থা করা। কিন্তু এটা সহজ কথা নয়। একদিন মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরলেন ইসলামের আহ্বান শোনানোর জন্য কিন্তু কাউকে পেলেন না, কুরাইশরা এখন এড়িয়ে যাওয়া নীতি গ্রহণ করেছে। তারা এটা অনুভব করেছিল, যে রসূলের কাছে গিয়েছেন তিনি যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে একেবারে ইসলাম গ্রহণ না করলেও কিছু না কিছু প্রভাবিত হয়েছেন। তাই এড়িয়ে থাকা ভাল, যদিও দু-একজনের সাথে তিনি সাক্ষাত পেয়েছিলেন, তারা গোঁয়ার্তুমি জবাব দিয়ে তাঁর কাছ থেকে হটে গিয়েছে। যাইহোক এরকম পরিস্থিতিতে রসূল এটা অনুভব করলেন যে মক্কার মাটি বর্তমানে ইসলাম প্রচারের জন্য ঠিক উর্বর নয়, বরং এর চারপাশে অন্য কোন স্থানে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার।

নবুয়্যতের দশম বছরে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সাঃ) পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে তায়েফের পথে পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তায়েফ মক্কা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরত্বে। সঙ্গে ছিল মুক্ত দাস যায়েদ। তায়েফে তাকিফ নামে যে গোত্রটি ছিল তাদের কাছে ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরলেন। কিন্তু গোত্র প্রধান মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবী হওয়াকে ঠাট্টাচ্ছলে দেখলেন, কোন প্রকার গুরুত্ব দিলেন না। তিনি প্রশ্ন তুললেন আল্লাহর কি প্রয়োজন একটি নাম ধাম না জানা গোত্রের সমর্থন পাওয়ার জন্য নবীকে পাঠানো হয়েছে। তারা কেবলমাত্র ঠাট্টা বিদ্রুপ করে

ছাড়ল না বরং রসূলের বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দিল। একদল শিশু বালক নবী (সাঃ) কে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধাওয়া করল দীর্ঘপথ পর্যন্ত। রসূল (সাঃ) এর দুটি পবিত্র পা থেকে ঝরে পড়ছিল রক্তধারা। যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি এক আঙুর বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। এ এক বেদনার চরম মুহুর্ত। রক্ত এতটা ঝরেছিল জুতোর সাথে পা আটকে গিয়েছিল তাঁর। তিনি তখন আঙুরলতার গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে তিনি দু-রাকাত নামাজ আদায় করলেন আর আল্লাহর কাছে মর্মভেদী দোওয়া করলেন।

চরম এই মুহুর্তে আল্লাহর রসূল একেবারেই একা ছিলেন। তাঁর যাবতীয় অভাব অভিযোগ জানিয়েছিলেন একমাত্র প্রভু আল্লাহর কাছে। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর দৃঢ়তা, চাওয়া-পাওয়া সব কিছু তিনি আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। অসহায়ত্বের অবস্থাও তিনি পরম প্রভু আল্লাহর কাছে জানিয়েছিলেন সকাতরে। আর এই প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ঝরে পড়ে এক আধ্যাত্মিক অমৃত ধারা। এরকম চরম অসহায় নির্জন অবস্থাতেও তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে তিনি একা নন। বরং তার সাথে চরম ও পরম সাহায্যকারী আছেন। তিনি হলেন আল্লাহ।

"হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, সম্বলহীনতা ও জনগণের সামনে অসহায়ত্ব সম্পর্কে কেবল তোমারই কাছে আবেদন জানাই। দরিদ্র অক্ষমদের মালিক তুমিই। তুমি আমাকে কার কাছে সমর্পন করতে চাইছ। আমার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে, নাকি শত্রুর কাছে। তাহলে আমার উপর তুমি অসন্তুষ্ট না থাকলে আমি কোন কিছুকে ভয় করি না, তার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে শান্তি নিরাপত্তা এলে সেটা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার শাস্তির কবলে পড়ার আশঙ্কা থেকে তোমার জ্যোতির কাছে আশ্রয় চাই যা সব কিছুর অন্ধকার দূরীভূত করে এবং ইহকাল ও পরকালের সব সমস্যার সমাধান করে। তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। তুমি ছাড়া আর কোন শক্তির আশ্রয় নেই।"

একজন দাস

এই সময় দূর হতে বাগান মালিক এই ঘটনা দেখেছিলেন। তিনি তার দাস আদ্দাসকে দিয়ে রসূলকে এক ছোড়া আঙুর পাঠালেন খাওয়ার জন্য। রসূল (সাঃ) অতি আগ্রহভরে তা গ্রহণ করলেন এবং তা খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ'–আল্লাহর নাম পাঠ করলেন। আদ্দাস রসূলের মুখে এই শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বহুত্ববাদী খ্রীষ্টানরা তো এক আল্লাহকে উপাস্য মানে না। তাই তাঁর কাছে এই নতুন কথা শুনে অবাক হওয়ার কথাই ছিল। রসূল (সাঃ) আদ্দাস কোথা থেকে এসেছেন তা জানতে চাইলেন। আদ্দাস

রসূলের প্রশ্নের জবাবে জানালেন যে সে নিনেভা (ইজরাইল) থেকে এসেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথার সাথে যোগ করে বললেন ইউনুস বিন মিত্তার দেশের লোক। যুবক ক্রীতদাস রসূলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কেমন করে ইনি মিত্তা পুত্র ইউনুসকে চিনলেন। কিছুতেই তো তাঁর এ কথা জানার নয়। আদ্দাস নিজেকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে রসূলের কাছে জানতে চাইলেন কিভাবে তিনি মিত্তাপুত্র ইউনুসকে চিনলেন। রসূল উত্তর করলেন "ইউনুস আমার ভাই, সে একজন নবী ছিল। আমিও একজন নবী" – উত্তর শুনে আদ্দাস রসূলের প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর পবিত্র দুটি হাত ধরে তাতে চুমু দিলেন। তার পা মাথা স্পর্শ করলেন চুম্বনে। আদ্দাসের প্রভুরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। এতে তাদের আদ্দাসের প্রতি বিরূপ মনোভাব জন্মালো। কিন্তু আদ্দাস জানিয়ে দিলেন যে কেবল নবীরা একথা বলতে পারে। এটা নবী হওয়ারই চিহ্ন। তক্ষুনিই আদ্দাস ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন, মাত্র কয়েক মিনিট আলোচনায়।

আবিসিনিয়ার রাজাও মাত্র দুটি কথায় জানতে পেরেছিলেন। এখন আদ্দাসও অতি অল্প কথায় রসূলকে চিনে নিলেন যদিও তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান। উভয়ক্ষেত্রে একই সূক্ষ্ম অনুভূতি কাজ করছিল। উভয়ই চরম দুর্দিনে মুসলিমদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আর ক্রীতদাস আদ্দাসও চরম বিপদের দিনে ইসলাম গ্রহণ করে সেবা দিয়েছিল রসূলকে, ইসলাম ও রসূল যখন সবাই-এর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল।

এরপর রসূলের হৃদয়ে অদৃশ্য স্বর্গীয় জ্যোতি ভরে গেল। তাঁর ক্লান্তি দূর হল তখুনিই, মক্কার পথ ধরলেন আল্লাহর রসূল আল-আমীন।

মদিনায় ইসলাম

আল আকাবা নামক স্থানে মদিনা থেকে আগত একদল লোকের সাক্ষাত হল রসুলের সাথে। মদিনায় যে দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল তারই একটি গোত্র খাজরাজের সদস্য ছিলেন তারা। মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের বার্তা শোনালেন তাদের। তারা রসূলের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে তারা ইসলামের বার্তাকে তাদের গোত্রের মধ্যে প্রচার করবেন। তারা যখন মদিনায় নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে গেলেন তখন হতেই রসূলের বার্তা প্রচার করা শুরু করে দিলেন।

এক বছর অতিক্রান্ত হল। মক্কা শহরে আবার জড়ো হতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত লোকেরা। দ্বিতীয় বারে মদিনা থেকে প্রতিনিধি দল আকাবায় রসূলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা রসূলকে জানালেন যে মদিনায় ইসলাম প্রচারের কাজ যথেষ্ট পরিমাণ এগিয়েছে। মদিনা থেকে এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বারোজন।

আওস গোত্রের দুইজন ও খাজরাজ গোত্রের দশ জন এই দলের সদস্যরা রসূলের কাছে অঙ্গীকার করলেন যে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং ইসলামের যা করা দরকার তার সব কিছুই করবে, কোন প্রকার শিথিলতা দেখাবেনা। মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মদিনায় ফেরৎ পাঠালেন, সঙ্গে পাঠালেন উমায়স পুত্র মুসাবকে। মুসাব (রাঃ) ছিলেন শান্ত ভদ্র ধীশক্তি সম্পন্ন। তার কুরআন পাঠের মাধুর্য্যও ছিল অতুলনীয়।

মদিনায় এই প্রতিনিধিদল ফিরে এসে ইসলামের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছাতে লাগলেন। মুসাব তাদেরকে ইসলামের নিয়মনীতি শেখালেন। সেই সঙ্গে কুরআন পাঠও তারা শিখল মুসাবের কাছে। মদিনার অধিবাসীরা মুসাবকে ইসলাম বিষয়ে নানান প্রশ্ন করত। মুসাব তাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতেন।

মদিনার এই দুটি গোত্র (আওস ও খাজরাজ) দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে প্রায় পরস্পর বিছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু তাদের কাছে ইসলামের বার্তা আসার পর তারা একতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইসলামের প্রচার প্রসারে সামগ্রীক সহায়তা করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের দীর্ঘদিনের যে পরস্পর বিরোধীতা চলে আসছে তার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও দুই গোত্র প্রধানেরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। মুসাব কিন্তু তাদের প্রতি বিরক্ত হলেন না। বরং তিনি তাদের ইসলামের বার্তা মনোযোগ সহকারে শোনার কথা বললেন। আর বললেন যদি তোমাদের পছন্দ হয় তবে তা মেনে নাও, নচেৎ তা মানবে না। ফলে দীর্ঘ আলোচনার ফলে ইসলামের বার্তা উচ্চ মর্যাদা পেল।

পরের বছর মদিনা থেকে তিয়াত্তর জন তীর্থযাত্রী মক্কায় এলেন তাদের মধ্যে দু-জন মহিলাও ছিলেন। আউস ও খাজরাজ উভয়গোত্রের মানুষেরা ছিলেন এই দলটিতে। মুহাম্মদ ((সাঃ)) তাদের কাছ থেকে শুভ সংবাদ শুনলেন যে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর তারা মক্কাবাসীর সাথে তাদের সম্পর্ক পরিস্কারভাবে তুলে ধরলেন। তারা দ্বিতীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। তারা অঙ্গিকারবদ্ধ হলেন যে মক্কার মুসলিম নরনারী সবাইয়ের সবরকম ব্যবস্থা তারা নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেন। তারপর মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলিমদের মদিনায় হিজরতে উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। আর তাঁর সাথিরাও মদিনার পথে পাড়ি দিতে অধিক আগ্রহ দেখালেন।

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

মক্কায় রসূল (সাঃ) সাম্প্রতিক যার দ্বারা নিরাপত্তা পেয়েছিলেন সেই মুত'ঈম অল্পদিন পরে মারা গেলেন। এর পরে পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল। মুসলিমদের উপর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলল। সহ্য করার বাইরে চলে গেল পরিস্থিতি। কুরাইশ নেতারা দেখছেন দিন দিন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই বিস্তার রোধ করার জন্য শেষ মারাত্মক কিছু ঘটনা ঘটিয়েও-এর রোধ করা দরকার। আবু লাহাব ও আবু জেহেল অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে বসলেন। সবাই একত্রিত হল মক্কার মিলনস্থল 'দারুল নাদওয়া'-তে। শলা পরামর্শ হল মুহাম্মদ (সাঃ)-র উপর কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কেউ কেউ মত প্রকাশ করল যে, তাকে লোহার কারগারে বন্দী করা হোক। কিন্তু অনেকেই এ সিদ্ধান্তে সায় দিল না। তারা জানাল যে মুহাম্মদ (সাঃ) এমন এক ব্যক্তি যাকে লোহার কারগারে বন্দি রেখে কোন লাভ হবে না, কারণ সেখান থেকেই তাঁর বার্তা পৌঁছে যাবে তাঁর সঙ্গী সাথিদের কাছে। তারা তাঁকে সুযোগ মত ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কারাকক্ষ থেকে। অনেকে আবার বলল তাকে একেবারে মক্কা থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু একথার প্রতিবাদ করলেন অনেকেই - এতে কোন লাভ হবে না, কারণ এটাতো আমাদের সকলের জানা যে তাঁর চিত্তাকর্ষক ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা যে কোন লোককে আকৃষ্ট করে। তাঁর চিত্তাকর্ষক কথাবর্তা দিন দিন তার দলকে ভারি করবে। অবশেষে তারাই আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদেরকে পরাস্ত করবে এবং সারা আরবে তাদের আধিপত্য বিস্তার হবে এবং আমাদের উপর তাদের শাসন চেপে বসবে তাতে লাভ কিছু হবে না। সভায় ধুরন্ধর কূটনীতিক আবুজেহেল শেষ চাল চাললেন। তিনি প্রস্তাব রাখলেন সবচেয়ে ভাল হবে মক্কার প্রত্যেকটি গোত্র থেকে শক্তিশালী বীর যুবকদের নিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে এবং তারা একযোগে মুহাম্মাদের উপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করবে। এতে চিরতরে ইসলামের বাতি নিভে যাবে আর কোন ঝামেলাই আমাদের থাকবে না। সবরকম অরাজকতার অবসান ঘটবে। সবাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। বাহবা দিতে লাগল আবুজেহেলকে। হত্যার জন্য আরবে প্রচলিত যে রক্তপণ দেওয়ার কথা আছে তা সকলগোত্র থেকে একত্রিত করে তা বন্ধু হাসিম গোত্রকে প্রদান করা হবে। মোটেই সময় নষ্ট করা যাবে না। তারা এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় সংকল্প হলেন সবাই। মাত্র কয়েকদিন আগে আল্লাহর রসূল স্বপ্নে এক সুদৃশ্য সাজানো শহরের দৃশ্য দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এর অর্থ বুঝতে পারেননি। এই সময় একদিন জিব্রিল আঃ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন যে ওটা মদিনা। তাঁকে শীঘ্রই মদিনায় হিজরত করার জন্য তৈরী থাকতে বললেন এবং সঙ্গী হিসাবে হজরত আবুবকর রাঃ-কে নিতে বললেন। রসূল্লাহ (সাঃ) আবুবকর রাঃ-কে এ শুভ সংবাদ শোনালেন। আনন্দে আপ্লুত হয়ে আবুবকর রাঃ কেঁদে ফেললেন। আলি (রাঃ)-কেও ডেকে নিলেন

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এবং তাকে তাঁর বিছানায় ওই রাত্রিতে ঘুমাতে বললেন এবং যতক্ষণ না তাকে পরবর্তী আদেশ না করা হয় ততক্ষণ ওই গৃহ ত্যাগ করতে বারন করা হল।

রসূল (সাঃ) পালিয়ে যাবেন এমন কিছু ইঙ্গিত যখনই কুরাইশরা পেল তখন সশস্ত্রে তারা রসূলের ঘর আক্রমণ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য রসূল তাদের চোখে কিভাবে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। তারা আলির উপর সমস্ত রাগ ঝাড়ল। কিন্তু ফল হল না, সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল কুরাইশ নেতাদের।

৪

হিজরত

অত্যাচারিত হয়ে
ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গমণ

পরম প্রভু আল্লাহর উপর চরম বিশ্বাসী ছিলেন রসূল মুহাম্মদ (সাঃ)। সহজে সময় স্রোতে ভেসে যেতনা মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরিকল্পনা। তিনি তো ইতিপূর্বে প্রত্যাদেশ দ্বারা জেনেছেন, যা কিছু ঘটে সব আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে। নিজের শক্তি সামর্থ সব কিছু আল্লাহর উপর নির্ভর করছে। মদিনায় হিজরত করার জন্য বিগত দু-বছর ধরে রসূল (সাঃ) পরিকল্পনা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন সুযোগ তিনি পাচ্ছিলেন না। এখন তিনি সমস্তরকম দৃঢ়তা ও প্রত্যয় আল্লাহর কাছ থেকে পেয়ে গেলেন। তাই তিনি বিলম্ব করা ঠিক হবে না বলে স্থির করলেন।

রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে এক রাত্রিতে মক্কা থেকে মদিনার দিকে অগ্রসর হলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা পথ হাঁটছিলেন। এখন বিশ্ব মানবতার সবচেয়ে বড় বন্ধু একেবারে বিনা দোষে বিনা অপরাধে নিজের দেশ, বাড়িঘর সব থেকে বিতাড়িত হলেন। জন্ম থেকে এ পর্যন্ত যে সকল মরুপ্রান্তর, উপত্যকা, পাহাড়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সব কিছুকে ত্যাগ করে তাঁকে যেতে হচ্ছে মদিনায়। তিনি তো সেই কাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন যেখানে তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সহস্রবার সেজদা করেছেন আনুগত্য জানানোর জন্য। এই শহর তো হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর বহু স্মৃতি বিজড়িত। তাঁদেরই দোয়ায় মুখরিত এ শহরের আকাশ বাতাস। আর এই শহরকে তিনি আজ বিদায় জানাচ্ছেন, বড় বেদনার এটা। বড় ব্যাথার অনুভূতি রসূলের হৃদয়কে আজ টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি এর চেয়ে অনেক বড়। আর আল্লাহর এ সন্তুষ্টির জন্য বড় ত্যাগের দরকার, বড় কুরবানীর দরকার। তাই তিনি ব্যাথাকে ভুলে মদিনার পথে পাড়ি দিচ্ছেন। বিশ কিছু পথ এগিয়েই তিনি সূর নামক গুহা দ্বারে পৌছলেন। রসূল নিজেই এই পথে অগ্রসর

হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কুরাইশ নেতারা অনেক খোঁজাখুজির পর যখন রসূল (সাঃ)-কে পেলেন না তখন তারা এটা বুঝে নিলেন যে রসূল (সাঃ) মদিনার পথেই পাড়ি দিয়েছেন।

তারা তাঁর খোঁজে দক্ষিণ দিকের পথ ধরে ধাওয়া করলেন। এসে পৌঁছলেন ঠিক সূর গুহার মুখে। গুহার ভিতর থেকে রসূল (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) বাইরে থেকে কারোর যেন আসার শব্দ পেলেন। ভয়ার্ত কণ্ঠে জানালেন যে শত্রুরা যদি নীচের দিকে তাকায় তা হলে তারা তাদের দেখতে পাবেন। রসূল (সাঃ) তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন "ভয় নেই আমাদের সাথে আল্লাহও রয়েছেন।" (কুরআন ৯ ঃ ৪০)। তিনি আরোও বললেন যে এমন দুজন নেই যেখানে আল্লাহ তৃতীয়জন নেই। রসূলের এই কথাগুলো শুনে আশ্বস্ত হলেন, মনের ভয় কেটে গেল আবুবকরের (রাঃ)।

কুরাইশ নেতারা গুহার ভিতরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় লক্ষ করলেন গুহার মুখে একটা মাকড়সা জাল বুনে চলেছে আর একটি ঘুঘু পাখি বাসা বুনছে। স্বাভাবিক কারণে তাদের সন্দেহ দুরীভূত হল, তারা ভেবে নিলেন গুহার ভিতরে থাকতে পারে না কেউ। তারা শীঘ্রই খোঁজার মনস্থ করে অন্য দিকে মুখ ঘোরালেন। ধরা না পড়ার জন্য কতরকম পরিকল্পনা করাই হয়েছিল কিন্তু কোন কিছুর প্রয়োজন হয়নি। একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি ছোট ঘটনা থেকে রসূল (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-কে আল্লাহ এভাবে তাঁর নিরাপত্তা দান করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করেছিলেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন তার তাৎপর্য এখন আবুবকর বুঝতে পারলেন।

আল্লাহই তাঁর রসূলকে রক্ষা করেছেন। আবুবকর (রাঃ) এক আরব বেদুইনকে মজুরী দিয়ে রেখেছিলেন যেন মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবুবকরকে ঘুর অজানা পথ দিয়ে মদিনায় পৌঁছে দেন। অমুসলিম এই বেদুইনের নাম ছিল উরাকাহ। উরাকাহ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন উট। তাতে চড়ে তারা পশ্চিম দিকে প্রথমে খানিক্ষণ হাঁটলেন, তারপর দক্ষিণে, তারপর সোজা উত্তর দিকে ৩৪০ কিমি পথ দূরে মদিনার দিকে। এ যাত্রা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাঁরা জানত যে তাদের পেছনে কুরাইশরা ধাওয়া করে আসছে এবং যদি তাদের তিনজনকে কোন রকমে পায় তবে নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলবে। আর এইভাবে শেষ হয়ে যাবে রসূলের বিপ্লব, ইসলামী মিশন।

মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথি আবুবকর (রাঃ) উভয়েই আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস সমর্পন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরিচিত ঘুর পথ অতিক্রম করার জন্য সাহায্যকারী হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন অমুসলিম বেদুইন সাথি উরাকাহ। তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসূল তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। এটা তাঁর দূরদর্শিতা। রসূলের (সাঃ) জীবনে এরকম ঘটনা বহু পরিলক্ষিত হয়। বহু নর-নারী তার আশেপাশে সব সময় থেকেছেন যারা ইসলামী আন্দোলনের

সাথি হয়নি। কিন্তু রসূল (সাঃ) তাদের ঘৃনা করেননি কখনও বা তাদের কোন রকম অনিষ্টও হতে দেননি কোনদিন। তারা রসূলকে সবসময় চিনতেন একজন ভালমানুষ হিসাবে। রসূল (সাঃ) এর নানান চারিত্রিক গুণে তারা সর্বদা মুগ্ধ ছিল।

বিশ্বস্ততার চরম এক পরীক্ষাঃ হিজরত

মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গী সাথিদের চরমভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে। তাদেরই গোত্রের লোকেদের দ্বারা এবং শেষকালে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে জন্মভূমি মক্কা পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছিল। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনেক সঙ্গী সাথিদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল অসহায়ভাবে। এক চরম মুহূর্তে কুরাইশ প্রধানরা এতটাই নির্মম হয়ে গিয়েছিলেন যে তারা নবীকেই (সাঃ) একবারে শেষ করে ফেলার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে দেশ ত্যাগ বা হিজরত ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ওই সকল নর-নারীদের জন্য যারা ইসলামের উপর চরম বিশ্বাস রাখত। কারণ আল্লাহর এ পৃথিবীর বিস্তার মোটেই কম নয়। আর ইসলামের চরম বিশ্বাসের উপর যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাদের জন্য তো এরকম কঠিন পরীক্ষা একান্তভাবে দরকার ছিল। তাই তো আল্লাহর প্রত্যাদেশ হয়েছিল ওই সকল মুমেন নর-নারীদের জন্য যারা সব কিছু ত্যাগ করে আল্লাহর জন্য বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল। অকাতরে কুরআনের ঘোষণা,

> *“যে সব লোক অত্যাচার সহ্য করার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়ায় উত্তম জায়গা দান করব আর আখিরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়। হায়! সেই নির্যাতিত লোকেরা যদি জানতে পারত। যারা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করে।”*
> *(কুরআন - ১৬:৪১-৪২)*

বিশ্বাসের জন্য দেশত্যাগ অন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা। সমস্ত নবীদের এই পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছে এবং নবীদের সঙ্গী সাথিরাও এর ভুক্তভোগী ছিলেন। আল্লাহ এটা দেখতে চেয়েছেন যারা তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী বলে প্রচার করে, বাস্তবে তার কতটা প্রমাণ দিতে পারে আল্লাহ তারও পরীক্ষা নিয়েছেন। এই অগ্নি পরীক্ষাগুলো ইতিহাসের পাতায় প্রচুর দেখা যায় যে কোন সত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে। হিজরত তাই মুসলমানদের জীবনে প্রাথমিক অগ্নিপরীক্ষা বলা যেতে পারে। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের নতুন ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়েছিল এই হিজরত।

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মুসলিমরা উৎপীড়িত হয়েছিল নিদারুণভাবে, এখন তারা আর অত্যাচার সহ্য করতে চাইলেন না। অত্যাচারীদের দমন করে নিজেরা

স্বাধীন হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেন, আর এই হিজরত তাঁদের স্বাধীনতার জন্য মহা সংগ্রামের মহা পদক্ষেপ। এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে তারা আর কোন রকম অত্যাচার বরদাশত্ করবেন না। কোন প্রকার অন্যায় আবদারও তারা আর মানবেন না। এখন তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর কথা বলতে পারে সকলকে।

অবশ্য ইসলামের এই মহান বার্তা ইতিমধ্যে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবু বকরের (রাঃ) দ্বারা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছান হয়ে গিয়েছিল। এখন মদিনায় তাদের পৌঁছান মানে এটা সবাইয়ের কাছে পরিস্কার হল যে এখন আর কুরাইশদের দাসত্ব করার দিন নেই। মহামুক্তি পেয়েছেন সমস্ত মুসলিম ভাই বোনেরা। বাইরে থেকে আসা সমস্ত মুসলিমরা মদিনাবাসীর ভাই-বোন হয়ে গেলেন। ন্যায়, নীতি, সাম্য সকলের জন্য প্রযোজ্য হল সমানভাবে।

হৃদয়ের মধ্যে যে সকল মিথ্যা দেব-দেবী স্থান করে বসেছিল এবং তাদেরকে ঘিরে যে সকল অন্যায় অবিচার চলত তার সবকিছুই নির্মুল হল এই হিজরতের মধ্য দিয়ে। শক্তি, অর্থ, সংস্কৃতির মিথ্যা দেব-দেবীগুলোর কাছ থেকে মুসলিমরা মুখ ঘুরিয়ে এখন আল্লাহর পথের পথিক হলেন। যার ফলে মুক্তির সুশীতল বাতাস দ্বারা তারা যেন ফুসফুস ভরলো এত দিন পর। এটা ছিল হিজরত করার আধ্যাত্মিক সাফল্য। পরবর্তীতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে হিজরতের সাফল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন এটা তো নিজের পাপ পঙ্কিলতা থেকে নির্বাসন।

আধ্যাত্মিক এই নির্বাসনের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নরূপে বার বার ফিরে এসেছে। এইভাবে এই হিজরত মুসলিমদের মন মানসিকতায় বিরাট ধরনের আধ্যাত্মিক ছাপ ফেলেছিল। যার ফলে তারা সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারকে পায়ে দলে মহামুক্তির সন্ধানে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সমর্পন করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তাদের দৈহিক মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসার ফলে যে সবরকম নীচতা হীনতা থেকে উন্নত চারিত্রিক গুণে ভূষিত হয়েছিলেন সেটাই বড় কথা।

উমার (রাঃ) পরে বলেছিলেন যে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত আসলে প্রকৃত ইসলামী যুগের সূচনা বলা যেতে পারে। আল্লাহর জন্য এই হিজরত আসলে কতকগুলো প্রশ্ন যা মূলত আল্লাহর কাছ থেকে আসে, সেগুলো হল –

১) তুমি কে ?
২) তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ?
৩) কোন দিকে যাচ্ছ ?

এর উত্তরও আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এত বিপদ থেকে তোমরা হিজরত করেছ, এক আল্লাহর প্রতি ভরসা করেছ, তার জন্যই নিজেকে চিনেছ এবং নিজেই এখন স্বাধীন।

9

মদিনা

মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে মদিনার একবারে কাছেই কুবা নামে একটি স্থান ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে প্রথমে কুবায় পৌছালেন কুড়ি দিনের পথ অতিক্রম করে। লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবুবকরের (রাঃ) জন্য একেবারে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। তারা তাদের সাদর সম্ভাষন জানালেন হৃদয় দিয়ে। কুবায় তিন দিন অবস্থান কালে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। পরে তিনি যাত্রা করেন মদিনা অভিমুখে। দুপুর বেলায় তিনি স্পর্শ করলেন রানুনা উপত্যকার মাটি। আর এখানেই তিনি সঙ্গী সাথিদের নিয়ে শুক্রবারের নামাজ আদায় করলেন। পরে এখানে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়েছিল। তারপরে সোমবার তিনি পৌঁছলেন মদিনায়। দিনটি ছিল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর সোমবার। লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল এবং প্রত্যেকে চাইলেন তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে। স্বাভাবিকভাবে কার আমন্ত্রণ তিনি প্রথমে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন। পরে তিনি জানালেন তার উট কাসওয়া কে ছেড়ে দিতে এবং এই উট প্রথমে যার বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করবে তিনি তার বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। উট ছেড়ে দেওয়া হল। লোকেরা তার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। অবশেষে উট এসে দাঁড়াল দুই অনাথ বালকের এক খন্ড জমিতে। তিনি ওই অনাথ বালকের কাছ থেকে জমিটি দ্বিগুন মূল্যে কিনে নিলেন এবং ঐখানেই শুরু করলেন নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ। সেই সঙ্গে নিজের বাসভূমিও।

মসজিদ নির্মাণ

তিনি পরপর তিনটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলামের আন্দোলনে মসজিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন জায়গায় মসজিদের অবস্থান সমাজের মানুষকে আল্লাহর সাথে

এক আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বেঁধে দিতে অনেকটাই সাহায্য করে। মানুষ তথা সমাজ জীবনের অভিমুখ এই মসজিদের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় হয়ে থাকে। মসজিদের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূল (সাঃ) বলেছেন 'সারা বিশ্বই মসজিদ'। এর দ্বারা তিনি প্রাথমিকভাবে যা বুঝিয়েছেন তা হল – পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ আল্লাহর জন্য সিজদা লুটাতে পারে। সে জন্য পৃথিবীর এমন কোন ছোট ভূখন্ডও নেই যেখানে মানুষ তার গর্বপ্রকাশ করতে পারে। বরং সর্বত্রই মানুষ আল্লাহর দাস হওয়ার দাবী রাখতে পারে। আর একটা দিক হল পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগই পবিত্র। আমার দেশ যেমন পবিত্র অন্য দেশও তেমন পবিত্র হতে পারে যদি তাতে আল্লাহর আনুগত্য পালন করা হয়। আমার দেশের মানুষের রক্ত যেমন পবিত্র অন্য দেশের মানুষের রক্তও তেমন পবিত্র। সারা বিশ্বের যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করে থাকেন, কোন জায়গা পবিত্র হয়ে থাকলে তা মাঠ, ঘাট, মরু, বন, সৈকত যা হোকনা কেন সেখানে নামাজ সম্পাদন করতে পারে। সাধারণভাবে মুসলমানেরা মসজিদকে একটি পবিত্র স্থান বলে মনে করে থাকেন। এদিক থেকে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্রতা নিয়েই মুসলিমরা মসজিদে প্রবেশ করে। দেহ পবিত্র থাকার সাথে সাথে পোষাক পরিচ্ছদও পবিত্র থাকে। সেই সাথে পবিত্র থাকে হৃদয়ও। অতি বিনীতভাবে মসজিদে ঢোকা হয়। একান্ত আল্লাহর দান হিসাবে মসজিদে ঢোকার প্রবণতা সাধারণত কমবেশি সবাইয়ের আছে। মসজিদে ঢুকেই মসজিদে পূর্ব থেকে অবস্থানরত মুসলীমদের ইসলামী পরিভাষায় 'আসসালামু আলাইকুম'। তোমাদের উপর শান্তি ধারা বর্ষিত হোক। – বলা হয়। প্রতিটি নতুন আগন্তুক শান্তি বার্তা দিয়ে মসজিদে ঢোকে। মসজিদের প্রতিটি কর্নার থেকে শান্তি বার্তা গুঞ্জরিত হয় পরস্পরের জন্য। এইভাবে ভ্রাতৃত্বের এক মহা মিলনপর্ব সংঘঠিত হয় সমজিদে যাতায়াতের ফলে। একদিকে মুসলিমরা আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করার জন্য যেমন মসজিদে একত্রিত হয় তেমনি মুসল্লীদের মধ্যে একাত্মতার এক বিরাট প্রভাব পড়ে এই মসজিদের মধ্য দিয়ে। সারা বিশ্বের মসজিদ সমূহের কেন্দ্রমূলে রয়েছে 'কাবা' পবিত্রগৃহ। এই কাবাকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই কোনপ্রকার রক্তপাত এই কাবাগৃহ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলতে পারে না। এইভাবে মসজিদের সাথে যে শান্তিবার্তা জুড়ে আছে তা কেন্দ্রীয় মসজিদ কাবায় সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) যে মসজিদ পরিকল্পনার চিন্তা নিয়েছিলেন তার থেকে এটাই প্রেরণা যুগিয়েছিল যে, সারা পৃথিবীর মাটি পবিত্র হয়ে যাক। মসজিদে বসে কলহ বিবাদ চলতে পারে না। মসজিদ এক শান্তি প্রিয় জায়গা। সমস্ত মানুষ যাতে করে পৃথিবীর মাটিতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য মসজিদ থেকে তার অহরহ প্রচার থাকা দরকার। এই ছিল রসূলের ভিসন ও মিশন। এইভাবে রসূল (সাঃ) যখন কোন অঞ্চলকে মসজিদের সাথে জুড়ে দিলেন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে শান্তিপূর্ন পরিবেশ

সৃষ্টি করলেন। তাই প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন পৃথিবীর মাটিকে একটি শান্তিপূর্ণ বাসস্থান হিসাবে তৈরী করা। প্রকৃতপক্ষে মসজিদ বা মসজিদের মতো স্থানগুলো থেকে শান্তি পূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বার্তাই অনবরত অনুরণিত হতে থাকে।

আস্‌সালামু আলাইকুম

রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম কুবায় গিয়ে যে সম্ভাষণ বাণী বিনিময় করলেন তা হল আস্‌সালামু আলাইকুম –তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষণ হোক। এটা ছিল মৌলিক দায়িত্ব। সর্বত্র শান্তিবার্তা তোমাদের উপর বর্ষিত হোক প্রত্যুত্তরেও সেই একই বার্তা তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক ! শান্তির বার্তা যখন চারিদিকে অনুরণিত তখন তিনি তা বাস্তবে আনার জন্য ঘোষণা করলেন –'ক্ষুদার্তকে খাদ্য দান কর, আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় কর। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তুমি প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি শান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। গরীব মানুষদের তত্ত্বাবধান ও আত্মীয়তার বন্ধনে দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। আর সেজন্য ভালগুণের জন্য এ দুটি মুমিনের নৈতিক গুণ হওয়া একান্ত দরকার। আর রাতের নামাজ দ্বারা এক আধ্যাত্মিক চেতনা সব দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এই শান্তি সন্ধানই মুসলিমদের সারা বিশ্বে শান্তি ছড়িয়ে দিতে বিশেষ সহায়ক হয় এবং সেই সাথে সবচেয়ে গরীব মানুষগুলো শান্তির সুশীতল ছায়ায় স্থান লাভ করে।

এ শিক্ষাগুলোই মদিনায় অবস্থানকালে রসূলের (সাঃ) সারা জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। মদিনায় পৌঁছেই রসূল (সাঃ) এ প্রতীকি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যা ওই শহরের পূরানো মর্যাদাকে কোন প্রকারে খর্ব করেনি। মদিনার অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে চিনতে পেরেছিলেন। এরা ছিলেন আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্রেরই লোক। ইসলামী বার্তায় এমন প্রভাবশালী শক্তি অর্জিত হয়েছিল যে এর দ্বারা জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, নারী পুরুষে এতদিন ধরে যে বিবাদ সংঘর্ষ চলছিল তা চিরতরে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হল।

ইহুদীদের সাথে সন্ধি প্রস্তাব

মদিনা যাওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই রসূল (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করলেন এক ইসলামী ঐক্য। আর এর ফলে শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ সহজ হল ইসলামী আন্দোলনে। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাও পেল মুসলিমরা। এখন দরকার মদিনার আশেপাশে বসবাসরত জাতিগুলির সাথে বিভিন্ন শর্তে চুক্তি সম্পন্ন করা। তাই তিনি পাশের অমুসলিম বিভিন্ন জাতির সাথে চুক্তি সম্পাদনে এগিয়ে এলেন। এই চুক্তির মূল কথা ছিল পরস্পরের

মধ্যে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে পরস্পরের নিরাপত্তা ও উন্নতির কথাও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়। যে যার অঞ্চলে শান্তিতে নিরাপত্তার সাথে যেমন বাস করতে পেরেছিল এই সন্ধির শর্তে তেমনি তাদের পারস্পরিক সার্বিক উন্নতিও সাধন করেছিল এই সমস্ত চুক্তি।

ভৌগলিকভাবে মদিনার পাশে যে সকল জাতি বাস করছিল তাদের মধ্যে ইহুদীরাই ছিল অগ্রগন্য। তাদের মন সবসময় ছিল অভিসন্ধিপ্রবণ। তারা সবসময় মনে মনে পুষে রেখেছিল ঘৃনা ও বিদ্বেষ। তাদের মধ্যে কোন রকম উদারতা ও কোমলতার স্থান ছিল না। নবী (সাঃ) ভেবেছিলেন এরকম এক জাতিকে একেবারে সন্দেহের উপরে রাখা ঠিক হবে না। বরং এদের সাথে কিছু চুক্তি সম্পাদন করে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদের আন্দোলনকে বাঁচিয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং এর ফলে উভয়ের বিশ্বাস ও সম্পদের সংরক্ষণ ঘটবে। তাই ইহুদীদের সঙ্গে যে চুক্তি রসূল (সাঃ) করলেন তা মোটামুটি এরকম- কুরাইশ বা অন্য কোন পক্ষ যদি মদিনার মুসলমানদের উপর চড়াও হয় তাহলে এই ইহুদীরা না মুসলমানদের হয়ে লড়বে না অন্য কোন পক্ষ সমর্থন করবে। অন্য ক্ষেত্রে যে সকল চুক্তি হল তাতে অন্য পক্ষ মুসলীমদের আক্রান্ত হওয়ার সময় তাদের হয়ে অন্যের সঙ্গে লড়বে বলে স্বীকার করল। এইভাবে মদিনার মুসলমান ও ইহুদীর সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্র নিয়ে একটি কোয়ালিশান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হল এবং মদিনা হল এই নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী। মুহাম্মদ (সাঃ) রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশ শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা পেলেন। ইসলামের কেন্দ্রীয় ভাবনায় এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। বৈবাহিক জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর হয়। কুরআন তাই এর গুরুত্ব প্রকাশ করে ঘোষণা করেছে,

> *"ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে তোমাদের*
> *যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"*
> *(কুরআন - ১৭ ঃ ৩৪)*
>
> *"হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামে চুক্তির মর্যাদা সম্বন্ধে বলেছেন*
> *"মুসলিমরা অবশ্যই চুক্তি রক্ষা করে চলবে।"*

কপটতা

মদিনায় যখন একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হল তখন তার ভিতর থেকে ভীত নড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে কিছু কপট মুনাফিকের আবির্ভাব ঘটল। তারা আশঙ্কা করল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার ফলে তাদের কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে। তাই তারা চুপ না থেকে কপটের বিষ ঢেলে কিভাবে সবুজ তরতাজা এই

ইসলামী ঐক্যপূর্ণ রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করা যায় তার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তারা তাদের দূর্বল ঈমানের কারণে ইসলামের জন্য সার্বিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারল না। যদিও তারা মুখে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছিল কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে সন্দেহপ্রবণ ছিল। তাদের দ্বিমুখী আচরণ ইসলামকে ভিতরে ভিতরে কুরে খাচ্ছিল। এই মুনাফিকরা একদিকে মুসলমানদের সাথে মিশে পার্থিব সকল সুযোগ আদায়ের সব রকম প্রচেষ্টা চালাল অন্যদিকে তারা কাফির মুশরিকদের সাথেও পূর্ণ যোগাযোগ রাখল। তাদের এ আচরণের মূল লক্ষ্য ছিল যে, যদি কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে তাতে যে পক্ষই বিজয় লাভ করুকনা কেন তাদের কাছ থেকে নিজেদের যথার্থ প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া। কোন সময়েই তাদের স্বার্থ নষ্ট যেন না হয়, সে জন্য তারা ছিল সদা সচেষ্ট। ইসলামী আন্দোলনে এই মিত্ররূপী শত্রুরাই ছিল মারাত্মক। এদের সঙ্গে রেখে ইসলামী কাজ কারবার চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল। এই সকল মুনাফিকদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। হিজরতের আগে মদিনার লোকেরা তাকে ওই অঞ্চলের বাদশা নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রসূলের হিজরতের পর তার আর বাদশা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই প্রথম থেকেই সে ইসলাম তথা মুহাম্মদ (সাঃ) এর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

মদিনায় এই রকম মুনাফেকী ও কপটতার যে বিশাল প্রভাব পড়েছিল এবং এর ফলে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছিল তার সম্বন্ধে কুরআন দীর্ঘ আলোচনা করেছে। সূরা বাকারায় মুনাফিকদের আচার আচরণ ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মুনাফিক আচরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট,

> "তারা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি –কিন্তু তারা বিশ্বাস আনেনি। তারা আল্লাহ ও যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সাথে প্রতারণা করে। কিন্তু তারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করে মাত্র, তারা বোঝে না।"
> (কুরআন - ২ ঃ ৮-৯)

আরো বর্ণিত হয়েছে–

> "যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তারা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু যখন তারা নিভৃতে তাদের দলের দুষ্ট ব্যক্তিদের সাথে থাকে তখন বলে আমরা আসলে তোমাদের দলে, আমরা কেবল ওদের সাথে ঠাট্টা করি মাত্র।"
> (কুরআন - ২ ঃ ১৪)

তাদের প্রবৃত্তি সত্যিই কত জঘন্য। তারা তো ইসলামের জন্য বড় ধরনের বিপদ। এই সকল মুনাফিকদের কেউ কেউ আওস ও খাজরাজের মধ্যে যে পূরানো

বিবাদ ছিল তা উস্কে দিতে তৎপরও হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর মত আর একজন ছিলেন আওস গোত্রের আবু আমীর, সেও ইসলামী আন্দোলনকে শেষ করে দেবার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু এই সকল মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার পদক্ষেপও নেওয়া যাচ্ছিল না। তাই আল্লাহ এই মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে, কারণ এই সমস্যায় পড়ে মসুলমানেরা যেন নিজেদের মধ্যে বিভেদের শিকার না হন।

চুড়ান্ত ভ্রাতৃবন্ধন

মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের মধ্যে একটি চুক্তি করেছিলেন। বিশেষত এ চুক্তি মক্কা থেকে মুহাজির ও মদিনাবাসী যারা মুহাজিরদের সাহায্য করেছিল অর্থাৎ আনসারদের মধ্যে সংঘঠিত হয়েছিল। এতে প্রত্যেক আনসার একজন মুহাজিরকে সবদিক থেকে সাহায্য করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এ বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল এক আধ্যাত্মিক প্রেরণায়। এই চুক্তির ফলে নতুন মুসলিম সম্প্রদায় তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে বাঁচার তথা ইসলামী আন্দোলন করার সুযোগ পেয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে এই যে ভ্রাতৃবন্ধন পরবর্তীতে মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল সার্বিকভাবে। যে মুসলিমরা এ রকম এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ বলবেন,

> "কোথায় সেই লোকেরা ? যারা আমার মর্যাদার জন্যই পরস্পরকে
> ভালবেসেছিল, আমি আজ তাদের আমার ছায়ায় ছায়াদান করব।
> সেদিন আমার ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া নেই।"

একজন মুমেনের জীবনে অনেক কষ্ট অসুবিধা ও অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করার জন্য পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে কোনভাবেই একজন মুমেনের জীবন ভেসে যায় না।

আর মুসলিমদের মধ্যে এই রকম চুক্তিও বোঝা পড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। এক প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক পরিবেশ যার দ্বারা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানুষদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা বিরাজ করেছিল।

আযান

এইভাবে মদিনায় কয়েক মাস ইসলামী আন্দোলন চলল। ইতিমধ্যে রমযান মাসে রোজা রাখা ও যাকাতের কিছু বিধিবিধান পালন করার জন্য মুসলিমরা অভ্যস্ত হয়েছিল, মুসলিমরা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও মসজিদে সমবেত হয়ে নামায আদায় করে চলল। মুহাম্মদ (সাঃ) এই সময় ভাবছিলেন কিভাবে মুসলিমদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা যায় মসজিদে নামাযের জন্য। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে রকম ঘন্টা ধ্বনি প্রচলিত আছে। সে রকম ঘন্টা শুনিয়ে লোকেদের জড়ো করার কথাও তিনি ভাবলেন। এই সময় যায়েদ পুত্র আবদুল্লাহ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এলেন এবং তিনি রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছেন বলে জানালেন। এই স্বপ্নে তাঁকে সেখানো হয়েছিল কিভাবে একজন অন্যান্যদেরকে নামাযের জন্য ডাকবেন তার ধরন সম্বন্ধে। রসূল (সাঃ) তার স্বপ্নের কথা শুনে এটির অনুমোদন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিলাল (রাঃ)-কে ডাকলেন। বিলাল (রাঃ) কণ্ঠস্বর ছিল অতীব সুন্দর ও মধুর। তিনি তাকে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়াতে বললেন এবং লোকেদের নামাজের জন্য ডাক দিতে বললেন,

১) 'আল্লাহু আকবর – আল্লাহু আকবার'
– আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান
'আল্লাহু আকবর – আল্লাহু আকবার'
– আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান

২) 'আশহাদুআল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ'
– আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
'আশহাদুআল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ'
– আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

৩) 'আশহাদুআন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ'
– আমি সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল
'আশহাদুআন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ'
– আমি সাক্ষ দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল

৪) 'হাইয়া আলাস সলাহ'
– তোমরা নামাজের জন্য দৌড়ে এসো
'হাইয়া আলাস সলাহ'
– তোমরা নামাজের জন্য দৌড়ে এসো

৫) 'আল্লাহু আকবার
আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ'

‘আল্লাহু আকবার
আল্লাহু সর্বশ্রেষ্ঠ’

৬) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
–আল্লা ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই

ভোরের নামাজের জন্য ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলার পর দুবার ‘আস্‌সলাতু খইরুম মিনান নাউম’ –‘ঘুম অপেক্ষা নামায উত্তম’ বলতে হয়।

এই ভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও সেই সাথে রসূলের স্বীকৃতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা হল। আযান শুরুর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সমস্ত আনাচে কানাচে আল্লাহর মহিমা ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর রসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য আজোও সমানভাবে চলে আসছে। আযানের মাধ্যমে তাই আল্লাহর মহানত্ব যেমন ঘোষণা করা হয় তেমনি মানুষকে নামাজ পড়ার আহ্বান জানানো হয় সমভাবে এবং মানুষকে কল্যাণের জন্যও ডাকা হয় খুবই আন্তরিকতার সাথে। এইভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক বোধকে সচেতন করা হয় দৈনিক পাঁচবার আযানের ডাক দ্বারা। যে আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি আধ্যাত্মিক আনুগত্য সৃষ্টি করার কথা বলেন সেই আল্লাহই আযানের বিধি বিধানের দ্বারা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের কাজ কারবারে ব্যস্ত থাকার মধ্যে থেকে ক্ষণিক সময়ের জন্য বের করে এনে তাকে পরিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। আর এইভাবে একজন মুমেন আযান শুনে নামাযে যোগদান করার পর যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়ে থাকে তাতে দুনিয়া জুড়ে আল্লাহর আনুগত্য মূলক কাজ কারবারে জড়িয়ে যেতে পারে।

কল্যাণ রাষ্ট্র

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথে যে সকল সঙ্গীসাথি যারা মক্কা থেকে মদিনায় পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন তারা ধীরে ধীরে অস্থিরতা কাটিয়ে মদিনায় বসবাস শুরু করলেন এবং তাঁরা এই নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিজেদের চিহ্ন রাখতে চাইল আনুগত্যপরায়ণ হিসাবে।

এর ফলে এক বিশেষ পরিবেশ ও একটি সমাজ গঠিত হওয়ার মুখ দেখল। কিন্তু এটা ছিল খুবই অসুবিধাজনক পরিবেশ। এই সমাজে মুসলিম, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীও যোগ দিয়েছিল। সবাইয়ের সাথে নানা চুক্তি থাকলেও জটিলতা কিন্তু মোটেই কম ছিল না।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবাদের মধ্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা চলতে লাগল জোরকদমে। নবী (সাঃ) তাদেরকে অবশ্য সবসময় নৈতিক বিশ্বাসের উপর

জোর দিতে বললেন।

অপর দিকে মক্কার বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে চলল। মদিনায় মুসলমানদের উন্নতি তাদের জন্য কেবল অবমাননা বলে মনে হল না বরং তাদের নিজেদের অস্তি ত্বের উপর আক্রমণের সম্ভাবনা বলে বিবেচিত হল। সারা আরব উপদ্বীপ জুড়ে ক্ষমতার একক আধিপত্যের পতন ঘটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল কুরাইশদের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজের উপর বিভিন্ন দিক থেকে কুরাইশদের যে প্রভাব এতদিন চলে আসছিল তাও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বড় করে দেখা দিল সবার কাছে। কা'বা শরীফের সমস্ত দায় দায়িত্ব কুরাইশরা দেখাশোনা করত কিন্তু ক্রমশ এটাও তাদের হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। অপরপক্ষে মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় গিয়ে একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। যার ভিত্তি ছিল সুদৃঢ় ও শক্তিশালী আর এটি সমগ্র আরব উপদ্বীপের লোকেদের কাছে ক্রমশ বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মক্কার কুরাইশদের আত্মমর্যাদার প্রশ্নেও এটি ছিল মারাত্মক। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথিদের কাছে এটা পরিস্কার হয়েছিল যে এর একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দেবে শীঘ্রই। আর এ প্রতিক্রিয়া যারা প্রথমে দেখাবেন তারা হলেন নিজেদেরই বংশের লোকেরা – একেবারে মুখচেনা আত্মীয় স্বজনেরা।

কুরাইশদের সাথে বিরোধ

মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসা মুসলিমরা কেবল অত্যাচারিত হয়েছিল তা নয় বরং যারা হিজরত করতে পারেনি তারা কুরাইশ নেতাদের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল চারদিক থেকে। দিন দিন ইসলামী আন্দোলন যত দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিল কুরাইশ নেতারা তত বিচলিত হতে লাগল। মক্কায় তখনও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা সংগোপনে। তাদের মনে এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে যদি তারা কোনওক্রমে কুরাইশদের নজরে পড়ে যায় তা হলে আর রক্ষে থাকবে না।

কুরাইশ নেতারা তাদের মান সম্মানের এরকম দুর্গতি লক্ষ করে এর সমাধানকল্পে নানা পরিকল্পনা নিলেন। তার মধ্যে যে সকল হিজরতকারী মদিনায় চলে গেছেন তাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পত্তি, জায়গা জমি সব কিছু দখল করে নেওয়ার সিদ্ধান্তই ছিল সর্বাগ্রে।

হিজরতকারী মুসলিমরা এ কথা শোনার পর মনে মনে আঘাত পেল দারুনভাবে। কুরাইশদের এরকম কাপুরুষের মত আচরণে তারা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশদের উপর হিজরতকারী মুসলিমরা ক্ষুদ্ধ হন।

এই পরিস্থিতিতে প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লোহিত সাগরের ধার ধরে যে সকল জাতি গোষ্ঠী বাস করত তাদের সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। যার ফলে তাদের সাথে এক সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল। আর এই সাগর তীরের ধার ঘেসে সোজা যে কাফেলাবাহী পথ সৃষ্টি হয়েছিল সেই পথ ধরেই মক্কা মদিনার বাইরে ইরাক ইরান ও সিরিয়ায় বাণিজ্য চলত ব্যাপকভাবে। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওই সকল জাতির সাথে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের গুরুত্বছিল খুবই কিন্তু এটাকে কুরাইশরা মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। তাদের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রা দিন দিন বাড়তে লাগল। তাই তারা মদিনার মুসলিমদের সবরকম উন্নতির বাধা কামনা করল। একই সময় মুহাম্মদ (সাঃ) বুদ্ধিজীবিদের একত্রিত করে কুরাইশদের সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে কুরাইশদের উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকা সবাইয়ের দরকার এটা তিনি সকলকে বোঝালেন। বুদ্ধিজীবিরা সবাই একত্রিত হয়ে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই সর্তকতার দ্বারা সবাই এক আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা উপলব্ধি করেছিলেন ভীষণভাবে।

জিহাদ এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

যখনই মুহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলিমরা আক্রান্ত হবেন তখনই তার প্রতিকার হিসাবে কুরআনের প্রত্যাদেশই রসূল (সাঃ) ব্যবহার করতেন। তার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চরমভাবে জিহাদ শব্দযুক্ত প্রথম আয়াত হল,

> *"অতএব হে নবী অবিশ্বাসীদের কথা একেবারে মানবে না আর এই কুরআনের মাধ্যমে তীব্রভাবে সংগ্রাম কর।"*
> *(কুরআন - ২৫ ঃ ৫২)*

সবরকম চাপের মুখে পড়ে রসূল (সাঃ) যখন একেবারে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হওয়ার মুখে, ঠিক সেই সময়ই তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচার ও নিরাপত্তার জন্য প্রত্যাদেশ পেলেন- 'জিহাদ' সংক্রান্ত বিষয়ে। আর এই প্রত্যাদেশই তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন সার্বিক নিরাপত্তার জন্য।

এখানে আমাদের কাছে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে কোন কিছুর নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর প্রত্যাদেশই সর্বপ্রথম হাতিয়ার। আর জিহাদ কথার অন্তর্নিহিত অর্থও আমরা জানতে পারি এ প্রত্যাদেশ দ্বারা। 'জিহাদ' -এই আরবি শব্দটি এসেছে জা-হা-দা মূল শব্দ থেকে। যার অর্থ হল সংগ্রাম করা, প্রচেষ্টা করা -এ ক্ষেত্রে অবশ্য এর অর্থ নিরাপত্তা পাওয়া।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরাইশদের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ দ্বারা নিরাপত্তা দান করলেন কুরাইশদের আক্রমণের বিরুদ্ধে। এই প্রত্যাদেশ প্রকৃতপক্ষে ছিল এক মস্ত বড় আধ্যাত্মিক অস্ত্র। যারা ইসলাম অবমাননা করত, যারা ইসলামকে সবাইয়ের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সভা সমিতি করে বেড়াত তাদের কাছে সংগ্রামের এই মুক্তবাণী তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। যে সকল কুরাইশ রসূলকে নানান অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ঘটানোর জন্য অনবরত চাপ সৃষ্টি করত তাদের কাছেও প্রত্যাদেশ দ্বারা সাবধান করে দেওয়া হল। কুরআনের প্রত্যাদেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক ধারণায় পুষ্ট হয়ে প্রথমেই মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথিরা তা সর্বত্র প্রচার করার ব্যবস্থা করলেন। এতে তারা কোন প্রকার চাপকে গ্রাহ্যই করলেন না।

এমনটি হবে কুরাইশ নেতারা কখনই ভাবেনি। তাই তারা তাদের নির্যাতনকে আরোও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু কুরআনের প্রত্যাদেশকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল মুসলিমরা। আর এর মাধ্যমে তারা সাফল্যকে আরোও বেশী করে অনুভব করল। তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত, আল্লাহর একত্ববাদ, পরকালের জীবন, পরকালের হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্ন, আর দুনিয়ার ভালমন্দ কাজের জন্য পরকালের ভালমন্দ অবস্থা - সকল বিষয়ের উপর কুরআনকে সর্বক্ষেত্রে নির্দেশনা বলে মেনে নিলেন। কুরআনের এই নির্দেশনামূলক প্রত্যাদেশ তাদেরকে যে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করল তা কুরাইশদের পাশবিক অত্যাচার প্রশমিত করল দারুণভাবে।

অবশ্য অনেক সময় কুরাইশরা এত অত্যাচার চালাত যে তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। লাগাতর এরকম অত্যাচারে মুসলিমদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। একদিন অত্যাচারিত কিছু মুসলিম মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এলেন এবং বললেন, "আপনি আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করুন"। মুহাম্মদ (সাঃ) দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন,

"তোমাদের পূর্বে যে সকল মুসলিমরা এসেছিল তাদের অনেককেই গভীর কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আবার অনেককেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের উপর এ নির্যাতন তাদেরকে ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। এমনকি তাদের হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল অনেকেরই। আবার লোহার চিরুনী চালিয়ে তাদের মাংস ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে নির্মমভাবে, কিন্তু তবুও তারা ছিল ধৈর্য্যে অনড়। আল্লাহর কসম শীঘ্রই ফিরে আসবে সে অবস্থা যখন সিনাই থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত একজন ভ্রমণকারী এক আল্লাহ অথবা বন্য প্রাণী দ্বারা তার ভেড়া আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করবে না, তোমরা বড়ই অধৈর্য্যশীল।"

তাই তো তাদের ধৈর্য্যশীল হতে হয়েছিল। হতে হয়েছিল সহিষ্ণু, আল্লাহর

প্রতি চরম আশাবাদী। মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রতিনিয়ত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন কঠিন পরিস্থিতিতে কিভাবে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় থাকা যায় সে সম্পর্কে। মুসলিমদের উপর যে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চলছিল তা গ্রাহ্য না করে মুসলিমরা চরমভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমানে দৃঢ় হয়েছিলেন, আর এ বিষয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। এতটা উন্নত হয়েছিল যে তারা কোন প্রকার আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে সবসময় ছিল চরম আশাবাদী। তারা তাদের নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললেও আল্লাহর প্রতি আস্থা হারায়নি কখনও।

কিতাল সশস্ত্র প্রতিরোধ

এই সময় মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ন হয়। একেবারে সফলকাম প্রত্যাদেশ। বিশ্লেষণে দুটি প্রত্যাদেশের ধারা একেবারে পৃথক ধরনের। কিন্তু পরম্পরা সাপেক্ষে এগুলো অতীতে নজীর ভঙ্গকারী প্রত্যাদেশ। ইসলামী আন্দোলন দীর্ঘ তের বৎসরের অধিক অতিক্রম করে গেছে। কুরাইশদের হাত থেকে যে নির্যাতন মুসলিমরা এত দিন ধরে পেয়ে আসছে এই প্রথম তা থেকে পরোক্ষ নিরাপত্তা পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হল এই প্রত্যাদেশ গুলোতে। তাদেরকে ইতিপূর্বে ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু বিচক্ষন হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেই সঙ্গে তাদের মদিনায় হিজরত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল চুড়ান্তভাবে। মুসলিমরা এ নির্দেশ পেয়েছিল কুরাইশদের দ্বারা সব রকম নির্যাতনকে উপেক্ষা করার জন্য। এটা ছিল আল্লাহর কাছ থেকে পরম আশীর্বাদ।

মদিনায় অবস্থিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা যে চরম আক্রমণ করতে যাচ্ছে তা একেবারে স্পষ্ট হল সবার কাছে। তারা শুধু মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার সাথীদের যে আক্রমণ করে শেষ করতে চাইল তা নয় বরং তারা সার্বিকভাবে ইসলামকে চিরতরে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল পৃথিবীর মাটি থেকে। কারণ তারা বুঝেছিল পরবর্তীতে আরবের মাটিতে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলামই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কেবলমাত্র আরব শক্তিতে ভারসাম্য নষ্ট করবে না বরং তার বিস্ত ার আরব ভুখন্ডের সর্বত্র বিরাজ করবে, –এ ছিল তাদের ভয়ের কারণ। ফলে সমগ্র আরব জুড়ে কুরাইশদের যে ধর্মীয় দেব-দেবীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজ করছিল তাও যে আর থাকবে না, তা বুঝেছিল কুরাইশ নেতারা। ফলে কুরাইশরা ষড়যন্ত্রের মাত্রা আরো তীব্র করল। এদিকে সবরকম সন্দেহের অবকাশ সরিয়ে দিল রসূলের প্রতি অবতীর্ন প্রত্যাদেশ,

> "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কেননা তারা নির্যাতিত, আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, এরা সেই লোক যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে

> বহিস্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলত আমাদের রব তো আল্লাহ! আল্লাহ যদি একদলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ করতে না থাকতেন তা হলে খানকা গীর্জা উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো – যেখানে বেশী বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করা হয় – সবই বিধ্বস্ত করে দেওয়া হত। আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকেদের সাহায্য করবেন যারা তাঁর সাহয্যে এগিয়ে আসবেন। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও অতিশয় প্রবল।"
> (কুরআন ২২ ঃ ৩৯-৪০)

আমাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন ও উপস্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চরম কোন ক্ষমতা, ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্র বিশেষের যার হোকনা কেন তা মোটেই শুভ লক্ষনের নয়। তা অংকুরীত বীজ থেকে বেরিয়ে মহীরূহের আকার ধারন করতে পারে এবং সমাজ জীবনের ভীতকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিতে পারে। মানুষের মধ্যে যে বৈচিত্র রয়েছে তার মাহাত্মকে করতে পারে ফেকাসে। এরকম চরম ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে একেবারে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে যে কোন সময়ে। তাই সমাজের নানান সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং সেই সাথে যুদ্ধনীতির দ্বারা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা পরস্পর একই সরল রেখায় অবস্থিত। আর এর দ্বারাই মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে। আর এ কথাই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআনের অন্য আয়াতে।

> *"শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তারা খোদাদ্রোহীদের পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুনিয়ার লোকেদের প্রতি আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে।"*
> *(কুরআন ২ ঃ ২৫১)*

সাধারণতঃ মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মগত প্রথায় অপরের ধন সম্পদের প্রতি লোভ পোষন করে থাকে। তাদের উপর নানান দিক থেকে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালায়। তা কোন সময় ইতিবাচক ভূমিকা যেমন ন্যায় বিচার, সাম্য মৈত্রি হতে পারে আবার নেতিবাচক হত্যা, লুন্ঠন, আগ্রাসন ইত্যাদিও হতে পারে।

এইভাবে জিহাদের নির্যাস ও প্রেরণা মানে শান্তির অনুসন্ধান বা শান্তির আন্দোলন। অপরপক্ষে কিতাল হল শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি পথ।

জিহাদ
ব্যক্তির সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সি. আই. এ ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স কাউন্সিলের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্রাহাম ই.ফুলার ইসলামের জিহাদ নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তার বিখ্যাত গ্রন্থ অ ড়ড়ৎষফ রিঃযড়ঁঃ ওংষধস -এ লিখেছেনঃ

"Theories of Jihad and the extensive literature around it are the functional equivalent of Christian just a war theory; the concept is designed to define and limit the action of muslims in war, Jihad is most controversial and emotive word that the west associates with Islam today; Not a day goes by in the media when the word is not invoked by critics of Islam. Many observers are impatient with examination on the orgins and use of the world `Jihad' feeling it represents little more than rationalisation of the horrofic character of the Jihad challange to western power to peace and stability.

In the Quran and Hadith. Jihad has many meaning the basic root of the Jihad in Arabic means efforts or thruggle. It is widely used to refer to the struggle of the individual to live a virtals life to uphold religious values in ones personal life, to help propegate Islam through personal effort by way of personal example and promoting the faith of Islam. In the context the word Jihad for Muslims retainls quite positive religious association of personal devotion to word Arabic symply to mean "I will make an effort do my best. That is the great Jihad or personal Jihad, as defined by the Proplet Muhammad (pb)........

Islamic Jurisprudence set for lengthy rulings on rules of conduct in war including the fact that women and children should not be targeted, that proportionality of force must be used, that civilian structures should not be without cause

destroyed that Jihad must be declared by a legitimate ruler or heat of state, and that warfare outside the rules of Jihad is not legitimate prophet Muhamad is on record for ordering his soldiers to avoid harming women, children, the elder or people at temples, churches and monasteries."

"জিহাদ নিয়ে যে বিশাল সাহিত্য সমালোচনা বর্তমানে হচ্ছে তা প্রায় খ্রীষ্টান যুদ্ধনীতির। মুসলিমদের উপর অনুরূপ একটা পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ সব সময় চালানো হয়ে থাকে। পশ্চিমীদের সমালোচনার সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বিষয় হল এই জিহাদ। গণমাধ্যমের প্রচারে বোধ হয় একটিও দিন বাদ যায় না যেদিন ইসলামের জিহাদ নীতির সমালোচনা করা হয়নি। বহু সমালোচক লক্ষ্য করেননি যে 'জিহাদ' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে এবং এর প্রকৃত ব্যাখা বিশ্লেষণই বা কি ? এটি শান্তির দ্যোতক কি অশান্তির স্ফুলিঙ্গ। জিহাদ নীতির যৌক্তিকতা তারা খুব অল্পই অনুভব করে থাকে এবং তার ভিত্তিতে তারা এটা মনে করে যে পাশ্চাত্য শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে জিহাদ বোধ হয় একটি চ্যালেঞ্জ ছাড়া কিছু নয়।

"কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের অর্থ অনেক আছে। জিহাদ আরবী শব্দটির অর্থ প্রচেষ্টা অথবা সংগ্রাম। এর দ্বারা বোঝা যায় কোন ব্যক্তির সার্বিক উন্নতির জন্য সংগ্রাম যা মানুষের নীতি নৈতিকতাকে উন্নত করে থাকে। সেই সঙ্গে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উন্নতিকে সমর্থন জানায় ধর্মীয় উন্নতির মাধ্যমে। এইভাবে নিজের জীবনে শান্তিময় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতিপালন করা। তাই মুসলমানদের কাছে জিহাদ হল সম্পূর্ণ ইতিবাচক একটা প্রচেষ্টা যা তাদের বিশ্বাস ও নৈতিকতার উন্নতি সাধন করে থাকে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে আরবী বাগধারা অনুযায়ী 'জিহাদ' মানে আমি আমার ভালোর জন্য সার্বিক চেষ্টা করব। এটাই বড় জিহাদ, অন্যান্য জিহাদ সম্বন্ধে রসূল (সাঃ) এরকমই বলেছেন, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মিলিটারী শক্তি প্রয়োগ মূলত ছোট জিহাদ ...."

"ইসলামী আইনগ্রন্থ যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে বিশাল আলোচনা করেছে। যাতে করে এটা সহজেই অনুমিত হয় যে এখানে নারী ও শিশু সুরক্ষা নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুদ্ধে কোন কোন সময়ই নারী ও শিশুদের আক্রমণ করা যাবে না। কোন সময়েই এ সব নীতি লঙ্ঘিত হবে না। আর এই যুদ্ধ ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে আইনসিদ্ধ শাসকই ঘোষণা করতে পারে। যত্রতত্র যে কোন জায়গা থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা কখনই যেতে পারে না। মুহাম্মদ (সাঃ) যখন কোন জায়গায় সৈন্য পাঠাতেন তখন তাদের সাবধান করে বলতেন "শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের এড়িয়ে চলবে। আর এড়িয়ে চলবে মন্দির, গীর্জা ও মঠে অবস্থানকারী লোকদেরকে আক্রমণ করা থেকে।"

মহত্তর জিহাদ

যে সকল মহিলা বা পুরুষ ইসলামকে বুঝতে চাইতেন তিনি তাদের তড়িঘড়ি করে ইসলামে দীক্ষিত করে নিতেন না, ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য তিনি তাদের যথেষ্ট সময় দিতেন। ইসলাম সম্বন্ধে তাদের নানান প্রশ্ন তিনি তাদের কাছ থেকে খুব মনযোগ সহকারে শুনতেন এবং সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করতেন। তাদের জীবনের সুখ, দুঃখের ভাগীদার হয়ে তিনি তাদের সব সময় উন্নতি কামনা করতেন। অনেক দিন পরে তিনি যখন হুনায়েন অভিযান থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি সঙ্গী সাথীদের বললেন "আমরা এক ছোট জিহাদ থেকে ফিরে এসে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করলাম"। একজন সাথী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন "আল্লাহর রসূল! বড় জিহাদটি কি ?" উত্তরে তিনি বললেন, "এটা হল নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" মুসলিম হোক বা অমুসলিম যেই হোক না কেন এই অন্তর্নিহিত সংগ্রাম করা বড়ই কঠিন কাজ এবং এ সংগ্রামে জয়লাভ করা বড় ধরনের মহৎ কাজ। এর দ্বারা অপরকে জানা, ক্ষমা করা ও অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়।

তাই যুদ্ধ আর সংগ্রাম এক জিনিস নয়। দুটোর মধ্যে আছে বেশ বড় ধরনের পার্থক্য। জিহাদ মুসলিমদের দেখিয়েছে যে আল্লাহর জন্য বাঁচতে হবে এবং তাঁর জন্যই মরতে হবে। আর কারোর জন্য এ সংগ্রাম নয়। আর এটার দ্বারাই আসে আলো, স্বচ্ছতা, তৃপ্তি, ধৈর্য ও শান্তি।

IO

প্রথম যুদ্ধ

বদর

মুহাম্মদ (সাঃ) হিজরত করে মদিনায় চলে এলেও কুরাইশদের শত্রুতা মোটেও কমল না, তারা মক্কা থেকে বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে এসে মদিনায় হামলা চালাতে লাগল। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করে চলল মুনাফিক ও ইহুদীরা। কিন্তু মুসলমানরা ছিল সতর্ক। তাই কুরাইশরা মুনাফিক ও ইহুদীদের দ্বারা তাদের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না, তাই তারা নিজেরাই কিভাবে মুসলিমদের ক্ষতি করতে পারে তার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। কুরাইশদের-এ হীন চক্রান্ত নষ্ট করার জন্য রসূল (সাঃ) মুসলিমদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে মদিনা পাহারা দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এক সময় মদিনার বাইরে চারণভূমি থেকে মুসলমানদের উট চুরি করে নিয়ে পালায় কুরাইশরা। পরে অবশ্য মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের উপর আক্রমণ করলে একজন কুরাইশ নিহত হয় এবং দুজন বন্দী হয় মুসলিমদের হাতে। এরপর থেকে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আর যুদ্ধের রসদ সরবরাহের জন্য আবুসুফিয়ানকে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে পাঠিয়ে দেয় ।

অল্প সময়ের মধ্যে রসূল (সাঃ) নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে সিরিয়া থকে আবু সুফিয়ান ফিরে আসছে মক্কায়, মদিনার পাশ্ববর্তী রাস্তা ধরে এবং তার এই বাণিজ্যে অগাধ অর্থ সম্পদ লাভ হয়েছে যা সমস্তটাই যুদ্ধের জন্য ব্যয় হবে। সেই সঙ্গে কুরাইশরাও বহু সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে করে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রান্ত না হয়।

এ খবর শুনে মুহাম্মদ (সাঃ) ৩১৩ জনকে নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে এই ৩১৩ জন সৈন্য মামুলী অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এর দ্বারা যুদ্ধ করা চলে না বললেই চলে। কিন্তু তাদের ঈমানী বল ছিল প্রচুর। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত

উসমান (রাঃ)-কে পিছনে থাকতে বললেন যাতে করে তিনি নবী কন্যা রুকাইয়াকে সাহায্য করতে পারেন কারণ তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে অসুস্থ।

আবু সুফিয়ান তার গুপ্তচর দ্বারা রসূলের এই অভিযান সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেন। তখনই আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের সাহায্য চাইলেন জরুরীভাবে। কৌশলে তিনি তার কাফেলার অভিমুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন যে এখন তার আর বিপদ নেই। তাই তিনি মক্কায় খবর পাঠালেন যে বর্তমানে আর তার সাহায্যের দরকার হবে না।

ইত্যবসরে কুরাইশ নেতারা অবশ্য হাজারেরও বেশী সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল আবুজেহেলের পরামর্শে। তারা যুদ্ধ না করে মক্কায় ফিরে যাওয়াকে বোকামী মনে করল। এই সময় যদি মুসলিমদের তাদের সৈন্যবহর দেখানো না যায় তাহলে মুসলিমদের সাহস দমবেনা বলে তারা ভাবল। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের যুদ্ধ শিবির বসেছিল মদিনা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে বদর নামক স্থানে। তাদের কাছে কুরাইশ সৈন্যদের এগিয়ে আসার খবর পৌঁছাল। কুরাইশরা ছিল মুসলিমদের তিনগুনেরও বেশী। প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধের অভিপ্রায়েই আসছিল অপরপক্ষে মুসলমানেরা এরকম কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই আসেনি।

পারস্পরিক পরামর্শ

এইরকম এক নাজুক পরিবেশে নবী (সাঃ) তাঁর সাথিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। সকলের কাছে এ ব্যাপারে তাদের মতামত পেশ করতে বললেন। হজরত মিকদাদ (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে রসূলকে বললেন "আপনি এবং আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা আপনার সামনে ও পিছন থেকে যেমন যুদ্ধ করব তেমনিভাবে ডানে বামে থেকেও যুদ্ধ করব।

মিকদাদ (রাঃ)-র কথা নবী (সাঃ)-কে যারপরনাই সন্তুষ্ট করল। তিনি এটা আশা করেছিলেন মুহাজিরিনদের কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ করলেন আনসারীরা ও আনসারদের পক্ষে সাদ (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন "আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আপনার সাথে আছি। যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি আপনি যদি আমাদের সমূদ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন আমরা আপনার সাথে সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একজনও পেছনে দাঁড়িয়ে থাকব না। এইভাবে আনসার ও মুহাজিরীন উভয়ের কাছ থেকে তিনি এরকম দৃঢ় আশ্বাস পাওয়ার পর সম্মুখ সমরে এগিয়ে যেতে মনস্থির করলেন। কুরাইশ সৈন্যরা তাদের কুচকাওয়াজ দেখিয়ে মুসলিমদের সন্ত্রস্ত করতে পারল না।

বুদ্ধিদীপ্ত রণ কৌশল

এর দ্বারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের বাস্তব নীতি ফুটে উঠেছে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলেছেন তার মনস্তাত্ত্বিক বিচক্ষণতার প্রয়োগ দ্বারা, সামষ্টিক জীবনে, গণতান্ত্রিক সমাজে এ এক চরম মূল্যবোধ, মূল্যবোধের সংযোগ। এটা যেমনভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিভাধর জীবনের বিশ্লেষণ করে তেমনিভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করতে হয় না কারণ তারা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পথ নির্দেশ পেয়ে থাকেন, কিন্তু একেবারে এটা সত্য নয়। বরং অতীতেও যেমন শলা-পরার্শের প্রয়োজন হয়েছিল বর্তমানেও সেই একইভাবে শলাপরামর্শের গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবসময় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর সঙ্গী সাথিদের সাথে পরামর্শ করেছেন। নানান সমস্যার কথা তিনি তাদের কাছে পেশ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শও সাদরে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি তার আন্ত:প্রতিভা দ্বারা সাথিদের পরামর্শের ভালমন্দ দিকটা যথেষ্ট অনুভব করতে পারতেন। তার সংগ্রামে তিনি তাদের শলাপরামর্শে অংশ গ্রহণে অধিকার প্রদান করে মূলত তাদের প্রতিভা বিকাশের পথকে উন্নত করেছিলেন সামগ্রিকভাবে। এর মধ্য দিয়ে সঙ্গী-সাথী প্রাণ দিয়েও তার সাথে থাকার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

নবী (সাঃ) তাঁর সাথিদের নানান ধরনের প্রশ্ন করতেন এবং তা বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রশ্নের মধ্যে থাকত গভীরতা। তাই সাথিরা উত্তর দেওয়ার আগে অনেকটা ভাবত বিষয়টাকে নিয়ে। তারপর তাদের গভীর চিন্তার ফসল স্বরূপ তারা তাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করত। সকলের মতামতকে শোনার পর তিনি তার গভীর সুচিন্তিত মতামতটি পেশ করতেন। এতে তিনি যে মতটি গ্রহণ বা বর্জন করতেন তার যথাযথ কারণ তিনি ভালভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক সময় তিনি তাঁর সাথীদের বললেন,

“শত্রুকে হারাতে পারলেই শক্তিশালী হওয়া যায় না।”

এ কথা শুনে সবাই একে অপরের দিকে তাকালেন। অবেশেষে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

“তাহলে কে শক্তিশালী ?”

তিনি সঙ্গী সাথিদের মধ্যে তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করলেন এবং তাদেরকে আরো গভীরভাবে ভাবার জন্য বললেন,

"শক্তিশালী হল সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ

রাখতে পারে।"

এক সময় তিনি সাথিদের বললেন *"অর্থ সম্পদ যার আছে সে প্রকৃতপক্ষে ধনী নয়।"*

সাথিরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন *"তা হলে ধনী কে ?"*

তিনি বললেন,

"যার হৃদয় ধনী, সেই প্রকৃত ধনী।"

অনেক সময় তার কথাগুলোকে অনেকটা দ্বিমুখী বলে মনে হত। কিন্তু তাতে ছিল গভীরতা, ভাবনার বিষয়। এক সময় তিনি বলেন, "তোমার ভাই ঠিক করুক অথবা ভুল করুক তুমি সাহায্য কর।" সাথিদের কাছে সত্যি এটা অনেকটা ধাঁধার মত লেগেছিল। ভাল কাজে মানুষকে সাহায্য করা নিসন্দেহে ভাল কাজ কিন্তু মন্দ সম্পাদনকারীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে ? মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের ধারণাটা পরিস্কার করে দিলেন এই বলে,

"যখন কোন এক ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যোগী হয় তখন তা করা থেকে তাকে বিরত করাই হল তাকে সাহায্য করা।"

এইভাবে তিনি তাদের চিন্তাশীল প্রশ্ন করতেন এবং তাদের কাছে চিন্তাশীল উত্তর কামনা করতেন। অনেক সময় তিনি তাদের মনের মধ্যে যে অস্পষ্টতা থাকত তা ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। অন্ধ আনুগত্য আদায় করে নেওয়ার জন্য তিনি কখনই বাধ্য করতেন না কাউকেই। এইভাবে তিনি শলাপরামর্শের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটাতেন সঙ্গী-সাথিদের মধ্যে। তারা হতেন সাহসী, স্বাধীন, বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ। এমনকি রসূলের উপস্থিতিতেও তারা তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাতে পারত পূর্ণভাবে। এইভাবে সাথীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি তাদের সমাজ নেতা বানাতে পেরেছিলেন সে যুগের আরব জাতির কাছে। পরে অবশ্য তাঁর এ নীতি সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য।

এ প্রসঙ্গে যুবক হুবাব (রাঃ)-র উদাহরণ খুবই উল্লেখযোগ্য, যখন রসূল বদর প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য পৌঁছলেন তখন রসূল (সাঃ) একটি কূপের কাছে তার শিবির

স্থাপন করলেন যেটি তিনি প্রথম দেখেছিলেন। হুবাব (রাঃ) রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি এইখানে শিবির স্থাপনের জন্য আল্লাহর কাছে থেকে কোন প্রত্যাদেশ পেয়েছেন কি-না। নবী (সাঃ) জানালেন যে তিনি কোন প্রত্যাদেশ পাননি বরং তিনি এখানে অবস্থান করেছেন একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে। হুবাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন এখান থেকে শিবির উঠিয়ে সামনে কিংবা পিছনে নিয়ে যাওয়াতে কোন বাধা আছে কিনা। এ সব কিছুতে রসূল (সাঃ) কোন রকম যুক্তি পেশ করলেন না। ঠিক এই সময় হুবাব (রাঃ) অন্য একটি পরিকল্পনা রসূল (সাঃ)-কে শোনালেন। তিনি বললেন যে যুদ্ধ শিবিরটিকে বড় কূপের পাশে স্থাপন করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ এটা ছিল শত্রু শিবিরের অধিকতর নিকটে। তাই এটি আটকে দিলে তারা তাদের পানীয় জলের সংকটে শীঘ্রই পতিত হবে। তা ছাড়া অন্য কূপগুলো থেকে জল সংগ্রহ করতে গেলেও এ স্থান তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। সে সময় তাদের আক্রমণ করা সহজ হবে। আর যুদ্ধের এই মুহুর্তে যদি তারা জল সংকটের শিকার হয় তাহলে মুসমানদেরই সুবিধা হবে। মুহাম্মদ (সাঃ) খুব মনোযোগ সহকারে হুবাব (রাঃ)-র যুদ্ধ কৌশলের ব্যাখা শুনলেন তাই কোনরূপ দ্বিমত পোষন না করে হুবাব (রাঃ)-র মতকে অগ্রাধিকার দিলেন নিজের পূর্ব সিদ্ধান্তের উপরেও। এই উদাহরণ থেকে এটাও পরিস্কার যে অহীর সিদ্ধান্ত যা রসূলের উপর আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হত তার কোনরূপ অবমাননা করা যাবে না কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে রসূলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। মানুষের কাজ কারবারের উপর আল্লাহর রসূলের নীতিমালা কোন চাপিয়ে দেওয়ার বস্তু নয় অথবা তার মধ্যে কোন সীমা থাকবে না তা নয়। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথিদের কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট অবকাশ প্রদান করেছিলেন। যার ফলে দেখা গেছে যে অনেক চরম পরিস্থিতিতেও সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং সাথিদের বোধোন্নতি ঘটেছে।

নবী (সাঃ) কেবল মুসলিম পুরুষদের অধিকার প্রদান করেছিলেন তা নয় তিনি তার পরামর্শে মহিলাদেরকেও সুযোগ দিয়েছিলেন। পরামর্শ আসরে তারা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে তাদের মতামত পেশ করতেন। তাতে রসূল (সাঃ) নিজের মর্যাদা হ্রাসের কথা কোন সময় ভাবতেন না। এর দ্বারা রসূল (সাঃ) এটা তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, তার সাথিদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অনেক মূল্য তাঁর কাছে আছে। তিনি তাদের বুদ্ধি মেধা ও আন্তরিকতা-সব কিছুকেই অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তারাও তাদের রসূল, তাদের নেতাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। তাই রসূল (সাঃ) এর সিদ্ধান্তের কাছে তাদের নিজেদের শলাপরামর্শ অনেকটাই বোকামী বলে মনে করতেন তারা।

বদর যুদ্ধের প্রাক মুহূর্ত

মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এটি যখন পরিস্কার হল যে আবু সুফিয়ান অন্যপথ থেকে পালিয়ে গিয়েছে অপর দিকে কুরাইশ নেতারা যুদ্ধ দামামা বাজিয়ে সম্মুখ সমরে এগিয়ে আসছে তখন তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য কুরাইশদের সাথে পরামর্শ করতে মনস্থির করলেন। তিনি উমর (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন কুরাইশ নেতাদের কাছে। তিনি বোঝালেন যে তাদের এখন ফিরে যাওয়া উচিত। কোন প্রকার যুদ্ধে অবতীর্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই উভয় পক্ষেরই। অনেক কুরাইশ নেতা এ প্রস্তাবকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন। তারা যুদ্ধ এড়িয়ে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু বেশির ভাগ কুরাইশরা যুদ্ধ করতে চাইলেন। কারণ তারা এটা হিসেব কষে দেখেছিল যে মুসলিমদের চাইতে তাদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী। তা ছাড়া তাদের সমরাস্ত্রও অনেক উন্নত মুসলমানদের চাইতে। তাই তাদের সামনে যুদ্ধের ময়দানে নামাটা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল। দূত হিসাবে হজরত উমর (রাঃ)-র প্রস্তাবকে তারা মুসলিমদের দুর্বলতা বলে ধরে নিল। তাছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ)-কে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার এটাই চরম মুহূর্ত বলে তারা ভাবলো। তাই কিছুতেই এ সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না এ সিদ্ধান্তে অনড় রইল।

> সমস্তরকম অনুসন্ধান করে জানার পর মদিনা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে বদর নামক স্থানে শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করতে মনস্থির করলেন। ৩১৩ জনের এ ক্ষুদ্র কিন্তু অতি শৃঙ্খলাপরায়ণ বাহিনী কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলল যুদ্ধ ময়দানে। আর এই বাহিনীতে আলি (রাঃ) রসূল (সাঃ)-র পতাকা উড়িয়ে চললেন তাদের সাথে। দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান শনিবার অতিসকালে আকাশ বাতাস মুখরিত করে এগিয়ে চলল রসূল (সাঃ) এর সেনাবাহিনী, সত্যের সেনাবাহিনী মুসলিম দল। (৬২৪ খ্রী, ১৩ই মার্চ)

রসূল (সাঃ) তাঁর এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে মোট পাঁচ দলে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক দলে কমান্ডোদের আলাদা আলাদা নাম দিলেন এবং তাদের ডানে বামে উভয় দিকে তাদের অবস্থান ঠিক করে দিলেন এবং তাদের কেন্দ্রীয়ভাগেও একজন কমান্ডার নিযুক্ত করলেন। তিনি নিজে নিলেন প্রধান কমান্ডারের দায়িত্ব। তিনি অবস্থান করছিলেন নিকটবর্তী একটি উঁচু পাহাড়ে স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ শিবিরে। এখান থেকে পুরো রণক্ষেত্রের ছবিটি এক নজরে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন এবং সেই মত তিনি সবাইকে প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতে পারছিলেন অতি সহজেই। এর ফলে সবাই যেমন প্রয়োজনমত এগিয়ে যেতে পারছিল তেমনিভাবে নিজেদের নিরাপত্তাও পাচ্ছিল সর্বাধিক।

এই সময় মুসলিম সৈন্যরা দুজনকে আটক করে শিবিরে আনল তারা তাদের জল নেওয়ার জন্য কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময় রসূল ((সাঃ)) নামাজে রত ছিলেন। মুসলমানদের কয়েকজন তাদের প্রশ্ন করেছিলেন- তারা কোথা থেকে এসেছেন, প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল যে, তারা মক্কার সৈন্য দলেরই লোক। কিন্তু মুসলিমরা কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। তারা বার বার প্রশ্ন করে চাপ দিচ্ছিলেন যে তারা স্বীকার করুক যে তারা আবু সুফিয়ানের লোক। ইত্যবসরে রসূল (সাঃ) নামাজ শেষ করে তাদের কাছে এলেন। নবী (সাঃ) বিরক্তির সাথে নিজের সাথিদের জানালেন, তারাতো বড় আশ্চর্যের লোক। যখন ধৃত ব্যক্তিরা সত্য কথা বলছে তখন তাদের নিপীড়িত করা হচ্ছে। আবার যখন মিথ্যা কথা বলবে তখন ছেড়ে দেওয়া হবে। অতঃপর রসূল (সাঃ) তাদের নিয়ে আলাদাভাবে প্রশ্ন করলেন, তারা কাদের লোক। তারা উত্তরে বলল যে তারা মক্কার সৈন্য বিভাগেরই লোক। এ কথা শোনার পর রসূল (সাঃ) তাদের সংখ্যা কত জানতে চাইলেন। তখন তারা এ বিষয়ে জানেন না বললেন। রসূল তাদের দৈনিক মিলের জন কত উটের মাংস লাগে তা জানতে চাইলেন। তারা জবাবে বলল প্রথম দিন ন'টি ও পরের দিন দশটি। এ কথা শোনার পর নবী ((সাঃ)) সহজেই বিরুদ্ধ সেনা সংখ্যা অনুমান করে নিতে পারলেন। কারণ একটি উটের মাংস একশ জনের জন্য বরাদ্দ। এভাবে হিসেব করলে সৈন্য সংখ্যা ৯৫০ জনের মত হয়।

সৈন্য সংখ্যা জানার পর নবী (সাঃ) তাদের কাছ থেকে আরো জেনে নিলেন তাদের বিভিন্ন কমান্ডারদের অবস্থান। অর্থাৎ কে কোন দিকে অবস্থান করছে। বিভিন্ন অবস্থানে যে সকল কমান্ডাররা নিযুক্ত ছিলেন তিনি তাদেরও নাম যথাযথভাবে জেনে নিলেন আর সকলকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আগে থেকে জানতে পারার জন্য তাঁর পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে খুবই সুবিধা হয়েছিল।

মক্কার ৯৫০ জন কুরাইশ সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবু জেহেল। অপরপক্ষে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম বাহিনীতে দুটোর বেশী ঘোড়া ছিল না। অপরপক্ষে কুরাইশ সৈন্যদলে ছিল ১০০টিরও বেশি ঘোড়া। মুসলিমদের ছিল মাত্র ১২ জনের মত বর্মধারী সৈন্য অপর পক্ষে কুরাইশদের ছিল ২০০শ'রও বেশী বর্মধারী সৈন্য। সমস্ত দিক থেকে কুরাইশরা ছিল অধিক শক্তিশালী। এমতাবস্তায় আল্লাহর রসূল মাটিতে সেজদা লুটালেন। আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা নিয়ে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তিনি সাহায্য চাইলেন তাঁর ছোট্ট যুদ্ধ শিবিরে বসে। তাঁর এই দোওয়া ছিল খুবই মমার্থপূর্ণ যা হৃদয় নাড়িয়ে দেয়।

"ও গো আমার প্রভু ! যদি এই ক্ষুদ্র সংখ্যক বিশ্বাসীরা আজ পরাজিত হয় তাহলে আপনার ইবাদত করার মত আর কেউ থাকবে না।"

যুদ্ধ শুরু হল তিন জোড়া দ্বৈত লড়াই দ্বারা। মুসলিমদের মধ্যে থাকলেন বীর হামজা (রাঃ), আলি (রাঃ) ও উবায়দাহ (রাঃ)। হামজা (রাঃ) ও আলি (রাঃ) সহজেই শত্রুপক্ষকে পরাজিত করলেন। কিন্তু উবায়দাহ (রাঃ) আহত হলেন মারাত্মকভাবে। তারপর মুসলমানেরা দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে গেলেন। ফলে শীঘ্রই কুরাইশরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। যদিও তারা সংখ্যায় ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুন। মুসলিম বাহিনীর সামনে তাদের পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব হল না।

যুদ্ধ নীতিতে র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী সজ্জিতকরণ মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগে কেউ করেননি মরুযুদ্ধে। এর পূর্বে যুদ্ধবিজ্ঞানে এ ধরনের কোন শৃঙ্খলা কেউ জানত না। মুহাম্মদ (সাঃ) এমনভাবে সাজিয়েছিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যে তারা লৌহপ্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিল। যাদের ভেদ করে শত্রুপক্ষ কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিল না। তারা চার চারজন করে দলবদ্ধভাবে এক সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। নিজেদের ভূমিকা এক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। শত্রুপক্ষকে মুসলিমরা বর্শা ও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার সুযোগ পেয়েছিল। একইসঙ্গে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল ঢাল দিয়ে। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। আসলে রসূল (সাঃ) নিজেই ছিলেন কমান্ডার। যিনি তাঁর সেনাদের সার্থকভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে অহী দ্বারা জানানো হয় নবী (সাঃ)-কে, তার সফলতায় মহান আল্লাহর অলৌকিক সাহায্যের কথা। যেখানে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে হাজির ছিলেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। আল্লাহ ঘোষণা করেন,

> *"এর আগেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।" (কুরআন - ৩ ঃ ১২৩)*

কুরাইশদের উপর মুসলিমদের বিজয় লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি নতুন যুগের সূচনা অধ্যায় বলা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যে সামাজিক মর্যাদায় কুরাইশরা অধিষ্ঠ ছিল, বদর যুদ্ধের পরাজয়ে তা আজ ভূলুণ্ঠিত হল। সারা আরবের আনাচে কানাচে কুরাইশদের পরাজিত হওয়ার গ্লানি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে বিরোধী দল কুরাইশবাহিনী হারিয়েছিল সত্তরজনকে। এদের মধ্যে কুরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বদানকারী আবু জেহেল ছিলেন। আবু জেহেল ছিল সবচেয়ে বেশি হিংসাপরায়ণ। যুদ্ধ বাধানোর জন্য সে ছিল সর্বাগ্রে। কুরাইশদের বন্দীদের মধ্যে আব্বাস (রাঃ)ও ছিলেন। যিনি তখনও ইসলাম গহণ করেননি।

মক্কায় প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা

কুরাইশরা পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন মক্কায়। এ যুদ্ধে তাদের প্রতিটি গোত্রের কেউ না কেউ নিহত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাল। আবার শপথ গ্রহণ করল এ কাজের জন্য। এরকম এক নারী হিন্দা যে তার পিতাকে হারিয়েছিল বদর যুদ্ধে। ভাই ও চাচা নিহত হয়েছিল। সে শপথ নিয়েছিল হামজা (রাঃ)-র রক্ত পান করবে বলে। কারণ হামজা (রাঃ)-র হাতেই নিহত হয় তার পিতা ও চাচা। শলাপরামর্শে কুরাইশরা, সবাই ভাবল আর সময় নষ্ট করা যাবে না কিছুতেই। তারা পাশ্ববর্তী শহর ও জাতির লোকেদের সাথে একজোট হল মুসলিমদের আক্রমণের জন্য। আর এভাবেই তারা ভেবে বসল যে নিশ্চিতভাবে তারা শেষ করে দেবে ইসলামী আন্দোলনকে, একেবারে আরবের মাটি থেকে।

আবু লাহাব ছিলেন ইসলামের তথা মুসলিমদের চরম শত্রু, কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপের জন্য তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আবু সুফিয়ানকে তিনি নিজের কাছে ডাকলেন এবং যুদ্ধে পরাজয়ের কথা সবিস্তারে জানতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান বললেন,

“আমাদের কাছে এর চেয়ে বড় কিছু নেই, আমরা শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলাম। শত্রুরা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল, আমাদেরকে বন্দী করেছিল এবং আমরা তাদের ইচ্ছার দাস হয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমাদের সৈন্যদের কোন দোষ দিতে পারি না, কেননা আমরা কেবল মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়নি বরং সেই সব ফর্সা সৈন্যদের সম্মুখীন হয়েছিলাম যারা স্বর্গ-মত্তের নানান বিচিত্র ঘোড়ায় আরোহী ছিল এবং তাদের গতিরোধ করার জন্য কেউ দাঁড়াতে পারছিল না তাদের সামনে।”

যখন আবু সুফিয়ান যুদ্ধ পরাজয়ের এরকম বিষাদ বর্ণনা করছিলেন তখন আবু রাফি নামক একজন দাস তার এ বর্ণনা মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি কিন্তু পূর্ব থেকেই গোপনে মুসলিম হয়েছিলেন। যখন তিনি মুসলমিদের পক্ষে ফর্সা মানুষদের অংশগ্রহণের কথা শুনলেন তখন যুদ্ধ বিজয়ের উচ্ছাসে বলে ফেললেন “ওরা ছিল ফেরেশতা।” আবু রাফির এরকম মন্তব্যকে আবু লাহাব ধৃষ্টতা বলেই মনে করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাঘের মত। সজোরে আঘাত করল তার মুখের উপর এবং মাটিতে ফেলে চেপে ধরল। কাছেই ছিলেন আবু লাহাবের শ্যালিকা উম্মাল ফজল যিনি আব্বাস (রাঃ)-র স্ত্রী ছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখতে পারছিলেন না। তিনি আবু লাহাবকে সংযত করার জন্য কাছে পড়ে থাকা তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করলেন। মাথায় এ আঘাত বড় ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল আবু লাহাবের। পরে এ আঘাত বিষিয়ে

গিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আবু লাহাবের মৃত্যু ঘটল। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ইসলামের চরম শত্রু ছিল। নানান দিক থেকে তারা মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নির্যাতন চালাতেন। কিন্তু আল্লাহ তাদের অপরাধের পরিণাম কি ভয়াবহ তা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এইভাবে,

> *"চূর্ন হল আবু লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে গেল। তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজেই আসল না। সে অবশ্যই শিখা যুক্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে আর তার স্ত্রীও। যে কুটনী বুড়ি। তার গলায় শক্ত পাকানো রশ্মি বাঁধা থাকবে। (কুরআন - ১১১ ঃ ১-৫)*

আবুলাহাব এবং তার স্ত্রী এমনই দুজন ব্যক্তি যাদেরকে কুরআন একেবারে উল্লেখ করে তাদের মারাত্মক পরিণতির কথা বর্ণনা করেছে। যারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে তারা রসূলের প্রতি শেষমেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কোন সময়ই কোন প্রকার সহানুভূতিশীল ছিলেন না রসূলের প্রতি। কুরআনের প্রত্যাদিষ্ট ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল আবুলাহাব ও তার স্ত্রীর মৃত্যুতে। যারা চরম অবিশ্বাস করত কুরআনকে তাদের কাছেও অবাক লাগছিল এ ঘটনা বাস্তবে যখন ঘটেছিল।

মদিনায় জয়োচ্ছাস ও বেদনার সুর

যুদ্ধ জয়ের খবর পেয়ে সারা মদিনাবাসী এতটা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়েছিল যে তারা মদিনা নগরের উপকণ্ঠে 'আর রাওহা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন নবী (সাঃ) ও মুসলিম বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। তারা তাদের অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে আল্লাহ তাদের নবীর বিজয়কে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

কিন্তু নবী (সাঃ) এর হৃদয় তখনও ভারাক্রান্ত। তিনি তাঁর প্রথম স্তরের কয়েকজন ইসলামী আন্দোলনকারী সাথিদের সবেমাত্র যুদ্ধ প্রান্তরে হারিয়ে এসেছেন। সেই ব্যাথাকে আরো বড় করে তুলল তাঁর প্রিয় কন্যা রুকাইয়ার মৃত্যু সংবাদ। যুদ্ধ বিজয় করে তিনি যখন ফিরছিলেন তখনই তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়। সুখ দু:খের এই মিশ্রণ তাঁকে তাঁর জীবনের ভঙ্গুরতা সম্বন্ধে সজাগ করে দিল। এই আছি এই নেই – এই চরম সত্য তাঁর কাছে নানান ভাবনার উদ্রেক ঘটাল। তাই তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন সুখে দু:খে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার অনুভূতি।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতেও রসূল (সাঃ) ভুলে জাননি তার কতর্ব্যের কথা,

দায়িত্বের কথা। ইসলামের মহান আদর্শের কথা যুগ যুগ ধরে তাই সমানভাবেই আছে বিশ্ব উদারতার ইতিহাসে। মুহাম্মদ (সাঃ) উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলেন মুসলিমদের যাতে করে সার্বিকভাবে যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয়। মুসলিমরা তাই করেছিলেন নজীরবিহীনভাবে। তারা নিজেরা খেয়েছিলেন শুকনো খেজুর। কিন্তু বন্দীদের দিয়েছিলেন আরবের সমৃদ্ধশালী খাবার দুধ ও রুটি। তারা নিজেরা পায়ে হেঁটে পথ অতিক্রম করেছিলেন কিন্তু বন্দীদের চড়িয়ে এনেছিলেন উটের পিঠে করে।

বন্দীরা যখন মদিনায় এলেন তাদের আত্মীয় স্বজনেরা ছুটে এল তাদের কাছে। তাদের কাছে যারা ঋণী ছিলেন তারা তখুনিই তাদের ঋণ শোধ করে দিলেন। তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল ক্ষুদ্র কিছু শর্তে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ বড় নজীরবিহীন ঘটনা! উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার মত কোন কিছু ছিল না, তারা লেখাপড়া মুসলিমদের দশজন বাচ্চাকে লেখাপড়া শেখানোর শর্তে মুক্তি পেল। একাধিকবার মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। জ্ঞান মানে পড়া, জানা, লেখা ও মানুষকে দক্ষতা সরবরাহ করে থাকে। যা তার মর্যাদাকে সমুন্নত করবে। বন্দীদের লেখাপড়ার জ্ঞানটি তাদের সম্পদ হিসাবে কাজ করেছিল। যা তাদের মুক্তি এনে দিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। এইভাবে ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হয়েছিল তেমনিভাবে শিক্ষা যেখান থেকে পাওয়া যায় তা গ্রহণ করতে হবে, তাও আমরা জানতে পারি।

হৃদয়ের আহ্বান

এক সময় মুহাম্মদ (সাঃ) আবু লুবাবাহ নামে এক সাহাবীকে খুব উচ্চসম্মানী ভাবতেন। যাকে মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনার দেখাশোনার চার্জ দান করেছিলেন। যখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক সময় এক অনাথ বালক আবু লুবাবাহর বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল আবু লুবাবাহ তার কাছ থেকে একটি বড় খেজুর গাছ অনধিকারে দখল করে নিয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) ঘটনার তদন্ত চালালেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে আবু লুবাবাই ছিলেন ওই খেজুর গাছের মালিক। তাই তিনি তার পক্ষেই রায় দিলেন। কিন্তু তিনি ওই অনাথ বালকটির প্রতি অত্যাধিক স্নেহশীল ছিলেন। তাই তিনি আবু লুবাবাহকে ব্যক্তিগতভাবে নিভৃতে অনুরোধ করলেন তিনি যেন ওই গাছটি বালকটিকে ফিরিয়ে দেন কিন্তু আবু লুবাবাহ (রাঃ) তা অস্বীকার করলেন। এ ক্ষেত্রে রসূল (সাঃ) এর বিচার ছিল সঠিক। কিন্তু হৃদয়ের ব্যাথা ছিল অন্য জায়গায়। তিনি অনুভব করেছিলেন ক্ষমাগুণ এক জিনিস আর অধিকার অন্য জিনিস। ক্ষমাগুণ মানুষ চাহিদার চেয়েও বেশি দিতে চায়।

"আল্লাহ সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন।"
(কুরআন - ১৬ ঃ ৯০)

এ ঘটনা আমাদের এটাই বলতে চায়- একজনের অধিকার কখনই নষ্ট করা যায় না। কিন্তু তাই বলে হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেখানে থাকে সেদিকেও নজর দেওয়া একান্ত দরকার। মানুষের হৃদয়তো মানবিকতা ও ভালবাসা দ্বারা দৃঢ় হওয়া উচিত।

আবু লুবাবা রসূলের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পেয়েছিলেন, কিন্তু রসূল তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে যে অনুরোধ করেছিলেন তিনি তা মেনে নেননি। তাই স্বাভাবিকভাবে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। আবু লুবাবার কাছে এরূপ প্রতিক্রিয়া রসূল (সাঃ) কামনা করেননি। তাই তিনি এটা ভেবে নিয়েছিলেন যে লুবাবাহ তার অধিকার পাওয়ার জন্য অন্ধ ছিল।

এই ঘটনার সমস্ত কিছু লক্ষ্য করে সাবীত (রাঃ) নামে অন্য এক সাহাবী আবু লুবাবাহকে ওই গাছের পরিবর্তে গোটা একটা বাগান দিতে চাইলেন এবং তিনি ওটা ওই অনাথ বালককে দিয়ে দিলেন। রসূল (সাঃ) আনন্দে ফেটে পড়লেন এ ঘটনায়। কিন্তু তিনি আবু লুবাবাহর প্রতি কোন কঠোর মন্তব্য করলেন না বা তাকে অপছন্দ করলেন না। এমনকি এ ঘটনায় রসূল (সাঃ) তার উপর থেকে পূর্বের উচ্চ ধারণাও তুলে নেননি। পরবর্তীতে তিনি ইসলামী আন্দোলনের অনেক কাজে আবু লুবাবাহকে নিযুক্ত করেছিলেন। ইহুদী গোষ্ঠী বনু কুরাইজার সাথে তিনি চুক্তিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে তিনি তাদের সাথে এমন কিছু গোপনীয় তথ্য অনিচ্ছাকৃত বলে ফেলেছিলেন যা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। পরে তিনি তার এই ভুল নিজেই বুঝতে পেরে চরমভাবে লজ্জা পেয়েছিলেন। নিজের এই ভুল শুধরানোর জন্য তিনি মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে ছয় দিন নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। আর এটাই আশা করেছিলেন যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) একদিন না একদিন তাকে ক্ষমা করবেন।

একদিন সকালে উম্মে সালমার গৃহে রসূল (সাঃ) অবস্থানকালে হাসিমুখে জেগে উঠলেন। উম্মে সালমা এটা অবলোকন করে বললেন "আল্লাহ তোমাকে সব সময় হাসি মুখে রাখুন। কিন্তু আপনি হাসলেন কেন ?" রসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন "আবু লুবাবাহর অনুতাপ গৃহীত হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে এ সংবাদ প্রদান করতে পার।"

উম্মে সালমা (রাঃ) তার ঘর থেকে উঁকি মেরে বললেন "আবু লুবাবাহ তোমাকে অভ্যর্থনা, তোমার অনুতাপ গৃহীত হয়েছে।"

তার এ কথা কানাকানি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মদিনার অলিতে গলিতে। আবু লুবাবাকে সবাই অর্ভথনা জানাতে ভীড় জমালো মসজিদে। রসূল (সাঃ) নিজেই মসজিদে এসে তার বাঁধন খুলে দিলেন।

II

উদারতা ও ভালবাসা

দৈনন্দিন জীবনে রসূল (সাঃ) ছিলেন খুবই ব্যস্ত মানুষ। অলসভাবে সময় কাটানো মোটেই তিনি পছন্দ করতেন না। পরিবারিক খুঁটিনাটি কাজও তিনি নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তা বলে নিজের দায়িত্ব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি কোন সময় ভুলে যেতেন না। তাঁর আশেপাশের সমস্ত মানুষের কথা সব সময় তিনি ভাবতেন। তাদের আশা আকাঙ্খা তিনি সব সময় পূরণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর স্ত্রীরা এবং সাহাবীরা দেখতেন তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা রাত্রিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। যেন মহান প্রভুর সাথে তিনি ফিসফিস করে অভাব অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছেন। হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্খা সব কিছু সমর্পন করছেন একমাত্র প্রভু আল্লাহর কাছে। একদিন আয়েশা (রাঃ) তাঁর এই নামাজে দন্ডায়মান অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আপনি কেন এত ইবাদত করে থাকেন। ইতিমধ্যে আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের পাপরাশিতো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? এতে আল্লাহর রসূল (সাঃ) উত্তর করলেন "আল্লাহর বান্দা হওয়া থেকে আমি কি করে দূরে থাকতে পারি?" নবী (সাঃ) যে ধরনের নামাজ রোজা নিজে করে থাকতেন ততটা তাঁর সঙ্গীসাথিরা করুক তা দাবী করতেন না। অপর পক্ষে ইবাদত যাতে কারোর জীবনে বোঝা হয়ে না যায় তার জন্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর কাছে ইবাদত বাস্তবকে ছাড়িয়ে নয়। বরং দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবতার ব্যস্ততার মধ্য থেকে আল্লাহকে স্মরণ করাই হল প্রকৃত ইবাদত। এক সময় কতিপয় সাথি তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকলেন রাত্রিতে দীর্ঘ নামাজ পড়ার জন্য এবং দিনেও টানা কয়েকদিন রোজা রেখে কাটানোর মনস্থ করলেন। রসূল (সাঃ) তাদের এ ধরনের ইবাদতের কথা শুনলেন, তখন তিনি তাদের ডেকে বললেন,

> "ও রকমটি করো না, কিছু দিন রোজা রাখ এবং অন্যান্য দিন খাওয়া দাওয়া কর। রাতের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে নামাজ পড় আবার

> অন্য অংশে ঘুমিয়ে কাটাও। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরেরও চাহিদা আছে। তোমার উপর তোমার চোখেরও কর্তব্য আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও অধিকার আছে। অধিকার আছে তোমার অতিথিরও।"

এক সময় তিনি তিনবার বললেন "উদার হও! উদার হও! উদার হও! উদারতা তোমাকে সফল করবে" নবী (সাঃ) তাঁর ভক্তদের মনের মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের উথাল পাতাল অবস্থা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। তাদের সেই বৈষম্যসদৃশ মনের অবস্থাকে উপশম দেওয়ার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা করতেন। এই রকম অবস্থাতে মানুষের যে হতাশায় হারিয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই তা তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এক সময় সাহাবী হানাজালা রাঃ আবু বকর (রাঃ) এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং নিজের মনের গভীরে যে কপটতা আছে তা খুলে বললেন। কারণ তিনি নিজের হৃদয়ের মধ্যে দ্বিচারিতার যেন আভাস পাচ্ছিলেন। রসূলের সামনে যখন থাকতেন তখন জান্নাত ও জাহান্নামের বাসস্থানকে তিনি যেন স্বচক্ষে দেখতে পেতেন কিন্তু যখন তিনি বাড়িতে ফিরে যেতেন তখন সাংসারিক কাজকর্ম, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাইয়ের মায়ায় পড়ে সব কিছু যেন ভুলে যেতেন। আবু বকর (রাঃ) এ কথা শুনলেন এবং তিনিও স্বীকার করলেন যে একই উদ্বিগ্নতায় তিনিও ভুগছেন। হানজালা (রাঃ)-র মত তিনিও রসূলের কাছে থেকে এক রকম অনুভব করেন অপরপক্ষে বাড়িতে যখন ফিরে যান তখন অন্যরকম হয়ে যান। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের উভয়েরই কথা রসূল (সাঃ) শুনলেন এবং উত্তর দিলেন এইভাবে,

"যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, যখন তোমরা আমার সামনে থাকো যদি তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর উপস্থিতি তোমাদের মনে জাগরুক থাকে তবে সেটাই যথেষ্ট। তাহলেই ফেরেশতা তোমাদের হাতে হাত মেলায়। হানজালা ! ইবাদত-বন্দেগী যেমন সময় আছে, বিশ্রামের জন্যও সময় আছে।"

নবী (সাঃ) এর কথা দ্বারা এটা বোঝা গেল মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে এরকম যে টালমাটাল অবস্থা হানাজালা ও আবুবকর (রাঃ) এর জীবনে ঘটেছিল তা অতি স্বাভাবিক। তা থেকে বেঁচে থাকা যায় না । এটা মানুষের প্রকৃতি। মানুষ কখনও স্মরণ করতে পারে। আবার কখনও ভুলে যায়। কারণ মানুষের জীবন কোন ফেরেশতার জীবন নয়।

অন্য এক পরিস্থিতি বিচার করে দেখলে অবাক হতে হয়। তিনি তাঁর সাথিদের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তারা পারিবারিক ব্যক্তিগত কাজের মধ্যেও পূণ্য আছে তা যেন ভাবতে পারছিলেন না। অথচ তারা শুনেছিলেন ভাল কিছু করা সাদকা (দান)।

খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকাও সাদকা (দান)। এমনকি স্ত্রী-র সাথে সহবাসের কাজেও। একথা শোনার পর সাহাবাদের বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা প্রশ্ন করল,

"হে রসূল (সাঃ), কেউ যদি যৌন সম্ভোগে তৃপ্তি পায় তাহলে সে কি প্রতিদান পাবে ? মুহাম্মাদ (সাঃ) উত্তর দিলেন - আমাকে বল, যখন একজন অবৈধ যৌন সম্ভোগ করতো তার কি পাপ হতনা ? সে জন্য বৈধ সম্ভোগে প্রতিদান তো আছেই।"

তিনি এ ভাবেই মানুষকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং মানুষের মানবিকতার শিক্ষা দিতেন। তিনি কোন দিন বাস্তব মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করেননি। সবকিছুর মধ্যে আত্মসংযমই হল পুণ্যের উৎস। আধ্যাত্মিকতা মানে নিজের প্রবৃত্তিকে বৈধভাবে গ্রহণ করা এবং তাকে সংযত করা। নৈতিকতার ছাঁচে ফেলা কোন আশা আকাঙ্খা মূলত ইবাদত বিশেষ। এটাকে কোন সময় কপটতা বা অপকর্ম বলা যাবে না।

রসূল (সাঃ) সব সময় তাঁর সাথীদের আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী থাকার পরামর্শ দিতেন। কারণ আল্লাহ হলেন অসীম দয়ালু। তিনি সব মানুষকে সব সময় ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য উদার। তাঁর দয়া থেকে কেউ তো বঞ্চিত হতে পারে না। হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে পরম প্রভুর কাছে হাত তুললে তিনি তাঁর দাসের কথা শোনেন, তাদের ক্ষমা করে দেন। আর মানুষ তার পাশের মন্দ শ্রেণির সূক্ষ্ম অনুভূতি যখন তাকে পীড়া দেয় তখনই সে ক্ষমা চাইতে যায়। এই হল 'তওবা'-র অন্তর্নিহিত অর্থ। গভীর অনুতাপ নিয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসাই হল তওবা। আর এই তওবাকারীকে আল্লাহ বড়ই ভালবাসেন। মানুষের চলার পথ বড়ই পিচ্ছিল। এ পথে চলতে চলতে পিছলে পড়া বড়ই সহজ। তাই পিছলে পড়লেও ফিরে আসতে হবে প্রভুর কাছে। রসূল (সাঃ) সাহাবাদের সব সময় উদার ও ক্ষমাশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। কোন মানুষের মধ্যে কোন দোষ থাকলে তা গোপন করে বরং তার ভাল গুণটিকে দেখে তার প্রশংসা করা উচিত। কোন সময় লোকের দোষ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা উচিত নয়।

আহলে সুফ্ফা

বেশ কিছু সংখ্যাক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে বাড়ি ঘর আত্মীয়-স্বজন, সহায় সম্বল সব কিছু হারিয়েছিলেন। এমন কি তাদের দু মুঠো অন্নও প্রায় জুটত না। তারা সারাক্ষণ মসজিদে অবস্থান করেই দিন কাটাত। তারা অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ার কারণে তাদের জীবন জীবিকা অন্যান্য মুসলমিদের দয়ার উপর নির্ভর করত। অন্যান্য মুসলমিরা কখনও এককভাবে কখনও বা পালাক্রমে তাদের বাঁচার রসদ যোগান দিত। ক্রমশ তাদের সংখ্যাটা দিন দিন করে বেড়ে যাচ্ছিল। এই সকল ব্যক্তিবর্গকে লোকেরা আহলে সুফ্ফা বলে অভিহিত করত। নবী (সাঃ) এই সকল লোকেদের ব্যাপারে খুবই

সজাগ ছিলেন। তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর তিনি সব সময় নিতেন এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতার হাত সব সময় বাড়িয়ে দিতেন। তিনি তাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন এবং তার সমাধান করার ব্যবস্থা নিতেন। তারা অনেক সময় রসূলের কাছে আধ্যাত্মিকতা, অদৃশ্য জগৎ ইত্যাদি বিষয়ে নানান প্রশ্ন করতেন। একই প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আসলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উত্তর দিতেন। এতে তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেন। তিনি প্রশ্নকারীর অভিজ্ঞতা দক্ষতা পরিস্থিতি নানান বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন।

রসূল (সাঃ) এর জীবন খুব অভাবেই কাটত বলা যেতে পারে। অনেক সময় তাঁর বাড়িতে খাবার বলতে শুধু কয়েকটি শুকনো খেজুর ছাড়া অন্য কিছু থাকত না। তা সত্ত্বেও তিনি আহলে সুফ্ফাদের খোঁজ খবর নিতেন সার্বিকভাবে। শুধু তারা নন যে কেউ তাঁর কাছে সাহায্য পেতেন। তিনি তাঁর জীবনকে খুব স্বাভাবিক সরলতায় চালাতেন এবং তাঁর কাছে যারা আসতেন তারাও তার কাছে উদারতার শিক্ষা পেতেন। তার নিজের বলতে কিছু না থাকলেও তিনি দাসদাসী, গরীব, শিশু, নারী সবাইকে সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। তিনি তাদেরই মধ্যে বাস করতে ভালবাসতেন। মনে হত তিনি তাদেরই একজন।

নবীকন্যা ফাতিমা (রাঃ)

নবী (সাঃ) এর প্রিয়তম কন্যা ছিলেন ফাতিমা (রাঃ)। তিনি খাদিজার গর্ভের সন্তান। নবী (সাঃ) তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হজরত আলি (রাঃ) এর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনি সব সময় পিতার বাসস্থানের আশেপাশে থাকতেন এবং আহলে সুফ্ফাদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। নবী (সাঃ) এর তিনটি সন্তান নাবালক অবস্থায় মারা যায়। কনিষ্ঠ কন্যা হিসাবে তিনি ফাতিমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যখনই নবী (সাঃ) কোন ভ্রমণ থেকে ফিরতেন তখনই তিনি কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে তিনি প্রথমে মসজিদে যেতেন সেখান থেকে নামাজ সেরে ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তার মাথায় ও হাতে স্নেহের চুম্বন দিতেন। উমায়র পুত্র জুমাই এক সময় আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রসূল (সাঃ) কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ফাতিমাকে রসূল (সাঃ) সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। রসূল (সাঃ) এক সময় বলেছিলেন 'ফাতিমা আমার টুকরো', যে তাকে বিরক্ত করে সে মূলত আমাকেই বিরক্ত করে।

নবী (সাঃ) ঘরে কিংবা প্রকাশ্যে কোন স্থানে থাকলে যদি ফাতিমা (রাঃ) তার সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন তিনি দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং অভিবাদন জানাতেন। এর

দ্বারা তিনি তাকে যেমন সম্মান জানাতেন তেমনি স্নেহাশীষ জানাতেন হৃদয় দিয়ে। কন্যার প্রতি একরকম অসাধারণ আচরণ দেখে মক্কা মদিনার উভয় স্থানের লোকেরা অবাক হয়ে যেতেন। সচরাচর তাদের সমাজে এধরনের অভিবাদন, ভালবাসা ও স্নেহাশীষ কন্যাদের প্রদান করা হত না।

নবী (সাঃ) কন্যা ফাতিমাকে স্নেহের চুমু দিতেন। পাশে বসাতেন, তার সঙ্গে ভালমন্দ আলোচনা করতেন। এ ধরনের আচরণে কেউ কোন সমালোচনাও করতেন না। কন্যাস্নেহের এ বড় নজীরবিহীন উদাহরণ। একদিন তিনি তার নাতি হাসান (রাঃ)কে চুমু খেলেন তা দেখে পাশে বসে থাকা এক বেদুইন বলে ফেললেন "আমার দশটি সন্তান আমি তাদের কাউকে কোন চুমু খাইনি।" রসূল (সাঃ) এর প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যে স্নেহশীল নয়', আল্লাহও তার প্রতি স্নেহশীল নন।" এইরকম উদাহরণ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে নবী (সাঃ) মানুষকে এই শিক্ষাই দিতেন যাতে করে তারা দয়াদ্র, ভদ্র, নম্র ও উদার হয় নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতি। তাছাড়া নারী জাতির প্রতিও আলাদা সম্মান প্রদর্শন করা দরকার। একসময় তিনি বলেছিলেন "আমাকে কেবলমাত্র পাঠানো হয়েছে নম্র আচরণ করার জন্য"।

পিতার এ শিক্ষা ফাতিমা (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। তিনিও মানুষের প্রতি ছিলেন অতি নম্র স্বভাবের। তিনি এ আদর্শকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়ে গেছেন জগতের কাছে। গরীব, দুঃখী, অনাথ, অসহায় যে কেউ তার কাছে যেতেন তিনি তাদেরকে উদারতার স্পর্শে শীতলতা দান করতেন।

একদিন ফাতিমা (রাঃ) তার স্বামী আলি (রাঃ)-র কাছে সাংসারিক কিছু অভিযোগের কথা নিয়ে হাজির হলেন। সব শোনার পর আলি (রাঃ) রসূল (সাঃ)-র কাছে ব্যাপারটা পেশ করতে বললেন। কারণ আলিও রসূল (সাঃ) এর মত সহায় সম্বলহীন একজন ব্যক্তি ছিলেন। ফাতিমা রসূল (সাঃ) এর কাছে গেলেন সাংসারিক দুরাবস্থা জানানোর জন্য। কিন্তু তিনি তা পেশ করতে পারলেন না। কারণ তিনি তার পিতাকে খুবই সম্মান করতেন। তিনি ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। খালি হাতে এ অবস্থা দেখে আলি (রাঃ) নিজেই তাকে নিয়ে রসূল (সাঃ) এর কাছে পুনরায় যাবেন বলে স্থির করলেন। রসূলের কানে এ কথা পৌঁছাল, তিনি তখনই খবর পাঠালেন যে তিনি তাদের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। কারণ আহলে সুফফাদের চেয়ে তাদের অবস্থা তুলনামূলক ভাল। আহলে সুফফাদেরই জরুরী সাহায্যের দরকার। তাদের এ ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত। এ কথা শুনে তারা হতাশ হয়ে গেলেন। নিজের কন্যার দুরাবস্থার চেয়ে আহলে সুফফাদের দুরাবস্থা তাঁর কাছে বড় হয়ে বিবেচিত হল। রসূল (সাঃ) এর কাছে কোনরূপ বংশ পরিচয়ের দোহাই দিয়ে কোন সুবিধা পাওয়া যেতনা এটা তার বড় উদাহরণ। তিনি ইচ্ছা করলে প্রিয় কন্যা ফাতিমাকে কিছু

দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে তাকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নবী (সাঃ) আলি (রাঃ)-র গৃহে এলেন। তারা উঠে গেলেন রসূলকে অভিবাদন করতে। কিন্তু রসূল সোজা সুজি তাদের শয্যা পাশে এসে বললেন "আমি কি তোমাদেরকে তোমরা যা চেয়েছিল তার চেয়ে উন্নত জিনিসের কথা বলব? তারা উভয়েই এই প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতই ছিল। রসূল (সাঃ) বললেন, ওগুলো ওই শব্দ যা আমাকে জীব্রিল আঃ শিখিয়েছিলেন। তোমাদের উচিত নামাজান্তে তা দশবার করে পাঠ করা। বাক্যগুলো হল, "পবিত্রতা আল্লাহর জন্য, সব প্রশংসা আল্লাহর, তিনি সবচেয়ে বড়।" তিনি আরোও বললেন ঘুমানোর আগে তোমাদের এ বাক্যগুলো তেত্রিশ বার করে পাঠ করা উচিত। যুগ যুগ ধরে রসূলের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা আমাদের কাছে চলে আসছে। সমস্ত মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ মহান আমলে নিয়মিত অভ্যস্থ হয়েছেন। ফাতিমা ও আলি (রাঃ) উভয়েই ছিলেন ভালবাসা, উদারতা ও ভদ্রতার মূর্ত প্রতীক। তারা বাস করতেন রসূলের আধ্যাত্মিক ছত্রছায়ায়। তারা রসূলের কাছ থেকে এ চরম শিক্ষা পেয়েছিলেন যে যা কিছু পাওয়া যায় তাতো কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। অতএব নিজেদের উজাড় করে পরের সুখে দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

আগেই বলা হয়েছে রসূল (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাতিমাকে বড়ই ভালবাসতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে রসূল (সাঃ) নিজ কন্যা ফাতিমা (রাঃ)কে বললেন,

"ফাতিমা তুমি রসূলকন্যা হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের বিশেষ স্থানে তোমার স্থান হবে না। কেবল তোমার কাজই তোমাকে ওই বিশেষ স্থান দিতে পারে।"

এর দ্বারা রসূল (সাঃ) সমস্ত মানব সমাজকে এটা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে রসূলের বংশ সূত্রও কারোর কোন কাজে লাগবে না। কিয়ামতের দিন যদি তার সৎকর্ম গচ্ছিত না থাকে। কোন মানুষের বংশ সূত্র যত উন্নত হোক না কেন তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। তিনি কেবল দেখবেন আমাদের আমল বা সৎকাজসমূহ। বংশ গোত্র পরিবারের মর্যাদা বা বড়াই দেখিয়ে কেউই রেহাই পেতে পারে না সেই মহাসংকটের দিনে। প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়ী থাকবেন কেবল নিজ কাজের ভিত্তিতে।

বেশ কয়েক বছর পর রসূল (সাঃ) মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত। ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে আকুল, কারণ রসূল (সাঃ) তার কানে কানে বলেছিলেন আল্লাহ তাঁকে ডেকে নিতে যাচ্ছেন, এখন তার এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময়। সত্যিই তো এরকম শ্রদ্ধেয় পিতা তাকে ছেড়ে চলে যাবেন এটাতো কম বেদনার কথা নয়! একটু পর রসূল (সাঃ) তাঁর কানে কানে বললেন- তিনিই তাঁর পরিবারের প্রথম যিনি রসূলের সাথে আগে সাক্ষাত করবেন। আর এ খবর যখন তিনি রসূলের কাছ থেকে শুনলেন তখন তার

হৃদয়ে পুলক উদ্ভাসিত হল। তিনি নিজেকে আনন্দের সাগরে না ভাসিয়ে পারলেন না। তাই তো স্বাভাবিক কারণে হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখমন্ডলে।

আদর্শ স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ) এর স্ত্রী, আবু বকর (রাঃ)-র কন্যা। নবী (সাঃ) এর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তিত্ব। যিনি নবী (সাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী করে দেখেছিলেন। সবচেয়ে বেশী করে চিনেছিলেন। সত্যি কথা বলতে আয়েশা (রাঃ) হলেন নবী (সাঃ) এর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সবচেয়ে বড় সাক্ষী। ভবিষ্যতে আমরা যদি আয়েশা (রাঃ)-র বর্ণনা না পেতাম তা হলে নবী (সাঃ) এর জীবন চরিতের অনেক কথাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। আমরা ইসলামী আন্দোলনের অনেক ইতিহাস হারিয়ে ফেলতাম। একজন স্ত্রী-র প্রতি স্বামীর আচার-আচরণ ও ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা তিনি জেনেছিলেন নবীর কাছ থেকে। নবী (সাঃ) তার স্ত্রী আয়েশার আশা আকাঙ্খা কিভাবে পূরণ করেছেন তিনি তা সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। একেবারে তিনি যখন শৈশবে ছিলেন নবী (সাঃ) তার সেই সময়ের প্রতি অতি গুরুত্বদান করেছেন। নবী (সাঃ)-র গৃহে এসে তিনি নানান খেলার সামগ্রী পেয়েছিলেন। একথা একেবারে ভাবা যায় না। কিন্তু খেলধূলা জীবনের একটি অংশ। নবী (সাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে যেমন খেলতে দিতেন তিনি নিজেও অনেক সময় তাতে অংশ নিতেন। এইভাবে তিনি আয়েশা (রাঃ)কে সন্তুষ্ট করতেন। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এক সময় আবিসিনিয়া থেকে একদল প্রতিনিধি এসেছিলেন নবী (সাঃ) এর কাছে। তারা নানাবিধ খেলা ধূলায় পারদর্শী ছিলেন, এমনকি অনেক ঐতিহ্যশীল শারীরিক কসরতও তারা জানতো। তারা তাদের ক্রীড়া প্রদর্শনী নবী (সাঃ) এর উঠানেই দেখাচ্ছিল। নবী (সাঃ) সেই সময় দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন। আর কাঁধের পেছন থেকে আয়েশা (রাঃ)ও এই ক্রীড়া প্রদর্শনী উপভোগ করছিলেন সমানভাবে।

অনেকবারই প্রাসঙ্গিকক্রমে আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ) তার প্রতি কতটা আন্তরিক স্নেহশীল ছিলেন তা বর্ণনা করেছেন খুবই হৃদয় দিয়ে এবং পারিবারিক নানান কাজে রসূল (সাঃ) যে তাকে কতটা স্বাধীনতা দান করতেন তাও তিনি বর্ণনা করেছেন খুবই যত্ন সহকারে। এর দ্বারা সহজেই বোঝা যায় নবী (সাঃ) ছিলেন স্ত্রীদের প্রতি অতি কর্তব্যপরায়ণ এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। নারী জাতির প্রতি নবী (সাঃ) এর স্বশ্রদ্ধ সম্মান চিত্রও আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ব্যাপারে নবী (সাঃ) যেমন উদার ছিলেন স্ত্রীদের প্রতি তেমনি সামাজিক জীবনেও স্ত্রীদের দিয়েছিলেন বৈধ সব স্বাধীনতা।

মূলত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্ত্রী। তিনি মদিনার সমস্ত মহিলাদের কাছে একটি মডেল হয়েছিলেন। স্বামীদেরও কি রকম হওয়া উচিত তা তিনি জানিয়েছিলেন তাদের। কারণ রসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে তিনি যে সকল আদর্শের ছটা পেয়েছিলেন তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মহিলাদের মধ্যে। আর তা সামাজিক ও দৈনন্দিন উভয় জীবনেই।

সামাজিক জীবনে স্ত্রী তথা নারীদের ভূমিকা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব সমাজের মধ্যে চর্চিত হওয়ার জন্য নানান উদাহরণ পেশ করেছেন। নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে নবী (সাঃ) এর এ আদর্শ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। এক সময় এক বেদুইন নবী (সাঃ)-কে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। নবী (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে আয়েশা (রাঃ)-রও আমন্ত্রণ আছে কি-না জানতে চাইলেন। বেদুইনটি তাতে অসম্মতি জানালেন। বেদুইনের এই অসম্মতিতে রসূলও তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। কিছুদিন পর বেদুইনটি পুনরায় রসূলের কাছে এলেন এবং তাঁকে বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। রসূল (সাঃ) একইভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন স্ত্রী আয়েশার নিমন্ত্রণ আছে কি-না। বেদুইনটি অসম্মতি জানিয়ে বললেন 'না' কেবলমাত্র তাঁর একারই আমন্ত্রণ। রসূল (সাঃ) একথা শুনে তাকে ফিরিয়ে দিলেন তার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে। তৃতীয়বার বেদুইন লোকটি পুনরায় একদিন এসে রসূল (সাঃ) কে একইভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। রসূল (সাঃ)ও একইভাবে জানতে চাইলেন তার সাথে আয়েশা রাঃ-রও আমন্ত্রণ আছে কিনা। বেদুইনটি এবারে জানালেন যে উভয়েই আমন্ত্রিত। একথা শুনে নবী (সাঃ) অত্যাধিক আনন্দিত হলেন এবং সাদরে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। মূলত এই উদাহরণ পেশ করে নবী (সাঃ) সারা আরব উপদ্বীপে চলতি প্রথাকে আঘাত না করে বরং এটার সংস্কার করেছেন। বেদুইন সহ সমস্ত আরববাসীও এটাকে মেনে নিতে কোনপ্রকার দ্বিধা করেননি। আয়েশা (রাঃ), খাদিজা (রাঃ) ও নবী (সাঃ)-র সমস্ত কন্যাসন্তান ছিলেন সমাজের প্রতিটি স্তরে একেবারে সক্রিয় কর্মী। সেই সাথে মুসলিম মহিলারাও তাদের কাছ থেকে এ শিক্ষা পেয়ে সমাজের নানান স্তরে কাজে লেগেছিলেন। এমনকি তা পরিবারিক জীবন ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মিলিটারী বিভাগেও।

নবী (সাঃ) ছিলেন সমাজ গড়ার স্থপতি। তিনি মহিলাদের সার্বিক উন্নতি চেয়েছিলেন। নারীত্বের অজুহাত দেখিয়ে সমাজের নানান স্তর থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়াকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি তাদের প্রতিভা বিকাশের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তারা যাতে সমাজের জটিল পরিস্থিতি অনুভব করতে পারে ও সমাজকে আল্লাহর পছন্দমত সাজাতে পারে তার ব্যবস্থার দায়িত্ব সমস্ত মুসলিমের উপর চাপিয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে যে

শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মদিনার সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে। আর তার সুফলও হয়েছিল সার্বিকভাবে। বেশ কয়েক বছর পরে আয়েশা (রাঃ) একদিন সে সব মহিলাদের স্মরণ করেছিলেন, যারা সম্মুখে প্রশ্ন করার সাহস পেয়েছিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জানার অবকাশ পেয়েছিলেন সাদরে। আয়েশা (রাঃ) যে কতটা উচ্ছসিত হয়েছিলেন তা নিচের ভাষা দ্বারা জানা যায়:

"আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক আনসার মহিলাদের উপর যারা তাদের মিথ্যে শালীনতার দোহাই কাটিয়ে দ্বীন (ইসলাম) সম্বন্ধে জানতে চাইছেন।"

এইভাবে কুরআনের নানান শিক্ষাও আয়েশা (রাঃ) পেয়েছিলেন রসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে। কুরআন যখন অবতীর্ন হত অনেক সময়ই তিনি রসূলের কাছে উপস্থিত ছিলেন। যার ফলে কুরআনের ওই অংশের প্রাসঙ্গিকতা, পারিপার্শ্বিকতা ও গুরুত্ব সব কিছুই আয়েশা (রাঃ) জানতে পারতেন। আর তিনি সেগুলো বর্ণনা করে গেছেন নিখুঁতভাবে। হাদীস শাস্ত্রে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ)-র এই স্মৃতিশক্তি সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রায় দু'হাজারের বেশী হাদীস তার বর্ণনা থেকে আমরা পেয়েছি।

আয়েশা (রাঃ) ও রসূল (সাঃ) এর মধ্যে যে ভালবাসা বর্তমান ছিল তা মূলত এক শক্তিশালী অন্তর্নিহিত শক্তি যা ইসলামী আন্দোলনকে সুদৃঢ় করেছিল। এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে যে বিশ্বাস জেগেছিল তা ছিল পুতঃ ও পবিত্র। আর এই বিশ্বাস ও পবিত্রতা নিয়ে আয়েশা (রাঃ) সমাজের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের শিক্ষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূল (সাঃ) তার প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে একটা আদর্শ বটে। আর এটার সাক্ষী হয়ে রইল রসূল (সাঃ) এর মৃত্যু, যা ঘটেছিল আয়েশা (রাঃ)-র গৃহেই এবং সেখানেই তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

12

বিশ্ব জগতের করুণা রসূল (সাঃ)

কুরআনে আল্লাহর দুটি বিশেষ গুণ তাঁর নামের সাথে জুড়ে রয়েছে একটি হল 'আর-রহমান' অপরটি হল 'আর-রহিম'। এ দুটির অর্থ মূলত: জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, দয়া, করুণা, আশির্বাদ প্রসন্নতা ইত্যাদি শব্দের সাথে। নবী (সাঃ) বলেন,

> *"যখন আল্লাহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করছিলেন তখন সর্বোচ্চ ভাগ্য লিপিতে লিখেছিলেন- আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে।"*

তারপর আল্লাহ বর্ণনা করেন যে তিনি তাঁর দয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন। এক অংশে রেখেছেন শতকরা নিরানব্বই ভাগ অপরভাগে রেখেছেন মাত্র এক ভাগ। আর এই এক ভাগই তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে, এই এক ভাগ দয়া সমস্ত সৃষ্টিজগত পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে থাকে,

> *"হে নবী আমি তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য দয়া স্বরূপ পাঠিয়েছি" (কুরআন ২১ ঃ ১০৭)*

যে ধরনের দয়া আল্লহ তায়ালা রসূল (সাঃ) কে প্রদান করেছিলেন তা কেবল মানব জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি। কুরআন ব্যাখ্যাকারীগণ বলে থাকেন যে এ পৃথিবীতে কুরআনই হল সমস্ত দয়ার উৎসধারা। আর এই কুরআনই মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সমস্ত মানবকূলের প্রতি দয়াশীল করে দিয়েছিল। সর্বপ্রথম কুরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়েই আল্লাহর অনন্ত দয়ার কথা ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বমাঝে। দয়া-ধর্ম মানুষের এক বড় সম্পদ। দয়া ব্যতিরেকে কোন মহৎ কাজ কখনই সম্ভব নয়। বিশ্ব প্রভু আল্লাহর দয়ার ছত্র ছায়ায় তাঁর এ সৃষ্টি জগৎ লালিত পালিত।

পশু পাখির উপর রসূল (সাঃ)-র দয়া

আল্লাহর রসূল (সাঃ) ছিলেন দয়াধর্মের মূর্ত প্রতীক। মানবিক গুণে দয়ার স্থান অনেক উর্দ্ধে- এ কথা তিনি বুঝেছিলেন খুব হৃদয় দিয়ে। আর তার শিক্ষাও ছিল দানশীল হওয়ার জন্য। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা দানশীল হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন–

● একজন সাহাবী এক সময় কয়েকটি পাখির বাচ্চা পেড়ে নিয়ে এসেছিলেন তাদের বাসা থেকে। ছানাদের তুলে আনা হয়েছে বাসা থেকে আর মা পাখিটা অতি দুঃখে কিচির মিচির করে সারা পরিবেশটি যেন তোলপাড় করে তুলেছিল। বাধ্য হয়ে মা পাখিটা ওই সাহাবীকে ঠোকর দিতেও ছাড়লনা। এ দেখে নবী (সাঃ) সাহাবীকে ডাকলেন এবং ওই বাচ্চাটাকে তার বাসায় ফিরিয়ে দিতে বললেন। সেই সঙ্গে রসূল (সাঃ) উপস্থিত সব সাহাবীকে উপদেশ দিয়ে বললেন–

> "এই পাখিটি যেমন তার বাচ্চাকে ভালবাসে তার চেয়েও অধিক তোমাদের প্রভু আল্লাহ ভালবাসেন।"

এখানে পাখিগুলোর দয়া ভালবাসাকে আল্লাহর দয়ার সাথে টেনে আনা হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করে বলেছেন,

> "তোমরা কি দেখতে পাওনা যে আল্লাহর তসবীহ করছে সে সব কিছু যা আকাশ ও যমীনে অবস্থিত রয়েছে -আর সেই পক্ষীকুলও যারা পক্ষ বিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে ? প্রত্যেকেই নিজের নামাজ ও তসবীহ করার নিয়ম জানে । আর যারা এ সব করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়কিবহাল"
> *(কুরআন ২৪ ঃ ৪১)*

● নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিক এই পথনির্দেশ টেনে এনে নিজেকে সমস্ত পশু পাখিদের কল্যাণ কামনায় সচেষ্ট করেছেন। তাঁর দয়া থেকে তাই পশু পাখি কেউই বঞ্চিত হয়নি। তিনি তার সাহাবীদের প্রতিটি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছিলেন। নবী (সাঃ) থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে বিনা প্রয়োজনে পাখি মারা যাবেনা । তিনি বলেন,

"যে কেউ বিনা কারণে কোন পাখি শিকার করবে, কিয়ামতের দিন ওই পাখি বলবে ওগো আল্লাহ! এই ব্যক্তিটি আমাকে খেলাচ্ছলে মেরেছিল কোন রকম কারণ ছিলনা।"

নবী (সাঃ) এর জীবনের অনেক ঘটনা থেকে জানা যায় যে তিনি পশু পাখিদের

উপর কতটা সদয় ছিলেন । তিনি সব সময় তাঁর সাহাবীদের পশু পাখিদের উপর করুণা আরোপের কথা বলতেন। এমনকি অনেক পশু পাখির আচরণের মতও নিজেদের আচরণ তৈরী করতে বলেছিলেন। নিচের বাণীটি এখানে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কিছু কিছু মানুষের হৃদয় পাখির মত, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

● এখানে পাখির হৃদয় মানে নম্র ও উদার হৃদয়ের মানুষের কথাই বলা হয়েছে। কোন প্রাণীকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে আল্লাহর রসূল (সাঃ) কঠোরভাবেই নিষেধ করেছেন। এক সময় তিনি একটি পিঁপড়ের বাসা অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন যেটি আগুনে পুড়ছিল। তিনি তখন জানতে চাইলেন যে কে ঐখানে আগুন লাগিয়েছে। তখন তাঁকে জানানো হল যে অমুক অমুক ব্যক্তি এ কাজটি করেছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন কেবল মাত্র আল্লাহরই তাঁর সৃষ্টি জীবকে পুড়িয়ে মারার অধিকার অছে। এইভাবে তিনি তাঁর শিষ্যদের পশুপাখিদের প্রতি উদার ও সদয় হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

● আরব দেশের উট খুব পরিচিত প্রাণী, আকারে বড়সড়ও। আরব বেদুইন তথা মক্কা মদিনার অধিবাসীদের জীবন যাত্রায় উটের প্রভাব খুবই। এই উট প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত- *"ওরা কি চিন্তা ভাবনা করে না উটের ব্যাপারে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"*

নবী (সাঃ) একদিন এক উটের পাশ থেকে অতিক্রম করছিলেন যেটা বাঁধা ছিল এবং ক্ষুদায় তার পেট ও পিঠ এক হয়ে যওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি তখনই ওর মালিকদের ডেকে বললেন ,

"অবলা এই প্রাণীদের প্রতি সচেতন হও। যদি তাদের আরোহণের জন্য ব্যবহার কর তাহলে যখন তারা স্বাস্থ্যবান হবে তখন তাদের উপর আরোহণ কর। যখন তোমরা এদের নিয়ে সুজলা সুফলা মাঠ অতিক্রম করবে তখন এদের ওই মাঠ থেকে খাবার সুযোগ দেবে এবং যখন অনুর্বর এলাকা থেকে অতিক্রম করবে তখন দ্রুত তা পার হবে।"

● প্রাণীদের প্রতি রসূলের এই ভালবাসা সারাটা জীবন ধরে দেখা গেছে। কোন সময় তিনি এ দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাননি। মক্কা বিজয়ের সময় যখন মুসলিম সৈন্য বাহিনী মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পথের পাশের একটি কুকুরের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও রসূল (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন। কুকুরটি তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল। রসূল (সাঃ) এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সাথের সৈন্য সুরাগা পুত্র জুহাইলকে এখানে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন। যাতে করে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী অতিক্রমকালে কুকুর বাচ্চাদের দুধ পান করাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়। এ ঘটনা দ্বারা এটাই

প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সাঃ) কেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন অবলা প্রাণীদের প্রতি। মিলিটারি মার্চ-এর পথে একটা কুকুরের জন্য এ রকম বিরতি আমরা মনে করতে পারি না। কিন্তু রসূল (সাঃ) যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা তিনি এটাকে কিছুতেই তুচ্ছ ভাবতে পারেন না। তাঁর এই মহান শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে থাকবে।

নবী (সাঃ) তাঁর এক সাহাবীকে প্রাণীদের প্রতি সদয় হওয়া প্রসঙ্গে একটি গল্প বলেছিলেন।

● *"একজন ব্যক্তি উত্তপ্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। এই সময় তিনি নিজের তেষ্টা নিবারণের জন্য একটি কূপের নিকট পৌঁছলেন এবং কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করলেন। তারপর কূপ থেকে উঠে তিনি দেখতে পেলেন যে একটি কুকুর কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। লোকটি মনে মনে এটাই ভাবলেন যে, নিজে যেমন তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছিল তেমনি এই কুকুরটাও তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে। লোকটি পুনরায় কূপের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং মোজায় করে পানি ভরে তা দাঁতে কামড়ে ধরে কূপের বাইরে তুলে আনলেন। অবশেষে ওই পানি দিয়ে কুকুরের তেষ্টা নিবারণ করলেন লোকটি। এতে আল্লাহ খুশি হয়ে তার প্রতিদান দিলেন এবং ক্ষমা করলেন।"*

এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল প্রাণীদের প্রতি সদয় হলে কি কোন প্রতিদান পাওয়া যায়? রসূল (সাঃ) উত্তরে বললেন, "জীবের প্রতি কোন ভাল কাজই প্রতিদান এনে দেয়।"

● অন্য এক প্রসঙ্গে নবী (সাঃ) বলেন, "একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বিড়ালটাকে সে আমৃত্যু বেঁধে রেখেছিল। এই বিড়ালের জন্য তাকে নরকে দেওয়া হল। সে বিড়ালটিকে অধিকাংশ সময়ে খেতেও দেয়নি এবং পানি পান করতে দেয়নি। বাঁধা থাকায় বিড়ালটি শিকার ধরতেও পারেনি।"

এই কাহিনী বর্ণনা করে রসূল (সাঃ) যে জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল প্রাণীর সেবা করা এক মহৎ কাজ। এবং তাদের পীড়া দেওয়া এক বড় ধরনের পাপ বয়ে আনতে পারে। ইসলামী শিক্ষায় প্রাণী জগতের উপর করুণা বর্ষণ করা আমাদের গুরু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

নবী (সাঃ) আমাদের সাবধান করে বলেছেন,

● *"যে কেউ একটি চড়ুই কিংবা তার চেয়েও কোন বড় প্রাণী বিনা প্রয়োজনে মেরে ফেলে তবে এটার কারণে তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।"*

একটা প্রাণীর কাছ থেকে যেমন আমরা নানান দিক থেকে উপকার পেয়ে থাকি তেমনিভাবে তাকে খাওয়ানো, অসুস্থ অবস্থায় দেখাশোনা করা এবং বার্ধক্য অবস্থায় তাদের প্রতি কঠোর ভারী বোঝা না চাপানো আমাদের দায়িত্ববোধের মধ্যে পড়ে। বর্তমান যুগে আমরা প্রাণী জগতের উপর নানান দিকে সচেতন হলেও আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আমলে এ চিন্তাভাবনা করা মোটেই সহজ ছিল না।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এই পৃথিবী এবং সেই সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ তাঁরই অনুগত। তারা সবাই তারই কাছে সিজদায় অবনত হয়ে থাকে। কুরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে,

> *"তোমরা কি দেখনা, আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সেই সব কিছুই যা আসমানে আর যা জমীনে রয়েছে? সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার এবং বহু সংখ্যক মানুষ। আবার এমন বহু লোকও যারা আযাব পাওয়ার অধিকারী হয়েছে। আর আল্লাহই যাকে লাঞ্ছিত করেছেন তাকে সম্মান দেওয়ার কেউ নেই, আল্লাহ যা চান তাই করেন।" (কুরআন - ২২ ঃ ১৮)*

কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল সমস্ত কিছু আল্লাহর একত্ববাদের কাছে মাথা নত করে চলে। আল্লাহ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কুরআন আমাদের জ্ঞাত করায় যে তিনি হলেন চরম ও পরম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি হলেন পরম দয়ালু, তিনি এই বিশ্বজগতের চালক ও পালক, তিনি এমন এক চরম সত্তা যার উপর প্রশ্ন করা যায় না। তিনি বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। তাঁর আদেশে সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়। তাঁর সামনে টুঁ শব্দ করার কেউ নেই। কুরআন তথা ইসলামের এই তৌহিদী তত্ত্ব বা একত্ববাদের ধারণা এমন কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের সাথে যুক্ত যা এড়িয়ে মানুষের জীবন একেবারে ব্যর্থ। একত্ববাদ মানুষের মধ্যে ঐক্যের কথা বলে। একত্ববাদ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্যের আহ্বান জানায়। সেই সঙ্গে একত্ববাদ মানুষের জ্ঞানের সাথে মূল্যবোধের কথা বলে। তাই মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে পারে কিন্তু তাই বলে তার প্রতি অবিচার করতে পারেনা, মানুষকে বোঝা উচিত যে প্রকৃতির উপর স্বেচ্ছচারিতার থাবা বসানো মানে নিজের অস্তিত্বের উপর থাবা বসানো। কুরআনের ভাষায় প্রকৃতি হল আনুগত্যপরায়ণ অর্থাৎ ধার্মিক। তাইতো সে প্রতিনিয়ত মহান প্রভুর কাছে সিজদাবনত অবস্থায় থাকে। আর সেজন্য তো প্রকৃতি এক পবিত্র প্রতিষ্ঠান।

> *“পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন। তাতে সকল প্রকারের বিপুল পরিমাণে সুস্বাদু ফল রয়েছে। খেজুর গাছ রয়েছে, এর ফল আবরণে আচ্ছাদিত। আর খোসাবিশিষ্ট শষ্য ও সুগন্ধি ফল। অতএব হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করবে?”*
> *(কুরআন -৫৫-১০-১৩)*

আকাশ মন্ডলকে তিনি সুউচ্চে স্থাপন করেছেন এবং মানদন্ড স্থাপন করেছেন। এর ঐকান্তিক দাবি এই যে তোমরা মানদন্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না। সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন কর এবং পাল্লায় দাঁড়ি বাঁকা করোনা। পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন। এই পৃথিবী ও পরিবেশের নানান অধিকার রয়েছে। এদের প্রথম অধিকার হল মানুষের এ স্বীকৃতি দান যে এর মালিক মানুষ নন, মানুষ এর সৃষ্টি করেনি অতএব মানুষ এর মালিক হবে কি করে? বরং আমরা এর প্রকৃত মালিকের কাছ থেকে ব্যবহার করার অধিকার পেয়েছি মাত্র। আল কুরআনের তৌহিদী শিক্ষায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহর অস্তিত্বের ছোঁয়া ছাড়া এ বিশ্ব অচল, স্বর্গীয় চেতনাবিহীন এ প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। সেই জন্যই তো কুরআনের আলোচনা ধারায় বার বার ঘূরে এসেছে প্রকৃতির প্রসঙ্গ।

মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধি ছাড়া কিছু নয়

কুরআনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এ পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর ‘খলিফা’ হিসাবে প্রেরিত। ‘খলিফা’ কথাটির অর্থ প্রতিনিধি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কুরআনে এই খলিফা নিয়োগের কথাটি সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে।

> *“সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা বলল আপনি কি পৃথিবীতে এমন এক জীব সৃষ্টি করবেন যারা নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করবে, এবং রক্তপাত করবে। আপনার প্রশংসা, স্তুতি,তসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনাতো আমরাই করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জান না।”* (কুরআন ২ ঃ ৩০)

খলিফা হলেন নিযুক্ত ব্যক্তি যিনি চরম কোন সার্বভৌম শক্তির কাছ থেকে প্রেরিত হয়। এই চরম সার্বভৌম শক্তি ছাড়া খলিফার কোন প্রকার ক্ষমতাই থাকেনা। প্রতিনিধির উপর দায়িত্ব হলো উচ্চ সার্বভৌম শক্তির কাছ থেকে যা পেয়ে থাকে তা

মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই মত সার্বভৌম শক্তির পথনির্দেশনা সমাজে বাস্তবায়িত করা। এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের মধ্যে যে কর্তব্য আরোপিত হয় তা আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু ও প্রাণী যাতে ভারসাম্য অবস্থাতে পরিচালিত হয় তার সামগ্রিক ব্যবস্থা করা। এই ভাবে এটা প্রতিয়মান হয় যে এ পৃথিবীতে আমাদের কাজ কর্ম নিজেদের খামখেয়ালীপনায় চলতে পারে না। আমাদের উপর সদা সর্বদা আল্লাহর তীক্ষ্ণ নজর বিদ্যমান। এবং আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব হল আল্লাহর আইন কানুন জমিনের বুকে বাস্তবায়িত করা। আর এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে বাধ্য।

> *"তিনিই তোমাদেরকে প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন,"*
> *(কুরআন ৬ : ১৬৫)*

সে জন্য প্রকৃতি হল একজন খলিফার কাছে 'আমানত' বা গচ্ছিত ধন। তার প্রতি গচ্ছিত এ ধন মোটেই হেলা ফেলার বিষয় নয়। এ ধন-সম্পত্তির যথাযথ পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। যার কাছ থেকে এ সম্পদ পাওয়া গেছে তার কাছে এ সম্পদের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যও একজন খলিফা বা প্রতিনিধি দায়বদ্ধ। এক জন প্রতিনিধি সব সময় খেয়াল রাখবে প্রকৃতির এ ধন সম্পদ এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে যাই হোকনা কেন তার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে কি-না। তিনি এ পরিবেশের সামগ্রিক সংরক্ষণের ব্যাপারেও সদা সতর্ক থাকবেন। এই ভাবে আমরা আল্লাহর দান সকল স্বাধীনভাবে ব্যবহারের অনুমতি পেলেও সেগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করছি কি-না তা আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির ভয় করতে হবে। প্রকৃতিকে ব্যবহার করার সার্বভৌম শক্তি খলিফার নেই। কুরআনে প্রকৃতিকে আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আমাদের এই মহানির্দেশ থেকে সব সময় শিক্ষা নিতে হবে।

> "*আকাশ* ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত দিনের আবর্তনে সেই সব বুদ্ধিমান লোকেদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উঠতে বসতে শুতে সকল অবস্থাতেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে। বলে, হে আমাদের প্রভু! এ সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর।"
> (কুরআন ৩ : ১৯০-১৯১)

এই প্রকৃতি জগৎ আমাদের বাঁচার, মুক্তির ও বোঝাপড়ার বিষয়, আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিই হল পবিত্র। এই প্রকৃতির দেখভাল করা, এর ভারসাম্যের কথা ভাবা, এবং সুসামঞ্জস্যের সর্ববিধ ব্যবস্থা করার দায়িত্ব খলিফার উপর বর্তায়, যাতে করে মানব সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। যদি আমরা প্রকৃতির প্রতি এ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হই তাহলে পক্ষান্তরে আমরা বিদ্রোহীই হয়ে পড়ব।

> "যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা- তার সংশোধন ও স্থিতি বিধানের পর। এবং আল্লাহকেই ডাকো ভয়ের সাথে ও আশা নিয়ে।" (কুরআন ৭ : ৫৬)

রসূল (সাঃ) বলেছেন, *"যমীনবাসীদের উপর দয়াশীল হও এবং আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়াশীল হবেন।"*

অবশ্য বর্তমান যুগের মুসলিমরা ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছে অনেকাংশে। তারা এখন আর প্রকৃতি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন নয়। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের অধঃপতন এবং আধুনিক হওয়ার পাগলামী মাথায় চেপে বসেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিমরা একেবারে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। আবার নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। কুরআনে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সচেতনতার কথা বলা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়েছে। মুসলিমরা কুরআনের নির্দেশিত প্রেরণায় অনেকটা দায়িত্বশীল হয়েছে।

প্রকৃতি জগতের সংরক্ষণের জন্য মুসলিমরা ধর্মীয় ভাবাবেগেও বর্তমানে প্লাবিত হচ্ছে। তারা ভাবতে শিখছে যে প্রকৃতির এতবড় বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে ঐক্যের তান লুকিয়ে আছে। প্রকৃতি পরিবেশের আনাচে কানাচে শুধু বৈচিত্রই নেই সেই সঙ্গে রয়েছে এক মহা মিলন সুর। পৃথিবীতে ক্ষেত, উদ্যান, সমুদ্রকে যদি মুসলিমরা অনুভব করতে না শেখে, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যদি না নিয়ে থাকে তবে তারা এ পৃথিবীতে যেমন লাঞ্ছিত হবে পরকালেও চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকবে।

> "আর তিনিই এ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন, এতে পাহাড়ের খুঁটি গেঁড়ে দিয়েছেন এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাত প্রবর্তিত করেছেন। এ সমস্ত জিনিসেই বহু ও বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। আর লক্ষ্য কর যমীনে ভিন্ন ভিন্ন শষ্যক্ষেত্র রয়েছে যারা পরস্পর সংলগ্ন। আঙ্গুরের বাগান আছে, ক্ষেত খামার আছে, খেজুরের গাছ আছে, যাদের কিছু একহারা ও কিছু দ্বৈত। সবগুলোবে একই পানি সিক্ত করে। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমি কোনটাকে বেশি স্বাদযুক্ত এবং কোনটাকে করি কম স্বাদের। এসব জিনিসেই অসংখ্য

নিদর্শন বিদ্যমান তাদের জন্য যাদের জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে।”

(কুরআন ১৩ ঃ ৩-৪)

হারাম এবং হিমা

প্রকৃতিকে ভালবাসা ও তার সংরক্ষণ মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কাছে একটা বড় ধরনের বিষয় বলে বিবেচিত হত। আমানত অথবা ট্রাস্ট এবং খলিফা অথবা ট্রাষ্টি কেবল আইনগত বিষয় নয় বরং এর বাস্তবরূপে সে সময় পালিত হত। আর এটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সময় সময় পলিসি প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) দু- ধরনের পরিবেশ বান্ধব এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি হল ‘হারাম’ অপরটি হল ‘হিমা’। ‘হারাম’ অঞ্চলে বেশ কিছু কাজ নিষিদ্ধ ছিল। এগুলো সাধারণত কূপ, নগর ও শহরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। আর জল দুষণ রোধেরও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সেখানে সেচ ব্যবস্থা ছিল, এবং নদী বা প্রাকৃতিকভাবে জলসম্পদে ভরা স্থানে লোকেরা কোন প্রকার দুষণের কাজ করতে পারত না। শহর ও নগরের কোন গাছপালা লোকেরা কেটে ফেলার, পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি পেত না। এমনকি ওই সকল বনভূমির যাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হত সবাইকে। এইভাবে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় ছিল।

মদিনার চারপাশে সবুজ অঞ্চল

হিমা অঞ্চলগুলি সাধারণত নহরের পাশে অবস্থিত ছিল, এগুলো ছিল বন্যপ্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত বন। নবী (সাঃ) মদীনার চারপাশের এ রকম অঞ্চলকে ‘হিমা’ নামে অভিহিত করেছিলেন এবং শহরের মধ্যে ছিল অনেক ‘হারাম’ অঞ্চল, এইরকম একটি অঞ্চলের নাম ছিল ‘হিমা আল নাকি’। এটি মদীনা শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে আকিক উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। এটিকে সুন্দর পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা হয়েছিল গবাদি পশুর চারণভূমি হিসাবে। এখানে নবী (সঃ) অনেক চারাগাছ রোপণ করেছিলেন। শ্রীঘ্রই এই অঞ্চল বনানী হয়ে যাওয়ার ফলে ঘোড়া আরোহীদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি একজন ব্যক্তিকে গাছের উপর থেকে উচ্চস্বরে আহ্বান করতে বললেন এবং যতদূর পর্যন্ত ওই আওয়াজ পৌঁছালো ততদূর পর্যন্ত এই বনভূমির সীমা নির্ধারণ করলেন। আর এই অঞ্চলের কোন গাছ কাটা যাবে া বলে ঘোষণা দিলেন। একদিন নবী (সাঃ) আকিক বনভূমি থেকে ফিরে আসার পর তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পত্নী আয়েশা (রাঃ)-র কাছে বর্ণনা করছিলেন। মদীনার কিছু ধনী ব্যক্তি পরের দিকে তাদের গ্রীষ্মকালীন অবসর সময় কাটানোর জন্য আকিক অঞ্চলের আশেপাশে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে আকিক অঞ্চল ভ্রমণ স্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। মদীনার লোকেরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে প্রায়ই এই আকিক অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য যেতেন। এবং আনন্দ উপভোগ করতেন।

'হারাম' ও 'হিমা' পরিকল্পনা অবশ্যই ইসলামী শরীয়তের একটি অংশ আর এট ছিল প্রাণী অধিকারের সংরক্ষণ নীতি। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

> *"মাটিতে হামাগুড়ি দেওয়া সমস্ত প্রাণী, আকাশে ডানায় ভর করে ওড়া সকল প্রাণী তোমাদেরই মতো একটি সম্প্রদায়।"*
> (কুরআন ৬ ঃ ৩৮)

এইভাবে ইসলামি শরীয়ত পশু, পাখি ও পরিবেশের সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান প্রকৃতিকে যখন আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করছি তখন নবী (সাঃ) এর এ পরিকল্পনা ও কুরআনের ঘোষণা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলবে বৈকি। বর্তমান যুগের মুসলিম সচেতন ব্যক্তিরা এ বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণ করলে আমাদের পরিবেশ কতই না সুন্দর হত।

সবুজ পৃথিবী

আনাস রাঃ বলেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন , *"যদি কোন ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় আর তার ফল মানুষ অথবা অন্য সৃষ্টি ভক্ষণ করে তবে তার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে।"*

রসূলের এই কথা দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ফলবান অথবা ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। রাস্তার পাশে সামাজিক বন স্থাপনে অথবা পার্কে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা শরিয়তীভাবে খুব প্রয়োজনীয় কাজ। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরনের কাজের ভূমিকা অবশ্যই থাকা দরকার।

নবী (সাঃ) এক সময় বলেছিলেন,

> "যদি কোন ব্যক্তি মরুভূমিতে পশুপাখি বা পথিককে ছায়াদানকারী কোন গাছ কেটে ফেলে তবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন।"

এর দ্বারাই বোঝা যায় নবী (সাঃ) এ পৃথিবীর মাটিকে কতটা সবুজ দেখতে চেয়েছিলেন। যে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে আমরা বেঁচে থাকি তার পরিবেশকে রক্ষা করতে একেবারে নতুন ধারণা তিনি বিশ্বকে দান করেছিলেন– এটা কম অবদান নয়। আর এর জন্যও পরকালে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তাও তিনি আমাদের জানিয়ে গেলেন।

নবী (সাঃ) বলেন,

> “যদিও কিয়ামতের মুহুর্ত এসে পড়ে আর কোন ব্যক্তির হাতে যদি কোন চারাগাছ থেকে থাকে তা হলে সেটি যেন সে তাড়াতাড়ি রোপন করে দেয়।”

মুসলিম সচেতনতা আজ জেগে ওঠা একান্তভাবেই দরকার। প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক রসূলের নির্দেশে গড়ে তোলা চাই তবেই তো সে রসূলের নির্দেশ অনুভব করতে শিখল। কুরআনের পাতায় পাতায় প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রেরণা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। যারা প্রকৃতিকে অনুভব করতে শেখে তারা প্রকৃত জ্ঞানী। প্রকৃতিকে ভালবাসা ও সংরক্ষণের মধ্যদিয়ে জীবনের চক্র এগিয়ে চলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আর প্রকৃতির বুকে যে বিশাল সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে তা আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সে জন্যই তিনি আমাদের আদেশ করেছেন এই সম্পদ ধ্বংস না করার জন্য। কারণ প্রকৃতির এ বিশাল সম্পদ তো আল্লাহর দয়া ছাড়া কিছু নয়।

> *“হে আদম সন্তান! প্রতিটি উপাসনায় তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। আর খাও ও পান কর কিন্তু সীমালঙ্ঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”*
> *(কুরআন ৭ ঃ ৩১)*

প্রকৃতির সম্পদের অপব্যবহার করা মূলত আল্লাহর দানকে অবমাননা করার সমতূল্য। এটি মানবতার চরম অপমানও বটে। নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ছিলেন। বিশেষ করে জলসম্পদ ব্যবহার করার ব্যাপারে তিনি সাহাবীদের নানান উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি বিখ্যাত সাহাবী সাদ রা:-র কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই সময় সাদ রাঃ অজু করছিলেন। রসূল (সাঃ) দেখলেন যে তিনি যথেষ্ট বেশি পানি ব্যবহার করছেন অজুতে। নবী (সাঃ) তৎক্ষণাতই তাকে সাবধান করে বললেন, “কেন এমন অপচয় করছ সাদ? ” সাদ রাঃ প্রত্যুত্তরে বলল, অযুর জন্য এটাও কি অপচয়? “নবী (সাঃ) বললেন হ্যাঁ যদিও এটা প্রবাহমান ঝরনায়ও করে থাকো।”

নবী (সাঃ) এর দ্বারা সাহাবী সাদ রাঃ ও অন্যান্যদের এটাই শিক্ষা দিলেন

জলসম্পদ বা প্রকৃতির যে কোন সম্পদ অপব্যয় করা যাবে না। কথায় কথায় ধর্মীয় অজুহাত দেখিয়ে কোনরূপ অপচয়মূলক কাজে কোন সময়েই কাউকে সমর্থনও করা যাবেনা। অপর পক্ষে প্রকৃতির যে কোন সম্পদ মানবকল্যণের জন্য তার যথাযথ ব্যবহার সব সময়ের জন্য বৈধ।

ঝরনার জল হলেও তা অজুর মতো ধর্মীয় কাজে বেশী করে প্রবাহিত করা যাবে না। নবীর নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ মৌলিক তথ্য। এই মৌলিক তথ্যই হল পরিবেশ রক্ষা করার ও যথাযথ ব্যবহার করার জন্য রেগুলেটর স্বরূপ। কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়া দেয়-

> *"আর আসমান হতে আমি অনুমান মতো এক বিশেষ পরিমাণ*
> *পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে স্থিতিসম্পন্ন করে দিয়েছি।*
> *আর আমি তাকে যে দিকে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারি।"*
> *(কুরআন ২৩ ঃ ১৮)*

সারা বিশ্বে আজ অনেক দেশেই জল সংকট। অথচ আমরা পেয়ে থাকি অঢেল, সেজন্য আল্লাহর কাছে আমাদের সব সময় কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আরো মনে করা উচিত কোনভাবে জলের অপব্যবহার যেন না ঘটে। এভাবে আমরা রসূলের এ আদেশ পালন করে নিজেদের তথা পরিবেশকে ভালো করতে পারি।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং একজন ভূতপূর্ব ক্যাথেলিক সন্ন্যাসিনী। তা সত্ত্বেও তিনি নবী (সাঃ) এর জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে "আমাদের যুগে নবীর অবদান" অধ্যায়ে বলেছেন, নবী (সাঃ) এর শিক্ষা ছিল সার্বিক, তাঁর শিক্ষায় পোকামাকড়, পশু, পাখি, গাছপালা, শিলা পাথর, নদী নালা, এক কথায় প্রকৃতির এমন কিছু বাদ নেই যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি।

আজ যখন আমরা পরিবেশ দুষণের নানান সমস্যায় ভুগছি তখন রসূলের নির্দেশিত পথ আমাদের বাঁচার হাতছানি দেয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের যতগুলো কারণ আজ আমরা দেখতে পাইনা কেন, তা ওজন স্তর ফুটো হওয়া থেকে বায়ুদূষণ এবং জলদূষণ যাই হোক না কেন সবকিছুর সমাধানসূত্র রসূল (সাঃ) আমাদের বাতলেছেন। কেবলমাত্র রসূলের নির্দেশের বাস্তবায়ন যদি আমরা ঘটাতে পারি তাহলে সব সমস্যার সমাধান আমরা করে উঠতে পারব। আর আমাদের কিছুতেই অবহেলা করা চলবে না।

মানুষের প্রতি করুণা

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, রসূল (সাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ। তা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি তাঁর করুণা তুলনাহীন। সবার উপরে তিনি মানুষের প্রতি

করুণাকে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর করুণার প্রভাব মানুষের জীবনকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তার করুণার ছায়া সমাজজীবনের সবক্ষেত্রে এক আত্মীয়তার জাল বুনেছে। নর-নারী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী, স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-দাস, বন্ধু-শত্রু, দেশী-বিদেশী সবাই পরস্পরের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর এর জন্য বাধা ছিলনা কোন বংশ-গোত্র কিংবা সাদা-কালোর বিভেদ। তাঁর হৃদয় থেকে সবসময় ঝরে পড়ত করুণা, সহানুভূতির শীতল ঝর্নাধারা। অপরের কোন অসুবিধা দেখলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। তাঁর চোখ সিক্ত হয়ে উঠত অপরের দুঃখ বেদনায়।

পিতামাতা

কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে পিতামাতার স্থান অনেক উর্দ্ধে। কুরআনে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের সাথে পিতামাতার মর্যাদাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের প্রতি করুণা ও বিনয়ী হওয়ার কথা বলেছে।

> "তোমার প্রভু আদেশ করেছেন তাকে ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত
> না করতে এবং পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়ার জন্য,"

আল্লাহর ইবাদাতের পর মানুষের প্রতি ভাল আচরণ করার আদেশ এসেছে। আর তারমধ্যে আবার পিতা-মাতার প্রতি ভাল আচরণ সর্বাগ্রে। কুরআনের ভাষায় "এবং পিতামাতার মঙ্গল কর।" কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ইবাদাতের পরে পিতামাতার প্রতি ভাল আচরণের প্রসঙ্গ এসেছে। আর এর অর্থ হল আল্লাহর প্রিয় হওয়ার পর সন্তানকে অবশ্যই পিতমাতার প্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। একজন সন্তানের জন্মলাভ, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা এবং নৈতিকতার বিকাশ সাধনের জন্য পিতামাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার যত্ন ছাড়া সন্তানের একপ্রকার বেঁচে থাকাই সম্ভব হত না। এমনকি এক অশিক্ষিত বা প্রতিষ্ঠাহীন পিতামাতাও সন্তানের জন্য যা করে তার ঋণ কোনদিন শেষ করা যাবে না। পিতামাতার প্রিয় হয়ে যাওয়া মানে আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাওয়া। মূলতঃ ইবাদাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। পিতামাতা অবশ্য এ ইবাদত পাওয়ার অধিকার পান না। কিন্তু তারা সম্মান পাওয়ার দিক থেকে একেবারে উচ্চাসনে, তাদের প্রতি করুণারোপ, তাদের আশির্বাদ পাওয়া যার বড় সোপান। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এবং পিতামাতার প্রতিও,

> *"আমার প্রতি ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আমার*
> *কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (কুরআন ৩১ ঃ ১৪)*

বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে আধুনিক সভ্যতা পবিত্র পারিবারিক প্রতিষ্ঠানকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের যে পর্বতসমান মূল্যবোধ ছিল তা আজ ধূলায় মিশে গেছে। আর এইভাবে এর বিশাল কুপ্রভাব পড়েছে বয়স্ক পিতা-মাতার দুর্বীসহ জীবনে। আজকের লোকেরা এটাই আলোচনা করছে বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিয়ে তারা কি করবে? তারা বলছে পিতামাতা তো জীবনের বোঝা। কেমন করেই বা পিতামাতার সেবা করা যেতে পারে কারণ তাদের দিয়ে তো এখন আর কোন কাজ করা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও কোন কাজে লাগবেনা। আজকে যে পিতামাতা অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার একদিন এই পিতামাতাই তাদের সন্তানের উপর– সকল প্রকারের ক্ষমতাশালী ছিলেন। তখন তারা ইচ্ছা করলে সন্তানের প্রতি যে রকম ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারতেন। বাস্তবে কিন্তু তা তারা করেননি। আধুনিক প্রজন্মের উন্নতি ও বিকাশ সেই বৃদ্ধ পিতামাতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফলেই এসেছে। কুরআন নির্দেশ দান করেছে খুব সুন্দর ভাষায়। পিতামাতার প্রতি এ ধরনের সুন্দর আচরণের কথা অন্যকোন ধর্ম বা অন্যকোন মতবাদ বলেনি কোথাও।

> *"তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, (এক) তোমরা কারোর উপাসনা করবে না- কেবল তাঁরই উপাসনা করবে। (দুই) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকটে যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে 'উহ!' পর্যন্ত বলবে না; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যদা সহকারে কথা বলবে। এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই দোওয়া করতে থাকবে ঃ 'হে আল্লাহ' এদের প্রতি রহম কর, যেমন* করে তারা স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে পালন করেছে।" (কুরআন - ১৭:২৩-২৪)

ইসলাম কেবলমাত্র দোওয়া করে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য শেষ করতে বলেনি বরং আমাদের উচিত সীমাহীন দয়া প্রদর্শন করে পিতামাতার সকল রকম সমস্যার সমাধান করা। আর সন্তান এটা কখনই করতে পারে না যদি সে তার শৈশব থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত অসহায় অবস্থাকে স্মরণ না করে। তার অস্তিত্ব নিয়ে এ পৃথিবীতে কিছুতেই বেঁচে থাকা সম্ভব হত না যদি তার পিতামাতা দয়ার হাত বাড়িয়ে না দিতেন। তাকে যদি স্নেহ ভালবাসা না দিতেন। তার মুখে যদি খাদ্যগ্রাস না তুলে দিতেন। প্রতিটি মুহুর্তেই সন্তান পেয়ে এসেছে পিতামাতার করুণা।

এই আধুনিক সংকটকালে পিতামাতার জীবন এক সম্মানীয় বস্তু হিসাবে দেখা দরকার। আর এর ফলস্বরূপ পেতে পারি আমরা এক সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ। এরকম

আধ্যাত্মিক সমাজব্যবস্থা আমাদের কাম্য। তাদের প্রতি 'উহ!' বলোনা কথাটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে পিতামাতার বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের কিছু অসংযত আচরণ দেখা দিতে পারে ঠিক শিশু'র মত। কিন্তু তাতে আমাদের বিরক্তি এসে গেলেও কুরআনের ভাষা আমাদের প্রতি লাগাম এঁটে দিয়েছে, বরং ঘুরিয়ে তাদের প্রতি সম্মানজনক ও অবনত আচরণ করার নির্দেশ দান করে।

মাতা

নবী (সাঃ) বলেছেন, "বস্তুত মায়ের পদতলে জান্নাত অবস্থিত।" তিনি তাঁর শিষ্যদের এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে পিতামাতার প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন অতি উচ্চধরনের মানবিক মূল্যবোধের বিষয়। আর এটা মানুষের হৃদয়ের উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এ পৃথিবীতে ভালবাসা পাওয়ার দাবিতে কার বেশী অগ্রাধিকার?

নবী (সাঃ) বললেন তোমার 'মা'।
ব্যক্তিটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে?
নবী (সাঃ) বললেন 'তোমার 'মা'।
পুনরায় ব্যক্তিটি বললেন তারপর কে?
নবী (সাঃ) তিনবার বললেন, 'তোমার 'মা'
ব্যক্তিটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে?
রসূল (সাঃ) বললেন 'তোমার 'বাবা'।

এখানে এটা পরিস্কার হচ্ছে যে সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে মায়েদের অংশ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আর পিতার জন্য বরাদ্দ হয়েছে পঁচিশ শতাংশ।

আসমা রাঃ বলেন, মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে যখন সন্ধি চুক্তি হচ্ছিল তখন তার মা তার কাছে এসেছিলেন। তিনি নবী (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার মা ইসলামের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। এখন তিনি কি তাকে সম্মান দেখাতে পারেন। রসূল (সাঃ) ততক্ষণাৎই তাকে বললেন "হ্যাঁ তোমরা মায়ের প্রতি সম্মান দেখাও।"

পিতা

নবী (সাঃ) বলেন, একজন পিতা তার সন্তানকে ভাল আচরণ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে আর কোন বড় উপহার দেওয়ার নেই।"

তিনি আরোও বলেন *"একজন পিতার সন্তানকে সবচেয়ে ভাল যে জিনিস*

দেওয়ার তা হল সুন্দর শিক্ষা ও সুন্দর আচরণ।"

নবী (সাঃ) বলেন *"মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তিনটি জিনিস ছাড়া সবকিছু চলে যায়। দান যা উত্তরাধিকারীদের কাজে লাগে, সুশিক্ষা এবং সন্তানের বিনীত দোওয়া যা সে তার জন্য করে।"*

তিনি আরও বলেন, একজন লোকের সবচেয়ে ভাল গুণ এটাই তাহল পিতার বন্ধুদের প্রতি ভদ্র আচরণ করা। অন্য এক প্রসঙ্গে নবী ((সাঃ)) উমর পুত্র আব্বাসকে বলেন "এক জন মানুষ সবচেয়ে ভাল যে পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করে"।

আত্মীয় স্বজন

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "তোমরা আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" পিতামাতার পর আল্লাহ তায়ালা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ভাল ব্যবহার প্রদানের কথা বলেছেন। আত্মীয়- স্বজন পিতামাতার সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ'ই হয়ে থাকে। পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে সমাজজীবন সুন্দর হয়। সমাজে শান্তি বিরাজিত হয় আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনের মধ্যদিয়ে। আল্লাহর সাথে যে সমাজের আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধন নেই - সে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার সূত্র বিচ্ছিন্ন। আমির পুত্র সুলাইমান বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেন ,

> "কোন দান দরিদ্রকে দিলে তা সাধারণ দান, কিন্তু প্রতিবেশীকে দিলে তা বিশেষ দান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারি জিনিস।"

এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে আত্মীয়তার মধ্যে দান করায় দ্বিগুন প্রতিদান। এই দানের মধ্যে আত্মীয়তার একটি স্বাভাবিক সহানুভূতি গড়ে ওঠে, কিন্তু এটা সাময়িক। ভঙ্গুরও বটে। সামান্য সামান্য কারণে এটা ভেঙ্গে যেতে পারে যখন তখন। রসুল (সাঃ) সতর্ক করে বলেন যে তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে সম্পর্ক নষ্ট করোনা। বরং সব সময় চেষ্টা কর কিভাবে সম্পর্ক গড়া যায়। আমর পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন রসূল (সাঃ) বলেছেন "আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন মানে যে আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে গেছে তা পুনরায় স্থাপন করা।"

বয়োজেষ্ঠ্য

বয়োজেষ্ঠ্যদের প্রতি মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা এক উচ্চ আদর্শ বহন করে। জীবনসায়াহ্নে বয়োজেষ্ঠ্যদের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধা-ভক্তি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। বলা যেতে পারে

প্রাণবায়ুর মতো। নবী (সাঃ) বলেন, জিব্রাইল (আঃ) আমাকে আদেশ করেছেন বড়োদের প্রাধান্য দিতে। তিনি শিক্ষা দিলেন "যখন কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাবার দেওয়া হয় তখন বয়স্কদের অগ্রাধিকার দাও, তাদের কাছ থেকে খাবার দেওয়া শুরু করো।" নবী (সাঃ) আরও বলেন "আমাদের মধ্যে যারা ছোটদের প্রতি ভালবাসা দেখায় না ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। মুহাম্মদ (সাঃ) বড়দের অধিকার উচ্চস্থানে তুলে তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও নবী (সাঃ) এ আদর্শ বলবৎ রাখতে নির্দেশ দেন। এ সম্বন্ধে নবী (সাঃ) এর নির্দেশ 'বয়স্কদের, শিশু-কিশোর ও মহিলাদের হত্যা করোনা'।

মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সাঃ) পবিত্র মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন। আবুবকর রাঃ তার বৃদ্ধ অংশীবাদী পিতাকে নবী (সাঃ) এর কাছে আনলেন। যখন তিনি তার সাহাবীর বৃদ্ধ পিতাকে দেখলেন তখন আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করে বললেন কেন তাকে ঘরে রাখলে না, আমি তার কাছে যেতে পারতাম? এতে আবুবকর রাঃ উত্তর দিলেন "আপনার যাওয়ার চেয়ে তার আসা উচিত হয়েছে।" দয়ার নবী (সাঃ) বৃদ্ধ মানুষটিকে নিজের সামনে বসালেন এবং তাকে সম্মান জানিয়ে বুকে স্পর্শ করে বললেন "মুসলিম হয়ে যাও।" তিনি তৎক্ষণাত মুসলিম হয়ে গেলেন । ইসলামের কি অনুপম আদর্শ। এক সময় এ মহান আদর্শ দিয়েই বিশ্বজয় করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ কথা বলতেই হয় এই আদর্শ বাস্তবায়ন করার কোন প্রচেষ্টা আজ আর নেই বলে আমরা বিশ্বজয় দূরের কথা সর্বত্র লাঞ্ছিত।

শিশু

নবী (সাঃ) শিশুদের খুব ভালবাসতেন। কারণ শিশু সত্যিই নিষ্পাপ, তারা ভদ্র দয়াদ্র, তাদের উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর, তারা আল্লাহর খুব কাছাকাছি। শিশুরা রসূলের হৃদয়ের মণি। নবী (সাঃ) শিশুদের চুমু খেতেন। তাদেরকে নিজের কাঁধে চড়িয়ে খেলতেন। তাদেরকে সাথেকরে নিয়ে ফরজ নামাজ পড়তে যেতেন। আর রসূল (সাঃ) এটা করতেন এ কারণে যাতে তারা ছেলেবেলা থেকে সামাজিক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে নামাযী পরহেজগার। শিশুদের কান্নাও নবী (সাঃ)কে পীড়া দিত। নামাযে অংশগ্রহনকারী মহিলারা যখন আসতেন তখন তিনি শিশুদের কান্নাকাটির দিকে লক্ষ্য রেখে নামাযকে সংক্ষিপ্ত করতেন। নবী (সাঃ) শিশুদের এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি তাদেরকে 'জান্নাতের ফুল' বলে অভিহিত করতেন। তিনি আরোও বলতেন 'এক জন মানুষের সৌভাগ্য হল সৎ সন্তান'।

নবী (সাঃ) এর কাছে কেউ কোন ফল ফলাদি নিয়ে এলে তিনি তা প্রথমে ছোট ছোট শিশুদের বিতরণ করতেন। প্রায় দেখা যেত নবী (সাঃ) শিশুদের মুখে ও

মাথায় চুম্বন দিচ্ছেন। এক সময় নবী (সাঃ) এক শিশুকে নিয়ে আদর করছিলেন এবং তাকে চুমু দিচ্ছিলেন, এ দৃশ্য দেখে এক বেদুইন বলল "আমার দশটি সন্তান আছে আমি তাদের কাউকে চুমু দিইনা।" এটা শুনে রসূল (সাঃ) বললেন "তোমার হৃদয় থেকে আল্লাহ যদি ভালবাসা তুলে নেন, তাহলে আমি কি করতে পারি।

এক সময় জনৈক সাহাবী যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান। তিনি তার স্ত্রীকে সন্তানদের সঙ্গে করে তার কাছে আসতে বললেন। নবী (সাঃ) তাদের জড়িয়ে ধরলেন এবং সশব্দে কেঁদে তাদের মৃত্যুর খবর জানালেন। তাদের জন্য নিজের বাড়িতেই রান্নার ব্যবস্থা করতে বললেন। কারণ তিনি জানতেন এই রকম দুঃখের দিনে তারা তাদের নিজেদের খাবার প্রস্তুত করতে পারেন না।

নবী (সাঃ) কেবলমাত্র মুসলিম শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তেমনটি নয়। বরং তিনি ছিলেন সকল শিশুদের প্রতি একই রকম। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন "প্রতিটি শিশুই তার প্রাকৃতিক পবিত্রতার উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে।

একটি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কিছু শিশু আকস্মিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হয়। এবং নিহত হয়। নবী (সাঃ) যখন এ খবর পেলেন, সেই সময় কোন এক ব্যক্তি বলে ফেললেন "ওগো আল্লাহর রসূল ওরা তো অমুসলীম শিশু।" নবী (সাঃ) উত্তর করলেন,

> "অমুসলিম শিশুরা তোমাদের চেয়েও ভাল, সাবধান হও! শিশুদের হত্যা করবেনা। সাবধান! শিশুদের হত্যা করোনা। প্রতি শিশুই আল্লাহর প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে।"

নবী (সাঃ) বলেছেন "মিথ্যা বলা খারাপ কাজ, এটা ইচ্ছায় হোক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে হোক! শিশুদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিওনা।"

প্রতিবেশি

নিচের আয়াত দ্বারা সুন্দরভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পাড়া পড়শীদের প্রতি কীরূপ আচার-আচরণ করা হবে সে সম্বন্ধে।

> "আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগীকর, তার সাথে কাউকে শরীক করোনা পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো, নিকট আত্মীয় এতিম ও মিসকিনদের প্রতিও, প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপশি চলার সাথি ও পথিক

এবং তোমাদের অধিনস্থ ক্রীত দাসদাসীদের প্রতি।”

পাশাপাশি যারা আমরা বাস করি এবং যাদের সাথে নানান ব্যাপারে শলা পরামর্শ বা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করে থাকি, তারা সবাই আমাদের প্রতিবেশী। তারাই হবে বেশী হকদার আন্যান্যদের চেয়ে যারা এরকম নয়। এখানে মূলত: তিন ধরনের প্রতিবেশী হয়ে পড়ে। প্রথমত যারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ, আর যারা পাশাপশি বাস করে এবং পথে ঘাটে আকস্মিকভাবে যারা কিছু সময়ের জন্য সাথী হয় তারা সবাই প্রতিবেশী।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মগুলো প্রতিবেশীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দান করে । কিন্তু ইসলামে প্রতিবেশীদের প্রতি আচরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। এমনকি অল্প সময়ের জন্যও যারা পরস্পর পরস্পরের কাছে আসে তারা এই প্রতিবেশীর অধিকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর পারস্পরিক অবস্থান যত দীর্ঘ হতে থাকে ততই প্রতিবেশীর অধিকার আরোও বেশি দৃঢ় হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) ও উমার পুত্র আবদুল্লাহ উভয়েই বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

“জিব্রাইল আ: আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্বন্ধে এতটাই জোর প্রদান করেছেন যে আমার ধারণা হয় প্রতিবেশীদের উত্তরাধিকার বানিয়ে না দেওয়া হয়।”

ইসলাম শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে থাকেনি যে ‘কোন প্রতিবেশির প্রতি খারাপ আচরণ করোনা’ বরং প্রতিবেশীর সার্বিক উন্নতি যাতে ঘটে সে জন্য তাগাদা এসেছে বার বার। আমাদের উচিত সবসময় তাদের সাথে সবচেয়ে ভালো আচরণ করা। একজন প্রতিবেশী যেন এটাই ভাবতে পারে যে পাশের মানুষটি তার শত্রু নয় বরং মিত্র, তার দ্বারা কোন সময়ই কোন ক্ষতি হতে পারেনা। সবসময় তার দ্বারা কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ইসলাম এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেয় যে প্রতিবেশীর মর্যাদা অনেক উচ্চ। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

“আল্লাহর কসম, সে মুসলিম নয়; আল্লাহর কসম, সে মুসলিম নয়; আল্লাহর কসম, সে মুসলিম নয়।”

এ কথা শোনার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হল কে মুসলিম নয়। তিনি উত্তর দিলেন “যার অন্যায় অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।” রসূলের এ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ একজন মানুষের মুসলমান হওয়া বা না হওয়ার শর্তও জুড়ে আছে। তাই আমাদের সকলের উচিত এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া।

আব্বাস পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় এবং তার প্রতিবেশী অভূক্ত থাকে সে মুসলিম নয়।" এখানে ঈমান থাকা বা না থাকার প্রশ্নে প্রতিবেশীর অধিকার জড়িত। তাই সব সময়ের জন্য প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখে সমব্যাথী হতে হবে প্রত্যেক মুসলিমকে।

দরিদ্র ব্যক্তি

মুহাম্মাদ (সাঃ) তখনও নবী হননি। তিনি তার নবী হওয়ার পূর্বের জীবনে সবসময় দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। সবচেয়ে গরীব ও হতভাগ্য বেচারার দল ছিলেন আস্ সুফ্ফারা। তারা রসূল (সাঃ) এর একেবারে চিরস্থায়ী অতিথি ছিলেন। রসূলও তাদের সাথে সবসময় থাকতে ভালোবাসতেন। এক সময় তিনি বলেন, দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ট, আবার চার জনের খাবার পাঁচ জনের যথেষ্ট।

নবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)কে বলেছিলেন,

> *"ও আয়েশা ! তুমি কখনও তোমার বাড়ি থেকে খালি হাতে কাউকে ফিরিয়ে দিওনা। যে কিছু চায় তাকে কিছু না কিছু দিও, তা আধখানা খেজুর হলেও। হে আয়েশা! গরীবদের ভালবাস, তাদের কাছাকাছি হও, কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর কাছাকাছি হতে পারবে।"*

নবী ((সাঃ))- বললেন,

"যে ভোজ বাড়িতে গরীবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের খাওয়া-দাওয়া হয় সে ভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট"। এক সময় নবী (সাঃ) পথ অতিক্রম করে যাচিছলেন, এমন সময় তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন' এ লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?" উত্তরে সাথিরা বললেন ,

"ওগো আল্লাহর রসূল আমরা মনে করি এই লোকটি ভদ্র, যদি সে বিয়ের প্রস্তাব রাখে তাহলে লোকেরা তা গ্রহণ করে, যদি কারোর মধ্যস্থতা করতে চায় তাহলে লোকেরা তার মধ্যস্থতা গ্রহণ করে, যদি কোন কিছু বলে লোকেরা তার কথা মনোযোগ সহকারে শোনে।"

এরপর নবী (সাঃ) কিছুটা পথ অতিক্রম করে যাওয়ার পর আর একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে সাথিদের মতামত জানতে চাইলে সাথিরা উত্তর দিলেন,

"ইনি একজন দরিদ্র মানুষ, ইনি যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয় কেউ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে না। কারোর মধ্যস্থতা করলে কেউ মধ্যস্থতা গ্রহণ করেনা। যদি কিছু বলেন

লোকেরা তা শোনে না।"

এই কথাগুলো শোনার পর রসূল (সাঃ) বললেন,

> *"যদিও সারা পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই ভর্তি তবুও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সবচেয়ে ভালো।"*

নবী (সাঃ) এর সাথি জাফর (রাঃ) গরিবদের খুব ভালবাসতেন। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন। সে জন্য নবী (সাঃ) তাঁর এই সাথিকে আবু আল মাসাকিন অর্থাৎ 'গরীবদের পিতা' বলে ডাকতেন।

অন্য এক সাহাবী সাদ (রাঃ) মেজাজের দিক থেকে গরীবদের চেয়ে নিজেকে একটু শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। একদিন নবী সা: তাকে ডেকে বললেন "গরীবের পরিশ্রমের কাছে তোমার ধন-সম্পত্তি ও সফলতার কি মূল্য আছে?"

দাসদাসী ও চাকরবাকর

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সাঃ) বলেন, "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও।" রসূল (সাঃ) দাসদাসীদের প্রতি ছিলেন উদার মনোভাবের। তিনি প্রায় একথা বলতেন,

"তারা আমাদের ভাই বোনের মত। তোমরা যা খাও তাদের তা খেতে দাও, তোমরা যা পর তাদের তা পরতে দাও।"

সাধারণভাবে এদের দাস কিংবা দাসী হিসাবে সম্বোধন করলে এরা নিজেরা হীনমন্যতায় ভুগতে পারে তাই রসূল (সাঃ) সম্বোধন রীতি নীতিও আমাদের বলে দিয়েছেন, তিনি বলেন এদের তোমরা 'আমার পুত্র' অথবা 'আমার মেয়ে' হিসাবে সম্বোধন করো। তিনি দাস দাসীদের ও তাদের মালিককে প্রভু হিসাবে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা প্রভূ তো একমাত্র আল্লাহ হতে পারেন। নবী (সাঃ) নিজের দাস-দাসীদের এতটা ভালোবাসতেন যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে যে উপদেশ দান করেছিলেন তার মধ্যে ছিল "তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।" নবী (সাঃ) বলেন,

"এই দাস দাসীরা তোমাদের ভাই বোন, যাদের প্রতি আল্লাহ তোমাদের সাময়িক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যদি তাদের কাজে তুমি সন্তুষ্ট না হও তাহলে তাদের মুক্ত করে দাও। আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাহর প্রতি অবিচার করো না। যা তোমরা খাও তাদের তা খেতে দাও, যা তোমরা পর তাদের তা পরতে দাও। তাদের প্রতি এমন

কঠোর কাজ চাপিওনা যা তারা বহন করতে অক্ষম। যদি তুমি তাদের উপর কোন কাজ দাও তাহলে নিজের হাত লাগিয়ে তাকে সাহায্য কর।"

মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর দাসদাসীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতেন তার বিস্তৃত বর্ণনা জানতে পারি হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে। হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচীব। তিনি বলেন আমি দশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাজে নিযুক্ত ছিলাম। তিনি সামান্য ধাক্কা পর্যন্ত আমাকে কোন দিন দেননি। আমি তার জন্য যা করতাম তার কোন দোষই তিনি ধরেননি। আমি তার কোন কাজে ব্যর্থ হলে তিনি কোনদিন কঠোর হতেন না। তিনি তাঁর দাসদাসীদের সাথে সমান আচরণ করতেন। নবী (সাঃ) অনেক কাজের ব্যাপারে দাসদাসীদের মুখাপেক্ষী থাকতেন। তিনি দাসদাসীদের কাউকে কোনদিন প্রহার করেছিলেন এমন কোন নজীরও নেই।"

প্রতিবন্ধী

শারীরিক বা মানসিক যাই হউক না কেন সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধীদের প্রতি রসূল (সাঃ) ছিলেন অসাধারণ দয়ালু। তাদের প্রতি তিনি সবসময় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। অতীতে অথবা বর্তমানেও আমরা সাধরণতঃ দেখে থাকি প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবহেলা। তাদেরকে সবসময় ভাবা হয় সমাজের আবর্জনা হিসাবে। তারা যেন আমাদের জীবনের বোঝা। নবী (সাঃ) কিন্তু তাদের প্রতি অসাধারণ দয়া দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকেও তাদের প্রতি ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দান করেছেন। এক কথায় তিনি প্রকাশ করেছেন,

> "তোমরা দুনিয়াবাসীদের প্রতি করুণা কর, যিনি আকাশে আছেন
> তোমাদের উপর দয়া দেখাবেন।"

এই আদেশ সাধারণতঃ অসহায় মানুষদের প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে অবশ্য অন্ধ, বোবা, কালা, খোঁড়া সবাইকে বোঝায়, যারা সমাজে দয়ার ভিখারী।

সমাজের এইসব মানুষের প্রতি কোন সময় অবহেলা করা যাবে না। কুরআনের বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম ছিলেন একজন অন্ধব্যক্তি। কোন এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে কিছু জানতে চেয়েছিলেন। রসূল (সাঃ) তার প্রতি অনাগ্রহ দেখিয়ে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, অন্য প্রভাবশালী লোকদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত থাকার কারণে। রসূল (সাঃ) যে সব লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন তারা ছিলেন কুয়াইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। নবী (সাঃ) ভেবেছিলেন যে এরা তার কথায় ইসলাম গ্রহণ করবে। তাই তিনি অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুমের প্রতি একটু উদাসীন হয়েছিলেন। আর এ প্রসঙ্গেই

কুরআনের আয়াত অবতীর্ন হল,

> *"বেজার হল ও অনাগ্রহ দেখাল; এ জন্য যে, অন্ধ ব্যক্তি তার নিকট এসেছে। তুমি কি জানো হয়ত সে পরিশুদ্ধ হত কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হত? যে লোক উন্নাসিকতা দেখায় তুমি তার প্রতি লক্ষ্য দিচ্ছ। অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয় তোমার প্রতি এ দায়িত্ব নেই, আর যে লোক তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং যে ভয় করে তার প্রতি অনিহা প্রকাশ করছ। কক্ষণও নয় এতো এক উপদেশ, যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করবে।" (কুরআন ৮০ ঃ ১-১২)*

পরে নবী (সাঃ) এর কাছে যখনই আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম আসতেন তখন তিনি তাকে গ্রহণ করতেন এবং এই কথাই বলতেন "আপনি এমন এক ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ আমাকে দোষী সাবস্ত করেছিলেন।" হয়তো এই কারণেই নবী (সাঃ) দু-দু'বার তাকে মদিনায় গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

অনাথ

সমাজে পিতা মাতার প্রতি অধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃত। তারপর অসহায় দুর্বল মানুষদের প্রতি আমাদের দয়া দেখানো দরকার । আর এ প্রসঙ্গে অনাথ ও দরিদ্রদের কথা কুরআনে প্রথম উল্লেখ হয়েছে, 'পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকিনদের প্রতিও' (কুরআন ৪ ঃ ৩৬)। পিতামাতার মৃত্যু মানে সন্তানের উপর থেকে ভালবাসার হাত গুটিয়ে যাওয়া। তার বেঁচে থাকার জন্য আর পথ থাকে না। সে হয়ে যায় অসহায় অনাথ, বিশেষ করে আর্থিক শোচনীয় অবস্থায় তার নাভিশ্বাস ওঠে। তাই সমাজের উপর গুরুদায়িত্ব বর্তায় তাকে বেঁচে থাকার সমস্ত উপায় উপাদান সরবরাহ করার জন্য। সমাজকে এটা সতর্ক থাকতে হবে যে পিতামাতার মৃত্যুতে সন্তানদের যে অসহায় অবস্থা উপস্থিত হয়, তা যেন তারা অনুভব না করে। এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার তাদের দৈহিক ও মানসিক কোন প্রকার বিকাশে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। সমাজ যদি তাদের প্রতি এ ব্যাপারে সচেতন না হয়ে বরং তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে থাকে তাহলে ফল অন্যরকম হয়। কিছুদিন পরে তারা যখন অত্যাচার অবহেলায় বড় হয় তখন তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে বিদ্রোহের। সমাজকে তারা শত্রু ভাবতে শেখে। সুনাগরিক হওয়ার পরিবর্তে তারা সমাজের মূল স্রোত উপেক্ষা করে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। এক সময় তাদের দৌরাত্ম্যে সমাজজীবন একেবারে কোন ঠাসা হয়ে পড়ার উপক্রম হয়।

নবী (সাঃ) নিজেই প্রাথমিক জীবনে অনাথ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা গিয়েছিলেন তাঁর জন্মের আগেই। আর পরে যখন তাঁর বয়স ছ'বছর তখন তাঁর মা আমিনাও তাঁকে ছেড়ে পরকালে পাড়ি দিলেন। আর এই অনাথ অবস্থা'ই তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এরমধ্যে থেকে তাকে এই শিক্ষা নিতে হয়েছিল যে অনাথ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। পরবর্তীতে তাই হয়েছিল- তিনি অনাথদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন দূর্গ-প্রাচীরের মতো। সবরকম অসহায় অবস্থা কাটিয়ে অনাথশিশুরা মাথা উচু করে বাঁচতে পারে তার সবরকম ব্যবস্থা তিনি করেছেন। অনাথদের শিক্ষাদীক্ষা ভরণ-পোষন সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি নিজের হাতেই করেছেন। তিনি অনাথ অসহায়দের পাশে নিজে যেমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তেমনি মানুষের কাছে কুরআনের বাণী নিয়ে গেছেন তাদের সাহায্য করার জন্য। কুরআনের ঘোষণা,

> *"কক্ষণও নয়, বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করনা, এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য উৎসাহিত কর না, মীরাসের সব মাল সম্যকভাবে খেয়ে ফেল। ধন সম্পদের মায়ায় তোমরা বড়ই কাতর" (আল কুরআন ৮৯ ঃ ১৭-২০)*

কুরআন ও হাদীস উভয়ই অনাথদের প্রতি সম্মান জানিয়েছে। বার বার সাবধান করে এতিম বা অনাথদের ধন সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় তার দিকে আমাদের নজর ঘুরিয়েছে। নবী (সাঃ) সকলের প্রতি ছিলেন দয়ালু তা সত্ত্বেও তিনি অনাথদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের জানিয়েছেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

"মুসলিম গৃহগুলির মধ্যে সেই গৃহগুলিই উৎকৃষ্ট যেখানে অনাথ শিশুরা ভাল ব্যবহারে লালিত পালিত হয়। আর ওই গৃহগুলি নিকৃষ্ট যেখানে অনাথ শিশুরা লাঞ্ছিত হয়।"

নবী (সাঃ) এর এক সাথী আবু উম্মাহ বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

"যদি কোন ব্যক্তি অনাথ শিশুর মাথায় ভালবাসার হাত বুলায় আর এটা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে করে থাকে তাহলে তার হাত যতগুলি চুল স্পর্শ করে ততগুলি পুরস্কার সে পাবে এবং যদি একজন তার কাছে থাকা কোন অনাথ বালক বালিকার সাথে ভাল ব্যবহার করে তাহলে আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এরকম পাশাপাশি থাকব - বলে তিনি হাতের দুটি আঙুল একত্রিত করলেন।"

অনাথ শিশুরা নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে জানে না, কারণ যে অবস্থায় তারা পিতামাতাকে হারায় তখন তাদের পক্ষে বৈষয়িক জ্ঞান থাকে না, এই সুযোগে সমাজের অসৎ ব্যক্তিরা তাদের সম্পদে আত্মসাতের থাবা বসায়। এতে করে অনাথদের বৈধ অধিকার পরবর্তীতে নষ্ট হয়। কুরআন সেজন্য আমাদের সতর্ক করে বলে,

“যারা অনাথদের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, তারা মূলত: আগুন দ্বারা নিজেদের পেটকে ভর্ত্তি করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।”
(আল কুরআন ৪ ঃ ১০)

ইসলাম কেবলমাত্র অনাথদের যত্ন নেওয়ার কথা বলেনি বরং তারা যাতে প্রকৃতপক্ষে খোদাভীরু যোগ্য নাগরিক হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থার কথা বলে, যাতে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে।

অসহায়

কুরআনে অনাথ এতিমদের সাথে দরিদ্র মানুষের কথাও বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্র হল সেই ব্যক্তিরাই যারা জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন সংগ্রহ করতে পারে না তাদের শারীরিক ও আর্থিক অক্ষমতার কারণে। তাই এরকম মানুষ কেবল জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন পেলেই হবে না, বরং যাতে করে এই প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আর্থিক সমর্থন পায় তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অর্থাৎ তার এই অসহায় অবস্থা যাতে অল্পদিনের মধ্যে দূরীভুত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে সমাজকে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ সাহায্য পাওয়ার অধিকারীরা সমাজের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়। আর্থিকভাবে তারা পিছিয়ে পড়ে সমাজে, তাই সমাজের দায়িত্ব বর্তায় তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার। কুরআনের ঘোষণা,

“বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সেই সব লোকেরা যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোন চেষ্টা করতে পারে না। তাদের আত্মসম্মানবোধ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে তারা স্বচ্ছল অবস্থার লোক। তুমি তাদের চেহারা দেখেই ভিতরের অবস্থা বুঝতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকেদের ধরে ধরে ভিক্ষা করার মত লোক নয়। তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু জানমাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টি হতে গোপন থাকবে না।” (আল কুরআন ২ঃ ২৭৩)

কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি প্রাসঙ্গিক হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

“একজন দরিদ্র বলতে তাকে বোঝায় না যে দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়ায় আর তোমরা তার হাতে এক দু-মুঠো অন্ন কিংবা খেজুর দিয়ে থাক, বরং দরিদ্র হল

সেই ব্যক্তি যে নিজের জীবনের প্রাথমিক চাহিদারও অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে হাত পাতে না। কেউ তার অবস্থা বুঝতে পারে না যে সে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র।"

এইভাবে ইসলাম আমাদের প্রকৃত দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে খুঁজে বের করতে বলেছে সেই সঙ্গে তাদের এই অবস্থা পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলেছে।

অসুস্থ

নবী (সাঃ) প্রায় অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন। তিনি তাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের পাশে বসে তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। অসুস্থ ব্যক্তিরা যদি কোন কিছু খেতে চাইতেন তিনি খাবারের ব্যবস্থা করে দিতেন। তাদের সান্ত্বনা দিতে তিনি কখনই ভুলতেন না। আর বলতেন "আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে পড়বেন।" মুসলিম অমুসলিম যারই অসুস্থতার কথা তিনি শুনতেন তখন তাকে দেখতে সেখানে হাজির হতেন। এমনকি কপটদের নেতা উবাই পুত্র আব্দুল্লাহকেও তিনি দেখতে গিয়েছিলেন যখন সে অসুস্থ হয়েছিল। অথচ সে ছিল ইসলামের অন্যতম ঘোরতর শত্রু।

নারী

পাশ্চাত্যের উগ্র সমালোচনায় ইসলামে নারীর মর্যাদাকে এত খাটো করে দেখানো হয়েছে যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আমরা সাধারণত: পাশ্চাত্যের উদ্গীরনকে ভক্ষণ করে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে বিচার করি। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থাটা সম্পূর্ণ উল্টো। ইসলামে নারীর মর্যাদাকে বিশ্লেষণ করতে নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে।

ইসলামের নারীর সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে প্রাক ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থা প্রথমে আলোচনা করা দরকার। রোমীয় সভ্যতায় নারীকে দাস হিসাবে দেখা হত। গ্রীক সভ্যতায় নারী পণ্য সামগ্রীর মত কেনাবেচা হত বাজারে। খ্রিষ্টীয় সমাজে প্রাথমিক যুগে নারীকে পথভ্রষ্টা ভাবা হত। কারণ সেই প্রথমে মানুষকে পাপ কাজে আকৃষ্ট করেছিল বলে তাদের অভিমত। এ প্রসঙ্গে বাইবেল আদমকে ইভের বিশেষ বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ির গল্প বিদ্যমান। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার কথাতো আমরা সবাই জানি। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায়ভাবে নারীদেরকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে সতী হওয়ার জন্য আমরা সবাই গর্বিত ছিলাম। এই প্রথা কত হাজার বছর ধরে চলছিল তা বলা মুশকিল। মাত্র সেদিন রাজা রামমোহনের চেষ্টায় তা বন্ধ হয়েছে।

ফ্রান্সের ইতিহাসে ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একটা সভা হয়েছিল। বিষয় ছিল নারী

প্রকৃতপক্ষে মানবিক সত্তা কি-না। তৃতীয় হেনরী নারীদের জন্য বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এটা চলেছিল মধ্যযুগ পর্যন্ত। আর ক্যাথেলিক চার্চ নারীদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখতো। ১৮৫০ সালের আগে ইংল্যান্ডে নারীদের নাগরিক হিসাবে গননা করা হত না। আর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা নারীদের কোন ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করেনি।

ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম আসার আগে পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে নারীর মর্যাদা একেবারে ভুলুণ্ঠিত ছিল। পশুর চেয়েও তারা ছিল অবহেলার। তাদেরকে মানুষই ভাবা হত না কখনো। ধর্মীয় অধিকার তো দূরের কথা তাদের ব্যক্তিগত অধিকারও প্রদান করা হত না।

নবী (সাঃ) নারীদের এ অমর্যাদার কথা মেনে নিতে পারেননি। তিনি নারীদের মর্যাদার আসনে বসান। প্রাক ইসলামী সময়ে যখন কন্যা জন্মগ্রহণের খবরে সবাই মুখ ম্লান করে বসতেন। নবী (সাঃ) তখন তাদের শুনিয়েছিলেন স্বর্গলাভের সুখ সংবাদ। কুরআনের ঘোষণা,

> *“এবং যখন তাদের কন্যা সন্তানের সুখ সংবাদ জানানো হত তখন তাদের সুখ দুঃখে ভরে যেত।” (আল কুরআন ১৬ ঃ ৫৮)*

ইসলাম আসার প্রাকলগ্নে আরবের মাটিতে কন্যা সন্তানদের মেরে ফেলার হিড়িক ছিল সর্বত্র। নবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের সতর্ক করে দিলেন যে, কিয়ামতের দিনে এই ভয়াবহ আচরণের জন্য তারা মারাত্মকভাবে পাকড়াও হবেন। মূলত: তিনটি কারণে আরবরা তাদের কন্যাদের মেরে ফেলতেন। কুরআনে উল্লেখ হয়েছে প্রথমত, তারা সন্তানদের হত্যা করত দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য।

> *“নিশ্চয় ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেইসব লোকেরা যারা নিজেদের সন্তানদের মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিককে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয় পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা কস্মিনকালেও সঠিক পথপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্যে গন্য ছিল না।”*
> *(কুরআন ৬ ঃ ১৪০)*

দ্বিতীয়ত তারা সন্তানদের হত্যা করত দরিদ্রতার ভয়ে,

> “হে মুহাম্মদ! এই লোকদের বল যে, তোমরা এস, আমি তোমাদের শোনাব তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, (তা হল) এই যে তার সাথে কাউকে শরীক করবেনা,

মাতা পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করবেনা।" (আল কুরআন ৬ ঃ ১৫১)

সতের নাম্বার সূরায় বলা হয়েছে,

"নিজেদের সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না, আমি তাদের ও তোমাদের উভয়কেই রিযিক দান করব, বস্তুত তাদেরকে হত্যা করা একটি অতিবড় অপরাধ।" (আল কুরআন ১৭ ঃ ৩১)

সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা এক ধরনের মনোবিকার বলা যেতে পারে। অতীত যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল যুগে এ মানসিক ব্যাধি আমাদের গ্রাস করে রেখেছে। বর্তমান যুগে ভ্রুন হত্যাও এ ধরনের প্রবণতা থেকে আসে।

তখন আরব জগতে নবজাত শিশু কন্যাকে মাটিতেই পুঁতে দেওয়া হত নির্বিচারে। আর প্রায় দশজনের মধ্যে একজন লোক একাজ করে থাকেন সকলের জ্ঞাতসারে। কেবলমাত্র পুরুষেরা জঘন্য একাজে অংশ নিতেন তা নয়, তাদের সাথে নারীরাও অংশ নিতেন নির্দয়ভাবে। মায়েরা তাদের শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবরে প্রোথিত করার জন্য তুলে দিতেন নিষ্ঠুর পিতার হাতে। আর এ ধারা বজায় থেকেছে আজও কন্যা ভ্রুন হত্যার মধ্য দিয়ে।

UNICEF World Childrens Report অনুসারে আমাদের ভারতেই নারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে যেখানে একহাজার পুরুষ সেখানে নারীর সংখ্যা ন'শ চুয়ান্ন জন। নারী জন্মহার এই নিম্নগামী হওয়ার কারণ হিসাবে কন্যা ভ্রুন হত্যাকেই দায়ী করা হয়েছে। একটা হিসাবে এটা উঠে এসেছে যে ভারতবর্ষে প্রতি বছর কন্যা ভ্রুন হত্যা করা হচ্ছে কম করে ৭০ মিলিয়নের মত। এই ধরনের মারাত্মক পরিসংখ্যান মানবধ্বংস বিপর্যয়কারী সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। আমাদের লজ্জা আমরা এখনও সচেতন নই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা জোর করে এটা বলে থাকি যে আমরা সভ্য জগতের নাগরিক। এমন এক শক্তিশালী মিশ্র সংস্কৃতি যেখানে নারী পুরুষের সমানাধিকারের নামে গলা ফাটানো হয় সেখানে এত বিপর্যয়কারী চিন্তা ধারা নিয়ে আমরা কন্যা ভ্রুন হত্যা করার মত অন্যায় কাজ করে থাকি ? কেবলমাত্র ছেলে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখালেই কি মানব জাতির ভারসাম্য বজায় থাকবে ?

কুরআন কিয়ামতের দিনে এর প্রাসঙ্গিকতা টেনে আমাদের সর্তকতা করে বলে,

"যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কি কারণে

তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" *(কুরআন ৮১ ঃ ৮-৯)*

এক সময় নবী (সাঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি তার ইসলামপূর্ব জীবনের এক ভয়ানক কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। তিনি তার এক কন্যাকে মরুভূমির বুকে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাটি চাপিয়ে দিচ্ছিলেন আর নিষ্পাপ কন্যাটি আব্বু আব্বু করে চিৎকার করছিল কিন্তু নিষ্ঠুর লোকটি তার কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেনি। নবী (সাঃ) এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

কুরআন সামগ্রীকভাবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। প্রথমেই পিতামাতার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন এনেছিল ইসলাম। ইসলাম শিক্ষা দেয় ছেলে মেয়ে উভয়েই সমান। তাদের কারোর প্রতি বৈষম্য আনা যাবে না। বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদে কোন রূপ ভেদ টানা মানে পুরো সমাজটাকেই একেবারে শেষ করে ফেলার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। তবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কন্যা সন্তানদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছিল সেজন্য কন্যা সন্তানদের মর্যাদার প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবে বেশি দিতে হয়েছিল রসূল (সাঃ)কে। আর এর চেয়ে বড় উদাহরণ হল নবী (সাঃ) তার কন্যা ফাতিমাকে বেশি ভালবাসতেন। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করে, নবী (সাঃ) বলেন,

> *"নবী (সাঃ) তাঁর দুটি আঙ্গুল পাশাপাশি একত্রিত করে বললেন আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এরকম কাছাকাছি থাকব যে দুটি কন্যাকে যথাযথভাবে বড় করে তুলবে।"*

নবী (সাঃ) এটা ভালভাবে বুঝিয়েছেন কোন পরিবারের কন্যা সন্তান কোন অবহেলার পাত্র নয়। বরং কন্যা সন্তান গর্বের। কোন ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে লালন পালনের জন্য সম্মান হিসাবে কিয়ামতের দিনে পাবেন নবীর সান্নিধ্য, এটা কম ব্যাপার নয়। সমস্ত আরব উপদ্বীপে তখন বৈবাহিক রীতিনীতি ছিল বিচিত্র ধরনের। একজন ব্যক্তি বহু বিবাহ করতে পারত, যখন তখন কারণ না থাকলেও। কেবলমাত্র ইচ্ছাই ছিল কারণ। এমনকি সামাজিক স্ট্যাটাসে অনেকে দশ-কুড়ি অথবা একশটি মেয়েকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করত। এর চেয়ে আরোও সহজ ব্যাপার ছিল বিবাহ বিচ্ছেদ। কোন রকম কারণ ব্যাতিরেকেই একাজ করতে পারত পুরুষেরা। কুরআন এ ধরনের আরবীয় বদ অভ্যাসের উপর বিধি আরোপ করে একটা ভারসাম্য এনেছিলো। মেয়েদের উপর আর এক ধরনের অনাচার ছিল: পুরুষেরা যে কোন স্ত্রীর উপর এই শপথ গ্রহণ করত যে তারা তাদের সাথে কোন সংস্রব রাখবেনা, এবং তাকে তালাকও দেবে না। এতে নারী জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে যেত। নতুন করে বিয়ে করে নতুন জীবনযাপন করারও কোন সুযোগ ছিল না নারীদের। সেজন্য কোন কোন নারীর সারাটা জীবন এভাবে এক দায়িত্বের বন্ধনে কাটত নিদারুন দুঃখের সাথে। কুরআন এ প্রসঙ্গে সাবধান করে দিয়েছে পুরুষদের।

প্রাক ইসলামী যুগে নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পেতেন না। বরং নারীকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হত বা ঋণ মেটানোর জন্য অপরের হাতে তুলে দেওয়া হত। কিন্তু কুরআন নারীদের উত্তরাধিকার প্রদান করে সম্মানের সাথে। উত্তরাধিকারীদের অংশ কোথা থেকে ও কতটা পাবে তাও উল্লেখ করে বলা হয় কুরআনে।

এক সময় খালিফা উমর (রাঃ) বলেন,

> "প্রাক ইসলামী যুগে আমরা নারীদের কোন সম্পদ থাক এটা মানতাম না। পরে যখন ইসলাম এল এবং কুরআন তাদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বলল, আমরা তখন বাস্তবে অনুভব করলাম তাদের অধিকার আমাদের উপর ছিল।"

পৃথিবীতে ইসলাম'ই প্রথম নারীদের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইসলামে নারীদের মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে অনেক কিছুই করেছে। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে মানব ইতিহাসে লিঙ্গ বৈষম্যতা না থাকলেও তার কোন আইনি স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু ইসলাম নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দান করেছে। যার ফলে নারী পেয়েছে তার জীবন, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা, শোষণ থেকে সে বাঁচার অধিকার পেয়েছে ইসলামের মধ্যে। একজন মানব সত্তার স্বাধীন বিকাশ হিসাবে যা যা দরকার ইসলাম নারীকে সে সব অধিকার প্রদান করেছে।

আর নারীদের এ অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য নবী (সাঃ) নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছেন সমাজে। তার দীর্ঘ তেইশ বছর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারী কল্যাণের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই তিনি দিয়েছিলেন। তখন তার জীবনের যেমন নিরাপত্তা ছিল, তেমনি ছিল তার সম্পদের। পুরুষের সাথে সাথে নারীও পেত সকল প্রকার ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পাদন করার অধিকার। ধর্ষণের হাত থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন শাস্তি প্রদান আইন। সমাজে কোনদিক থেকে নারী তার মর্যাদা যাতে না হারায় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল রাষ্ট্রের। অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগে নারীর যে হীন অবস্থা ছিল তা থেকে রসূল (সাঃ) তাদের টেনে এনেছিলেন মর্যাদার সিংহাসনে। বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, মদ, হত্যা ইত্যাদিকে ঘিরে নারীর যে অবমাননার দিকগুলো সমাজে জোঁকের মত জাঁকিয়ে বসেছিল নবী (সাঃ) একে একে তা সব তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলিষ্ঠতার সাথে। বিভিন্ন নাচ, গানের আসর থেকে নারী জাতির ভোগকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। সমাজে এগুলোকে পরিস্কারভাবে অশ্লীলতা বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন নবী (সাঃ)।

নবী (সাঃ) এর এই সমাজ পরিবর্তনের অবদান দীর্ঘ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ভাবতেই পারা যায় না নবী (সাঃ) ওই জাহিলিয়াতের অজ্ঞযুগে

কিভাবে সমাজ পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন।

নবী (সাঃ) প্রত্যেক পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় হতে বলেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন দাম্পত্য জীবনে শান্তি স্থাপন না হলে সমাজ বিষিয়ে থাকবে সব সময়। তিনি বলেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে।"

ইসলামে নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়ণ

ইসলাম নারীকে সঠিক মর্যাদা প্রদান করেছে আর এখানে আল্লাহর বিধানও লজ্জিত হয়নি। অন্যান্য ধর্ম ও মানব রচিত মতবাদগুলো নারীদের সঠিক মর্যাদা কি হবে তা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে বলা যেতে পারে। বর্তমান যুগে নারীকে এক ভোগ্যপণ্য হিসাবে সমাজে টেনে আনা হয়েছে। কাল্পনিক সমানাধিকারের দোহাই দিয়ে নারীরা নিজেরা নিজেদের মর্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনেও।

তারা এখন সমাজে শোষণের শিকার হচ্ছে সর্বত্র। স্বাধীনতা ও সাম্যের স্লোগান তুলে তারা আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে সর্বত্র। ফ্যাশান শো'র হাত ধরে তাদের শালীন মর্যাদা পুরুষ চক্ষুর বিনোদন হয়ে উঠেছে সমাজের সর্বস্তরেই। আর একাজে দ্রুত প্রসার ঘটাচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া ও বৈদ্যুতিন মিডিয়াগুলো। বিজ্ঞাপন জগতের হাত ধরে নারীর শরীর হতে আজ পোষাক খুলে পড়েছে। আর এ জন্য তাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে গৃহের বাইরে। আর এর ফলে সমাজজীবনে এসেছে মারাত্মক পরিণতি। শান্তি র বাতাবরণ আর কোথাও নেই, তা ঘরের ভিতরেও নয় আর বাইরেও নয়। তাই একথা বলা যেতে পারে যতক্ষণ না আমরা নারী শোষণ থেকে সমাজকে বাঁচাতে পারব ততক্ষণ সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব না।

কিন্তু ইসলামে নারী স্বাধীনতার রূপরেখা ভিন্ন প্রকৃতির। যা সমাজে শান্তি আনতে পারবে। ইসলাম নারী সমাজের জন্য কতকগুলো মূল্যবোধ সম্পন্ন অধিকার প্রদান করেছে যেগুলো হল,

১) ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যবস্থা হল বৈধ এক আবেগতাড়িত জৈব সন্তুষ্টি যা কিনা পারিবারিক দৃঢ়তা ও সংযুক্তি স্থাপন করে। ইসলামে এই বিবাহ চুক্তি সমাজে নারীদের এক ইতিবাচক মর্যাদাকে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে।

২) যখন কোন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সে তার কুমারীত্ব থেকে নিজেকে স্বাধীন ভাবে এবং এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

৩) নারী তার স্বামী নির্ধারণ ও নির্বাচনে স্বাধীন মত পোষণ করতে পারবে, বিয়েতে তার অনুমতি ও সম্মতি একেবারে অপরিহার্য বিষয়।

৪) মুসলিম বিয়েতে নারীকে বরপণ প্রদান করতে হয় না। বরং পুরুষকে প্রদান করতে হয় 'মোহর'। আর এই মোহর প্রদান করতে হয় বিয়ের সময় সকলের সামনে। এর অধিকার লাভ করে থাকে নারী। এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে সে ব্যয় করতে পারে।

৫) ইসলাম নারী বা তার পিতৃ পরিবার থেকে কোন পণ আদায়ের অধিকার পুরুষকে দেয় না।

৬) নারী তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে, পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর গৃহে চলে গেলেও পিতার সম্পত্তির অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৭) পিতামাতার কাছ থেকে নারী যে সম্পদ পায় সে তারই মালিক। সে এগুলো নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে। স্বামীর কিংবা তার পরিবারের কারো এ সম্পদ ভোগ করার অধিকার নেই তার সম্মতি ব্যতিত। এইভাবে একদিক থেকে পিতৃ পরিবার ও স্বামীর পরিবার থেকে সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকে নারী।

৮) এই সম্পত্তি সে রাখতে পারে বা বিক্রিও করতে পারে স্বাধীনভাবে।

৯) কুরআন নারীদের প্রতি মুসলমানদের সদয় হতে বলেছে।

"হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসোনা। এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং যে মোহরানা তোমরা তাদের দান করেছ তাদেরকে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়।"

কুরআন পুরুষদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যাতে করে নারীরা তাদের নিরাপত্তা লাভ করে সমাজে। যে সকল অর্থ তারা বিভিন্ন উৎস হতে পেয়ে থাকে তা তারা ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী, তারা ইচ্ছা করলে পুরুষের সংসারে তা ব্যয় করতে পারে অথবা তা নাও করতে পারে।

১০) নারীকে 'খুলা' নামে ধর্মীয় অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা তাকে স্বাধীন চিন্তা বিকাশে সহায়তা করে। এই অধিকারবলে কোন নারী ইচ্ছা করলে পুরুষের কাছ থেকে দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ নিতে পারে।

১১) কুরআনে নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যখন তখন কোন নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া যায় না। এরকমটি করলে

অপবাদ রটনাকারীকে পেতে হবে নির্দিষ্ট শাস্তি। নারীর সম্মান রক্ষার্থে এ এক যুগান্ত কারী অধিকার। কুরআনে বলা হয়েছে,

> *"আর যারা পবিত্রা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করবে আর তার জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি কোড়া মারো। আর তাদের সাক্ষ কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।"*

১২) বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা ইচ্ছে করলে পুনরায় নিজেদের পছন্দমত পুরুষকে বিবাহ করতে পারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। প্রাক্ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এ অধিকার নারীরা পেত না। কোন সময়ে যদি নারীরা এই রকম আকস্মিক সমস্যায় পতিত হত তাহলে আর উপায় ছিল না। জীবনের অবশিষ্ট সময়টা অতি দুঃখ কষ্টে কাটাতে হত তাদের। শুধু আরবে নয় সারা বিশ্বের নারীদের পোহাতে হত এ করুণ পরিণতি।

১৩) ইসলাম নারীদের কর্মের অধিকার প্রদান করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে নারী তার যে কোন বৈধ পেশা বেছে নিতে পারে। ইসলাম নারীদের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চায় না। যে যে পেশায় দক্ষ তাকে সেই পেশায় কাজ করতে ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে থাকে। হস্তশিল্প, চাষবাস, ব্যবসা কোন ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীকে বাধা দেয় না। কিন্তু সবকিছু হতে হবে ইসলামের বিধিনিষেধের অধীনে। হজরতের এক স্ত্রী জয়নাব হস্তশিল্পে অতি দক্ষ ছিলেন।

১৪) ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মর্যাদা একেবারেই সমান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নারী পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য একই। কুরআনের ভাষায়,

> "উত্তরে তাদের প্রভু আল্লাহ বললেন আমি তোমাদের মধ্যে কারোও কাজকে বিনষ্ট করে দেব না। পুরুষ হোক কিংবা নারী তোমরা সকলেই সমজাতের লোক।" (কুরআন ৩ ঃ ১৯৫)

> "হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং এই উভয় হতেই বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী লোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজেদের অধিকার দাবী করে থাক এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চয় জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"

> "যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে,

> আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট।" *(কুরআন ৪ ঃ ৩২)*

কুরআন আরো বলে,

> *"যে ব্যক্তিই সৎ কাজ করবে, সে নারী কিংবা পুরুষ, যদি সে মু'মিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবনযাপন করাব। আর পরকালে এই ধরনের লোকেদের তাদের উত্তম আমল অনুপাতে প্রতিফল প্রদান করবো।" (কুরআন ১৬ ঃ ৯৭)*

১৫) ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে জ্ঞানার্জন করার উৎসাহ প্রদান করে। শুধু উৎসাহ দান নয় বরং বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। প্রাথমিক যুগে নবী (সাঃ) এর জীবনী লেখক ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) এর উপর যখন অহী অবতীর্ন হত তখন তা যেমনভাবে পুরুষদের শোনাতেন তেমনিভাবে মহিলাদের জড়ো করেও তিনি তা তাদের শোনাতেন। নারী পুরুষ যাতে সমান শিক্ষার অধিকার পায় নবী (সাঃ) সে ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। যার ফলে সে যুগে নারীরা ছিল বৈষয়িক জ্ঞানে সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে তারা শাস্ত্রীয় হাদীস, কুরআনের জ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। মা আয়েশা (রাঃ)-র কাছ থেকে আমরা হাদীস না জানতে পারলে এক প্রকার হাদীস শাস্ত্র অসমাপ্তই থেকে যেত।

১৬) বিচার ব্যবস্থায় নারীদের সাক্ষী গ্রহণ এবং তাদের স্বাধীন মতামত পেশ করার স্বীকৃতি দান করেছে ইসলাম। এতে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়নি নারীর উপর।

ইসলামী সংস্কৃতিতে এই ধরনের অধিকার প্রদান করেছেন আল্লাহর রসূল এবং কুরআন। আমরা এটা বলতে পারি আল্লাহর চেয়ে বেশি কে জানতে পারে? তাই আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবনব্যবস্থা নারী জাতির জন্য কল্যাণকর ছাড়া কিছু নয়।

১৭) ইসলামী নীতিমালা যা কুরআন নারীদের প্রদান করেছে তা কখনও কারোর খেয়াল খুশি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। কোন সময় এই অধিকার সমূহ বাতিল করাও যেতে পারে না। কুরআনের এই নীতিমালা নারী সব সময়ের জন্য ভোগ করার অধিকার রাখে। এইভাবে ইসলাম নারীর মর্যাদাকে নিরাপত্তা দান করে। কুরআন যেখানে কোন প্রশ্নকে সামনে না রেখে সরাসরি নারীর অধিকারে স্বীকৃতি দান করে সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় সবে মাত্র কিছুদিন আগে নারীর কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই পাশ্চাত্যই নারীর আত্মা আছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল।

ইসলামী বিধানে নারীর উত্তরাধিকার অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন ?

প্রাক ইসলামী যুগে সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে কেবল পুত্ররা পিতার সম্পত্তি পেত। কিন্তু পরে ইসলাম যখন এল কুরআন ঘোষণা করল যে পিতার সম্পদে কন্যারও উত্তরাধিকার রয়েছে এবং তা পুত্রের অর্ধেক। এই রকম এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক। এর দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত: মহিলাদের যে পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে তার স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যটি হল মহিলাদের আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে তাদের স্বনির্ভরশীল করে তোলা।

কুরআনে মহিলাদের যে উত্তরাধিকার সুত্র বর্ণনা করা হয়েছে তাতে একজন নারী পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারে। স্বামীর কাছ থেকেও পেতে পারে। পেতে পারে পুত্রের কাছ থেকেও। এমনকি নি:সন্তান ভাইয়ের কাছ থেকেও। কূরআনের সূরা ‘নিসা’য় বিস্তৃতভাবে এটা আলোচনা করা হয়েছে। (সূরা নিসা ১১, ১২ এবং ১৭৬) এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সন্তান, পিতামাতা ও স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার নীতি বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে আরোও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে কে কতটা অংশ পেলে সমাজে ভারসাম্য থাকবে তা আল্লাহই ভাল জানেন, কেন না আল্লাহ ছাড়া বেশী জ্ঞান আর কারো নেই।

সাধারণভাবে চিন্তা করলে এটা মনে হবে যে পুত্র সন্তানদের অর্ধেক কন্যা সন্তানকে দেওয়া মানে কন্যা সন্তানকে অবমাননা করা। কিন্তু আজ থেকে আমাদের চিন্তা জগৎকে যদি সপ্তম শতাব্দীতে নিয়ে যাই তাহলে দেখব যে এটা কোন অবমাননা নয় বরং নারীদের সম্মান প্রদান করা। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক অসাধারণ পদক্ষেপ যা নবী (সাঃ) গ্রহণ করেছিলেন মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য। কারণ এর আগে অর্থনৈতিক দিক থেকে মহিলারা কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা কোন সময়েই সমাজে পায়নি। এখন আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি কেন পুরুষদের অর্ধেক নারীর উত্তরাধিকারের অংশ! এখন আমরা আরোও চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারি উত্তরাধিকারী অংশে নারীর ভূমিকা ও তার যথার্থতা। মহিলাদের ভূমিকার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে কুরআন মহিলাদের উপর কোন প্রকার অবিচার করেনি। এটা ছিল একটি যুক্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রদানের চূড়ান্ত নথি। ইসলাম সংসার পরিচালনা করার জন্য আর্থিক প্রয়োজনকে পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছে। আর পুরুষের খরচই স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণপোষণের, খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া ও অসুখ-বিসুখে পরিচালিত হয়। তাই নারীকে মুক্ত রাখা হয়েছে সংসারের অন্যান্য ঝামেলা থেকে। এই পরিস্থিতিতে যদি পুরুষকে তাদের উত্তরাধিকার নারীদের দ্বিগুন দেওয়া হয় তাতে কারো মাথা ব্যাথার কারণ থাকতে পারে না। পিতা, স্বামী বা

ভাই যখন পরিবারের এরকম হাজারো সমস্যার মোকাবিলা করে থাকে তখন নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব একেবারে শূন্য বলা যেতে পারে। তাই পাশ্চাত্য ইসলামী উত্তরাধিকার আইন নিয়ে যতই সমালোচনা করুক না কেন তাতে ইসলামের কিছু এসে যায় না।

ইসলাম চেষ্টা করেছে সমাজে নারী পুরুষের অর্থনৈতিক জীবনে একটা ভারসাম্য আনার জন্য। ইসলামী সমাজে নারী যেখানে অর্থ কেবল বিনিয়োগ করার সুয়োগ পায় সেখানে পুরুষকে পারিবারের অনেক দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। তাই নারীর উত্তরাধিকারের অংশ কম হওয়াতে কোন প্রকার ত্রুটি দেখা যায় না।

মনে করুন এক ব্যক্তি মারা গেলেন আর তার পুত্র যে সম্পদ পেলেন কন্যা তার অর্ধেক পেল। এখানে পুত্রের সম্পদ তার সংসারে ব্যয় করতে সে বাধ্য থাকে কিন্তু তার বোন যে সম্পদ পায় তা সে বিনিয়োগ করতে পারে আবার তার যখন বিয়ে হয় সে তার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা ও অন্যান্য যে সকল যৌতুক পায় তাও সে বিনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু পুত্র সন্তানের এরকম কোন সুযোগ ঘটে না। এতে তার পক্ষে হয়ত পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সমস্তটাই তার ভোগের খাতায় ব্যয় হয়ে যায়। বিনিয়োগ হয়ত হয়নাই বললে চলে। এইভাবে বিশ্লেষণ করার পর একজন ব্যক্তি নিশ্চয়ভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার স্বপক্ষে মত না দিয়ে পারেন না। তার কাছে এটা প্রতীয়মান হবে যে ইসলামে পুত্রের চেয়ে কন্যার উত্তরাধিকারের অংশ আরো বেশি পরিমাণের হয়ে থাকে।

ইসলামে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হল একটি সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারী যেমন কতকগুলি অধিকার না বলতেই পেয়ে থাকে তেমনি তার উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও আরোপিত হয়।

১) মুসলিম নারীকে প্রথমেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনতে হবে। নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকে আদায় করতে হবে। রমযান মাসে তাকে রোযা রাখতে হবে। যাকাত প্রদান করতে হবে। আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ থাকলে তাকে হজ্বও পালন করতে হবে।

২) নিজের সতীত্বের যত্ন নিতে হবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। বিবাহ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সাথে যে কোন ধরনের গোপন সম্পর্ক রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৩) মুসলিম নারীকে ভদ্র পোষাক পরিধান করতে হবে। যখনই সে বাইরে বেরুবে

তখন তাকে হিজাব পরিধান করে বেরুতে হবে।

৪) ইসলামী নিয়ম মেনে সন্তানদের উত্তম চরিত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মুসলিম নারীর। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুবিধা অসুবিধাগুলোও তাকে দেখতে হবে মনোযোগ সহকারে। সকলের সাথে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সংসারে যাতে শান্তি বিরাজ করে তার সুব্যবস্থা করতে হবে নারীকে। প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবারের রাজরানী হলেন নারী।

৫) ইসলাম স্বামী, স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক ঘোষণা দিয়েছে। কেউ কারোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব স্বাধীন মতামত ও দায়িত্ব-কর্তব্য। এইভাবে তারা পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যদিয়ে এক শান্তিপূর্ণ পরিবারের পত্তন ঘটাতে পারে। আর এইভাবে গড়ে উঠতে পারে সুস্থ এক সমৃদ্ধশীল সমাজ।

ইসলামে হিজাব ব্যবস্থা

ইসলামের হিজাব, বোরকা অথবা ঘোমটা নিয়ে অনেক নেতিবাচক আলোচনা হয়েছে পাশ্চাত্যে। আর এই আলোচনায় দেখানো হয়েছে হিজাব বোরখা বা ঘোমটা মূলত নারীকে অবদমিত করে রাখে। পাশ্চাত্যের এই নিন্দুকেরা না বুঝেই ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আঘাত হেনেছে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম নারীদের হিজাব গ্রহণের ব্যাপারটা অনেকটা ছাঁচে ঢালা ব্যাপারের মত হয়েছে। বর্তমানে এর একটি রাজনৈতিক পটভূমিকাও তৈরী হয়েছে। কিন্তু কুরআন হিজাব সম্বন্ধে কি বলে তা আমাদের জানা দরকার। কুরআনে শালীন পোষাক বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল হিজাব। কুরআনে এই শব্দটি আটবার ব্যবহার করা হয়েছে। আক্ষরিকভাবে হিজাব কথাটির অর্থ হল পর্দা, পার্টিশান অথবা আড়াল করার বস্তু। আর ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিমদের কাছে হিজাব হল এমন শালীন পোষাক যা মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া যায়।

মহিলারা হিজাব পরবে অবশ্যই তা হবে ঢিলেঢালা। এটা তাকে সম্মান দেবে এবং ভদ্র সমাজের পরিচয় প্রদান করবে। ভারত উপমহাদেশে এ ধরনের পোষাককে বোরকা বলেই অভিহিত করা হয়। ইরানে কালো চাদর জড়িয়ে পরাকে হিজাবের মর্যাদা দেওয়া হয়। আরব দেশগুলোতে 'আবায়া' নামে বহির্বাসকেও হিজাবের পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। আর মাথায় আলাদা করে স্কার্ফ বা রুমাল বাঁধা সারা বিশ্বে প্রচলিত আছে। কুরআনের ঘোষণা,

> *"আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বল তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জা-স্থানসমূহের হেফাজত*

করে ও সাজ-সজ্জা না দেখায়, কেবল সেই সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবং নিজেদের বক্ষ দেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে আর নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, ... তারা নিজেদের পা যমীনের উপর জোরে জোরে ফেলবে না, এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে তা লোকেরা জানতে পারে...... ।"
(কুরআন ২৪ ঃ ৩১)

নারী পুরুষ উভয়কেই ভদ্র হওয়ার জন্য কুরআন উপদেশ প্রদান করে। তাদের দৃষ্টি, চলাফেরা, আচার-আচরণে সবকিছুর মধ্যে যেন সুস্পষ্ট শালীনতা বিরাজ করে ইসলাম সেটা চায়। কিন্তু নিন্দুক সমালোচকেরা হিজাবের পবিত্র পোষাককে প্রগতি বিরোধী বলে ধুয়ো তুলে ইসলামকে কলঙ্কিত করতে চায় এবং হিজাবকে নারীর জন্য অবমাননাকর জিনিস বলে প্রচার করে থাকে। হিজাব নারীর জন্য অবমাননাকর, ক্ষতিকর নাকি বে-হিজাব অবমাননাকর ও ক্ষতিকর তা বিশ্বের সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কুরআনে পুরুষদের চাল-চলনও সংযত করার জন্য বলা হয়েছে।

"হে নবী মুসলিম পুরুষদের বল! তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জা-স্থানসমূহের হিফাজত করে। এ তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি, যা তারা করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি জানেন।"

মুহাম্মাদ (সাঃ) দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা উদ্রেককারী সমস্ত কিছুকে অনুমোদন করেছেন। কিন্তু কোন বৈধ সম্পর্ক ছাড়া যৌন সম্পর্ককে তিনি কখনই বরদাশত্ করেননি।

ঢিলেঢালা বোরকার মত পোষাকের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। স্কিন টাইট পোষাক পরার চেয়ে মহিলাদের বোরকা জাতীয় পোষাকে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য ও শালীনতা বজায় থাকে- এ বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। যারা বোরকা পরিধান করে চলাফেরা করে তাদের চেয়ে স্বল্প পোষাক পরে সিনেমা, নাচ-গান, বিজ্ঞাপণে যারা নেমে পড়েছে তারা বেশি লাঞ্ছিত হচ্ছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে ভোগবাদী যুগে বস্তুবাদীরা অবশ্য বোরকার গুণাগুণ খুঁজে পাবেন না। তারা তা বন্ধ করার জন্য সারা বিশ্বে হৈ চৈ ফেলে দেয়। পাশ্চাত্যবাসীরা এক বিরাট আশঙ্কার সম্মুখীন। তারা ভাবছে হিজাবকে যদি বাজেয়াপ্ত না করা যায় তাহলে তাদের ঘরের মহিলারাই একদিন হিজাব গ্রহণ করে ফেলবে। কারণ তারা চোখের সামনেই দেখছে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা লরেন বুথকে, দেখেছে

মারিয়াম জামিলাকে, দেখেছে বিট্রিশ জার্নালিষ্ট ইউভন রিডলিকে, ইংরেজি সাহিত্যিক কমলা সুরাইয়াকে এবং আরো অনেককে যারা হিজাবের মহত্বগুণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন পাশ্চাত্য সমালোচকরা ভাবতে বসেছে কি করে তারা সমালোচনা করবে বোরকার। কি করে সমালোচনা করবে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে। তারা তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, তাদের সমাজের করুণ অবস্থা। কাল যারা প্রগতিবাদের বড়াই করে হিজাবের সমালোচনা করেছিল আজ তারা তাদেরই সমালোচিত হিজাবকে বেছে নিচ্ছে নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য। এখন তাদের ভাবা উচিত কেন আজ সমাজে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, দাম্পত্য জীবনে কেন পবিত্রতা নেই। স্বামী স্ত্রী উভয় উভয়কেই সন্দেহের চোখে দেখছে। আর কেনই বা তারা লাম্পট্য জীবনযাত্রায় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নারী উদ্দামতায় যারা সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে তারা কি ভাববেন না সমাজের কি অবস্থা? কোন দিকে ছুটে চলেছে সমাজ?

বস্তুবাদীরা যে নারী স্বাধীনতার হাঁকডাক চালাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয় বরং তা মুখোশ। আর এই মুখোশের আড়াল থেকে তারা আজ নারী সমাজকে ভোগ করতে চায় যথেচ্ছভাবে। নারীর মান সম্মানের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। যৌনবাজারীদের কাছে নারীর মূল্য আশা করা যায় না। তারা আজ নারীকে টেনে এনেছে রঙীন পর্দায়। হাটে বাজারে, সমুদ্র সৈকতে, নির্জনে, ভ্রমণ স্থানে ভোগ করার স্বার্থে।

একদিকে যেমন বলা হচ্ছে তাদের নানান স্বাধীনতার কথা তেমনি তাদের মৌলিক স্বাধনিতাও লুণ্ঠিত করা হচ্ছে যত্রতত্র। এমনকি তারা কি পরিধান করবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে, সব কিছু নির্ধারণ করা হচ্ছে যৌন ব্যবসায়ীদের দ্বারা।

হিজাব বা বোরকা হল মুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক। অন্যান্যদের এটাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের বিভিন্ন পোষাক রয়েছে। যেমন, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা পরে 'হাবিত', পাস্তররা পরে 'রোব', তেমনিভাবে বিভিন্ন পেশার লোকেরাও বিভিন্ন পোশাক পরে থাকে। যেমন উকিলেরা পরে কালো আলখেল্লা, ডাক্তারেরা পরে প্রন। সমাজে এরা কোথাও সমালোচিত হয় না। কিন্তু মুসলিম মহিলারা শালীন পোষাক বোরকা পরে সমালোচিত হয়। অথচ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের পোষাক ও বোরকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। আজকের সমালোচকদের একথা ভাল করে বুঝতে হবে যে বোরকার মধ্যে যে শালীনতা ফুটে ওঠে তা অন্য যে কোন পোষাকের চেয়ে উত্তম।

হিজাব হল সভ্যতার চরম বিকাশ

এটাই সত্য যে কোন নোবেল বিজয়িনীকে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না। এরকমই একজন নোবেল বিজয়িনী হলেন তায়াক্কুল কারমান ইয়েমেনী। তিনি ২০১১ সালে নোবেল প্রাইজ পান শান্তির জন্য। তিনি তার এই প্রাইজ আনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন 'Nobel Peace Prize Award Ceremony' অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে। মজার ব্যাপার তিনি যখন প্রাইজ নিচ্ছিলেন তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ঝলক তাকে ছেঁকে ধরেছিল। কারণ ছিল একটাই তিনি পরিহিত ছিলেন 'আবয়া' নামক বোরকা সদৃশ্য পোষাক। বিভিন্ন মিডিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি আপনার এ ধরনের পোষাক পরার কারণে আপনার শিক্ষা দীক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধির সাথে এটাকে বেমানান ভাবেন না, তাছাড়া এটা কি নারীর প্রতি অবিচার ও পশ্চাৎপদতা নয়? নোবেল বিজয়ীনি তায়াক্কুল কারমান উত্তর দিলেন,

"প্রগৌতিহাসিক যুগে মানুষ উলঙ্গই থাকত। তারপর যত উন্নতি লাভ করল মানব সভ্যতা ততই তার পোষাক গ্রহণ করতে শুরু করল। আমি যে পোষাক পরেছি তা হল মানব সভ্যতার চরম বিকাশের ফল। এটা পশ্চাদপদতা নয়। নগ্ন হওয়া অর্থাৎ পোষাক সংকীর্ন করার প্রবণতা আসলে পশ্চাদপদতার দিকে ফিরে যাওয়ারই লক্ষণ।"

আমাদের খুব পরিচিত আর একজন প্রয়াত নোবেল বিজয়িনীর নাম না বলে পারছিনা। তিনি হলেন আমাদের দেশের গর্বের ধন। মাদার টেরেজা, তার ড্রেস নিয়ে কি আমারা কখনো ভেবেছি? তাকেও যদি এই প্রশ্ন করা হত তাহলে তিনিও হয়ত একই উত্তর দিতেন।

13

উহুদের যুদ্ধ

সমাজ সংস্কারের বিরাট ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকেও নবী (সাঃ) নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারের সজাগ ছিলেন সব সময়। মদিনাবাসীরা যাতে শত্রুর কবলে না পড়ে তার জন্য রসূল (সাঃ) ছিলেন উদ্বিগ্ন। তিনি এটা ভাল করেই জানতেন যে কুরাইশরা বদর যুদ্ধে হেরে গেলেও নিভে যায়নি। তারা সময় বুঝে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবে এবং সেজন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটা রসূল (সাঃ) এর কাছে অজানা ছিল না। এই সময় নবী (সাঃ) তাঁর চাচা আব্বাস রা:-র কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। এতে তিনি জানতে পারলেন কুরাইশরা তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এই খবর পেয়ে নবী (সাঃ) মাত্র এক সপ্তাহ চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য।

নবী (সাঃ) খুব তাড়াতাড়ি করে তাঁর সাথিদের ডাকলেন এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। সবাই পরামর্শে বসলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর দুটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এল। কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন শহরের বাইরে না বেরিয়ে শত্রুদের আক্রমণের অপেক্ষা করাই উচিত এবং যখন শত্রুরা শহরের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যুক্তিসঙ্গত হবে। আবার অনেকেই প্রস্তাব রাখল যে, শত্রুরা মদিনা শহরে আক্রমণ করার আগেই তাদের জন্য এগিয়ে যাওয়া দরকার এবং মুখোমুখি যুদ্ধ করাই শ্রেয় হবে। নবী (সাঃ) অবশ্য শহরের বাইরে না গিয়ে বরং ভিতরে থেকে শত্রু আক্রমণের পক্ষপতি ছিলেন। মুনাফিক উবাই পুত্র আবদুল্লাহ সহ এই মতের সমর্থন করেছিলেন অন্যান্য অনেক সাথি। কিন্তু পরে নবী (সাঃ) এর মত গৃহীত হয়নি। কারণ অনেক যুবক যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি তারা শহরের বাইরে গিয়ে বীরের মত মুখোমুখি যুদ্ধ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। বেশীর ভাগ সাথিরা মদিনার বাইরে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধকে বেশি কল্যাণকর ভেবেছিলেন। তাই নবী (সাঃ) মুখোমুখি যুদ্ধের প্রস্তাবকে মেনে নেন এবং এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে তিনি যুদ্ধ অভিযানকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। নবী (সাঃ) অধিকাংশের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করায় কিছু সাহাবী ভেবেছিলেন রসূলের অবাধ্য হয়ে গেলাম

নাকি এবং এতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে তারা রসূলকে তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তে ফিরে যেতে বার বার আবেদন করলেন। কিন্তু রসূল (সাঃ) যে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিয়েছেন তা তাদের কাছে পরিস্কার করলেন এবং এগিয়ে চললেন সম্মুখ সমরে।

উহুদ প্রান্তরের দিকে অভিযান

এটা ছিল তৃতীয় হিজরী। ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ ২৩শে মার্চ। মুসলিম সেনারা এগিয়ে চলল উহুদের দিকে মদিনা থেকে পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে। মুসলমানেরা সংখ্যায় ছিল একহাজার। অপরপক্ষে শত্রুপক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মুসলিম সৈন্যরা যখন সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পথিমধ্যে মুনাফিক উবাই পুত্র আব্দুল্লাহ তার অধীন তিনশত সেনা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই সময়ে তার এই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা বড় মারাত্মক ব্যাপার হল সবার কাছে। কিন্তু এই মুহূর্তে রসূল (সাঃ) এর করার কিছু ছিল না। আব্দুল্লাহ তার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদিনার ভিতর থেকে শত্রুদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেক আগে থেকেই মুসলীমরা মুনাফিক আবদুল্লাহ সম্বন্ধে সন্ধিহান ছিলেন। এখন এ ঘটনায় একেবারে তার মুনাফেকী আচরণ প্রকাশ হয়ে পড়ল সবার কাছে। মুসলিম সৈন্যরা এ ঘটনায় কিছুটা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেও সামনের দিকে তারা এগিয়ে চলল দৃঢ়তার সাথে।

মুসলিম সৈন্যদের এক অজ্ঞাতপথ ধরে এগিয়ে যেতে হয়েছিল যাতে করে তাদের কোলাহল যেন কেউ না জানতে পারে। এই সময় নবী (সাঃ) এক বিশ্বস্ত পথ প্রদর্শককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকলেন। তিনি মুসলীম সৈন্যদের পথ দেখিয়ে তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে হাজির হলেন। মুসলিম সৈন্যরা যে যার স্থান নিলেন। এবং নবী (সাঃ) তাদের সকলকে যুদ্ধ অভিযানের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরভাবে। তীরন্দাজরা তাদের অবস্থান নিল পাহাড়ী পথে। আর অশ্বারোহী ও সাধারণ সৈন্যরা সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধের জন্য সমভূমিতে সমবেত হলেন। নবী (সাঃ) তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে উপদেশ দিলেন,

"যদি তোমরা আমাদের নিহত হতে দেখ তাহলেও আমাদের সাহায্যের জন্য এ স্থান ত্যাগ করবে না, এমনকি পাখি যদি আমাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে তবুও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না যতক্ষন না আমি তোমাদের ডেকে নিই। আমরা জিতি বা হারি তোমরা তোমাদের এই অবস্থান থেকে নড়বে না। দাঁড়িয়ে থাকবে দৃঢ়তার সাথে। মনে রাখবে কোন ভাবেই যেন এ দিক থেকে আমরা আক্রান্ত না হই।"

নবী (সাঃ) তীরন্দাজদের খুব কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন পাহাড়ের

গলিপথ থেকে তাদের সরে না যাওয়ার জন্য কারণ এই পথ দিয়ে পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুব বেশী। তাই নবী (সাঃ) নিজ বিচক্ষণতার গুণে বুঝতে পেরে এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে কুরাইশরা পেছন দিক থেকে আক্রমন না করতে পারে।

নবী (সাঃ) যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছিল। যুদ্ধের শুরু থেকে কুরাইশদের একটি বিশেষ সৈন্যদল এই গিরিপথ বেয়ে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু প্রহরারত মুসলিম তীরন্দাজবাহিনীর তীর বর্ষণের মুখে তারা নাস্তানাবুদ হয়ে যায় এবং ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে নবী (সাঃ) এর পরিকল্পনা ছিল একেবারে যথার্থ।

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা

নিম্ন সমভূমিতে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী একটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হল। অপর দিকে কুরাইশরা মাঠে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং নানান অসুবিধার সম্মুখীন হল। কিন্তু মুসলীম সৈন্যরা যথেষ্ঠ সাহস পেল।

মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দুজন মহিলা শক্তি সাহসে ভর করে এগিয়ে এসেছিলেন যুদ্ধ ময়দানে। তাঁদের একজন হলেন উম্মে সুলাইম এবং অপরজন এক আনসার মহিলা, যার নাম ‘নুশেবা’। এঁরা যুদ্ধের ময়দানে পানি সরবরাহ করছিলেন, আহত সেনাদের সেবা যত্ন করছিলেন। সেই সঙ্গে সৈন্যদের কাছে তীর ও অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে রাখছিলেন। এমনকি মাঝে মাঝে তারা একেবারে যুদ্ধে অংশগ্রহন করে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। নবী (সাঃ) এই সকল মহিলাদের যুদ্ধে আমন্ত্রণ করেননি। কিন্তু তারা যখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন তিনি তাদের নিষেধও করেননি। বরং তিনি তাদের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোওয়া প্রার্থনা করেছিলেন।

একটু পরেই এটা পরিস্কার হল যে মুসলিমদের জয় অনিবার্য হয়েছে। আর এর জন্য মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে। ক্ষয় ক্ষতির পরিমানও তেমন নয়। আর এ অবস্থায় মুসলিমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল এবং কুরাইশরা তাদের যুদ্ধ রসদ সব কিছু ফেলে রেখেই পিছন দিকে হটে যাচ্ছিল। এই সময় যে সকল তীরন্দাজ গিরিমুখে দাঁড়িয়েছিলেন পাহারারত অবস্থায় তারা মুসলিমদের বিজয় লক্ষ্য করল। তাই তাদের মন বিজয়োল্লাসে অনেকটা আন্দোলিত হয়ে পড়ল। তাদের কাছে এটা মনে হল যে বর্তমান পরিস্থিতি তাদেরই অনুকূলে। এখুনি তাদের বিজয় পতাকা উত্তীর্ন হবে এটা তারা আসা করল। নবী (সাঃ) যে সাবধান বাণী তাদের দিয়েছিলেন তা তারা বিস্মিত হল বিজয়ানন্দে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে

পড়ল। তীরন্দাজ বাহিনীর বিশাল দল নিচে নেমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহকে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করল। যেমনি সিদ্ধান্ত, তেমনি কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও চল্লিশজন তীরন্দাজ তাদের কর্তব্যে অনড় থেকে গিরিপথে তীর উঁচিয়ে পাহারা দিতে থাকলেন।

এই সময় কুরাইশ সৈন্যদের এক নেতা খালিদ এ দৃশ্য লক্ষ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছন দিক থেকে গিরিপথ বেয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বভাবতই মুসলিম বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক। অনেকেই নিহত হল, অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। আবার অনেকেই কি করবে ভাবতেই পারল না। অনেকেই কি ঘটনা ঘটছে তা অনুমানই করতে পারছিল না।

এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) আক্রান্ত হলেন। এমনকি একটুর জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন। এক পাথরের আঘাতে তাঁর উপরের ঠোঁট কেটে গেল এবং সামনের একটি দাঁতও খসে পড়ল। অপর এক আঘাতে মাথার হেলমেট ভেঙ্গে কপাল থেকে রক্ত স্রোত বইতে শুরু করল। তিনি তক্ষনাৎ মূর্চ্ছা গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা ছজন নিহত হলেন। কোন রকমে সপ্তম জন আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এই সময় মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এক বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিল মুসলিমদের মধ্যে। তার কিছু সাথি তাকে বয়ে নিয়ে এল পাহাড়ের উপর এবং সেখানেই তার সেবা করতে লাগলেন।

মুসলিমরা এ অবস্থায় নিজেদের সমস্যা বুঝতে পারল। তাই তারা সবাই একে একে জড়ো হল একত্রে এবং পুনরায় যুদ্ধের প্রয়োজন হলে তারা যুদ্ধ করবে এই সিদ্ধান্ত নিল। যখন যুদ্ধ শেষ হল তখন মুসলিমরা দেখল তাদের সত্তর জন শহীদ হয়েছে অপরপক্ষে শত্রুপক্ষে নিহত হয়েছে বাইশজন। এ ঘটনায় তারা অনেকটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

প্রতিহিংসা

এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হন রসূলের চাচা হামজা রাঃ। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার দেহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে সংকল্প নিয়েছিল হামজার কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার এবং রক্ত পান করার জন্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবিসিনিয়ার এক বল্লমধারী হামজা রাঃকে বল্লমের আঘাতে নিহত করে। অনেক খোঁজার পর হিন্দা যখন হামজা রাঃ-র দেহ পেল তখন পূর্বের প্রতিজ্ঞা মত হামজা রাঃ-র লাশের উপর বসে তার বুক বিদীর্ন করে কলিজা টুকরো নিয়ে পৈশাচিকভাবে চিবাতে লাগল। রক্তপান করল হিংস্র নেকড়ের মত, তার

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করে কেটে টুকরো টুকরো করে নিজের গলার হার বানাল এবং পৈশাচিক নৃত্যে কুরাইশদের হিংসার আগুন জাগিয়ে তুলল দাবানলের মত।

কুরাইশরা তাদের মৃত সৈন্যদের দেহ যুদ্ধ থেকে বহন করে বাইরে নিয়ে গেল। মুসলিমরা খুব দুঃখের সঙ্গে দেখল যে তাদের সৈন্যদের লাশগুলোর উপর অকথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। নবী (সাঃ) যখন তার চাচা হামজা রা: ক্ষতবিক্ষত বিকৃত দেহ দেখলেন মনে অত্যধিক আঘাত পেলেন।

নবী (সাঃ) জীবিত কিংবা মৃত কোন দেহকে বিকৃত করার অনুমতি দেননি। তিনি ভাবতেন সমগ্র মানব সত্তা এক। কারোর মর্যাদা কম বেশি নয়। আল্লাহর সৃষ্টি এ সুন্দর দেহকে বিকৃত করার কারোর অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আচরণ মানুষের প্রতি অমর্যাদা।

তীরন্দাজদের আনুগত্যের অভাব

উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হল রসূলের প্রতি আনুগত্যের অভাব। রসূল (সাঃ) বারবার তীরন্দাজদের সাবধান করেছিলেন তাদের স্ব স্ব স্থান ত্যাগ না করার জন্য। কিন্তু যখন তারা মুসলিমদের প্রাথমিক বিজয় লক্ষ্য করল তখন তারা রসূলের কথা ভুলে গেল এবং শত্রুপক্ষের ফেলে যাওয়া অর্থের প্রতি লোভী হয়ে তা সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ত্যাগ করল। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা যুগের পেশাদারি আচরণ। তারা আল্লাহকে অভাব মোচনকারী না ভেবে যুদ্ধের মাল সংগ্রহ বড় বলে মনে করেছিল। তারা ভেবেছিল এই অর্থ পেয়েই তারা বড় লোক হয়ে যাবে। অর্থ লোভ তাদের এতটা পেয়ে বসেছিল, যে নবী (সাঃ) তাদেরকে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করেছিলেন তা তারা ভুলেই গিয়েছিল। আর এই সুযোগে বিখ্যাত সমরবিদ খালিদ বিন অলিদ তাদের উপর আক্রমন করে বসে পিছন দিক থেকে। অবশ্য অল্প দিন পরেই এই খালিদ বিন অলিদই ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে ধন্য হয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলীমদের পরাজয় অনেকগুলো শিক্ষা প্রদান করে। মানুষের প্রকৃতিগত অতীত অভ্যাস সহজে ছেড়ে যায় না। আর তাদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের পথও রচনা করা যায় না সার্বিকভাবে। মুসলিমদের অতীতের এক দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট তাদের সর্বনাশ যেকে এনেছিল।

শূরা বা পরামর্শ সভা

মুসলিমরা মদিনায় ফিরলেন, অনেকেই আহত। হতাশাগ্রস্তও ছিলেন অনেকে। নবীর প্রতি তাদের আনুগত্যের অভাব তারা নিজেরাই অনুভব করলেন হাড়ে হাড়ে। তাদের অনেকে সঙ্গীকে হারিয়ে এসেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজেই ছিলেন আহত।

তার সঙ্গে অন্যান্য আরোও অনেকে আহত ছিলেন।

কয়েকটা দিন কেটে গেল মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অহী নাজিল হল। উহুদের যুদ্ধে যে প্রকৌশলগত ত্রুটি ছিল তা বলা হল অহীতে। অতীতে নবীর প্রতি অবাধ্যতার ভয়াবহ দিকটিও তুলে ধরা হল এখানে। সাহাবীদের মৃত্যু ও নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর গুজব সম্বন্ধে আলোচিত হয় এই অহীতে।

এই অবস্থায় নবী (সাঃ) একেবারে চুপচাপ থাকলেন। যে সকল তীরন্দাজ সাথিরা যুদ্ধ ময়দানে অর্থ সম্পদ সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি তাদের সাথে বোঝাপড়া করলেন। তারা নবী (সাঃ) এর কথা অমান্য করে কি ভুল করেছিল তাও তাদের বোধগম্যতায় এল।

> কুরআনে-এ প্রসঙ্গে নবী (সাঃ)কে তার নীতির উপর দৃঢ় থাকতে বলে ঘোষণা করা হল- *"হে নবী! এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষান হৃদয়ের অধিকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত। অতএব তাদের অপরাধ মাফ করে দাও। তাদের জন্য পরকালে মুক্তির দোওয়া কর এবং দ্বীন ইসলামের কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অবশ্য কোন বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে।" (কুরআন ৩ ঃ ১৫৯)*

উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের সূত্রপাত হয়েছিল নবী (সাঃ) এর মতকে অগ্রাহ্য করে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে এবং পরে তার শেষ পরিণতি হয়েছিল গিরিপথে নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যদের রসূলের আদেশকে উপেক্ষা করার জন্য।

এখানে কুরআন পরামর্শের উপদেশ প্রদান করে এবং তার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। ফল যা হবার তা হবে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষকে নিয়ে সিদ্ধান্তের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সে জন্য মুসলিম হল তারা যারা পরামর্শে আগ্রহী। কুরআনের এই অহী সম্ভবত রসূলের প্রতি উপেক্ষার ফলে অবতীর্ন হয়েছিল তবুও কিন্তু রসূলকে কঠোর হৃদয় বা মেজাজী না হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে তাকে ঘিরে রাখা সাহাবীদের মধ্যেও একটা শান্তির পরিবেশ গড়ে ওঠে। যে সকল তীরন্দাজ সৈন্য অর্থ সম্পদ সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ছেড়ে দিয়েছিল তাদেরকেও নবী (সাঃ) কোনরকম ভর্তসনা করলেন না। আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই অতিমানবিক

আচরণ দেখে সাহাবীরা তাদের সমস্ত রকম ব্যাথা বেদনা ভুলতে পেরেছিলেন। আর তারা এই যুদ্ধের পরাজয় থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিনয়

'নম্রতা'-এই শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ "হিউমিলিটি"। এই হিউমিলিটি শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'humus'-থেকে যার অর্থ মাটি। সে জন্যই আমাদের নাম hominis-মানব সত্তা। সাধারণভাবে আমরা বলি আমরা মাটি থেকেই সৃষ্টি আর মৃত্যুর পর মাটিতেই ফিরে যাব। যাইহোক শব্দটির মধ্যে একটি ইতিবাচক অর্থ লুকিয়ে আছে। কুরআনে এই নমনীয়তার প্রসঙ্গ এসেছে, নবী (সাঃ) বলেন "বিনয় ও সৌজন্য হল আল্লাহকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পথ" কুরআনে বলা হয়েছে,

> *"তোমরা পৃথিবীতে গর্বভাবে চলাফেরা করো না। কেননা তোমরা তো পৃথিবীকে বিদীর্ন করতে পারবে না, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে।" (কুরআন ১৭ ঃ ৩৭)*

> *"লোকেদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না, না যমীনের উপর অহংকার সহকারে চলাফেরা করবে। আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (কুরআন ৩১ ঃ ১৮)*

নবী (সাঃ) সবসময় আল্লাহর ভয়ে থাকতেন, সর্বদা বিনয়ের চিত্র তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠত।

মদিনায় তিনি যে ঘরে বাস করতেন তা ছিল কাঁচা ইটের গাঁথুনি দেওয়া দেওয়াল, যার ছাউনি ছিল খেজুর শাখা দিয়ে। এ ঘর তৈরী করতে কোন মিস্ত্রি ডেকে আনেননি বরং নিতান্ত নিজের হাতেই তৈরী ছিল এইঘর। এই ঘর ছিল ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যেগুলোতে তাঁর স্ত্রীরা বসবাস করতেন। নিজের আলাদা ঘুমানোর কোন কুঠির ছিল না, তিনি ছিলেন যেন এক বেদুইন, যিনি তাঁবুর মহারাজা, পরবর্তীতে নবী (সাঃ) মোটা পর্দা ব্যবহার করেছিলেন কুঠিরগুলোকে আলাদা আলাদা করার জন্য। তাঁর জীবন ছিল খুবই সাদাসিধা। যখন তিনি দেশের সর্বময় শাসক হলেন, স্বাভাবিকভাবে কাজও বেড়ে গেল অনেক। কারণ তিনি তো প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি। কিন্তু তার বিনয় তাকে ছেড়ে গেল না বরং রাত্রিতে তিনি আল্লাহর কাছে এক উৎসগকৃত বান্দাহ হিসাবে সময় কাটাতেন। বিনয়ের সাথে তার মাথা সিজদায় ঝুকে পড়ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার বিনয় অবনত হাত উত্তোলিত হত মহান প্রভুর কাছে। প্রায় প্রতি রাত্রিতে তিনি দুই তৃতীয়াংশ কাটাতেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটিতে। গভীর রাত্রিতে

তার অশ্রু চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়তো। এমনকি শিশুর মত তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন।

নবী (সাঃ)-র বাড়ির আসবাবপত্র ছিল খুবই মামুলি ধরনের, খেজুর পাতার চাটাই, কম্বল, সামান্য পানির পাত্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না বললে চলে। অথচ তিনি তখন ছিলেন আরব উপদ্বীপের তৎকালীন সার্বভৌম শাসক। একসময় এই সাদাসিধা জীবনের উপর আপত্তি তুলে স্ত্রীরা তার কাছে আয়েশী জীবনের উপকরণ দাবী করে বসে। কিন্তু তিনি তাদের আবদার মেনে নেননি, খাবার জন্য তিনি কোন ডাইনিং টেবিল খোঁজেননি বরং স্বাভাবিক বেদুইনী ভঙ্গিতে মাটিতে বসে আহার করতেন, খুব সাধারণ মানের খাবার খেতেন। সাধারণত সাদা কাপড় পরতে তিনি ভালবাসতেন, যে ঘর থেকে সারা বিশ্বের বুকে আলো ছড়িয়ে গিয়েছিল সেই ঘর অনেক সময় থাকত অন্ধকারে কারণ বাড়িতে প্রদীপের তেলটুকুও জুটত না সব সময়।

আরবের শাসক হিসাবে তিনি সব কিছু পেয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি নিজ পরিবারের ভরণপোষণের জন্যও কিছু উত্তরাধিকার সম্পদ রেখে যাননি।

> "নবীদের কোন উত্তরাধিকার নেই, যা কিছু রেখে যান তা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য"

এশিয়া আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত যার শাসনক্ষমতা বিস্তারলাভ করেছিল এবং যিনি ছিলেন বিশ্বের মহান সম্রাট- এই ছিল তাঁর জীবনের ইতিকথা।

আমি তো কেবল পথিক মাত্র

মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সমগ্র আরব উপদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি। আর তাঁর ছিল অতি অনুগত একদল সাহাবা বা সাথী, তারা এতটাই অনুগত ছিল যে সমগ্র মানব ইতিহাসে তাঁদের মত অনুগত অনুসারী আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

হজরত উমর রা: ছিলেন নবী (সাঃ)-র একেবারে কাছের সঙ্গী। তিনি নবী (সাঃ)কে তাঁর বাড়িতে কি অবস্থায় দেখেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন নিচের ভাষায়,

"যখন আমি তার কুঠিরে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম তিনি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন তার গায়ে কোন জামা ছিল না। যার ফলে মাদুরের স্পষ্ট রেখা তার দেহে ফুটে উঠেছে। পাশে পড়ে আছে কাঠের একটি খাটিয়া যাতে অল্প পরিমান যব গুচ্ছ ছিল, এ দেখে আমি সাহায্য করতে পারলাম না কিন্তু কেঁদে ফেললাম। নবী (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কি জন্য কাঁদছ' আমি

উত্তরে বললাম রোমান ও পারস্যের সম্রাটেরা সকল প্রকার পার্থিব আরাম আয়েশ ভোগ করেছেন আর আপনি আল্লাহর রসূল হওয়া স্বত্তেও এরকম অভাব অনটন সহ্য করছেন। এই কথা শুনে নবী (সাঃ) উঠে বসলেন এবং বললেন উমর দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ ? ওরা এই পৃথিবীতে পাবে আর আমি পাব পরকালে এটা কি তুমি চাওনা?"

অল্প দিনের মধ্যে মদিনা সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) এর গৃহে রান্না হতনা টানা কয়েকদিন, কারণ ঘরে কিছু থাকতনা রান্নার জন্য। অথচ তিনি ছিলেন বিশাল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। খাদ্য বলতে তিনি কয়েকটি খেজুর ও একটু পানি খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। কোন সময়েই তাঁর ঘরে খাদ্যশষ্য তিন দিনের বেশী মজুত থাকত না।

একদিন এক আনসারী মহিলা নবী (সাঃ) বাড়িতে এলেন আয়েশা রাঃ-র সাথে সাক্ষাত করার জন্য। তিনি দেখলেন নবী (সাঃ) যে বিছানায় ঘুমান সেটি সাধারণ কম্বলের। এই দেখে তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং একটি উলের গদি আনলেন নবী (সাঃ)-র জন্য। যখন নবী (সাঃ) আয়েশা রাঃ-র কাছে ব্যাপারটা শুনলেন তিনি তা ফিরিয়ে দিতে বললেন। আয়েশা রাঃ এটা না ফিরিয়ে নিজের ঘরে রেখে দেওয়া ভাল মনে করলেন। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে আল্লাহ আমাকে উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ সোনা দিয়ে আমার ঘর পূর্ণ করে দিতেন।

একদিন নবী (সাঃ) মোটা এক মাদুরের উপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তাঁর দেহে মাদুরের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কয়েকজন সাথি তাঁকে বলল, যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমরা আপনার জন্য নরম বিছানা এনে দিই। নবী (সাঃ) বললেন,

> "দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক, আমি তো এক পথিক মাত্র যে আগুন ঝরা বিকেলে গাছের তলে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার তার যাত্রা শুরু করে।"

সদয় মন

আয়েশা রাঃ-র বর্ণনা অনুযায়ী নবী (সাঃ) ছিলেন খুবই উদার হৃদয়ের মানুষ। গৃহকাজের সমস্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন দায়িত্বপরায়ণ। তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, জুতো সারাতেন, ছাগল দোহন করতেন, চামড়ার ঝুড়ি বাঁধতেন, পশুদের জন্য নিজে ঘাস বহন করে নিয়ে যেতেন, গবাদী পশু দেখা শোনার জন্য যদিও কোন দাস থাকত

তিনি তাদের সাথে কাজ করতেন। নিজের কাপড়ের বোঝা নিয়ে বাজারে যেতেও কোন ইতস্ততা করতেন না। আয়েশা রাঃ আরোও বলেন যে তিনি পরিবারের সকলের প্রতি ছিলেন সদয়। নবী (সাঃ)-র মতো পরিবারের প্রতি সদয় ব্যক্তি আর দেখা যেত না কোথাও।

বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ঘোড়া ব্যবহার করতেন। অথচ তিনি নিজের হাতে ঘোড়ার গা ধুইয়ে দিতেন। তার নাক চোখ পরিস্কার করে দিতে কোন ইতস্ততবোধ করতেন না তিনি।

ছিলনা কোন বিশেষ ব্যবস্থা

চলার পথে নবী (সাঃ) কোন সময়ে সবাইয়ের আগে হাঁটতেন না মর্যাদার অহংকারে। বরং তিনি দাসও শিশুদের সন্মুখভাগে রাখতেন, কোন সভাতে তার জন্য আলাদা আসন পাতা থাকত না। সভার যেখানে ফাঁকা স্থান থাকত সেখানে তিনি নিজের জন্য স্থান করে নিতেন। তিনি বলতেন,

> "আমি তোমাদের মতই মানুষ, তোমাদের মত আমি খাবার গ্রহন করি এবং আমি তোমাদের মত বসে বিশ্রাম নিই যখন আমি ক্লান্ত হই।"

তাঁর সামনে কেউ মাথা নত করে দাঁড়াক এটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তার আগমনে কারোর দাঁড়িয়ে পড়াকেও ভীষণ ঘৃনা করতেন। এইরকম আচরণকারী কিছু ব্যক্তির উপর তিনি রেগে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের অন্যদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছিলেন। এক কথায় বলা যেতে পারে তিনি নিজের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা নিতে চাননি। কুরআনের ঘোষণা,

> "রহমানের বান্দাহ তারা যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে, আর অজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তাদের বলে দেয় যে তোমাদের উপর শান্তি।" (কুরআন ২৫ ঃ ৬৩)

ভেদাভেদের উর্দ্ধে

কোন এক ভ্রমণপথে নবী (সাঃ)-র সাথে অনেক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় তিনি তাদের একটি রান্না করার কথা বললেন। তখন সাহাবীদের একজন একটি ছাগল জবাই করল। অপরজন তার চামড়া ছাড়াল এবং অন্যজন রান্নার জন্য গেল। নবী (সাঃ) এই সময় জ্বালানী সংগ্রহে ব্যস্ত হলেন, তখন অন্যান্য সাহাবীরা তাঁর একাজে

বাঁধা দিয়ে বললেন "হে রসূল (সাঃ) আমরা সব কাজ করে ফেলব। আপনাকে করতে হবে না।" নবী (সাঃ) উত্তরে বললেন "হ্যাঁ আমি জানি তোমরা সব করে ফেলবে, কিন্তু এটা এক ধরনের ভেদাভেদ। যেটাকে আমি মানি না। আল্লাহ্ তাঁর কোন দাসকে অন্য কোন সঙ্গীর উপর প্রাধান্য দান করেননি।" এ ঘটনা থেকে আমরা একথা সহজেই বুঝতে পারি যে রসূল (সাঃ) ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর কাছে সকল মানুষই সমান। তাঁর কাছে শ্রমের মূল্য অনেক। শ্রম না হলে সমাজের অগ্রগতির চাকা বন্ধ হয়ে যায়। আর শ্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। যে কোন বৈধ শ্রম করতে কোন সময় ইতস্তত করা উচিত নয়।

অসাধারণ ধৈর্য

এক সময় সানাহ পুত্র যাদ নামে এক ইহুদীর কাছে রসূল (সাঃ) কিছু ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ঋণ পরিশোধের যে দিন ধার্য ছিল তার কয়েকদিন আগেই যাদ নবী (সাঃ)-র বাড়িতে এসে হাজির হয় এবং নবী (সাঃ)-র কাপড় জাপটে ধরে কর্কশ ভাষায় বলল, 'কেন তুমি ঋণ শোধ দাওনি। এই কিনা তুমি মুত্তালিবের বংশ, তারা তো সব সময় ঋণ পরিশোধ করে দিত'। কাছেই ছিলেন হজরত উমর রা:। তিনি ইহুদীর এরকম আচরণ দেখে বড়ই ক্রুদ্ধ হলেন, এমনকি ইহুদীটির উপর তখনই চড়াও হতে গেলেন। কিন্তু নবী (সাঃ) উমর রা:কে থামালেন এবং নিজেও চুপ করে রইলেন। ইহুদীটিকে তিনি ততক্ষণাৎ বললেন যে তার ঋণ শোধ করার জন্য যে দিন ধার্য করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে এখনও তিনদিন বাকি আছে। তারপর তিনি উমর রা:-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,

"যদিও আমি তোমার কাছ থেকে ভাল আচরণ আশা করছি, তুমি বরং বল আমার ঋন তুমি পরিশোধ করে দেবে যা ও চাইছে। যাও ওকে নিয়ে যাও ওর ঋন পরিশোধ করে দাও। কিন্তু যেহেতু তুমি ওকে ধমক দিয়েছ তাই ওকে অতিরিক্ত কুড়ি শা' বেশী দিও"।

এ ধরনের বিরল ঘটনা কেবল নবী-রসূলদের জীবনে দেখা যায়।। নবী (সাঃ) তখন ছিলেন মদিনার শাসনকর্তা, তাকে অপদস্থ করার সাহস পেয়েছে সামান্য এক ইহুদী নাগরিক। আর তার এই অসভ্য আচরণের জন্য নবী (সাঃ) কোন প্রকার বিরক্তবোধ করেননি, মজা দেখানোর মজায় মাতেননি, বরং উমর রা:-র খামাখা ধমক দেওয়ার জন্য ইহুদীকে অতিরিক্ত কিছু ফেরৎ দিতে বললেন। নজীরবিহীন ক্ষমাগুণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম মহৎ আদর্শের মানুষ খুঁজেই পাওয়া যায় না, তাই তো তিনি কেবল মহৎ নয় বরং মহত্তম।

রসূল (সাঃ)-র ছিল হৃদয় ভরা হাসি

নবী (সাঃ) সকলের সাথে মিলেমিশে বাস করতে ভালবাসতেন। সবাইকে তিনি সমান ভাবতেন, কোন সময় তিনি কাউকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেন না। আশ্চর্য এক ঘটনা একদিন এক মরু বেদুইন হঠাৎ নবী (সাঃ)-র কাছে এলো এবং তাঁর গলাবন্ধ ধরে হেঁচকা টান দিল। এত জোর টান দিল যে নবী (সাঃ)-র গলায় দাগ বসে গিয়েছিল। বেদুইনটি বলল "মুহাম্মদ ((সাঃ)) আমাকে দু'উট বোঝাই মালপত্র এখুনি দাও। কারণ এ সম্পদ তোমারও নয় এবং তোমার বাবারও নয়। এ সবকিছু আল্লাহরই, কিন্তু নবী (সাঃ) এতে রাগ করলেন না বরং বললেন "আমি তাঁর দাস।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আমার প্রতি তুমি যে আচরণ করলে তাতে কি তোমার ভয় করে না?" বেদুইন বলল 'না', নবী (সাঃ) পুনরায় বললেন 'কেন নয়'? বেদুইন দৃঢ়তার সাথে বলল "আমি জানি তুমি অন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায় করনা" –একথা শুনে নবী (সাঃ) মুচকি হেসে ফেললেন এবং সেই বেদুইনকে এক উট বোঝাই যব এবং এক উট বোঝাই খেজুর দান করে দিলেন।

নবী (সাঃ)-র সদয়তা

নবী (সাঃ) কাউকে ঘৃনা করতেন না, সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। নারী পুরুষের মর্যাদাকে তিনি সমানভাবে দেখতেন। মদিনার মসজিদে নববী ঝাঁট দিতেন একজন হাবসী মহিলা। নবী (সাঃ) তাকে সম্মানের চোখে দেখতেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন মসজিদ ঝাঁট দিতে এ মহিলাটি আসেন নি। তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন মহিলাটি মারা গিয়েছেন। এই খবর শুনে নবী (সাঃ) খুব দুঃখ পেলেন। তিনি দুঃখ করে বললেন "কেন তোমরা আমাকে খবর দাওনি? আমাকে তার কবর দেখাও।" তিনি সাহাবীদের সাথে কবরস্থানে গেলেন এবং তার জন্য জানাযার নামায আদায় করলেন।

শান্ত পরিবেশ তিনি পছন্দ করতেন

নবী (সাঃ) হৈ হট্টগোল পছন্দ করতেন না, শান্ত পরিবেশ ছিল তাঁর পছন্দীয়। সব সময় তিনি মর্যাদাশীল হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। অপরের মর্যাদার কোনপ্রকার ত্রুটি ঘটুক, তা তিনি চাইতেন না। শান্তভাবে চলাফেরা তিনি এতটাই পছন্দ করতেন যে নামাজে যোগদানের সময়ে ও তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছেন। মসজিদের মধ্যে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তিনি উপদেশ দিতেন। এক সময় তিনি হজ্বের ময়দানে খুবই হৈ-হুল্লোড়, প্রয়োজনের বেশি ব্যস্ততা ও তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করলেন, এতে তিনি এতটা অসন্তুষ্ট হলেন যে নিজের হাতের চাবুক উঁচিয়ে বললেন তাড়াহুড়ো করা কোন ধর্মীয় কাজ নয়।

মানবতার মুক্তি দূত

বিজেতা নেতাদের সাধারণত দু'ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তা হল গর্ব প্রকাশ ও প্রতিশোধ স্পৃহা। কিন্তু নবী (সাঃ) ছিলেন ভিন্ন ধরনের নেতা। এমনই বিজেতা, মক্কা বিজয়ের পর তিনি যে আচরণ মক্কাবাসীদের জন্য করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি যে সত্যিই মানবতার মুক্তিদূত ছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে ধ্রুব সত্য। প্রাচীন ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতার উদ্দেশ্যে মাথা এতটা হেট করেছিলেন যে তাঁর দাড়ি উটের হাওদার পাদানি স্পর্শ করেছিল। কাবা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বক্তব্য প্রদানকালে বলেছিলেন,

> *"আল্লাহ ছাড়া কারও প্রশংসা করা যায় না। তিনিই তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন এবং তিনিই সফলতা দান করেছেন। তিনিই তাঁর শত্রুদের অবনত করিয়েছেন।"*

মক্কা বিজয় করে যখন স্ত্রী আয়েশা রা:-র ঘরে এলেন তখন তিনি আয়েশার অতি অভ্যর্থনার জন্য বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন। কারণ আয়েশা রা: নিজের ঘরের দেওয়ালগুলোতে পর্দা টাঙিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। তিনি পরিস্কারভাবে জানিয়ে ছিলেন যে বিজয়দানকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। অতএব এখানে আল্লারই প্রশংসার জন্য সিজদাবনত হওয়া দরকার। তা না করে কোনপ্রকার আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করা জাহেলিয়াতেরই নামান্তর।

তিনি ছিলেন কেবল আল্লাহর দাস

এক সময় নবী (সাঃ)-র কোন এক সাহাবী তাঁর কাছে বলে ফেললেন "যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং তার রসূল ইচ্ছা করেন ..." এই কথা শুনে রসূল (সাঃ)-র মুখের বর্ণ রাগে পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি কঠোর ভাষায় বললেন,

> "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে এক করে দিলে? এরকম বলবে না বরং বল যদি আল্লাহ একাই ইচ্ছা করেন"।

এক সময় নবী (সাঃ) বলেন, "খ্রীষ্টানরা যেভাবে যীশু খ্রীষ্টকে অতিরঞ্জিতভাবে সম্মান দেখায় তোমরা আমাকে সেরকম করো না। তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস এবং আল্লাহর রসূল বলতে পার।"

নবী (সাঃ) বলেন, "তাদের প্রতি পরিতাপ, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে ভজনালয় বানিয়ে ফেলেছে, আমার কবরকে তোমরা পূজাবেদী বানিও না।"

14

খন্দক যুদ্ধ

বিদ্রোহ ও কৌশল অবলম্বন

উহুদ যুদ্ধের পর মদিনায় মুসলমানদের বসবাস করা অনেকটা মুসকিল হয়ে পড়ে ছিল। উহুদ যুদ্ধে কেবলমাত্র পরাজয় কিংবা সম্মানহানী ঘটেনি বরং নানাবিধ সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছিল। মদিনায় মুসলিম জাতির পাশাপাশি যে সকল অন্য জাতির মানুষেরা বাস করত তারা মুসলিমদের দুর্বল চোখে দেখতে শুরু করল। তারা যখন মুসলিমদের দুর্বল ভাবল তখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল। এমনকি মাঝে মাঝে মদিনা আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা দেখা গেল। নানান জায়গায় ছোট খাটো বিদ্রোহও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) কোথাও ১০০জন, কোথাও ১৫০ জনের এক একটি ছোট দল প্রেরণ করে তাদের শান্ত করলেন ও বিদ্রোহ দমন করলেন।

রসূলের চেষ্টা সাময়িক সফল হলেও এটা কোন স্থায়ী শান্তি আনল না। হিজরী চতুর্থ বছরে সংঘর্ষের আকারটা বড় করে দেখা দিল। মদিনায় মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে যেন লুকোচুরি খেলা চলল। সামনে যেন বড় ধরনের সংঘর্ষের সূত্রপাত হতে চলেছে তা সবাই টের পেয়েছিল। মক্কার কুরাইশদের চাপা ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকল। মূলতঃ কুরাইশ নেতারা তো চেয়েছিল আরব ভুখণ্ড থেকে ইসলামের সম্পূর্ণ মূলৎপাটন। তাই তারা তাদের ষড়যন্ত্র লাগাতার চালিয়ে রেখেছিল। মদিনায় মুসলিমদের আশেপাশে যে সকল ইহুদী ও বেদুইন গোষ্ঠী বাস করত কুরাইশরা তাদের সাথে জোট বাঁধল আর এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিল বনু নজীর গোত্রের লোকেরা। তারা কুরাইশদের প্রস্তাব দিল, একসঙ্গে ইসলামী এই নয়া আন্দোলনের উপর আঘাত হানলে তা আর টিকে থাকতে পারবেনা। এ রকম সুযোগের জন্য কুরাইশরা অপেক্ষা করেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। অবশেষে

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদী ও কুরাইশদের প্রায় দশ হাজার সৈন্যবাহিনী জোট বাঁধল। এদের মধ্যে ছিল বনু আসাদ, বনু গাতফান ও বনু সুলাইম গোত্রের লোকেরাও।

বিশাল সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলল। মদিনা আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছিল মুসলিমদের কেউ নেই এই আক্রমণ ঠেকানোর। চারিদিক থেকে দশ হাজার সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেলে মদিনাকে। এই পরিস্থিতিতে মদিনা যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্মুখীন হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

যখন কুরাইশদের বিশাল বাহিনী মদিনার দিকে এগিয়ে চলেছে তখন আল্লাহর রসূলের চাচা আব্বাস (রাঃ) আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি মক্কা থেকে মদিনায় একজন দূতকে পাঠিয়েদিলেন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করতে। আব্বাস (রাঃ)-র প্রেরীত দূত যখন মদিনায় পৌঁছলেন তখন রসূলের যুদ্ধ-বহর সাজিয়ে নিতে হাতে আর সময় নেই বললে চলে। বড় জোর একমাস সময় পাওয়া যেতে পারে। আর সার্বিক চেষ্টা চালিয়েও মাত্র তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহও কষ্টের। মাত্র তিন হাজার সৈন্য সংখ্যা অর্থাৎ প্রতিপক্ষের এক তৃতীয়াংশ।

যুদ্ধে বিদেশী কৌশল গ্রহণ

ইসলামী নিয়ম অনুয়ায়ী নবী (সাঃ) তাঁর সমস্ত সঙ্গীসাথিদের পরামর্শের জন্য একত্রিত করলেন। নবী (সাঃ) সকলের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি ও তার মোকাবিলা কিভাবে করা সম্ভব তা জানতে চাইলেন। কেউ কেউ বললেন বদর যুদ্ধের মতো আমাদের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করা উচিত। আবার অনেকে বললেন, সামনা সামনি যুদ্ধে না গিয়ে বরং মদিনাার ভিতরে অপেক্ষা করাই শ্রেয়, এর ফলে আত্মরক্ষা অনেকটা সহজ হবে।আর তাছাড়া উহুদ যুদ্ধে শহরের বাইরে যুদ্ধ করার পরিণতি কি হয়েছিল তা সবাইয়ের জানা। তাই আর বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করাই উচিত। সাহাবীদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক পার্সিয়ান, তার নাম সালমান (রাঃ)। আল্লাহ ও তার মনোনীত ইসলাম জানার জন্য তার অনুসন্ধিৎসা সম্বন্ধে অনেক বড় কাহিনী রয়েছে। আর সে জন্য তিনি নবী (সাঃ)-র সাথে সাক্ষাত ও তার সাথে বাস করার অভিপ্রায়ে মদিনায় এসেছিলেন। তিনি সামগ্রিকভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। নবী (সাঃ)-র বক্তব্য শোনার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্য, তার এই পরামর্শ সত্যিই সকলের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল। তিনি বললেন–

"হে আল্লাহর রসূল, পারস্যে আমরা যখন অশ্বারোহী সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা অনুভব করতাম তখন আমরা আমাদের শহরের চারিদিকে গভীর পরিখা খনন করে নিতাম। তাই আমাদের উচিত হবে আমাদের চারিদিকে একটি

পরিখা খনন করে নেওয়া।”

সালমান (রাঃ)-র এ প্রস্তাব সকলের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল এবং এর কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা সকলে অনুভব করল। হাতে অল্প সময়। সাহাবীগণ জোর কদমে কাজ চালিয়ে শহরের চারিদিকে একটা পরিখা খনন করলো মাত্র এক মাসের মধ্যে। এটি এতটা চওড়া করা হল যে, কোনপ্রকারে একটা ঘোড়া লাফিয়ে যেন পার না হতে পারে। আবার গভীরতাও ততটা করা হল। যাতে যুদ্ধের ঘোড়া লাফিয়ে এতে পড়লে ওঠার মত কোন প্রকার সুযোগ না থাকে।

এর আগে দু দুবার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে। উভয় পক্ষ একবার হেরেছে একবার জিতেছে। আর এই যুদ্ধ তৃতীয়বার, তাই হারা-জেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বদর যুদ্ধে কূপগুলিকে নিজেদের দখলে রাখা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। আবার উহুদ যুদ্ধের সময় গিরিপথে তীরন্দাজ মোতায়েন করা একটি কৌশল আর তৃতীয়বারে পরিখা খনন করা শত্রুদের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রতিহত করা বড় ধরনের যুদ্ধ কৌশল। এখানে নবী (সাঃ)-র বহির্দেশ হতে এ ধরনের যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করা খুবই বিচক্ষণতার লক্ষণ ছিল। সাহাবা সালমান (রাঃ) যখন এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি ও তার অন্যান্য সাহাবারা এর বড় ধরনের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিলেন। ভিন দেশীয় প্রকৌশল বলে তা কিছুতেই উপেক্ষা করেননি রসূল (সাঃ)। কেননা এতে বৈষয়িক অনেক উপকার ছিল কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক বাধাও এতে ছিলনা। মানুষের প্রতিভা, দক্ষতা, নবী (সাঃ) এর কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হত। তা ছাড়া কোন জাতির বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধিও শ্রদ্ধার অযোগ্য নয়। তাই এগুলি গ্রহণ করার ব্যাপারে রসূল (সাঃ) অহেতুক আমাদের গোঁড়া হতে বলেননি কখনও। দৃঢ়তার সাথে নবী (সাঃ) বলেন, *জ্ঞান হারানো সম্পদের মত, যেখানে পাও সংগ্রহ কর”।*

এটা দ্বারা বোঝা যায় মানুষের জন্য কল্যাণকর সমস্ত জ্ঞানকে গ্রহন করতে হবে। এতে কোন ইতস্তত করা চলবেনা। এ হল মানব সম্পদ, এর থেকে উপকার পাওয়া একান্ত জরুরী। নবী সঃ এর দ্বারা কেবল ভীন্ দেশীয় প্রকৌশল যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রহণ করার অনুমতি দেননি বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণকর সমস্ত প্রযুক্তি ও প্রকৌশলকে মুহাম্মাদ (সাঃ) গ্রহণ করার অনুমতি দান করেছেন। মানুষের জীবনে কল্যাণ আনতে পারে এরকম প্রকৌশল, সৃষ্টি ও সংস্কৃতি গ্রহণের মধ্যদিয়ে বিশ্বে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

পরিখা

মদিনার তিনদিক ঘিরে ছিল ঘরবাড়ি ও মরুদ্যান, কেবলমাত্র এক দিক ছিল খোলা। নবী (সাঃ) এই পরিখা খনন করার জন্য তিন হাজার সাহাবীকে নিযুক্ত করলেন। তিনি সকলকে মাত্র দশ গজ করে খনন করার দায়িত্ব দিলেন। পরিখার দৈর্ঘ ছিল ছয় কি.মি. আর প্রস্থ ছিল দশ গজের মত। মোট কাজের পরিমাণ ছিল তিন লাখ আটাশ হাজার বর্গ গজ। এত বড় কাজ সমাধা করতে সময় লেগেছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। তৎকালীন যুগে এত বড় কাজ এত অল্পদিনের মধ্যে সমাধান ইতিহাসে নজীর সৃষ্টি করেছিল। বুল ড্রেজার বা অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতিই তখন ছিলনা। হাতিয়ার বলতে কেবল ছিল গাঁইতি শাবল। আর মাটি বহনের জন্য বনু কুরাইজা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ধার করে আনা হয়ে ছিল ঝুড়ি। নবী (সাঃ) এর সাহাবীরা এখানে প্রাণ খুলে শ্রম দিয়েছিল। ভোর থেকে শুরু করে তারা কাজ করেছিল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আল্লাহর রসূল নিজেই একাজে- যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্যদের মত তিনি নিজেই কোদাল গাঁইতি চালিয়ে ছিলেন। ঝুড়ি ভর্তি মাটি নিজের কাঁধে বয়েছিলেন ইসলামের জন্য। তার এই কাজে কেউ বাধা দিলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন " আমি একজন সাধারন শ্রমিক"। সালমান ফারসি গাঁইতি চালিয়ে মাটি কাটছিলেন, এমন সময় এক বিশাল শক্ত পাথর তার খনন স্থানে দেখা গেল। তিনি বারবার চেষ্টা করেও ভাঁঙতে পারছিলেন না। এমন সময় নবী (সাঃ) তার কাছ থেকে গাঁইতিটা নিলেন এবং এমন আঘাত করলেন যে শক্ত পাথরটি ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল।

নবী (সাঃ)কে দেখলেই মনে হত তিনি সব ধরনের কাজ করার জন্য প্রস্তুত। গৃহস্থালী সমস্ত কাজ করতে তিনি কোন আলসেমি দেখাতেন না। আনাস রাঃ ছিলেন তার গৃহভৃত্য। আশ্চর্যের বিষয় তিনি নিজেই বনর্না করেছিলেন, "আমি নবী (সাঃ) এর যতটা সেবা করেছি তার চেয়ে তিনি আমার সেবা করেছেন অনেক বেশী। তিনি আমার উপর কখনও রাগেননি অথবা আমাকে কর্কশ স্বরে কিছু বলেন নি "।

নবী (সাঃ) কেবল বসে বসে কাজ দেখেননি বরং নিজেই অংশ নিয়ে ছিলেন এ কাজে, এসময় সাহাবারা কখনও তাকে আল্লাহর প্রসংশা করতে শুনেছেন আবার কখনও আবৃত্তি করতে শুনেছেন। আর তার সাথে কর্মরত সাহাবীরাও নবী (সাঃ) এর সাথে তাল ধরেছেন। এই ভাবে নবী (সাঃ) সমস্ত শ্রমিককূলের যুগিয়েছেন কর্ম প্রেরণা। নবী (সাঃ) যে গাঁথাগুলি এই সময় গাইছিলেন তার মধ্যে ছিল এক তৌহিদী চেতনা। যে চেতনা সারা বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের এক সূত্রে বাঁধার মহামন্ত্র।

শহরের চারিদিকে এ ধরনের পরিখা খননের জন্য খুবই উপকার হয়েছিল মুসলিমদের। কারন এটি টপকে শত্রুপক্ষের কোন অশ্বারোহী এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারছিল না। আবার ভিতর থেকে তীরন্দাজ বাহিনীরা অনবরত তীর বর্ষন করার সুয়োগ পেয়েছিল।

প্রাজ্ঞ কমান্ডার

নবী (সাঃ) পরিখা যুদ্ধের পরিকল্পনার দ্বারা এক মিলিটারী আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত গভীর বুদ্ধির পরিচয়। তিনিনিজেই এই যুদ্ধের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পরিখা কাটার কাজ শেষ হলে তিনি নিজেই ঘোড়ায় চেপে শহরের চারিদিকে ঘুরে এলেন। সঙ্গে ছিল কিছু বিশ্বস্ত কয়েকজন সাহাবা। এইভাবে তিনি নিজের চোখে সমস্থ কিছু যাচাই করে দেখে নিলেন। কোথাও কোন অসুবিধা আছে কিনা, নবী (সাঃ) এর এই পরিকল্পনা ছিল এক সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের মত। ঠিক সময় অর্থাৎ যুদ্ধে আক্রান্ত হওয়ার আগেই এত বড় একটা কাজ তিনি যথাযথভাবে সমাধা করেছিলেন- এটা সেই সময়ের জন্য মোটেই সহজ কথা নয়। ঠিক সময় কোন কাজ করার মধ্য দিয়ে দক্ষতার পরিচয় ফুটে ওঠে একজন সফলকাম ব্যক্তির।

যখন তিনি ভাল করে জানলেন যে কোথাও কোন ক্রুটি নেই তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। আর এটা ছিল আরব উপদ্বীপের যুদ্ধ প্রকৌশলে নতুন এক সংযোজন। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে মদিনার রণনীতিতে এই নতুন প্রকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত কুরাইশরা জানতে পারেননি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে যৌথ বাহিনী একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে পরিকল্পনা নিয়েছিল তার ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচার এটা এক বড় উপায় ছিল। এই সময় তিনি চেয়েছিলেন, মদিনার ভিতর যেন বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ না করে, আর ভেতর থেকে কেউ যেন বাইরে বেরিয়ে না যায়, এর ফলে স্বাভাবিক ভাবে যুদ্ধ নীতিতে যে নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে তা কুরাইশদের কাছে গোপন থাকতে পারবে। তাই তিনি চুপ করে থাকতে পারেননি। চব্বিশ ঘন্টা ধরে তিনি আলি (রাঃ)কে মদিনা সীমান্তে সতর্ক পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত রাখেন, এমন কি সে যুগে রসূলের মাথায় টাওয়ার স্থাপনের চিন্তা অনুভূত হয়েছিল। তাই তিনি সাহাবিদের কতগুলি ওয়াচ টওয়ার নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। যাতে করে শত্রু পক্ষের কেউ হঠাৎ করে ঢুকে পড়লে তা সবার নজরে এসে পড়ে।

নবী (সাঃ) সাহাবিদের আদেশ করলেন মদিনার বাইরের মাঠে বা গোলায় যে সকল খাদ্যশষ্য ও খাদ্যদ্রব্য রয়েছে তা যেন মদিনার ভিতরে নিয়ে চলে আসে। এর দ্বারা তিনি বেঁচে থাকার প্রধান উৎস খাদ্য সহজে শত্রুদের হাতে তুলে দিতে চাইলেন না। আর যদি তারা মদিনার ভিতরে খাদ্য দ্রব্যগুলি নিয়ে নেয় তাতেও বেশ কিছু দিন একেবারে বসে বসে খেতে পারবে মুসলিমরা এবং সহজে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। নবী (সাঃ) এর নির্দেশ পেয়ে সাহাবারা কাল বিলম্ব না করে মদিনার বাইরে যে

সমস্ত খাদ্যভান্ডার ছিল ও ক্ষেত খামারে যে খাদ্য ছিল তা মদিনার ভিতরে নিয়ে নিলেন যাতে করে অল্পদিনের মধ্যে শক্ররা খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়।

বিশাল কুরাইশ সৈন্যরা যখন দামামা বাজিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল। তখন মদিনায় মাত্র তিন হাজার সৈন্য পরিখার ভিতরে অপেক্ষা করে বসে রইল ধৈর্যের সাথে। নবী (সাঃ) এর এই ধরনের যুদ্ধ কৌশলে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত রোমানিয়ান লেখক মন্তব্য করে বলেছেন,

"The Soviet forces also adopted this strategy in their war against Germany. The either collected the produce or damaged the crops in the farms and orchards that lay in the path of the advancing German forces, lest they benefit from them or ruin them, this pertains to the 20^{th} century. Prophet Muhammad (s) however deployed this as early as the 7^{th} century. So when the Quraysh arrived on the border, they were taken by complete surprise. They had never met an enemy who so artfully stalled a direct engagement through a Trench. Nor had they encountered an enemy who deprived them of the produce from their fields and gardens. So the Quraysh soon ran out of food for the soldiers and fodder for their horses and camels."

জার্মানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নও এই প্রকৌশলই গ্রহণ করেছেন। তারা জার্মান সৈন্যরা যে পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিল সেই পথের ধারের সমস্ত ফসল তুলে নিয়েছিল অথবা নষ্ট করে দিয়েছিল। যাতে করে তারা এর থেকে উপকার পেতে না পারে অথবা নষ্ট না করতে পারে। এ কৌশলতো বিংশ শতাব্দীতে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু নবী (সাঃ) সপ্তম শতাব্দীতে এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাই কুরাইশ বাহিনী যখন মদিনার সীমানায় এসে পৌঁছল তখন অবাক হয়েই গিয়েছিল। তারা ইতিপূর্বে কখনোই এ ধরণের শক্রর মুখোমুখি হয়নি। যারা ইতিপূর্বে এত বিশাল পরীখা খনন করে তাদের পথ আটকে দিয়েছে। আর মাঠের সমস্ত ঘাস ও ফসল কেটে নিয়ে তাদের সামনে খাদ্য ও পশুখাদ্যের এমন সংকট সৃষ্টি করবে। তাই শীঘ্রই কুরাইশরা খাদ্যাভাবে পড়ল সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে যে ঘোড়া ও উটের বহর ছিল তাও খাদ্যাভাবে মারা পড়ার আশঙ্কায় রইল।

মদিনা প্রবেশ করায় বাধা

কুরাইশদের সেনা বহর ছিল ১০০০০ সৈন্যর। এর মধ্যে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৬০০ টি কিছু উটও ছিল সেনা বাহিনীতে। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে হাজির হল এক বিশাল বাহিনী। হিজরী সনে এটা ছিল চতুর্থ হিজরীর ঘটনা, কুরাইশ বাহিনী যখন সীমান্তে এল তখন তাদের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কারণ তারা দেখল মাঠের সমস্ত ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে। তাই তাদের সাথে গবাদি পশুগুলো না খেয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম হল। সঙ্গে যেটুকু পশুখাদ্য আনা হয়েছিল তা শীঘ্রই শেষের পথে। সে জন্য আর বিলম্ব করা চলবেনা। শীঘ্রই মুসলিম নিধন করে ফিরে যেতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা সম্মুখভাবে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু আগিয়ে গভীর পরিখার সম্মুখীন হল। পুরো শহরটা এরকম ঘেরা দেখে তারা মুসড়ে পড়ল হতাশায়। তারা যে মিলিত আক্রমণ চালিয়ে মদিনা শহরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে বলে চিন্তা ভাবনা করে এসেছিল, সে চিন্তায় হতাশা দেখল একে একে। যুদ্ধে পরিখা খননের কৌশল আরবের লোকেরা এর আগে জানত না মোটেই। তাই কুরাইশরা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে মুসলিমদের হারানো যায় কিনা সে ব্যাপারে ভাবতে বসল।

নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ চলল দীর্ঘ সময় ধরে। তারা একটা উপায় খুঁজে পেতে চাইল, মদিনা অবরুদ্ধের সময়কে কিভাবে কমানো যায় এবং কিভাবে তাড়াতাড়ি দখলে আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা হল সর্বাগ্রে। সিদ্ধান্তে এটা স্থির হল যে বেশীর ভাগ সৈন্যরা উত্তর দিকে জড়ো হবে। যাতে করে মদিনার মুসলিম সৈন্যরা পাশের দিকে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং অবশিষ্ট সৈন্য আক্রমন করবে পরিখার অরক্ষিত স্থান থেকে, এবং এটাই তাদের কাছে সহজ হবে বলে মনে হল।

বিশ্বাসঘাতকতা

এই অংশে মূলতঃ বাস করত বনু কুরাইজা নামে ইহুদি জাতির লোকেরা। তারা শীঘ্রই নবী (সাঃ) এর সাথে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করল যাতে তারা নবী (সাঃ)কে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মদিনা ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিল। বনু নাজীর গোত্রের প্রধান হুয়াই বনু কুরাইজা গোত্রের উপর চাপ দিতে শুরু করল যাতে করে নবী (সাঃ) এর সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল তা যেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। প্রথম দিকে বনু কুরাইজা প্রধান কাব এটা সমর্থন করেননি তিনি হুয়াইয়া কে প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু পরে তিনি চাপে পড়ে মদিনার মুসলিমদের যে চুক্তি হয়েছিল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলল।

বনু কুরাইজাদের এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলিমদের সমগ্র যুদ্ধ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। বনু কুরাইজাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা সহজে মদিনা শহরে ঢোকার পথ খুঁজে পেল। আর এটা মানেই পরাজয় আসন্ন হয়ে পড়ল মুসলমানদের কাছে। তার ফলে যে দাঙ্গা হঙ্গামাও হত্যালীলা সংঘটিত হবে তা আর বুঝতে বাকি রইলনা কারোও।

এখন পূর্বদিক থেকে কুরাইশদের যৌথ বাহিনীর সাথে যোগ দিল বনু কুরাইজারা। নবী (সাঃ) লক্ষ্য করলেন উত্তরের শত্রু বাহিনীর উপর। তাই তিনি একটু যাচাই করে দেখে নিতে চাইলেন দক্ষিণে অবস্থিত বনু কুরাইজাদের গতিবিধি সম্বন্ধে। কারণ তিনি এটা জানতেন যে বনু কুরাইজারা তার প্রতি অনুগত হওয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

ইত্যবসরে মুহাম্মাদ (সাঃ) একটি গুজব শুনলেন, বনু কুরাইজার নেতৃবর্গ এক তরফা সন্ধিপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। এতে করে স্বাভাবিকভাবে মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারে এমন কি লাভের আশাও কমে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নবী (সাঃ) দুজনকে গুজবটার সত্যতা নির্নয় করার ভার অর্পন করলেন এবং যদি সত্য না হয় তাহলে মুসলিমদের মধ্যে পূর্ব মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য ঘোষনা দিতে বললেন। আর ঘটনা সত্যি হলেও মনভাঙ্গা হওয়ার কোন কারণ নেই এ পরিস্থিতিতে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে মজবুতভাবে দাঁড়াতে হবে। নিযুক্ত দুজন গুপ্তচর নবী (সাঃ)কে জানালেন যে ঘটনা সত্যি। তাই শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তিনি যায়েদকে পাঠালেন দক্ষিণদিকে তিনশত সৈন্য সহ, যাতে করে শত্রু পক্ষের সৈন্যরা বনু কুরাইজার সাহায্য না পায়। মদিনায় এই অবরোধ তাই আর বেশী সময় স্থায়ী করা গেল না কারণ মুসলিমরা ছিল খুবই সতর্ক। একদিন শত্রুদের আক্রমণ তীব্র হল যে যুহর ও আসরের নামাজ পর্যন্ত মুসলিমরা আদায় করার মওকা পেল না। এমন কি মাগরিবের অবস্থাও প্রায় সে রকম হয়ে দাঁড়াল, এমন সময় নবী (সাঃ) খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। এবং মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল এই অবস্থাতে কুরআনের আয়াত অবতীর্ন হল,

> "যখন শত্রুগণ উপর হতে এবং নীচ হতে তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসল, যখন ভয়ের কারণে চক্ষু পাথর হয়ে গেল, কলিজা উপড়ে মুখে আসল এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে নানা প্রকারের ধারণা করতে শুরু করলে, তখন ইমানদার লোকদের যথেষ্ট রকম পরীক্ষা করা হল এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেওয়া হল।"
> *(কুরআন ৩৩ : ১০-১১)*

এ অগ্নিপরীক্ষা ছিল বড় ধরনের কাঠিন্যে ভরা। এর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল কোন জাতি বা ব্যক্তির আন্তরিকতার অথবা কপটতার। এযুদ্ধে কেবল বনু কুরাইজার দ্বৈত দ্বিমুখি আচরনের কথা প্রকাশ করে না, বরং তাদের মধ্যে যে কপটতার আসল রূপ লুকিয়ে ছিল তা বেরিয়ে পড়ল সবার কাছে। আর এ ধরনের কপটেরা ক্ষনে ক্ষনে সিদ্ধান্ত পাল্টায় ব্যক্তি স্বার্থে। কুরআনের ঘোষণা,

> *স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মুনাফিক ও সেই সব লোক যাদের হৃদয়ে রোগ ছিল, পরিস্কার ভাবে বলেছিল যে, আল্লাহ এবং তার রসূল আমাদের নিকটে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের একদল যখন বলল," হে ইয়াসরেববাসী, এখন তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকবার কোন অবসর নেই, ফিরে চল; তাদের একদল যখন নবীর নিকট এই কথা বলে বিদায় নিতে চেয়েছিল, আমাদের ঘর বাড়ি বিপদের মধ্যে রয়েছে। অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিলনা, আসলে তারা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।"(কুরআন ৩৩ ঃ ১২-১৩)*

অন্যান্যরা আসলে চেয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে এবং নিজেদের নিরাপত্তা পেতে। যেহেতু তারা এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে মুসলিমদের নিরাপত্তা এখন খুব সমস্যাবহুল পরিস্থিতিতে, তাই দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু যাদের মনে আল্লাহ ও রসূল প্রীতি বিদ্যমান ছিল তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। এই রকম বাস্তব পরিস্থিতিতে হৃদয়ের গভীরতায় যে ঈমান বিদ্যমান তা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ রসূলকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করে আয়াত অবতীর্ন করে বলেন,

> *"প্রকৃত পক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করে।"* (কুরআন ৩৩ ঃ ২১)

কুরআনের এই মহামূল্যবান আয়াত যুদ্ধক্ষেত্রের এই পরিস্থিতির চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদা এবং মুসলিমদের জীবনে আদর্শ গঠনের জন্য তা একে বারে অপরিহার্য সেটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা করেছে। এই আয়াত এটি ছিল খুবই শক্তিশালী নির্দেশনামা যখন এক জন মুসলিম ব্যক্তি তাদের জীবনে রসূলের আদেশকে এ ভাবে স্মরন করতে শেখে তখন তার মধ্যে জাগ্রত হয় এক দৃঢ় চেতনা। যে চেতনা ব্যক্তির স্থবিরতা ও হীনমন্যতা কাটিয়ে সাহসী মানুষ

হিসাবে সমাজ স্তরে উন্নিত করে। আর কুরআনের এই আয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এমন ভাবে সাহসী হয়ে উঠল যে যখন তারা শত্রুপক্ষের যৌথ বাহিনী দেখল তখনও বলল,

> *"আর সত্যিকারের মুমেনদের (অবস্থা এই ছিল যে) যখন তারা আক্রমণকারী সৈন্যদের দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠল এতো সেই জিনিসই, যার ওয়াদা আল্লাহ ও তার রসূল আমাদের নিকট করেছিলেন সে কথা সম্পূর্ন সত্য ছিল, এ ঘটনা তাদের ইমান ও আত্মসম্পর্কের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিল "*

এক দক্ষ কৌশল

মুসলমানদের এই সময় দিন কাট ছিল খুবই শোচনীয় অবস্থায়। কিন্ত যত দিন যাচ্ছিল ততই কুরাইশদের মিত্র শক্তি নিজেরাও এক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল। কারন তাদের মজুত খাদ্য শেষ পর্যায় পৌছানোর কারণে যথেষ্ট খানাপিনায় অভাব দেখা দিয়ে ছিল। সেই সঙ্গে শীতের দাপটে তারা রাত্রিতে ঘুমাতেও পারছিলনা একদম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল, মদিনাবাসীরাও অনেকটা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল। তাই নবী (সাঃ) চাইছিলেন আপাতত একটু আপোশরফা করতে। তিনি কুরাইশদের যৌথ বাহিনী ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা চালালেন। তাই তিনি প্রচন্ড অর্থ লোলুপ বনু গিতফানের দুই নেতাকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন আলাপ আলোচনার জন্য। তিনি তাদেরকে মদিনার উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করে যৌথ বাহিনীর কাছ থেকে দূরে থাকতে বললেন। এতে তারা খসড়া পত্র রচনা করলেন। নবী (সাঃ) তা বিবেচনা করে সাক্ষর করার জন্য সাদ বিন মুয়াজ ও সাদ বিন উবাহদাকে ডাকলেন। কিন্তু উভয়েই এতে রাজি হলনা । নবী (সাঃ) তাদেরকে বোঝালেন যে তারা প্রচুর সৈন্য-সামন্ত দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে যদি দুর্বল করতে হয় তা হলে এছাড়া কোন পথ নেই। কিন্তু আত্মাভিমানী মুসলিম নেতা বলেই ফেললেন-

> *"হে রসূল আমরা যখন কাফির ছিলাম তখনও তো এই সব গোত্রের লোকেরা আমাদের ধন সম্পদ এভাবে নিতে পারেনি। আর আজ যখন আমরা ইসলাম গ্রহন করে আগের চেয়েও শক্তিশালি হয়ে গেছি তখন তাদের হাতে আমাদের সম্পদ তুলে দেব ? আল্লাহর কসম এটা আমারা হাতে দেব না। আমাদের এমন চুক্তির দরকার নেই।"*

নবী (সাঃ) তাদের যুক্তির মর্যদা দিলেন, তিনি খুশি হয়েই দুই সাদের কথা মেনে নিলেন মন দিয়ে, তক্ষুনি চুক্তি পত্রটা ছিড়ে ফেলা হল। কিন্তু সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? আল্লাহই এর একটা রাস্তা বের করে দিলেন। যেটা ছিল ইসলামী

আন্দোলনের জন্য একেবারে সাক্ষাত গায়েবী সাহায্য বলা যেতে পারে। নবী (সাঃ) এর কাছে নঈম ইবনে মাসুদ বলে একজন লোক দেখা করলেন। এবং সকলের সামনে তিনি কলেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে নবী (সাঃ)কে জানালেন। বয়স্ক এ ব্যক্তিটিকে আরব উপদ্বীপের সবাই চিনত। এবং সবাই তাকে নানান বিষয় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুসলিমদের কাছে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে সাক্ষদান করেছিলেন কিন্ত কুরাইশরা এ খবর জানতে পারলনা, তিনি নবী (সাঃ)কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, এখনও শত্রুরা যেহেতু আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানেনা সুতরাং যদি অনুমতি দেন তবে আমি কুরাইশ ও বনু কুরাইজার মধ্যে ঐক্য নষ্ট করার জন্য কিছু কাজ করতে পারি।

নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে তিনি এই কাজ সমাধা করার জন্য অনুমতি পেলেন। তিনি বনু কুরাইজা গোত্রের কাছে গেলেন। তাদের সাথে কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা সারার পর বললেন,

"যদি বিজয় অর্জিত হয় তবে তা ভাল কথা, কিন্ত ভাগ্যে যদি পরাজয় আসে তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে তা ভেবে দেখ। পরাজয় হলে কুরাইশ ও গিতফান উভয় গোত্রের লোকেরা নিজের ঘরে ফিরে যাবে কিন্তু তোমাদের এখানে ফেলে রেখে যাবে তারা, তখন তোমাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তখন মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের শিকার হবে। তখন করার কিছু থাকবে না। তাই তোমরা এখন কুরাইশ ও গিতফান গোত্রকে বলো তারা যেন কয়েকজন করে যিম্মি তোমাদের কাছে রেখে যায়। যদি তারা তোমাদের প্রস্তাবে রাজি হয় তবে তোমরা তাদের সাহায্য কর নচেৎ তাদের কাছ থেকে তোমাদের পৃথক থাকাই ভাল।"

বনু কুরাইজা গোত্রকে তিনি কথাগুলো বলার পর ফিরে এলেন কুরাইশদের কাছে। কুরাইশ নেতাদেরও তিনি সম্বোধন করে বলেন,

"আমাদের কাছে বেশ কিছু তথ্য আছে যেগুলো এ মুহূর্তে আপনাদের শোনানো জরুরী মনে করছি। বনু কুরাইজারা এখন তাদের মত পাল্টেছে। যুদ্ধে সহযোগীতা করার জন্য তারা আপনাদের কাছে কিছু যিম্মি দাবি করবে। আর এর সত্যতা শীঘ্রই জানতে পারবে।"

এই সত্যতা যাচাই করার জন্য কুরাইশ নেতারা বনু কুরাইজার সাহাজ্য চাইল এই বলে যে আর সহ্য করা যাচ্ছেনা শীতের কামড়, তাই তারা যেন মদিনা আক্রমণে শীঘ্রই সাহায্য করার ব্যবস্থা করে। কুরাইশদের প্রস্তাব শুনে বনু কুরাইজা গোত্রের নেতারা নঈমের শেখানো জিনিস প্রমাণ করার দাবি জানাল। কুরাইশরা এখন বুঝল যে বনু কুরাইজা গোত্রের সাহায্য এখন আর পাওয়া যাবেনা। বনু কুরাইজা

গোত্রের প্রতি কুরাইশদের আর আস্থা রইলনা। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির রূপরেখা এখন পাল্টে গেল সম্পূর্ণভাবে।

স্বাভাবিকভাবে শত্রুদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তারা এখন নিজেদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল দেখতে পেল। দীর্ঘদিন ধরে তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। খাদ্য পানীয় যা সঙ্গে এনেছিল তাও শেষের পথে। গবাদি পশুর খাবার বলতে কিছুই ছিলনা। তাই প্রতি দিনই একটা দুটো পশু মারা যেতে লাগল। তাই এত বিশাল বাহিনীও ক্রমশ কমতে লাগল। ঠিক এই সময় আরো একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার দ্বারা আল্লাহ মুসলিম মদিনা বাসীদের সাহায্য করলেন। হঠাৎ করে রাত্রিতে ভীষন ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে শত্রু বাহিনীর তাঁবুর কাপড় ছিড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে যায়। যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য আনা ঘোড়া ও উট মারা পড়ে অনেক, সেই সঙ্গে রান্নার চুল্লিও নিভে যায়। পুনরায় জ্বালানোর জন্য নিকটে কোন জ্বালানীও পাওয়া গেলনা। তাই শত্রুপক্ষের সৈন্যদের না খেয়েই দিন কাটাতে হয়েছিল, যার ফলে যুদ্ধ করার মানসিকতা আর রইল না। তারা সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠিয়ে আল্লাহ যে সাহায্য করেছিলেন মুসলমানদের, সে প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে-

> "আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সামন্ত সমবেত হলো। আর আমি তাদের উপর ঝড় পাঠিয়ে দিলাম এবং সেই গায়েবী বাহিনী পাঠালাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।"
> *(কুরআন ৩৩ ঃ ৯)*

সমস্তকিছু অনুভব করে আবু সুফিয়ান এটা পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন কুরাইশদের দ্বারা আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই তাদের শীঘ্রই মদিনা ত্যাগ করা দরকার। তাই তারা হঠাৎ করে মদিনা ত্যাগ করে গেল। কুরাইশদের চলে যাওয়ার খবর রসূল (সাঃ) পেলেন। কিন্তু বিচক্ষণ নবী (সাঃ) সেটা ভাল করে জেনে নেওয়ার জন্য হুজাইফা রাঃকে খবর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন। হুজাইফা মুসলিমদের জন্য শুভ সংবাদ নিয়ে এলেন। শত্রু সেনারা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে সমস্ত রকম জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে মক্কার দিকে পাড়ি দিয়েছে। হুজাইফার তথ্যে এটা সবার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে শীতের কামড়, ঝড়ো আবহাওয়ায় তাঁবু নষ্ট হয়ে যাওয়া ও গবাদি পশু মারা পড়ার কারণে মক্কার সৈন্যরা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়েছে এবং তারা সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে পড়েছে।

নবী (সাঃ) সমস্ত মুসলিমদের ফজরের নামাজে এ শুভ সংবাদ প্রদান করলেন। হিজরী চতুর্থ সনে মদিনার এই অবরোধ হয়েছিল আর পঁচিশ দিন চলেছিল এই অবরোধ।

শত্রু যৌথ বাহিনী বাড়ি ফিরে গেল আহত ও পরাজিত হয়ে। যুদ্ধ ময়দানে না নেমে ও যুদ্ধ না করেই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে তারা ফিরে গেল।

মুসলিমদের দ্বিমুখী বিজয়বার্তা ছড়িয়ে গেল মদিনার মুসলিমদের ঘরে ঘরে। তার পর পৌছে গেল সমগ্র আরব ভুখন্ডে। সবাই অনুভব করল মুসলিম শক্তি ও কুরাইশ শক্তির মধ্যে ভারসাম্যতা। এটা সবাই জেনে গেল মুসলিমরা কেবল দশ হাজার শক্তিশালী কুরাইশ সৈন্য বাহিনীকে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়নি বরং তারা যেকোন পরিস্থিতিতে দৃঢ় সংকল্প থাকতে পারে।

নবী (সাঃ) এ যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয় লক্ষ করে বললেন, 'এখন কুরাইশদের যুগ শেষ হল'। এই খন্দক যুদ্ধের আগেই আর দুটি বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোতে কুরাইশরা একক ভাবে লড়াই করেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে অন্যান্যদের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেকটাই, তা সত্ত্বেও তারা পরাজয় বরণ করে ফিরে গিয়েছিল হতাশ হয়ে। তাই আগামীতে তারা এর চেয়ে বড় শক্তিধর হতে পারবে সেকথা ভাবার ছিলনা। তাই নবী (সাঃ) একথা স্পষ্টত বুঝতে পেরে ছিলেন কুরাইশদের ভয় আর ভবিষ্যতে থাকবে না। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষয় ক্ষতি খুব কম হয়েছিল। মুসলিমদের মাত্র ছ'জন শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত সাহাবী সাদ বিন মুয়াজ নিহত হয়েছিলেন এই যুদ্ধেই। যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাতে বিদ্ধ হন এবং কয়েক দিন পরে পরলোকে পাড়ি দেন।

মুসলিমদের উদারতার নজির

নবী (সাঃ) এর এক কন্যার নাম ছিল জয়নাব। তার বিয়ে হয়েছিল আবুল আস এর সাথে। তখনও পর্যন্ত তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসেননি। জয়নাব কিন্তু ইচ্ছা করে স্বামীর সাথে মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। কারণ তখনও পর্যন্ত নবী (সাঃ) তাকেও তার শিশুকন্যা উমামাকে নিয়ে মদিনায় চলে আসতে বলেন নি, জয়নাবের প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল আবুল আল আসের প্রতি। কিন্তু তাদের দু'জনের জীবন ধারা ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ভেদ টেনে দিয়েছিল। কিন্তু দুজনে কেউ কাউকে ত্যাগ করে অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেনি। পরে অবশ্য আবুল আস ও জয়নাব দুজনে পরস্পরে বিছিন্ন হয়ে মক্কা ও মদিনায় বাস করছিল।

এ খন্দকের যুদ্ধ মাত্র কয়েক দিন অতিক্রান্ত হয়েছে এই সময় নবী (সাঃ) এর কাছে খবর এল সিরিয়া থেকে এক মক্কী বানিজ্য কাফেলা ফিরে আসছে যার নেতৃত্বে রয়েছেন আবুল আল আস, তিনি আরোও জানালেন যে এই বাণিজ্য কাফেলায় কুরাইশ গোত্রের বহু লোকের বাণিজ্য শেয়ার রয়েছে। নবী (সাঃ) তৎক্ষণাত কাফেলাটি আটকানোর চিন্তা নিলেন, তিনি যায়েদকে আদেশ দিলেন মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে

কাফেলাটিকে আটকে দিতে। এর একটি কারণ ছিল মুসলিমরা যে ধন সম্পদ মক্কায় ছেড়ে এসেছিল তার অনেকটাই কুরাইশদের দ্বারা দখল হয়ে গিয়েছিল সে গুলোর যতটা পারা যায় ততটা উদ্ধার করা এবং অন্য একটি কারণ মদিনার মুসলমানদের যে ক্ষমতা রয়েছে তা প্রদর্শন করা। মদিনার মুসলমানরা এখন আর ক্ষীণ বা হীন নয়। তাদের হাতে এখন যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে যা যে কোন শক্তির সাথে জুঝতে পারে। এখন মক্কার কুরাইশদের এটা ভালভাবে জানা দরকার যে তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যতই উঠে পড়ে লাগুকনা কেন তা সম্ভব নয়, মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বরকম ষড়যন্ত্র চালিয়েও তারা ব্যর্থ হবে।

নবী (সাঃ) এর নির্দেশ পেয়ে যায়েদ (রাঃ) মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যদের সিরিয়া ফেরত বানিজ্য কাফেলকে আটকাতে নির্দেশ দিলেন। মক্কার কাফেলা আটক হল। তাদের অনেকের মধ্যে যারা পালাতে সক্ষম হয়েছিল তারা পালিয়ে গেল। কিছু ধন সম্পদ মদিনার হস্তগত হল। ইত্যবসরে আবুল আস হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রী জয়নাব ও শিশু কন্য উমামাহর সাথে সাক্ষাত করবেন। কিন্তু একাজটা ছিল বেশ বড় ধরনের ঝুকিপূর্ণ। যতই ঝুকিপূর্ণ হোকনা কেন আবুল আসের মনের ব্যাথার কাছে তা হার মানল। রাতের অন্ধকারে আবুল আস পৌছাল জয়নাবের কুটিরের সামনে, টোকা মারল দরজায়। খুলে গেল গভীর রাতে কুটীরের দরজা। জয়নাব আবুল আসকে দেখে অবাক হল। ভীতরে ঢোকার অনুমতি দিল স্বামীকে। স্বামী রাত্রিতে স্ত্রীর ঘরেই থাকলেন।

ভোর হতেই ফজরের আযানে সাড়া দিল জয়নব (রাঃ) প্রতি দিনের মত মসজিদে গিয়ে হাজির হলেন নামায পড়ার জন্য। ঠিক পুরুষদের পেছনে মহিলাদের কাতারের সম্মুখ কাতারে তিনি অংশ নিলেন। নামাজ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে নবী (সাঃ) যেই না নামাজের কাতার সোজা করার ঘোষণা দিতে যাবেন সেই সময় জয়নাব (রাঃ) বলে উঠলেন, 'আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি'। তারপর রসূল (সাঃ) নামায সমাধা করলেন। তিনি আদৌ কোন কিছু জানতেন না যে, রাত্রে আবুল আস জয়নাবের বাড়িতে এসেছেন এবং সে তাকে আশ্রয়ও দিয়েছেন। নবী (সাঃ) এর সকল সাহাবা এ কথা শুনলেন। তিনিও সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তার কন্যা বা অন্যান্য যে কোন মুসলিমদের দ্বারা আবুল আস নিরাপত্তা পাক না কেন তা অবশ্যই মেনে নেওয়া হবে, এটা অবশ্যই ভাল কাজ।

নবী (সাঃ) কন্যা জয়নাবের কাছে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনলেন। বর্তমানে বাণিজ্য যাত্রায় আবুল আল আসের সমস্ত কিছু নিয়ে নেওয়া হয়েছে তাই তিনি বিরাট ক্ষতিগ্রস্থ। এই সমস্ত সম্পদ মক্কার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে দিয়েছিল। তারা সবাই এটা ইচ্ছা করবে যে আবুল আল আস তাদের সমস্ত সম্পদ যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিক। এটা নিশ্চিত তারা তো তাকে ছাড়বেনা, যে কোন প্রকারে আদায় করবে। এই

অবস্থায় কিছু সাহাবা আবুল আল আসকে পরামর্শ দিলেন মুসলমান হওয়ার জন্য আর ওই সমস্ত মালের মালিক সেই হয়ে যাক। কিন্তু তিনি এটা মেনে নিলেন না। তিনি জানালেন এটা কী করে সম্ভব। এক জন মুসলিম হয়ে অন্যের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারেনা কখনই। পরে তিনি মক্কাবাসীদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে ফিরে গেলেন। তিনি তাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন সম্পদ। পরে ফিরে এলেন মদিনায়। তারপর ইসলাম গ্রহণ করে স্ত্রী জয়নাব ও কন্যাকে নিয়ে বসবাস শুরু করলেন একত্রে।

এইভাবে মুসলমানদের এই উদারতা ছিল একেবারে সহজ সরল যা দেখে বিশ্ব শিক্ষা নিতে পারে। প্রথমেই আবুল আসকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যেত। তাকে কোন প্রকারে মক্কায় ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগই মুসলিমরা না দিতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর রসূল তাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। পরে আবুল আল আস একেবারে স্ব-ইচ্ছায় আবার মদিনায় ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এমন কি এরকম পরিস্থিতিতেও তিনি মুসলিমদের দ্বারা নিরাপত্তা পেয়েছিলেন সার্বিকভাবে।

ইসলামে বক্তব্য পেশের স্বাধীনতা

নবী (সাঃ) এর কন্যা জয়নাব জনসমক্ষে মসজিদের ভিতরে তার স্বামীর ব্যাপারে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। তিনি সবসময় মসজিদে যাতায়াত করতেন। মসজিদ হল নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই। এই সময় কেউ'ই জয়নাবের কথায় প্রতিবাদ করেননি। এমনকি কেউই মসজিদে মহিলাদের কোন বক্তব্য চলবেনা বলে হৈ চৈ ফেলে দেননি। মহিলাদের মসজিদে নামাজে যোগ দেওয়া এবং এরকম দাবী দাওয়ার বক্তব্য পেশ করা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়।

এরকম আর একটি ঘটনা নবীর মসজিদ নামে খ্যাত মদিনার মসজিদে দাঁড়িয়ে আওস বিন সাবিতের স্ত্রী ও সালামা কন্যা কোহলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। কারণ তার স্বামী তার প্রতি নির্যাতন করত। নবী (সাঃ) এর কাছে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে বিচার চেয়েছিলেন। তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তা নবী (সাঃ) রাজনৈতিক নেতা হিসাবে শুনেছিলেন মন দিয়ে। কোনরকম ইতস্ততা বা ভয় করেননি কোহলা, কারণ নবী (সাঃ) তথা ইসলাম নারীকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে কোহলা ছিলেন স্পষ্টভাষী কুরআনে তা উল্লেখ হয়েছে নিচের ভাষায়,

> *"আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলাটির কথা যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর নিকটে ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের সব কথাবার্তা শুনেছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (কুরআন ৫৮ ঃ ১)*

কুরআনের এ অহী মহিলা কোহলাকে সমর্থন করে। প্রাক ইসলামী তালাক পদ্ধতিতে যে পৌত্তলিক নিয়ম নীতি ছিল তা পরিবর্তন করে মহিলাদের প্রতি নানা রকম উৎপীড়ন ও অন্যায় অবিচারের সমাধান করা হয়েছে। অহী মারফত আল্লাহর রসূল মহিলাটির অভিযোগের সুরাহা করে দিলেন। নিষ্ঠুর আচরণের হাত থেকে ইসলাম মহিলাদের এভাবে বাঁচিয়েছে। মহিলারা যদি তাদের বক্তব্য পেশ করতেই না পারে তাহলে সুবিচারের ধারা প্রবর্তীত হবে কি করে? সুবিচারের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের লোকেদের বক্তব্য শুনতে হবে বিচারককে। তারপর তা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে তার উপর বিচারকের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে।

> মহিলাটির অভিযোগ সম্বন্ধে কুরআনের আরও অহী অবতীর্ন হয়। এখানে বলা হয়, *"তোমাদের যে সকল লোক স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়, তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এ লোকেরা একটা অতীব ঘৃন্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা বড়ই ক্ষমাশীল ও মর্যাদা দানকারী।" (কুরআন ৫৮ ঃ ২)*

নবী (সাঃ) এর মসজিদেই মহিলারা নামাযে সারি দিত ঠিক পুরুষদের পিছনেই। রুকু সাজদা সব স্থানে একটা সৌজন্য ও শালীনতা বজায় থাকত। সব কিছুতে বিনয় বিনম্রতা ফুটে উঠত। মসজিদেই মুসলিম মহিলারা যেমনভাবে নামাজ পড়ার অধিকার পায় ইসলামে, তেমনিভাবে পড়াশুনা করা ও নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সমস্ত অধিকারই ইসলাম দিয়ে থাকে। মসজিদে মহিলারা কোন প্রকার হেনস্থা যাতে না হয় নবী (সাঃ) সেজন্য সতর্ক নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুরুষরা নিজ নিজ স্থানে ততক্ষণ বসে থাকবে যতক্ষণ মহিলারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে না যায়। সব সময় মহিলাদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য দিতেন নবী (সাঃ)। তিনি তাদের বক্তব্য কেবল শুনতেন না বরং তাদের অভিযোগ সত্য হলে তাদের পক্ষে রায় দিতেন। এভাবে তারা সমাজে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের সম্মানের আর এক নজির

হজরত উমার (রাঃ)-র শাসনকাল, মদিনায় মুসলিম জন-জোয়ার তখন দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর্থিক উন্নতিও ঘটেছে তরতর করে। সবাইয়ের হাতে পয়সা। আর এর প্রভাব পড়ল সামাজিক জীবনযাত্রায়। স্ত্রীদের প্রদেয় মোহরের পরিমানটা যেন প্রতিযোগিতায় বেড়ে চলেছে। উমার (রাঃ) মনে মনে ভাবলেন এ বড় অরাজকতা।

এভাবে অর্থগুলোর অপচয় না হয়ে বরং বায়তুল মালে পড়লে বেশি লাভ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মোহরের পরিমাণ কমিয়ে সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দেওয়ার জন্য। তিনি আদেশ জারি করলেন কেউ যেন চারশ'র অধিক দিরহাম মোহর হিসাবে প্রদান না করে। এর বেশী অর্থ মোহর হিসাবে ধার্য হলে বাড়তি অর্থ কেটে নিয়ে বায়তলু মালে জমা পড়বে।

> উমর (রাঃ) তাঁর সভামঞ্চে একথা ঘোষণা করার পর নেমে আসতে যাচ্ছেন এমন সময় এক দীর্ঘাকায় বয়স্ক মহিলা উঠে দাঁড়ালেন এবং দৃঢ়তার সাথে বললেন,
>
> "এ ব্যাপারে কুরআন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি, তাই উমার (রাঃ) কি করে মোহরের উপর বাধ্যবাধকতা আনতে পারে?"
>
> তখুনি মহিলাটি নিজের কৈফিয়তের সমর্থনে কুরআনের বাণী পাঠ করলেন নির্ভয়ে,
>
> "আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক তবে তাকে এক স্তুপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হতে কিছুই ফিরিয়ে নেবেনা। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে?"
>
> মহিলার যুক্তিটি কুরআন থেকে এসেছে, অতএব আর কোন কথা চলতে পারে না। তিনি নিজেই ভুল বুঝতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলের সামনে বললেন,
>
> "আল্লাহগো আমাদের ক্ষমা কর, উমারের চেয়ে সবাই, এমন কি এই বৃদ্ধ মহিলাও বেশী জানেন।"

ইসলামে মানব সেবা

কুরআনের যে সকল মৌলিক কথা রয়েছে তার শুরুতেই আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় করার তাগিদ এসেছে বার বার। মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক খুবই মজবুত হওয়া দরকার। তাই আল্লাহ ছাড়া মানুষ কোন সৃষ্টিকে উপাসনা করতে পারেনা। এটাই কুরাআনের মৌলিক দাবি গুলির মধ্যে অন্যতম। তার পরেই আসে মানুষের একান্ত আচরণবিধি যা সে পারিপার্শ্বিক অন্য মানুষদের সাথে করে থাকে। তাকে একান্তভাবে জানা দরকার তার পাশাপাশি মানুষ গুলোর সাথে তার কি সম্পর্ক রয়েছে আর কতটাই বা থাকা দরকার। অথবা

কোন স্বার্থে সম্পর্ক রয়েছে তা ব্যক্তি স্বার্থে না আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। প্রথমে তার কর্তব্য পালন করতে হবে পিতামাতার প্রতি। তার পর তার নিকট আত্মীয়দের প্রতি। তার পর একে একে এসে যায় পাড়া প্রতিবেশী। একসঙ্গে সালাত আদায়কারী মুসল্লী ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা যারা প্রতি দিনই তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কোন মানুষ যদি ধনসম্পদ বা অন্য কিছুতে অপরের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে তার কখনই উচিত হবেনা তার চেয়ে নীচু স্তরের মানুষদের সাথে কঠোর ব্যবহার করা। একজন মানুষ কাউকে প্রতারণা করতে পারেনা। তার আচরণ সব সময় হওয়া উচিত সুন্দর ও সৌজন্যমূলক। সমাজে তার আচরণ যেন কাউকে পীড়া না দেয় বরং তার আচরণ দ্বারা সবাই যাতে উপকার পেয়ে থাকে সেদিকে নজর দেওয়া একান্ত কর্তব্য। কুরআনে একজন মুসলিমের আচরণ কেমন হবে তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। সূরা বনী ইসরাইলে একসাথে কয়েকটি আয়ত –এ বিষয়ে খুবই উল্ল্যেখ যোগ্য,

"তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারোর দাসত্ব করবে না কেবল তাঁরই উপাসনা করবে। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের একজন কিংবা উভয়েই বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে তবে তুমি তাকে 'উহ!' শব্দ বলবেনা, তাদের ভর্ৎসনা করবেনা, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে, এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সম্মুখে নত হয়ে থাকবে। আর এই দোয়া করতে থাকবে -হে আল্লাহ এদের প্রতি রহম কর, যেমনভাবে তারা স্নেহ বাৎসল্য সহকারে আমাকে বাল্যকালে পালন করেছেন। তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাক তবে এই ধরনের সব মানুষের জন্যই তিনি ক্ষমাশীল, যারা নিজেদের অপরাধ সর্ম্পকে সজাগ ও সচেতন হয়ে বান্দাহ হওয়ার আচণের দিকে ফিরে আসে। নিকট আত্মীয়দের তার অধিকার দাও। আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার, তোমরা অপব্যয় করবেনা। অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ। তোমরা যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয় স্বজন, মিসকীন, ও সম্বলহীন পথিক) কাছ থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তোমরা আল্লাহর যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্খী তা এখনও তালাশই করছ তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জাওয়াব দাও। নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখনা। আর তাকে একেবারে খোলা ছেড়েও দিওনা- এমনটি করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার আল্লাহ যার জন্য চান রিযক্ প্রসস্ত করে দেন। আর যার জন্য চান তা সংকীর্ণ করে দেন, তিনি তার বান্দাহদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন। নিজেদের সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও রিযিক দেব। ব্যাভিচারের নিকটে যেওনা। তা অত্যন্ত খারাপ কাজ, আর তা খুবই নিকৃষ্ট পথ।

প্রাণ হত্যার অপরাধ করোনা যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন – কিন্তু সত্যতা সহকারে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার ওলীকে আমি কেসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। তার সাহায্য অবশ্যই করা হবে। ইয়াতিমের ধন মালের কাছেও যেওনা। কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়। যতদিন না সে তার যৌবন লাভ করে। ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। পাত্র দ্বারা মাপ দিলে তা পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে। এ খুবই ভালনীতি আর পরিণামের দিকেও খুবই উত্তম। এমন কোন বিষয়ের প্রতি লেগে যেওয়া না যে বিষয়ে কোন জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চয় জেনে রাখ চোখ কান ও হৃদয় সব কিছুরই জন্য জওয়াবদিহি করতে হবে। যমীনে বাহাদূরী করে চলাফেরা করো না। তোমরা না যমীনকে দীর্ন করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করবে। এই আদেশ সমুহের প্রত্যেকটির খারাপদিক সমূহ আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। এই সেই জ্ঞানপূর্ণ কথা, যা তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আর লক্ষ্য কর আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে বস না তাহলে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তিরস্কৃত ও সব কল্যাণ হতে বঞ্চিত অবস্থায়।"
(কুরআন ১৭ ঃ ২৩-৩৯)

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ধরনের হবে? তাদের অধিকার ও কর্তব্য কি? –তার বিস্তৃত আলোচনায় একই সঙ্গে-এতটা কুরআনের আর কোন অংশে আলোচিত হয়েছে কিনা তা বলা যায় না। সেজন্যই বুঝি নবী (সাঃ) সূরা বনি ইসরাইল নিজে সব সময় পাঠ করতেন ও সেই সঙ্গে আমাদেরও পাঠ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

আল্লাহর করুণা

এ পৃথিবীতে কিছু মানুষ তাদের জীবন ধারনের জন্য সব কিছু উপায় উপাদান না চাইতেই পেয়ে থাকে, তাই তাদের জীবন হয় সুখ-সমৃদ্ধির। তারা ভোগ করে নানান আয়েশ আরাম, অপর দিকে অনেক মানুষ রয়েছে যাদের সারা দিনেও একবার পেটে এক মুঠো অন্ন জোটে না। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাতো দূরের কথা লজ্জা নিবারণ কিংবা প্রাকৃতিক আবহাওয়াকে ঠেকানোর জন্য সামান্য বস্ত্রখন্ডও মেলেনা। এ বড় বিচিত্র পৃথিবী! কিন্তু ইসলাম বৈচিত্রের মধ্যেও ভারসাম্য রাখতে চায়। যাদের এ পৃথিবীতে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে তাদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষগুলির সার্বিক তত্বাবধানের ব্যবস্থা হয়। কুরআনের ছত্রে ছত্রে এর প্রমাণ মেলে,

যে মানুষগুলো জীবনের নানান সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেবল মুখের ভাষায় নয় বরং বাস্তবের মাটিতে বসবাসকারী অসহায় মানুষ গুলোকে মুক্ত হস্তে সেবা করা, তাদের অভাব অভিযোগগুলো পূরণ করা। আর এটাই হবে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি পরিমানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সহজ পন্থা। "জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা আল্লাহর দয়া পেয়ে যাচ্ছি তাই তো আমাদের দরকার আমাদের পাশের মানুষ গুলোকে তা দেওয়া যা আমরা পেয়ে থাকি। মানুষকে সেবা না করে কেবল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা কি করে গৃহীত হতে পারে? আর এ ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্পূর্ণ। আল্লাহর এত অসংখ্য নিয়ামত পাওয়ার পরও যদি আমরা অপরের কথা ভুলে যাই তাহলে আমাদের হৃদয় মরে গেছে বলা যেতে পারে।

ইসলামী দর্শনে তাই মানুষের সেবা করা মানে আল্লাহর সেবা করা। মানুষের প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করা মূলত আল্লাহকেই সাহায্য করা। যে মানুষের কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যায় সে মূলত আল্লাহকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গেলে অবশ্য তাঁর সৃষ্টির প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পৃথিবীতে স্বর্গীয় সূধা বর্ষণ মোটেই হতে পারেনা যদি আমাদের পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালবাসা না থাকে।

সেবা সকলের জন্য

ইসলাম কেবলমাত্র মুসলিমদের সেবা দিতে চায়– এ কথা বলা যায় না। বরং ইসলাম মুসলিম অমুসলিম নারী পুরুষ সবাইকে সেবা করে। সবাইকে সেবার কথা বলে। পৃথিবীর কোন মানুষই ইসলামের সেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। গোঁড়ামী থেকে হিংসা ও শত্রুতার জন্ম নেয়। কোন মানুষ যদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ধারায় অন্ধ হয়ে বসে তাহলে অন্য জাতির মানুষকে কিন্তু ভাল বাসতে পারেনা। ইসলাম এ ধরনের চিন্তা বা আচরণ থেকে আমাদের সতর্ক করে দেয়। ইসলাম ভাবে সমস্ত জীবজগৎই আল্লাহর সৃষ্টি, কারোর প্রতি অবিচার করা মানে আল্লাহর সৃষ্টিকেই অবহেলা করা। হজরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) বলেন,

"সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, তার মধ্যে মানুষের পরিবার হল সর্বোৎকৃষ্ট। তাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।"

কুরআনের সাধারণ নির্দেশনামায় এটা স্পষ্ট যে একজন গরীব দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি কিংবা প্রতিবন্ধি অনাথ সবাই যেন সেবা পায়, এটা কখনই বলা হয়নি কেবলমাত্র মুসলিম কিংবা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ সেবা পাবে অন্যরা পাবেনা। কখনই এটা দেখা হবেনা যে ও আমার জাতির লোক, কিংবা ধর্মের লোক, কিংবা আমার মতের লোক। বরং সব কিছুর উপরে একজন দরিদ্র দরিদ্রই, একজন অনাথ অনাথই, একজন অসুস্থ

অসুস্থই। অতএব এদের সবাইকে সমানভাবে সেবা করতে হবে। কারণ সবাই একই পরিবারের সদশ্য। নবী (সাঃ) এর বেশ কিছু হাদীস দ্বারা ইসলামের এই মহান আদর্শ প্রমাণিত–

(১) আবদুল্লাহ পুত্র জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ ওই ব্যক্তির উপর দয়া দেখান না যে অন্যের প্রতি দয়া দেখায় না।"

(২) উমার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

"দয়ালু আল্লাহ দয়া বর্ষণ করে ঐ সব লোকেদের প্রতি যারা দয়ালু। পৃথিবীর মানুষের প্রতি দয়ালু হও তাহলে তিনিও তোমাদের প্রতি দয়ালু হবেন।"

(৩) মাসুদ পুত্র আবদুল্লাহ বর্ননা করেন,নবী (সাঃ) বলেছেন,

"তুমি কখনই ইমানদার হতে পারবেনা যদি তুমি দয়ালু না হও "

এ কথা শুনে সাহাবারা বলে ফেললেন "ওগো আল্লাহর রসূল আমরা সবাই দয়ালু"

সাহাবাদের এ কথা শুনে নবী (সাঃ) বললেন,

"এ কথা দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, তুমি কেবল তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যে দয়া দেখাও তাই বরং সকল মানুষের প্রতি দয়ালু হতে হবে।"

(৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন একসময় কয়েকজন সাহাবা একসঙ্গে বসেছিলেন সেই সময় নবী (সাঃ) তাদের কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাদের মধ্যে কে ভাল মানুষ তা বলবেন কি-না। একথা তিনি তিন বার বললেন, এমন সময় এক সাহাবী বললেন,

"ওগো আল্লাহর রসূল আপনি বলুন কে আমাদের মধ্যে ভাল মানুষ এবং কে আমাদের মধ্যে খারাপ? নবী (সাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ভাল মানুষ যার কাছে মানুষ ভাল ছাড়া অন্য কিছু আশা করেনা এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে, আর খারাপ লোক হল সেই যার কাছে মানুষ কোন কল্যাণ আশা করেনা। এবং তার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ নয়।"

এ হাদীসগুলো থেকে এটা সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে সেবা সমস্ত সৃষ্টিকেই করতে হবে। কারণ সব কিছুকেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এদের কাউকে পৃথক করা যাবেনা। যে কোন মানুষের কোন কিছু অভাব হলে তাকে তা দেওয়ার ব্যবস্থা

করতে হবে এটা ইসলামের দাবী। মানুষকে কোন দল গ্রুপ, জাতি, দেশী, বিদেশী ইত্যাদিতে ভাগ করে বৈষম্য আনা যাবেনা কখনই। এক কথায় এটা আমরা বলতে পারি যে সোস্যাল – সারভীস এক প্রাকৃতিক প্রেরণা, ইসলাম-এ ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণা দিয়ে থাকে।

সেবার কাজ মূলত ইবাদত

কুরআন ঘোষণা করে যে মানুষের জীবন দান করা হয়েছে কেবল মাত্র ইবাদত সম্পাদন করার জন্য। ইবাদত ছাড়া কোন মানুষের এক মুহূর্ত চলতে পারেনা, ইবাদতের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ আল্লাহর কাছাকাছি হতে পারে। অনেক সময় তা দৈহিক ও মৌখিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে হলেও ইবাদতের সংজ্ঞা অনেক বড়। ধর্মীয় কিছু রীতিনীতি মানাকে আমরা ইবাদতের শেষ কথা ভেবে নিয়েছি। এটা আমাদের ভূল ধারণা, মানুষের কল্যাণে ধন সম্পদ ব্যয় করা ইবাদত। যখন একজন মানুষ অন্যকে সাহায্য করতে যায় তখন তার মনে যদি এটা জেগে ওঠে যে আমি যাকে সাহায্য করছি ও আল্লাহরই বান্দা আর আল্লাহই ওকে সাহায্য করতে বলেছেন আর যদিনা করি তাহলে তিনি এর কৈফিয়ত নেবেন তা হলে এটা অবশ্যই ইবাদত। তাই মানুষ যখন এরকম অনুভুতিশীল হয়ে যে কোন বস্তুগত কাজ সমাধা করবে তাও ইবাদত হবে।

ইসলামে মানুষের জীবনে পার্থিব সেবা আসলে বড় ধরনের ইবাদত তাই ইবাদতের সত্যতা বুঝতে আমাদের ইসলামের ইবাদতের ধারণা পরিস্কারভাবে জানা দরকার। কারণ ইবাদত কাকে বলে এ সংজ্ঞা আমাদের কাছে একেবারে পরিস্কার না হলে আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না যে আমাদের কোথায় গলদ থেকে যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা

কুরআনে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃতজ্ঞতা। নীতি নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি কৃতজ্ঞতা বোধের উপর গড়ে উঠেছে। সে জন্য বার বার করে কুরআনের ঘোষণা এসেছে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য।

> “আমি এর পূর্বে মূসাকেও স্বীয় নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমার নিজের জাতির লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে এস, এবং তাদেরকে আল্লাহর ইতিহাসের শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ

দাও। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন বর্তমান এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যারা ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।"
(কুরআন ১৪ ঃ ৫)

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক। যমীনে তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তিহীন মনে করা হত। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দিয়ে তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযক দান করলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (কুরআন ৮ ঃ ২৬)

"আল্লাহর কি লাভ তোমাদেরকে শুধু শুধু শাস্তিদান করে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকো এবং ঈমানের নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকো? বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই কাজের মূল্যদানকারী ও সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।" *(কুরআন ৪ ঃ ১৪৭)*

কৃতজ্ঞতা মানুষের হৃদয় ও মন উভয় স্থান থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যে বিস্ময় রয়েছে তার স্বীকৃতির জন্য কৃতজ্ঞতা হল প্রকৃত প্রতিফলন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন,

"আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়োনা আমার অনুগ্রহের প্রতি।"
(কুরআন ২ ঃ ১৫২)

"মুসলিম বিশ্বাসীদের বলতে বলা হয়েছে, "ওগো প্রভু আমাদের তুমি তোমার দয়ার প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য সাহায্য কর।" *(কুরআন ৪৬ ঃ ১৫)*

অপরপক্ষে কুরআনে অকৃতজ্ঞ ও নির্দয় মানুষদের আচরণ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

"বেশীরভাগ লোকেরাই কৃতজ্ঞতা প্রদান করে না।"
(কুরআন ১০ ঃ ৬০)

"প্রকৃতপক্ষে তোমার আল্লাহতো লোকেদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"
(কুরআন ২৭ ঃ ৭৩)

মানুষের সেবার মধ্যে বোঝা যায় কে প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ আর কে অকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় মানুষের বাহ্যিক অন্তর্নিহিত সত্তা থেকে। বাহ্যিক দিকে প্রকাশিত হয় যখন কোন মানুষ সরাসরি অন্যের সাহায্যে লেগে যায়। এছাড়া সে যেখানে বাস করে তার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করে। আমরা এর আগে দেখেছি যে কুরআন মানুষের দান কে খুবই গুরুত্ব সহকারে মর্যাদা দিয়েছে। গরীব, বয়স্ক, অসহায়,অনাথ প্রতিবন্ধি সকলের অস্থিত্ব রক্ষার জন্য পারিপার্শ্বিক দান বা সাহায্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অপরের প্রতি সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া একজন মুমেনের সারা জীবনে এক অনবরত টানা রুটিন হওয়া দরকার। একজন মানুষের আসেপাশে সমস্ত পরিবেশকে যাতে এক ভারসাম্য অবস্থাতে বজায় রাখতে পারা যায় সব সময় তার ব্যবস্থা করবে। আল্লাহকে সবচেয়ে বড় করে কৃতজ্ঞতা জানানোর উপায় হল আমাদের মানবিকতার বিকাশ ঘটানো এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতে ভারসাম্য এনে তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা।

এই ভাবে একজন মুমেন যখন কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে তার স্রষ্টার প্রতি তখন তার প্রত্যেকটি কাজ হয়ে ওঠে সুন্দর ও মানব কল্যাণকর। তার প্রতিটি কাজের মধ্যে স্ফুরণ ঘটে সমাজ গড়ার, সমাজে ভারসাম্য আনার, তার কোন ও কাজ ফালতু কাজ হয় না। কোন কাজ বে-হিসাবের হয় না। সব কিছুতেই থাকে সুসামঞ্জস্যতা। সব জায়গায় বিরাজ করে ন্যায় পরায়ণতা। কোথাও এ প্রশ্ন জাগেনা ও অমুসলিম আমি মুসলিম।

15

হুদাইবিয়া

শান্তি যখন যুদ্ধকে জয় করে

কুরাইশরা খন্দকের যুদ্ধে এককভাবে আসেনি বরং তারা ভিতরে বাইরে উভয়ের সাহায্য নিয়েই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে মক্কায় ফিরে যায়। এর ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে মদিনার মুসলিমরা এখন আর দুর্বল নয় তারা এখন যে কোন বড় শক্তির সাথে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে। এমন কি দুটি শক্তিধর রাষ্ট্র বাইজান্টাইন ও পারস্য উভয়েই বলতে শুরু করল মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বাধীন মুসলিমরা এখন আরব উপদ্বীপের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী। কারণ তারা এটা চাক্ষুস দেখেছিল যে সমস্ত আঞ্চলিক ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেছে মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইসলামী ক্ষমতা। তাই তাদের কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

পবিত্র রমযান ও একটি স্বপ্ন

মদিনায় শুরু হল রমযান মাস। নবী (সাঃ) এই সময় অধিক ইবাদতে মনোনিবেশ করলেন। রাত্রির ইবাদতকে তিনি বাড়িয়ে দিলেন। যদিও তিনি সবসময় রাত্রিতে বেশী করে আল্লাহর ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকতেন তা সত্ত্বেও রমযান মাসে তার এ অভ্যাস আরোও বেশী বৃদ্ধি পেল। শুধু কি রাত্রি জেগে ইবাদত সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার সমাজ সেবায় তিনি হলেন সক্রিয়। গরীব দুঃখীর সেবায় তিনি নিজে যেমন এগিয়ে এসেছিলেন তেমনি সকল সাহাবীকে তিনি একাজে উৎসাহ দান করলেন। সারা বছরে তিনি যে নামাজ পড়তেন তার সাথে রাত্রিতে তারাবীর নামাজ সংযুক্ত করলেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছিল তা তিনি জিব্রাইল (আঃ) এর কাছে আবৃত্তি করে ভুল ভ্রান্তি শুধুরিয়ে নিতেন। সমস্ত রোযাদাররা আল্লাহর কাছে নানান দোওয়ার মাধ্যমে কাকুতি মিনতি সহকারে নিজের যা কিছু চাওয়ার যা কিছু পাওয়ার তা পেশ করতেন।

সারাদিন যেমন রোযাদাররা না খেয়ে না পান করে কাটাতেন তেমনি নানা প্রকার চারিত্রিক গুনাবলী অর্জনের জন্য কৃচ্ছ সাধনা করতেন। রোযা অবস্থায় একজন মুসলিম মিথ্যা বলতে পারে না, ঝগড়াঝাটি নিন্দা, গিবত, রোযা অবস্থায় নিষিদ্ধ। এইভাবে একজন রোযাদার রমযান মাসে আল্লাহর সান্নিধ্য বেশি করে পেয়ে থাকে। তার মধ্যে এক স্বর্গীয় চারিত্রিক গুনাবলীর সমাবেশ ঘটে। রমজান মাসে কুরআন অবতীর্ন হয়েছিল তাই এই মাসে সর্বাধিক কুরআন পাঠ করা হয়। কুরআন থেকে চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করা হয় সেই সঙ্গে মানুষের চরিত্রগত সংশোধনও ঘটে দারুণভাবে। মানুষের হৃদয়ে আসে উদারতার প্লাবন। নারী, পুরুষ, দাস-দাসী এমনকি শিশুদেরও রমযান শেষে প্রদান করতে হয় বিশেষ ধরনের এক দান তা হল “ফিতরা”। এই ফিতরা অসহায় সমস্ত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে সবাইয়ের দুঃখ কষ্টকে ভাগ করে নেওয়া হয়। এরকমই পবিত্র রমযান মাসে মুহাম্মদ (সাঃ) এক স্বপ্ন দেখলেন। অতি আশ্চর্যজনক এ স্বপ্ন। এ স্বপ্ন তাঁকে যেমন বিস্মিত করে তুলেছিল তেমনি, আশার আলোও জ্বালিয়েছিল তাঁর মনে। স্বপ্নে তিনি দেখলেন। তিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন আর তার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কাবা ঘরের পবিত্র চাবি। এ দৃশ্য একেবারে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি তো এরকম পরিস্থিতি কামনা করতেন মনে মনে। আল্লাহ বুঝি তার এ কামনা শীঘ্রই পূরণ করতে চাইলেন।

পরের দিন তাঁর সমস্ত সাহাবীদের ডাকালেন এবং তাদের কাছে ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অবশেষে তিনি মক্কায় উমরা সম্পাদন করার জন্য সফরের সব সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। (উমরা বছরের যে কোন সময় মক্কায় গিয়ে সম্পাদন করা হয় কিন্তু হজ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় সম্পাদন করতে হয়।)

সবাই তোড়জোড় শুরু করলেন উমরায় যাওয়ার জন্য। ব্যবস্থা যখন ঠিকঠাক তখন প্রায় চৌদ্দশ’ সাহাবী যোগ দিলেন এই উমরা যাত্রায়। পথে নানা বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) কোন ভারী অস্ত্র সঙ্গে নেওয়ার অনুমতী দিলেন না। নবী (সাঃ) এ সফর যাত্রায় তার স্ত্রীদের মধ্যে সঙ্গে নিলেন উম্মে সালমাহকে। যাত্রা শুরু হল, নবী (সাঃ) সঙ্গে কুরবানীর জন্য উটও নিয়েছিলেন।

নবী (সাঃ) এর এই উমরাহ যাত্রার কথা চাপা থাকল না কুরাইশদের কাছে। তারা শীঘ্রই এ খবর পেলেন। তাই তারা খুবই বিচলিত হয়ে গেলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই কাবাকে পবিত্র হিসাবে আরবের সমস্ত লোক মনে করে আসত তাই একাজে ঝট করে মুসলমানদের বাধা দেওয়া এক হিতে বিপরীত কাজ বলে মক্কার কুরাইশদের অনেকে ভেবেছিলেন।

উভয় সংকটে কুরাইশরা

এরকম পরিস্থিতিতে কুরাইশরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল। তারা কি করবে তা ভেবে উঠতে পারল না। যদি তারা মক্কায় কাবা শরীফ জিয়ারত করার অনুমতি মুসলিমদের দিয়ে দেয় তাতে এ কথা লোকে বলবে মূলত মদিনার মুসলিমদের ভয়েই কাবা ঘরে প্রবেশের অধিকার কুরাইশরা দিয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের একবার এ অনুমতি দিলে প্রতি বছরই তো এ অনুমতি দিতে হবে। তাতে অনেক অসুবিধাই দেখা দেবে। তাছাড়া তারা যদি তাদের বাধা দিয়ে থাকে তাহলে অন্যরা কুরাইশদের নিন্দা করবে। সারা আরব উপদ্বীপের লোক বলবে কুরাইশরা এত জঘন্য যে ধর্মীয় কাজ উমরা করতেও মানুষকে বাধা দেয়। এইভাবে এক আত্মসম্মানের প্রশ্নও উঁকি দিল কুরাইশদের মধ্যে। সাত পাঁচ ভাবার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে তারা ওয়ালিদ বিন খালিদকে পাঠিয়ে দেবেন দু'শত সৈন্য সহ যাতে করে মুহাম্মদ (সাঃ)কে পথিমধ্যে আটকে দেওয়া যায়।

নবী (সাঃ)ও এ খবর পাওয়ার পর তাঁর কাফেলার যাত্রাপথের অভিমুখ পাল্টে নিলেন। এইভাবে কিছুপথ যাত্রা করার পর নবী (সাঃ) এর উট কাসওয়া একটি বিশেষ স্থানে বসে পড়ল আর নড়ল না। নবী (সাঃ) ভাবলেন এরকম স্থানেই তাদের কাফেলার অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত হবে। স্থানটি ছিল মদিনা থেকে তিন'শ দশ কি.মি. দক্ষিণে এবং মক্কা থেকে আঠারো কি.মি. উত্তরে। জায়গাটির নাম আল হুদাইবিয়া। এরকম ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের সাত বছর পর। নবী (সাঃ) কোথায় প্রথম অবস্থান করবে তা নির্ধারিত হয়েছিল এই কাসওয়ার থেকে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। নবী (সাঃ) বুঝে নিলেন এটাও সেরকম এক চিহ্ন বিশেষ। তাই তাঁকে এখানেই থামতে হল এবং তিনি মুসলিম তীর্থযাত্রীদের মক্কায় আপাতত প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন।

কুরাইশরা এতে অবাক হয়ে গেলেন। তারা ভাবতেও পারেনি যে সত্যিই নবী (সাঃ) তাঁর সাথিদের নিয়ে কেবল ধর্মীয় কাজের জন্য এসেছেন। সত্যিই তারা তো তাদের সাথে কোন সমরাস্ত্র নিয়ে আসেনি। কিন্তু আরবের এই নতুন শক্তি সঙ্গে তো ইচ্ছেমত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই আসতে পারত। আদৌ নবী (সাঃ) যুদ্ধ করার মনোভাব নিয়ে আসেননি এটা কুরাইশদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। তারা বুঝল নবী (সাঃ) এর সমর নীতি, ধর্মীয় নীতি কিংবা সামাজিক রীতিনীতি সমস্ত কিছুই তাদের চেয়ে আলাদা, তাদের চেয়ে উন্নত মানের।

আলোচনা

কুরাইশরা যখন নবী (সাঃ)কে মক্কায় ঢুকতে দেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি যখন জটিল হল তখন দূতয়ালীর কাজ শুরু হল -এর সমাধানকল্পে।সর্বপ্রথম কুরাইশদের খুজায়া গোত্রের প্রধান বুদাইন বিন উরাকা রসূল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে

গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন।

"আমরা শুধু কা'বা শরীফ দর্শন করার উদ্দেশে এসেছি। যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কুরাইশরা যুদ্ধ করার নেশায় পাগল অথচ যুদ্ধে তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হবে না। কয়েক বছরের জন্য কুরাইশরা যদি আমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে ক্ষতি কি?"

এইভাবে রসূল (সাঃ) যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমেই তাঁর ভাবনা তুলে ধরলেন। বুদাইলও কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রসূলের আসল উদ্দেশ্য যে যুদ্ধ করা নয় তা বোঝালেন এবং তিনি যে কাবা দর্শনের জন্যই এসেছেন তাও তিনি সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু একগুঁয়ে যুবকরা শান্ত হল না। অবশ্য বয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নবী (সাঃ) এর কাছে আহাবীশ নেতা উলাইস বিন আলকামাকে পাঠালো। তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে গিয়ে দেখলেন যে চারণভূমিতে কুরবানীরই জন্তু চরে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া কোনপ্রকার যুদ্ধ বহরও তাদের সাথে দেখা গেল না। তখন তার সমস্ত রকম সন্দেহ দূরীভূত হল। সে ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের সমস্ত কথা বলল। কিন্তু কুরাইশ নেতারা আরোও খানিক যাচাই করে দেখার জন্য উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফিকে প্রতিনিধি করে পাঠালেন, উরওয়া রসূল ও তাঁর সাথিদের সাথে কথোপকথনের পর এই সিদ্ধান্তে আসে যে মুসলিমরা আদৌ যুদ্ধ করতে আসেনি তাছাড়া যুদ্ধের জন্য কোনপ্রকার হাতিয়ারও তারা আনেনি। উরওয়া ফিরে গেল কুরাইশদের কাছে। সে জানালো,

> "নেতার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা কোন রাজা বাদশাহর দরবারে দেখিনি, মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথীরা তাঁর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। তাঁর সাথীরা তাঁর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তাঁর হাতের ইশারায় তারা মরতেও দ্বিধা করে না।"

উরওয়া এটা অনুভব করেছিলেন যে জাতি তার নেতাকে সম্মান করতে শিখেছে সে জাতির মাথা অবশ্য উন্নত হতে পারে। তাদের শির যেখানে সেখানে লুটিয়ে পড়ে না, তাই তাদের জয় সর্বত্র। সমস্ত আরব কেন সারা পৃথিবী যদি এগিয়ে আসে তাদের গতিরোধ করার জন্য তবুও তা রোধ করা যাবে না। নেতার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা দুর্জয় শক্তির জন্ম দিয়ে থাকে এটা উরওয়া খুব ভাল করেই অনুভব করেছিলেন। হুদায়রিয়ার ময়দানে ইসলামী সংগঠনের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, তাই এ দৃশ্য উরওয়ার মনে বড় ধরনের রেখাপাত করেছিল।

আলাপ আলোচনার এ ধারায় কিছুটা আশার আলো নবী ((সাঃ)) দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা বন্ধ করলেন না, যাতে করে আলাপ আলোচনা ও শান্তিতে ইতি পড়ে না যায় সে কারণে তিনি খারাইশ ইবনে উমামাকে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন। কুরাইশদের মধ্যে উত্তেজনার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে তারা যে উটে চড়ে মক্কার কুরাইশদের কাছে আলাপ আলোচনার জন্য গিয়েছিল সেটিকে মেরেই ফেলেছিল। খারাইশ কোন রকমে জীবন বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিল নবী (সাঃ) এর কাছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী (সাঃ) শান্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে রেখেছিল সমানভাবে। তিনি শেষে পাঠিয়ে দিলেন নিজ জামাতা ও প্রখ্যাত সাহাবা উসমান গনি (রাঃ)কে কারণ উসমান গনি (রাঃ)-র সাথে কুরাইশদের অনেক গোত্রীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই সময় কুরাইশদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে তারা কিছু বদমাইশ লোকেদের চর লাগিয়েছিল। এমনকি তারা মুসলমানদের মধ্যে এমন উস্কানিমূলক কথা চালাতে লাগল যে তাতে করে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়া খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এমনকি এক সময় তারা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে তীর ও পাথর ছুঁড়তেও কুণ্ঠা বোধ করল না। পরক্ষণে তারা মুসলমানদের এড়িয়ে পালাতে পারল না, ধরা পড়ল মুসলিমদের হাতে। নবী (সাঃ) কিন্তু তাদের এ অপরাধ ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাদের মুক্ত করে দিলেন।

কিন্তু উসমান (রাঃ)কে আটকে রাখল কুরাইশরা। তার ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে স্বাভাবিকভাবে মুসলিমদের মধ্যে উদ্বেগ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। দুশ্চিন্তায় পড়ল সকলে। পরিবেশ এতটাই থমথমে ছিল যে এক সময় কিছু গুজবে কান দিয়ে ফেলল মুসলিমরা। গুজব ছড়াল হজরত উসমান গনি (রাঃ)কে হত্যা করে ফেলা হয়েছে। এ কথা শোনার পর রসূল (সাঃ) দারুনভাবে বিচলিত হলেন। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।

এটা ছিল হজ্বের মাস। তাই এ সময়ে কোন প্রকার হত্যা বৈধ ছিল না সমগ্র আরব নীতিতে। তা ছাড়া মুসলমানরা তাদের কোন অন্যায় আবদার নিয়ে আসেনি। বরং তারা বৈধ অধিকার নিয়েই এসেছিল। কারণ কা'বা দর্শন তখন সমস্ত আরবের মানুষের বৈধ অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কুরাইশরা যখন একেবারে যুদ্ধ পাগল হয়ে যুদ্ধ বাধাতে চাইল তখন মুসলিমরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া ঠিক হবে বলে বিবেচনা করল।

আনুগত্যের সাফাই

নবী (সাঃ) তাঁর সমস্ত সঙ্গীসাথীদের ডাকলেন। সবাই নবী (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমবেত হলেন একটি বাবলা গাছের তলায়। সকলে মিলে নবী (সাঃ) এর হাতে হাত রাখলেন। অঙ্গীকার নিলেন যদি হজরত ওসমান গনি (রাঃ) সত্যিই শহীদ হয়ে থাকেন তবে তারা অবশ্যই আমরণ লড়াই করে যাবেন। কেউই বিনা যুদ্ধে বাড়ি ফিরে যাবেন না। কারণ আল্লাহ ও রসূলের অর্পিত দায়ীত্বই ওসমান গণি (রাঃ) পালন করে গেছেন। নবী (সাঃ) এর কাছে সাহাবীরা এতটাই আবেগাপ্লুত ছিলেন যে সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নবী (সাঃ) এর হাতের উপর হাত রাখছিলেন লড়াইয়ের অঙ্গীকার নিয়ে। নবী (সাঃ) সেই মুহুর্তে ঘোষণা দিয়েছিলেন, "আজকের দিনে তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" সাহাবীদের এই অঙ্গীকার "বাইওয়াতে রিদওয়ান" নামে পরিচিত। কুরআনও এই অঙ্গীকারের প্রশংসা করে বলেছে,

> *"আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন যখন তারা গাছের তলায় তোমার নিকট বাইয়াত করছিল।*
> (কুরআন ৪৮ ঃ ১৮)

কিন্তু মুসলিমদের এই সৌভাগ্যবান দলের মধ্যে থেকেও একজন মুনাফিক এ অঙ্গীকারে শপথ নিল না। হতভাগাদের দলে পড়ে রইল মুনাফিক জিফ বিন কায়েস। চৌদ্দশ' মুসলিম বাহিনীর কি সৌভাগ্য তখনও যুদ্ধের জন্য তারা এক ফোটাও রক্ত ঝরায়নি কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার ঘোষণা শুনলেন রসূলের মুখ থেকে।

মুসলমানদের এ রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পৌঁছে গেল কুরাইশদের কাছে। ঘাবড়ে গিয়ে তারা তখনই উসমান গণি (রাঃ)কে ফিরিয়ে দিলেন। কেননা যুদ্ধ চাইলেও তারা মুসলমানদের এ দৃঢ়তার কথা শুনে, নিজেদের মৃত্যুর কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ করে হজরত ওসমান গণি (রাঃ)-র আগমনে সবাই আনন্দিত হল, সবাই মনে করলেন নিষিদ্ধ মাসে অনিবার্য যুদ্ধের হাত থেকে অবশ্যই বাঁচা গেল। নবী (সাঃ) জ্ঞাত হলেন যে কুরাইশরা আবার দূত প্রেরণ করবেন সন্ধির জন্য। মক্কা থেকে মিকরাজ বিন হাফসা এলেন। কিন্তু নবী (সাঃ) আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এর সাথে আলোচনা শুভ ইঙ্গিত বহন করবে না। অবশেষে কুরাইশদের মধ্যে থেকে এল সোহায়েল বিন আমর। নবী (সাঃ) এই ব্যক্তির উপর অনেকটা আশাবাদী ছিলেন। সন্ধির ব্যাপারে অনেক কিছু আলোচনা হল। রসূলের সাথে সোহায়েলের সন্ধির শর্তগুলো লিখে নেওয়ার জন্য আলি (রাঃ)কে রসূল (সাঃ) বললেন। আলি (রাঃ) লেখার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল কয়েকটি বিষয় নিয়ে। প্রথমেই আলি (রাঃ) সন্ধিপত্রের প্রথমে 'বিসমিল্লাহির্ রহমানির রহীম' লিখলেন। সোহায়েল বিন আমর আপত্তি তুলে বললেন 'রহমান রহীম' শব্দ দুটি লেখা যাবে না, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে হবে। রসূল (সাঃ) লিখতে বললেন "নিম্নলিখিত চুক্তি আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ও সোহায়েল বিন আমরের মধ্যে সম্পাদিত হল।" এতেও জোর আপত্তি উঠল সোহায়েল বিন আমরের পক্ষ থেকে। তিনি বললেন 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল মানতাম তাহলে আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম নাকি? আপনি কেবল নিজের নাম এবং নিজের পিতার নাম লিখতে বলুন। ইতিমধ্যে আলি (রাঃ) 'আল্লাহর রসূল' কথাটা লিখে ফেলেছিলেন। তাই 'আল্লাহর রসূল' কথাটা নিজের হাতে আবার কেটে দেওয়াটা বড় ধরনের বেআদবী কাজ বলে ভাবলেন। তাই তিনি কাটতে পারলেন না। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই ওই অংশটি কেটে দিলেন এবং পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখে দিলেন।

সোহায়েল বিন আমরের এ ধরনের ঔদ্ধত্য সাহাবীরা ভাল চোখে দেখতে পারছিলেন না। কিন্তু তারা ছিলেন নবীর শিষ্য তাই নবীর সম্মানার্থে নিজেদের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। সোহায়েল বিন আমরের উপর চড়াও হলেন না।

স্রষ্টা বনাম সৃষ্টির উপাসনা

নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর 'বাইয়াতে রিদওয়ান' যে গাছের তলায় সংঘঠিত হয়েছিল সেই বাবলা গাছকে ঘিরে এক ধরনের কু-সংস্কারে মুসলমানরা জড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ ভেবে বসল এই গাছটি পবিত্রতার প্রতীক। এখান থেকে শুভ বা কল্যাণ ঝরতে থাকে। তাই তারা গাছের কাছে বসা মঙ্গল জনক বলে ভেবে বসল, দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা জড়ো হতে লাগল গাছের তলায়। এমনকি গাছের পূজাও তারা শুরু করে দিল ভক্তিভরে। কিন্তু এটা সত্যি ছিল যে নবী (সাঃ) বেঁচে থাকতে এ গাছের গুরুত্ব তিনি মোটেই দেননি। এই গাছের প্রতি কোন রকম ভক্তি নিবেদন মূলত ছিল তৌহিদী চিন্তা ধারার বিপরীত কাজ। হজরত ওমর (রাঃ) তখন ছিলেন খলিফা, তিনি ব্যাপারটা অনুধাবন করলেন মন দিয়ে। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন এই গাছের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির রেশ ধরে শিরকের ছয়লাব বইতে শুরু করেছে। এখুনই যদি এর কোন ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে এ অরাজকতার বাড়বাড়ন্ত আর রোখা যাবে না। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ গাছটি উপড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন "মানুষকে তার স্রষ্টার উপাসনা করতে হবে, তার সৃষ্টির নয়।" এ ঘটনা থেকে এটা একেবারে পরিস্কার নবীর কোন স্মৃতি অথবা কাহিনী আল্লাহর একত্ববাদের সাথে যেন জড়িয়ে না যায়। সে দিকে সকল মুসলিমদের সতর্ক থাকা দরকার। এরকম

সূক্ষ্ম ভুল অনুভূতির সুড়সুড়ি থেকে মানুষের মধ্যে শিরকের চোরা স্রোত প্রবেশ করে সমাজে। পরে তা বন্যার আকারে প্লাবিত করে মুসলিম আক্বিদা-বিশ্বাসকে। এইভাবে সব সময়ের জন্য শিরক ও বিদয়াতের নানান দিক মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে চলে। হজরত উমর (রাঃ) ব্যাপারে যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিলেন। তাই শিরকের মহীরুহ হওয়ার আগে গাছটি উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত

এটা ছিল আরবি ষষ্ট হিজরী, ৬২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে সাক্ষরিত হল এক সন্ধি যা ইতিহাসে 'হুদাইরিয়ার সন্ধি' হিসাবে খ্যাত। সন্ধি লেখার শুরুতে কিছু আপত্তি উঠেছিল কুরাইশদের পক্ষ থেকে পরে অবশ্য নবী (সাঃ) কুরাইশ নেতা সোহায়েলের কথা মেনে নেওয়াতে গন্ডগোল প্রশমিত হয়। এর পর আলি (রাঃ) সন্ধির শর্তগুলি লিখে চললেন,

১) উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি ও সন্ধি মেনে চলবে।

২) মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর কা'বায় যিয়ারত করতে আসবে, তখন তাদের কাছে কেবল কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। কিন্ত তারা মাত্র মক্কায় তিনদিন অবস্থান করার অনুমতি পাবে।

৩) আরবের গোত্রগুলো দুই পক্ষের যার সাথে ইচ্ছা মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।

৪) মদিনার পাশ থেকে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যখন যাতায়াত করবে তখন তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করবে মদিনার মুসলিমরা।

৫) এই দশ বছরের মধ্যে কুরাইশদের মধ্য থেকে যদি কেউ বিনা অনুমতিতে মদিনার মুসলিমদের সাথে যোগ দেয় তাহলে মুসলিমরা তাকে কুরাইশদের হাতে পুনরায় অর্পন করবে। কিন্তু মদিনার কোন লোক কুরাইশদের কাছে গেলে তারা তাকে আর ফেরত দেবে না।

সন্ধির শর্তগুলিতে আপাত: খুবই সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। কিন্তু রাসূল (সাঃ) তা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আমি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে এসেছিলাম কিন্তু এখন মক্কাবাসীদের ইচ্ছাকে মেনে নিলাম।

দুই শত্রুপক্ষের চাপে মদিনা

বিখ্যাত মুসলিম আইনজ্ঞ সারাক্সি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে। খায়বার ছিল মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত এবং মক্কা ছিল মদিনার দক্ষিণে। অর্থাৎ মদিনার অবস্থান ছিল উভয়ের মাঝে। এইভাবে মদিনাকে সব সময় দুই শত্রুর চাপে পড়ে থাকতে হত। খায়বারের ইহুদিরাও ছিল ইসলামের শত্রু এবং মক্কার কুবাইশরাও ছিল ইসলামের শত্রু। আবার এই দুই পক্ষের মধ্যে মিত্রতা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল অধিক। যদি মুসলিমরা যুদ্ধে জড়িয়ে যায় তাহলে এই দুই পক্ষ একে অপরকে সাহায্য করার ব্যাপারটা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। আবার রসূল (সাঃ) যদি মক্কার দিকে অগ্রসর হতেন তাহলে খায়বারের ইহুদিদের দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিত বেশী করে।

এইরকম এক চরম পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্র নেতার অবশ্যই উচিত ছিল যে কোন একপক্ষের সাথে শান্তি চুক্তি করে তাকে নিষ্ক্রিয় করা ও নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখা। আর নবী (সাঃ) তাই করেছিলেন। এতে করে উভয়পক্ষের কাছ থেকে আসা চাপ স্বাভাবিকভাবে প্রশমিত হয়ে ছিল। তবে একটা প্রশ্ন ছিল এরকম পরিস্থিতিতে মদিনার মুসলিমদের কোন পক্ষকে নিষ্ক্রিয় করা উচিত ছিল? মক্কা অথবা খায়বার, কোনটা? খায়বারের প্রশ্ন মোটেই আনা যায় না, কারণ বনু নাজির গোত্রের ইহুদীরা মদিনা থেকেই বিতাড়িত হয়েছিল। তারা তো স্বাভাবিকভাবে দাবি করে বসত মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তারা ছিল যথেষ্ট ধনী। তাই তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাধ্য করা যেত না।

মক্কার কথা ভাবা যেতে পারে কারণ নবী (সাঃ) এর বহু আত্মীয়-স্বজনই মক্কায় ছিল। নবীর সাথে যারা মদিনায় হিজরত করে এসেছিল তারা অনেকেই বিভিন্ন আত্মীয়সূত্রে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সাথে একাত্ম হয়েছিল অনেকদিন ধরে। কারোর পিতা, কারও মাতা, আবার কারও চাচা, মামা এইভাবে কেউ না কেউ তাদের আত্মীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ট ছিল। তাই তাদেরকে অন্যায় পথ থেকে রক্ষা করা একান্ত দায়িত্বের মধ্যে পড়েছিল মদিনাবাসী মুসলিমদের। তাদের সাথে রক্তপাত ও যুদ্ধ থেকে যতটা এড়িয়ে থাকা যায় ততটা ভাল বলে রসূলের কাছে বিবেচিত হয়েছিল। আবার তিন তিনটে যুদ্ধে কুরাইশরা ক্লান্তও হয়ে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে। তারা যেমন আর্থিকভাবে দমে গিয়েছিল তেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও তাদের অনেকটাই মন্দার দিকে যাচ্ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবে তারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে শান্তির প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিল। এরকম নানান কারণে মক্কাবাসীরা শান্তি চেয়ে নবী (সাঃ) এর কাছে অনেকটা নতি স্বীকারের পর্যায়ে এসেছিল। তাই অল্প চেষ্টাতেও শান্তির পরিবেশ আসা সম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) চেয়েছিলেন অনেকটা ক্ষতি স্বীকার করেও তাদের কাছে টানতে। মক্কার কুরাইশদের মধ্যে ও মদিনার মুসলিমদের মধ্যে যে সন্ধি

হয়েছিল তাতে শর্ত ছিল তারা পরস্পর আক্রমণ অথবা যুদ্ধ করবে না। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় তারা মাথা দেবে না। তাছাড়া তৃতীয় পক্ষ দ্বারা মুসলিমরা আক্রান্ত হলে মক্কার অধিবাসীরা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে। এখানে কোন বিশ্বাসভঙ্গ হবে না।

এই চুক্তির দ্বারা মদিনার মুসলিমরা বেশ কয়েকটি সুবিধা উপভোগ করলেন। প্রথমত মুসলমান ও মুশরেকদের মধ্যে পূর্বের মত অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ সৃষ্টি হল। দীর্ঘদিন ধরে যেসব আত্মীয়দের কাছ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তারা পুনরায় আবার মেলা মেশার ফলে একটা শান্তির 'আবহাওয়া সৃষ্টি হল'। মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীদের সম্বন্ধে যে সকল বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, মানুষের যে সকল প্রশ্ন এতদিন নিজেদের মনে দমিত ছিল তা তারা প্রকাশ করল মুসলিমদের কাছে এবং এর ফলে যে উত্তর তারা পেল তা থেকে অনেক নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক নানান বিষয়ে উপকৃতই হল বলা যেতে পারে। তাই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে খোলা মেলা আলোচনার বাতাবরণ সৃষ্টি হল সর্বত্র। দীর্ঘ আঠারো উনিশ বছরে যে অবস্থা ছিলনা বর্তমানে সেই অবস্থা হওয়ার জন্য ইসলাম দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করল এবং মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন করে বাড়তে লাগল। মাত্র দু'বছরেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল বিগত দিনের চেয়েও অনেক বেশী এমনকি এই সময় খালিদ বিন অলীদ ও আমর ইবনুল আসের মত বিখ্যাত সমর কুশলীরাও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল।

এই দীর্ঘ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকার কারণে মুসলমানরা নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেয়েছিল। তাদের মানসিক ও নৈতিক আচরণে ঘটেছিল বিরাট পরিবর্তন। তাই প্রসাশনিক স্তরে ঘটেছিল অনেক উন্নতি। স্বাভাবিকভাবে ইসলামকে আর কেবল আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হল। বিদেশী সরকাররাও আমন্ত্রন পেল ইসলাম গ্রহনের।

মদিনার সরকার যখন কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল তখন খায়বারের ইহুদীদের নির্মূল করার যথেষ্ট শক্তি অর্জন করল মুসলিমরা। কারণ তাদের দমন করার সময় তারা কুরাইশদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

হুদায় বিয়ার সন্ধির ফলে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা একদম স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। তারা ইচ্ছা করলে মদিনার মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করতে পারত। এমনকি বিপদে আপদে মদিনার মুসলিমদের সাহায্য করার অধিকার পেয়েছিল তারা। আর এতে বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা রাখল না কুরাইশরা। এই সুযোগ নিয়ে মক্কার বনু খুযায়া গোত্র সরাসরি মদিনার ইসলামী সরকারকে সাহায্য করেছিল।আর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা নির্ভয়ে নিসংকোচে মক্কায় এসে যিয়ারত করার সুযোগ পেয়েছিল।

অস্থির পরিবেশ

সমস্ত কিছু বিবেচনা করে বলা যেতে পারে নবী (সাঃ) সাহাবাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে সাময়িক নতি স্বীকার মনে হলেও অদূর ভবিষ্যতে বহু কল্যাণকর বিষয় বয়ে এনেছিল মুসলিমদের জন্য। যার সম্বন্ধে মুসলিমরা এর আগে কোন কল্পনাও করতে পারে নি। কুরাইশরাও ভাবতে পারেনি যে এই সন্ধির ফলে খায়বারের সাথে মিত্রতাও নষ্ট হয়ে যাবে। আর খায়বারের ধ্বংস হলে কুরাইশরা একেবারে একলা হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে মক্কা বিজয়ের বিপ্লবী চেতনা গড়ে উঠেছিল সকলের মধ্যে।

এই পরিস্থিতিতে যদিও ওমর (রাঃ) নবী (সাঃ)-র কাছে কয়েকটি অবান্তর প্রশ্ন করে নিজের ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং শেষমেশ নবী (সাঃ)-র কাছে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে ক্ষনিক শান্ত হয়েছিলেন। তবুও কিন্তু তিনি একেবারে রাগ দমন করতে পারেন নি, এমনকি তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধিপত্রে সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছিলেন। অবশেষে পরিস্থিতি এতটাই বিষন্ন ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে নবীর সেই সময়ের কোন আদেশ শোনার মত মানসিকতাও সাহাবীরা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

নবী (সাঃ) সাহাবীদের নিজ নিজ পশু কুরবানী করতে বললেন এবং নিজেদের মাথা মুন্ডন করার কথাও বললেন। কিন্তু সবাই সেই বিষন্ন পরিবেশে নবীর আদেশ যে মানতে হয় তা ভুলে গেলেন। নবী (সাঃ), দ্বিতীয়বার আদেশ করলেন কিন্তু ফল হল না, তৃতীয়বারের জন্য তিনি একই আদেশ করলেন কিন্তু সবাই চুপচাপ রইলেন আগের মতো। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা বোঝা যায় যে একজন নেতাকে কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। নিজ হাতে রসূলের গড়া এই ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এই স্থবিরতা রসূলের জন্য সত্যিই খুব কষ্টের ছিল। তিনি বিচলিত হলেন দারুনভাবে। তৎপরতার ক্ষেত্রে এরকম অনেক জটিল পরিস্থিতি আসতে পারে যে কোন মুহুর্তে।

নবী (সাঃ)-র সাহাবাগণ এর আগে কোন সময় একত্রে এভাবে নবী (সাঃ)-র অবাধ্য হয়নি। তাই তাঁর কাছে অবাক লাগছিল সাহাবাদের এরকম আচরণ। তিনি মর্মাহত হলেন, সাহাবাদের কাছ থেকে তিনি ফিরে গেলেন নিজ তাঁবুতে। নিজের স্ত্রী উম্মে সালমাহ কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বুদ্ধিমতি উম্মে সালমাহ এ কথা শোনার পর নবী (সাঃ)কে পরামর্শ দিলেন কাউকে কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে যেতে। তারপর পরামর্শ দিয়ে বললেন,

> "ওগো আল্লাহর নবী (সাঃ), এই দেড় হাজার মানুষ দিয়ে আপনি তা করাতে পারবেন না যদি তাদের হৃদয় তা করতে না চায়। কেবলমাত্র আপনি আপনার নিজের কাজটিই করে ফেলুন যেটা আপনার উপর আল্লাহ আরোপিত করেছেন। আপনি আপনার কাজ করার জন্য এগিয়ে যান খোলা মাঠে আর এটা আপনার জন্যই যথেষ্ট।"

নবী (সাঃ) স্ত্রীর উপদেশটিকে মহা মূল্যবান মনে করলেন। তিনি মর্যাদা দিলেন এক নারীর উপদেশকে। তিনি ভাল করে ভেবে দেখলেন যে এর মধ্যে রয়েছে অনেক যুক্তি। তাই তিনি আর বিলম্ব করলেন না বেরিয়ে এলেন তাঁবু থেকে তারপর কুরবানীর উটের কাছে গেলেন ধর্মীয় নিয়ম মেনে তিনি সেটাকে কুরবানী করলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে। চমৎকার এক প্রভাব পড়ল সমগ্র সাহাবাদের উপর। তারাও একে একে নিজ পশুদের কুরবানী করল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তারপর তিনি নিজের মাথা মুন্ডন করলেন। সকল সাহাবাগণও একে একে তাঁর অনুসরণ করে নিজেদের মাথা মুন্ডন করে ফেললেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল
মহাবিজয়ের বিশেষ ঘোষণা

মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেই সমস্ত রকম কাজ করে যাচ্ছিলেন। অত্যাধিক আবেগ নিয়ে তিনি বিচক্ষণতার সাথে দশ বছরের জন্য শান্তিচুক্তি করতে পেরেছিলেন। এই বছরের মধ্যে উভয়ের মধ্যে আপাতত কোন যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘঠিত হবে না বলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তা ছাড়া তিনি বিরাট আশা করতে পেরেছিলেন যে আগামী বছর পবিত্র কাবা দর্শন করার সৌভাগ্য মুসলমানদের হবে। বেশীর ভাগ সাহাবা মূলত তাৎক্ষনিক সফলতা খুঁজছিলেন, বিশেষত ওমর (রাঃ) কুরাইশদের কাছে মাথানত হবে এমন কোন কাজের সাথে মোটেই একমত হতে পারছিলেন না। তাই স্বভাবত তিনি অন্যান্যদের মতো রসূলের সামনে তার বিদ্রোহভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু তিনি এটাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে নবী (সাঃ) এর উপর কোন অহী অবতীর্ন হয়ে পড়ার নবীর প্রতি তার এ হেন কঠোর আচরণের জন্য। ওমর (রাঃ) লক্ষ্য করলেন নবী (সাঃ)-র মুখ বিবর্ন হয়ে উঠেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি শুনলেন অহীর বাণী। অবশ্য এটা ছিল ওমর (রাঃ)-র অপ্রত্যাশিত। তিনি যেটা ভেবেছিলেন তা না হয়ে অহীর বাণী এল অন্যরকম-

"হে নবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।" (কুরআন ৪৮ ঃ ১)

তারপর এই সন্ধিকে উল্লেখ করে বলা হল,

> *"আল্লাহ আয়ালা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যখন তারা গাছের তলায় তোমার নিকট বাইয়াত করছিল তাদের অন্তরের অবস্থা তাঁর জানা ছিল, এ জন্য তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ন করলেন। পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।" (কুরআন ৪৮ ঃ ১৮)*

সবকিছুর যেন পুন:স্মরণ ঘটল। নবী (সাঃ) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এ যেন তারই বাস্তব রূপ।

> *"বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সঠিক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণমাত্রায় শান্তি ও নিরাপত্তাসহ প্রবেশ করবে। নিজেদের মাথা মুন্ডন করাবে ও চুল কাটাবে। আর তোমরা কোন ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সে কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্নপূর্ণ হবার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদের দান করেছেন।"*
> *(কুরআন ৪৮ ঃ ২৭)*

সবেমাত্র ঘটে যাওয়া এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে সাহাবাদের ধ্যান-ধারণা থেকে পৃথক ছিল। আপাতত এই চুক্তি সাহাবাদের কাছে পরাজয় মনে হলেও আল্লাহ একে নিকটবর্তী বিজয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর নবী (সাঃ)-র স্বপ্নকে একেবারে বাস্তব করে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন এই বাক্যে– "তুমি প্রবেশ করবে পবিত্র মসজিদে।" তা সত্ত্বেও বেশীরভাগ মুসলিমরা এই চুক্তির এত গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে ভাবতে পারে নি। কিন্তু নবী (সাঃ) একজন দূরদর্শী নেতা হিসাবে এর গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সার্বিকভাবে।

উম্মে সালমা (রাঃ)-র সমাধান সূত্র

নবী (সাঃ)-র জীবনের প্রতিটি অবস্থায়ই মুসলমানদের কাছে অনেক শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে এমন কিছু ঘটে যা স্মরণ না করে মুসলমানদের এক পাও চলা সম্ভব নয়। উম্মে সালমা (রাঃ)-র কাছ থেকে উপদেশ নেওয়াও এ রকম এক ঘটনা, হুদাইবিয়া চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর মুসলমানেরা রসূলের উপর এত অভিমান করে বসেছিলেন যে নবী (সাঃ) তাদের সামাল দিতে পারলেন না। এমনকি তিনি

তাদের নিজ নিজ কুরবানীর পশু কুরবানী করতে আদেশ দিলেন। তারা তা পালন করেননি। একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিনবার তিনি এই আদেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবারা ছিলেন অনড়। একইভাবে তিনি তাদের মাথা মুন্ডন করতে বলেছিলেন তাও তারা করেনি। অবশেষে নবী (সাঃ) অনেকটা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজ তাঁবুতে স্ত্রী সালমা (রাঃ)-র কাছে। তিনি নবী (সাঃ) এর প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলেন, তার প্রতি অনুগত হয়ে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। দু'জনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তাতে বোঝা যায় নবী (সাঃ) স্ত্রীদের পরামর্শকে কত গভীরভাবে গুরুত্ব দিতেন। অনেক দিন আগে তিনি স্ত্রী খাদিজা (রাঃ)-র কাছেও এরকম সব সমস্যার কথা বলতেন এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে চলতেন ইসলামি আন্দোলনের কাজে। ইসলামি আন্দোলনের পথে তিনি মহিলাদের কাছে সমস্যা সমূহ খুলে বলতেন ও তাদের কাছ থেকে সমস্যার সমাধানও পেতেন। সমস্ত মানব সমাজের কাছে এবড় শিক্ষনীয় বিষয় যে নবী (সাঃ) নিজেই তার স্ত্রীদের কাছে বড় বড় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে এর সমাধান পেতে চেয়েছেন। জীবনে চলার পথে যে বড় বড় বিপদ থাকতে পারে এটাও যেমন সত্য তেমনি এ সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য স্ত্রীদের সহানুভূতি ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন আছে তাও সত্য।

উম্মে সালমা (রাঃ) একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। তিনি যেমনই বিশ্বস্ত ছিলেন তেমনি ছিলেন সুশ্রী ও ধার্মিক। আয়েশা (রাঃ) স্বীকার করেছেন নবী (সাঃ) তার পরামর্শ নেওয়ার জন্য তার হিংসা হত। এইভাবে নবী (সাঃ) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন জীবনে চলার পথে মহিলাদের পরামর্শের কত বড় মর্যাদা রয়েছে।

দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে

মুসলিমরা হুদাইরিয়ার চুক্তি সম্পন্ন করার পর কুরবানী ও অন্যান্য কাজ সেরে ফিরে এলেন মদিনায়। জীবন যাপনের ধারা চলল সেইভাবে। কিন্তু এখন বিপদের সম্ভাবনা না থাকার কারণে মুসলমানেরা নিজ নিজ কাজের মধ্য মনোনিবেশ করতে পেরেছিল নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তায়। নানান সামাজিক কাজ কারবারের উন্নতিতে মন দিতে পেরেছিল অনেকটা এবং ইসলাম প্রচারের কাজও চলছিল পুরোদমে যার ফলে ইসলামের প্রসার লাভ ঘটেছিল খুব দ্রুত। ইসলামের মুক্তবাণী আরব উপদ্বীপের সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল স্বকীয়তার সাথে। রসূল (সাঃ)-র প্রচারিত ইসলামের মৌলিক কথাগুলো আরবের প্রায় সব গোত্রের মানুষের কেউ না কেউ গ্রহন করেছিল ভক্তিভরে। এটা ছিল নবী (সাঃ)-র ব্যাক্তিত্বের এক বড় আকর্ষণ।

বেশ কিছু কারণে অনেক লোকেরা অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করা

থেকে নিজেদের এড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল। অনেক জাতি উপজাতির লোকেরা ইসলামের সত্যতা বোঝা সত্ত্বেও ইসলামের ছায়াতলে আসতে ইতস্তত করছিল বিশেষ বিশেষ কারণে। তারা এটা ভেবেছিল যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা মানেই বাণিজ্যের নেতাদের ক্রোধের শিকার হওয়া। তাছাড়া তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক লোকসানের কথাও ভেবেছিল মনে মনে। পরস্পর আত্মীয়তার যে বন্ধন তাদের মধ্যে ছিল তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল খুব বেশি পরিমাণে।

হুদাইবিয়ার এই সন্ধি সমস্ত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রের মানুষদের মধ্যে এনে দিয়েছিল অনেকটা খুশির জোয়ার। এ সন্ধি আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ বিগ্রহের ভয়ংকর দামামাকে নিভিয়ে এক শান্তির পরিবেশ দান করেছিল। যার ফলে একদিকে যেমন হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ হ্রাস পেয়েছিল তেমনি অপরদিকে শান্তিপূর্ণ অনেক কাজ কারবারের দ্বার খুলে গিয়েছিল। এখন লোকেরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশরা আর ততটা ক্ষীপ্র হওয়ার সাহস পেল না। তাই দলে দলে লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল কোন এক সভামঞ্চের বদ্ধ দ্বারে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছিল আর এখন তা খুলে দেওয়ার ফলে লোকেরা স্রোতের মত তাতে প্রবেশ করছে।

মুসলমানরা এতদিন ধরে যে সমস্ত অভিযান চালিয়ে এসেছিল সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসু হয়েছিল এই হুদায়বিয়ার সন্ধিতে। মাত্র দুবছরের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ ঢুকে পড়েছিল ইসলামের মধ্যে। সবরকম বাধা বিপত্তিকে পেছনে ফেলে এই হাজার হাজার জনতা ইসলামে প্রবেশ করার অন্যতম কারণ হল তারা দেখতে পাচ্ছিল উন্নত এক সুনির্দিষ্ট সংগঠনের। নবী (সাঃ)-র সাথে হুদাইবিয়ায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দশ' মুসলিম, আর তিনি যখন দুবছর পরে মক্কা বিজয়ে গিয়েছিলেন তখন তার সাথে ছিল দশ হাজার অনুগত মুসলিম।

নতুন ইসলাম অনুসারীদের শিক্ষার সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ধর্মীয় বিষয়ের নানান দিক। সমস্ত আরব থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষ ইসলাম গ্রহন করে যেমন মদিনায় আসা যাওয়া শুরু করেছিল তেমনিভাবে হাজার হাজার পন্ডিত বিদগ্ধ মানুষেরা নবীর সানিধ্যে এসে বসবাস করার জন্য মদিনায় তারা ঘরবাড়ি বেঁধেছিলেন।

হুদাইবিয়ার বড় শিক্ষা

হুদাইবিয়ার বড় শিক্ষা হল ধৈর্য্য। প্রত্যেকের উচিত অধৈর্য না হওয়া এবং কেবলমাত্র বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিক সফলতাকে লক্ষ্য করে কোন কিছুর সার্বিক বিচার না করা। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে মুসলমানেরা মেনে নেয়নি মনে প্রানে কিন্তু পরবর্তীতে এটা

মুসলমানদের অতি উপকার সাধন করেছিল। এর দ্বারা অনেক কিছু তাদের কাছে সৌভাগ্য হিসাবে আল্লাহ দান করেছিলেন। যারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এটা ছিল ভাবনার বিষয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এই ধরনের কূটনৈতিক চুক্তি অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত। নবী (সাঃ)-র দ্বারা তাঁর সাহাবাদের মধ্যে ধৈর্য্যগুণের অনুশীলন ঘটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। হুদাইবিয়া চুক্তি সম্বন্ধে হজরত আবুবকর (রাঃ) যে সকল উচ্চমানের কথা বলেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আসাকির তার কিছু উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> "এটা ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় বিজয়। যদিও ওইদিন লোকেরা খুব সংকীর্ন দৃষ্টির ছিল, তারা বুঝতে পারেনি নবী (সাঃ) ও আল্লাহর মধ্যে যে গোপন বিষয়গুলি লুকিয়ে ছিল। লোকেরা বড় অধৈর্য্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ অধৈর্য্য ছিলেন না । তিনি লোকেদের ঢিল দিচ্ছিলেন যতক্ষণ না তারা ফিরে এসেছিল, তিনি যা চান সেই অবস্থাতে।"

এটা খুব বাস্তব কথা মানুষ এ পৃথিবীতে জলদি সফলতা চায়। আর এটাই পার্থিব সফলতা দান করে। কিন্তু মজার ব্যাপার সফলতা স্থায়ী করার জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষা প্রয়োজন তার জন্য মানুষ কোন কষ্ট স্বীকার করতে চায় না।

সীমান্তের বাইরে ইসলাম প্রচার

এ সন্ধি চুক্তির ফলে মাঝে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল তা খুবই গুরুত্বের। এই অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমিদের সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে গিয়েছিল। শান্তি চুক্তির ওই মাসগুলোতে নবী (সাঃ) চিন্তা করলেন বহির্দেশে কিভাবে ইসলাম প্রচার করা যায় সে বিষয়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে চিঠি লিখলেন পাশের রাজ্যগুলির রাজা বাদশাদের কাছে। তিনি তার এই চিঠিগুলোতে পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের মৌলিক কথাগুলি। তাছাড়া তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল তাও তিনি জানিয়েছিলেন। চিঠিগুলিতে তিনি শীলমোহর হিসাবে ব্যবহার করলেন নিজের এক রৌপ্য আংটির ছাপ, যাতে লেখা ছিল "আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ।"

এইভাবে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত এক চিঠি পেয়েছিলেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী। অবশ্য তিনি আগে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবী (সাঃ) পারস্যের সম্রাট খসরুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। এইভাবে তিনি একে একে বাইজান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিশরের শাসক মুকাকীশ, বাহরাইনের রাজা মুন্দির, সিরিয়ার বেশ কিছু অংশের শাসক আল হারিসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন।

সকলের কাছে দেওয়া চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় একই ছিল। এগুলোতে তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরীত রসূল বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সবাইকে তিনি আল্লাহর একত্ববাদের কথা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে ছিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি তাদের ইসলাম গ্রহনের কথা বলেছিলেন। আর যদি তারা নবী (সাঃ) এর এই আহ্বানে সাড়া না দেন তাহলে তারা যে সমস্ত জাতির মানুষকে ভুলের মধ্যে রেখেছেন তার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে তাদেরকে- একথা যেন তারা জেনে রাখে।

এই সকল রাজাদের কাছে নবী (সাঃ) যে চিঠি দিয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছিল। আবিসিনিয়ার নাজ্জাসী এই বাণী গ্রহণ করেছিলেন। মুকাকিশ ও হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ অথবা যুদ্ধ কোনটাতেই আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আর আল হারিসের মত অন্যেরা নবী (সাঃ)-র আহ্বান পেয়ে মুসলিমদের শাসিয়েছিলেন এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ইসলামের কথা পৌঁছে গিয়েছিল সর্বত্র। ইসলাম এক রাষ্ট্রীয় শক্তি মদিনায় যে স্থায়ীভাবে কায়েম হয়েছে তা সকলে জ্ঞাত হয়েছিল। সবাই জানতে পেরেছিল এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে। এটি যে একটি বিশেষ আঞ্চলিক শক্তির আধার তা সবাইয়ের জানা হল। তারা আরোও জেনেছিল আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এর কর্ণধার। আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহরই মনোনীত।

মূলত হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এক মহা বিজয়। সেই সঙ্গে এর দ্বারা ইসলাম ঘরে বাইরে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল দ্রুত গতিতে। তাছাড়া বিগত যুদ্ধ গুলোতে যথেষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল দুই পক্ষেরই। তাই সবারই কাম্য ছিল নিজেদের জীবনের যেমন নিরপত্তার তেমনি নিজেদের সহায় সম্পদেরও। হুদায়বিয়ার পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। অবশেষে নবী ((সাঃ)) আল্লাহর একত্ববাদের কথা অনেকটা প্রকাশ্যে বেশি করে প্রচার করার সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। আর এই একত্ববাদের বাণী মানুষকে মুক্ত করেছিল সাময়িক সম্মুখে আসা অবাঞ্চিত ক্ষুদ্র শক্তির থাবা থেকে। একত্ববাদ তাদের শিখিয়ে ছিল এ জগতের সমস্ত শক্তি একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে উৎসারিত। তাই কেবল তিনিই ভয়ের কারণ হতে পারে অন্য কেউ নয়। সমস্ত আরব জগত এখন শান্তির বন্ধনে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বেশি বেশি করে সমস্ত গোত্রগুলো ইসলামের মহান বার্তা পাচ্ছিল। অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামের মহান আদর্শকে সম্মান জানাচ্ছিলেন। আর যারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ছিল তারাও জেনে বুঝে লড়ছিলেন। কেবল হটকারিতার জেরে তারা বিরোধিতা করেনি।

নবী (সাঃ)-র সময় ভারতীয়দের উপর ইসলামের প্রভাব

বাজান

বাজান ছিল বালুচিস্তানের এক জন শাসক। তার সাম্রাজ্য তখন আরব সাগরের মধ্যে যে সকল দ্বীপগুলো ছিল সে পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি পারস্যের রাজার অনুগত ছিলেন। পারস্যের রাজার হত্যা-খবর তিনি যখনই পেলেন তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি নিজে যেমন ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তেমনি তার সমস্ত সৈন্যরাও ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি পুলকেশী রাজপুত্রদের এক জন হয়ে থাকবেন। এই ভাবে নবী (সাঃ)-র জীবদ্দশায়ই ইসলামের আলো পেয়েছিল ভারতবর্ষের মাটি।

কনৌজের রাজা সারবাতিক

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন হাজম। তার পুত্র সায়ীদ মুযাফফর একদিকে যেমন কুরআনের হাফিজ ছিলেন তেমনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা। তিনি বর্ণনা করে বলেছেন যে কনৌজের রাজা সারবাতিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি তিনি নবী (সাঃ)কে তিন তিনবার দেখেছিলেন। দু'বার তিনি দেখেছিলেন মক্কায় ও একবার দেখেছিলেন মদিনায়। তার বর্ণনায় নবী (সাঃ) ছিলেন অতীব সুন্দর আকৃতির।

বাবারতন

বাবারতন ছিলেন পাঞ্জাবেরই মানুষ। তিনি বাখিণ্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সংসারত্যাগী যোগী ছিলেন। তিনিও দাবী করেছিলেন যে তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)কে দেখেছিলেন এবং নবী (সাঃ)-র সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মালাবারের রাজা সামরী

নবী (সাঃ)-র জীবনে আল্লাহ তায়ালা যে সকল অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিলেন তার মধ্যে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা খুবই পরিচিত। ভারতের মালাবার উপকূলে তখন শাসন করতেন রাজা সামরী। তিনি নিজেই দাবী করেছিলেন যে তিনি নবী (সাঃ)-র নির্দেশে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ফল দেখেছিলেন। এমনকি তিনি বলেন সত্যিই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় আকাশে দেখা গিয়েছিল। এ দৃশ্য দেখার পর নবী (সাঃ) সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয়ে পড়েন এবং মক্কায় গমন করেন। সেখানে তিনি কোন প্রকার ইতস্তত না করে ইসলাম গ্রহণ করেন নবীর কাছেই। পরে তিনি ভারতের পথে পাড়ি দেন, কিন্তু পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়েছিল। তিনি তার মুসলিম সাথিসঙ্গীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আর এর ফলেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল।

ইসলামের নৈতিক দিক

ইসলামি দৃষ্টিকোণে মানুষ এক নৈতিক বোধসম্পন্ন সত্তা, যে সত্তা চিন্তা করতে পারে, ভাবতে পারে, নিজের চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আর এই চিন্তা ভাবনার ফলে যে একটি নতুন সমাজ গড়তে পারে যে সমাজ কিনা সত্য পথের দিকে আলোর দিশারী হয়ে ফুটে উঠতে পারে। যার ফলে সমাজ পায় এক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও শান্তি শৃঙ্খলার সু-পরিবেশ। আর এর ফলেই সমাজ থেকে উৎখাত হতে পারে হিংসা, ঘৃণা, কলহ, বিবাদ। অনৈতিক চিন্তা ধারা কেবল নেতিবাচক প্রভাব সমাজের উপর ফেলেনা বরং তা মানুষের মধ্যে যে ইতিবাচক চেতনা থাকে তাকে লোপ করে দেয়। তাই নবী (সাঃ) মানুষের ইতিবাচক চেতনাকে সজীব রাখার জন্য বলেছেন।

> "যদি তুমি অন্যায় কাজ সম্পাদন হতে দেখ তাহলে হাত দিয়ে তা রুখে দাও। আর তা না পারলে তোমার মুখের ভাষায় তার প্রতিরোধ কর। আর তাও না পারলে তুমি হৃদয় দিয়ে ঘৃণা কর। আর এ অবস্থাটা একেবারে ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"

প্রকৃত হতভাগা

নবী (সাঃ) ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী মানুষ। জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপর তিনি কোন ভাসা ভাসা ধারণা পেশ করতেন না বরং প্রতিটি জিনিসকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অনুসারীদেরও প্রতিটি বিষয়কে গভীরভাবে ভেবে দেখতে বলতেন। তাই নবী (সাঃ) খুব জোরের সাথে বলতেন একজন মানুষকে তার নামাজ রোজা বাঁচাতে পারবেনা যদি সে অন্য মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়। কারণ আল্লাহ যে অধিকার মানুষকে ভোগ করার জন্য দিয়েছেন তা তাকে ভোগ করতে দিতে হবে। কোন মানুষ তার এ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মালিক নয়। এক সময় তিনি তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি জান কে প্রকৃতপক্ষে হতভাগা?"

> সাহাবারা গভীর চিন্তাভাবনা না করে যেমন উত্তর দেওয়ার তেমনিই দিলেন। আমাদের মধ্যে সেই হতভাগ্য যার কোন টাকা কড়ি বা ধন-সম্পদ নেই। নবী (সাঃ) তাদের কথা শুনলেন, তারপর তিনি হতভাগা কে, সে সম্বন্ধে প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বললেন,

"আমার অনুসারীদের মধ্যে সেই হল হতভাগা যে নামাজ রোজা ও যাকাত নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। সে অপরজনকে গালি দিয়েছিল, মিথ্যা অভিযোগ করেছিল, একজনের অর্থ-সম্পদ কেড়ে নিয়েছিল। অথবা একজনের রক্ত ঝরিয়েছিল,

একজনকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছিল- এরকম লোকদের ডাকা হবে এবং তাদের ভালকাজের বদলাগুলো ওই লোকগুলোকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং ওই লোকগুলোর অন্যায় কাজের বোঝাগুলো ওদের ঘাড়ে চাপানো হবে এবং জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে।"

আত্মত্যাগ

ইসলাম সব সময়ের জন্য মানুষের নৈতিক জ্ঞান ও নৈতিক মান যাতে বিকশিত হয় তার উপর চাপ দিয়ে থাকে। নৈতিক মানের বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের দায়িত্ববোধের চেতনা জাগ্রত হয়। মানুষ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতি যখন লাভ করে তখনই কেবল আত্মত্যাগী কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। একজন মানুষ নিজের জন্য যা ভালবাসে যতক্ষন না অপরের জন্য তা ভালবাসে ততক্ষন সে প্রকৃত দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা। এ অনুভূতির প্রেরণা দান নবী (সাঃ) সব সময়ের জন্য তাঁর অনুসারীদের দিতেন। এর থেকেই এসে যায় ভালবাসার মতো ঔদার্য্যশীল গুণাবলী, নবী (সাঃ) সেজন্য বলেন,

> "একজন মুসলিম প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তাই পছন্দ করে।"

হাসিমুখে কথা বলাও দান

দান বিশাল এক গুণ, প্রতিটি মানুষের জন্য। দানের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ রেখে প্রকৃতপক্ষে একজন যা কিছু হোক না কেন, একজন মুসলিম হতে পারে না। অবশ্য নবী (সাঃ) ও ইসলামের কাছে দানের পরিধি অনেকটাই বিশাল। এক সময় নবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের কাছে দান প্রসঙ্গে বললেন,

> "প্রতিদিনের সূর্য ওঠার সাথে সাথে আদম সন্তানদের দান শুরু হয়।"

তাঁকে সবাই জিজ্ঞাসা করলেন কোন জিনিস থেকে দান শুরু হয় তিনি বিস্তৃতাবে উত্তর দিলেন,

"ভাল কাজের দরজা অসংখ্য .... ভাল কাজে যোগ দেওয়া মন্দ কাজে নিষেধ করা, পথের কষ্টকর জিনিস সরিয়ে দেওয়া, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া, অন্ধকে পথ দেখান, বধিরকে শোনান, ... দুর্বলের হাত ধরে সাহায্য করা। .... এ সমস্ত কিছুই দান, যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।"

সামাজিক সুবিচার

> ইসলাম অনুযায়ী সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য (কুরআন ৩১ ঃ ২০, ৫৭ ঃ ৭)। এই সম্পদ কোন পরিবার গোষ্ঠী বা জাতির জন্য নয়, সমস্ত মানুষের জন্য। (কুরআন ২২ ঃ ২৯)। সুতরাং মানুষ ইশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। (কুরআন ৭ ঃ ৩২)

মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, তোমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করাও তোমার জিহাদ।

সহমর্মিতা

ইসলাম দয়া, ভালবাসা, দান বদান্যতা প্রভৃতি ইতিবাচক কাজের প্রেরণা যোগায় সব সময়। হত দরিদ্র মানুষের জন্য ইসলাম মুক্ত হস্ত হওয়ার কথা বলে,

> "আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা, অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন কর, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (কুরআন ২ ঃ ১৯৫)

> "জিজ্ঞাসা করছেঃ আমরা আল্লাহর পথে কি খরচ করব? বলো, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের জন্য এভাবেই সুস্পষ্ট বিধান বলে দেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের জন্য চিন্তা কর। জিজ্ঞাসা করছে, ইয়াতিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? বল, যে ধরনের কাজকর্মে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা খাওয়া একত্র রাখ তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারা তোমাদেরই ভাই বন্ধু ছাড়া আর তো কিছুই নয়।" (কুরআন ২ ঃ ২১৯-২০)

> "হে ইমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে উৎপন্ন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ কর। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে আল্লাহর পথে খরচের জন্য নিকৃষ্ট জিনিসগুলি বেছে নিতে চেষ্টা করবে। কারণ সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তবে তোমরা

তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবে না। তা গ্রহণ করার ব্যাপারে উপেক্ষা ছাড়া তোমাদের নেওয়া উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন ও তিনি সবচেয়ে উত্তম গুণে বিভূষিত।" (কুরআন ২ ঃ ২৬৭)

"যারা নিজেদের ধনমাল রাত দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের আল্লাহরই নিকটে প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।"
(কুরআন ২ ঃ ২৭৪)

"তোমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পার না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো ব্যয় করো। আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে বে-খবর থাকবেন না।" (কুরআন ৩ ঃ ৯২)

এইভাবে আল কুরআনের বহু স্থানে দান করা ও দান করার বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । সেই সঙ্গে দানের প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়ের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা হৃদয়ের খবর আল্লাহর চাইতে কেউ বেশী জানে না। তাছাড়া ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রকৃত কল্যাণ পাওয়ার চাবি কাঠি। নবী (সাঃ) থেকে বর্ণিত,

"সমস্ত মানব জাতি একই পরিবারের মত এবং সেই সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয়। সে-ই আল্লাহর সৃষ্টি এই পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ও সদয়।"

নবী (সাঃ) আরও বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন বিধবা বা দরিদ্র ব্যক্তির কোন রকম সাহায্য করে সে তারই সমান, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিংবা সারাদিন রোজা রাখে অথবা সারারাত নামাজ পড়ে।"

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় ইসলাম সমাজ চেতনা সম্বন্ধে কতই না সতর্ক দৃষ্টি দান করে সমাজের প্রতি স্তরে ইসলাম এক ভারসাম্যপূর্ন সামঞ্জস্য চায়।

16

অমুসলিমদের সাথে নবী (সাঃ)

ইসলাম চায় পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও পরস্পরের মধ্যে সহাবস্থান, তা মুসলিম কিংবা অমুসলিম যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। মানুষের এ চলমান বংশ ধারায় একই আদম ও হাওয়ার রক্তধারা প্রবাহিত। অতএব সকলের মধ্যে সমব্যাথী হওয়ার চেতনা থাকা একান্তভাবে দরকার।

নবী (সাঃ) সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সবক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নবী (সাঃ)-র সহানুভূতি মুসলিম অমুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই সমান ছিল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যাতে করে আমাদের সমাজে ইসলামী এই উন্নত মানের চিন্তা চেতনার প্রবেশ ঘটে।

অমুসলিম ব্যবসায়ী অংশীদার

যুবক বয়স পর্যন্ত নবী (সাঃ) অংশীদারী ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন, নবী (সাঃ)-র এই ব্যবসা সিরিয়া থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত চলত এবং এই ব্যবসা থেকে তিনি যে মুনাফা অর্জন করতেন তা পরস্পর অংশানুপাতে ভাগ করে নিতেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজা (রাঃ)কে বিবাহ করার আগে তিনি খাদিজার বাণিজ্য পণ্য নিয়ে ব্যবসা উপলক্ষে বহিরাঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন এবং বিয়ের পরে নিজ স্ত্রীর সাথে যৌথ ব্যবসা চালিয়ে ছিলেন। নবী (সাঃ) যখন নবুয়্যত প্রাপ্ত হলেন স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ইসলামের জন্য সমস্ত অর্থ দান করে দিয়েছিলেন তাঁকে। নবুয়্যতের এই সময়ে ব্যবসার জন্য মাথা ঘামানোর সময় পেতেন না। নবুয়্যত প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি তার বাণিজ্য পণ্য কুরাইশ নেতৃত্বস্থানীয় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং কুরাইশ গোত্রের বাইরে যে সকল ব্যবসায়ী ছিল তিনি তাদের সাথে ব্যবসায়িক পণ্য বিনিময়ের কাজে লেগে থাকতেন। এইভাবে

ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁর প্রভুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হয়েছিল।

তিনি ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ানের মাধ্যমেও নিজের পণ্য সামগ্রী সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন ও বাণিজ্য শেষে বিরাট লভ্যাংশ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্যবসায়িক ব্যাপারে তিনি আবু সুফিয়ানকে কোন সময় সন্দেহ করেননি বা অদক্ষ ভাবেননি। নবী (সাঃ) যখন পুরোপুরি ইসলামের প্রচার চালাচ্ছেন তখনও আবু সুফিয়ান তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক নবী (সাঃ)-র কাছ থেকে গুটিয়ে নেননি।

আবু সুফিয়ানের সাথে নবী (সাঃ)-র ব্যবসায়িক সম্পর্ক কত মধুর ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে কাসির বর্ণনা করে বলেছেন,

"এক সময় আবু সুফিয়ান তার ব্যবসায়ী সঙ্গী খাব্বাবকে নিয়ে সিরিয়া ও ইয়েমেনে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ মাস অবস্থান করে তারপর মক্কায় ফিরলেন। লোকেরা তাকে ডাকলেন এবং সবাই তাদের ব্যবসায়ে লগ্নির ব্যাপারে, লভ্যাংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। নবী (সাঃ)ও আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাহ তখন তার শিশু সন্তানদের সাথে খেলছিলেন। নবী (সাঃ) প্রথমেই আবু সুফিয়ানকে সম্ভাষন জানালেন তারপর তার কুশলাদি জানতে চাইলেন এবং তিনি কিভাবে ভালভাবে ফিরে এলেন তাও জানলেন। তিনি কিভাবে তার ভ্রমন সময় কাটিয়েছেন ও কিভাবে সেখানে অবস্থান করেছেন তা সব কিছুর খোঁজ নিলেন। কিন্তু ব্যবসার লাভ লোকসানের কথা কিছু আলোচনা করলেন না। এরকম ঘটনা দেখার পর আবুসুফিয়ান এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, নবী (সাঃ) ফিরে এলে তিনি তার স্ত্রী হিন্দাহকে বললেন "আমি অবাক হয়ে গেলাম এই লোকটাকে দেখে, আমি লোকটাকে পছন্দ না করে পারি না, সবাই তাদের লগ্নির লাভ লোকসানের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত হলেও ইনি নিরব রইলেন এ বিষয়ে। কিছুক্ষণ পর আবু সুফিয়ান খাব্বাবের কাছে এলেন এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-র সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তার ব্যবসার পাওনা বুঝিয়ে দিলেন এবং খাব্বাব (রাঃ)-র কাছ থেকে তা চেয়ে নিতে বললেন। সাধারণত আবু সুফিয়ান ব্যবসায়ী যে কমিশন নিতেন তা তিনি নিতে চাইলেন না, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে জোর করে তার পাওনা- যথার্থ কমিশন প্রদান করলেন।"

একদিন নবী (সাঃ) যখন ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় খবর এল আবুসুফিয়ান বাণিজ্য থেকে ফিরেছেন। এই বাণিজ্যে অন্যান্য লোকেদের যেমন লগ্নি ছিল তেমনি নবী (সাঃ)-রও লগ্নী ছিল। সবাই যখন নিজেদের পাওনা সম্বন্ধে নানান খোঁজ খবর নিচ্ছিল। নবী (সাঃ) তখন বলেছিলেন যে আবু সুফিয়ান ব্যবসার ব্যাপারে সৎ।

ব্যবসায়ী সূত্র

অর্থনীতি হল সমাজ জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সমস্ত সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ সম্পদ হল রক্ত প্রবাহের মত। যদি কোন ব্যক্তি আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে তা খুবই খারাপের দিকে অগ্রসর হতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে সমাজে তার গুরুত্ব কমে যায়। সম্মুখীন হতে হয় নানান সমস্যার। নবী (সাঃ) ছিলেন মক্কার বড় বড় ব্যবসায়ীদের একজন। তিনি জেনেছিলেন ব্যবসার গুরুত্ব। আর অর্থনীতিতে ব্যবসা যে কি বিরাট ভূমিকা রাখে তাঁর তা অজানা ছিল না।

নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ব্যবসায় সবসময় মনোযোগী থাকতেন। ব্যবসার মাধ্যমে তারা তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য সব সময় সতর্ক ছিলেন। ব্যবসার জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার প্লান পরিকল্পনা করতেন সময়ের প্রয়োজনানুসারে। এইভাবে ব্যবসায় তারা সবাই ছিল দক্ষ।

আবু সুফিয়ানের সাথে নবী (সাঃ) ব্যবসার সাথী ছিলেন এবং তার মাধ্যম দিয়ে তিনি আরবের বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে নিজ ব্যবসায়ী সূত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। সারা আরব তথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও এদের নাম ব্যবসায়ী হিসাবে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। এরা হলেন, আবদুল্লাহ পুত্র হাকিম, আল তাইমি, আল সায়ীব এবং কুয়াশ। ঐতিহাসিক আল বাগদাদী নবী (সাঃ)-র ব্যবসায়ী অংশীদারদের আলোচনা করেছেন, এমন কি তার আলোচনায় এটা প্রকাশ পেয়েছে যে নবী (সাঃ)-র মুসলিম ও অমুসলিম ব্যবসায়ী সঙ্গী ছিল প্রায় আটান্ন জনের মত। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এমনি এক অমুসলিম ব্যবসায়ী সঙ্গী ছিলেন নবী (সাঃ)-র। তিনি আবার উমাইয়া ইবনে খলফ এর বন্ধু ও ব্যবসায়ী অংশীদার ছিলেন। তিনি ইসলামের বিরোধী ছিলেন। কুরাইশ নেতা উৎবার পুত্র আল ওয়ালিদ ছিলেন আব্বাস (রাঃ) এর ব্যবসায়ী বন্ধু। অপর দিকে উসমান ও রাবিয়া ইবনে হারিস ছিলেন পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও ব্যবসায়ী সঙ্গী। আব্বাস ও আবু সুফিয়ানও ছিল পরস্পর ব্যবসায়ী বন্ধু। আর তাদের এই ব্যবসায়ী বন্ধুত্ব আজীবনই ছিল। যুদ্ধ কিংবা ধর্মীয় চিন্তার পার্থক্য তাদের বিচ্ছিন্ন করেনি।

বৈবাহিক সম্পর্ক

বৈবাহিক সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের মক্কার জীবনে নবী (সাঃ)-র সবচেয়ে বড় কন্যা জয়নাবের সাথে আবুল আল আসের বিবাহ হয়েছিল। আবুল আস ছিলেন খাদিজা (রাঃ)-র প্রিয় ভাগ্না। ঐতিহাসিক ইবনে হিসামের মতে

অজ্ঞতার যুগে এ বিবাহ বন্ধন অটুট ছিল। তখনও পর্যন্ত অবশ্য মুশরিকদের সাথে বিবাহ বন্ধনের উপর নিসেধাজ্ঞা অবতীর্ন হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম যতক্ষণ না কোন বাধা নিষেধ আরোপ করে ততক্ষণ খামাখা কোন কিছুতে গোঁড়ামী প্রকাশ করাকে ইসলাম সায় দেয় না। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আয়েশার বিবাহ হত মক্কার কুরাইশ প্রধান মুত'ঈম পুত্র যুবায়েরের সাথে। মূলত: আবি তালিবের মৃত্যুর পর নবী (সাঃ)-র নিরাপত্তার জন্য মুত'ঈম অনেক কিছুর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ)কে তিনি কেবল এই কারণেই পুত্রবধু করেননি পাছে তার দ্বারা পরিবারের মধ্যে ইসলামের প্রচার ঘটে যায়। এই রকম বহু ঘটনার মধ্যে এটা প্রমাণিত হয় যে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বহু বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি ততদিন বলবৎ ছিল যতদিন না কুরআনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে, এ রকম বিবাহের উপর।

সম্মিলিত সরকার গঠন

নবী (সাঃ)-র ইসলাম নিয়ে আগমনের সময়ে মক্কার মধ্যে বারোজন বংশীয় সূত্রে নেতৃত্ব দান করতেন। কুরাইশ বংশ এ অধিকার পেয়েছিল। অনেক গোত্র থাকলেও কুরাইশরা এই আভিজাত্য বহন করে আসছিল অনেকদিন ধরে। এদের মধ্যে অনেকেই পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবুবকর (রাঃ), যিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন। তারপর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আব্বাস (রাঃ)। তাকেও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হয়। উমর (রাঃ) পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের দিকে উসমান ও খালিদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় অর্ধ ডজনের মত এ রকম ব্যক্তিত্ব তাদের বাপ দাদাদের প্রাচীন ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যধর্ম ইসলামকে নিজেদের ধর্ম হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাদের পদ থেকে বরখাস্ত হননি। অর্থাৎ বলা যায় গোঁড়া কুরাইশরা তাদের পদ থেকে তাদের বিতাড়িত করেনি। এমনকি মুসলিম হিসাবে তারা তাদের জাতির লোকেদের সেবা করত। সেই সঙ্গে সকল কাজে সার্বিকভাবে সাহায্য করতেন। আর তারা তাদের একাজ চালিয়ে রেখেছিলেন যতদিন না মদিনায় তারা হিজরত করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত। আর একাজে অমুসলিমকেও সাহায্যে নেওয়া হয়েছিল, তাই এ কথা সহজে অনুমেয় যে মক্কায় তখন মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ে মিলে সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়েছিল। যাদের মধ্যে কুরাইশরা যেমন সংখ্যায় বেশী ছিল তেমনি মুসলিমরা সংখ্যায় ছিল কম। মুহাম্মাদ (সাঃ) সবসময় চাইতেন মানুষের মধ্যে হৃদ্রতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, যে কোন ভালকাজে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে মুহাম্মাদ (সাঃ) অনেক গুরুত্ব প্রদান করতেন আর এ বিষয়টাকে মাথায় রেখে সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সমস্ত কিছুতে উন্নতির কথা তিনি ভাবতেন। কুরাইশরা মুহাম্মদ (সাঃ)-র এইরকম ভাল পরিকল্পনার সাথে যুক্ত না হয়ে পারেনি।

সামাজিক আত্মীয়তায়

রসূলের কাছে ভোজসভার গুরুত্ব

নবী (সাঃ) যখন মহান রব্বুল আল আমীনের কাছ থেকে অহী পেলেন তখন তা প্রচার করার নানান উপায় গ্রহণ করেছিলেন তারমধ্যে ভোজ সভার আয়োজনকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দান করেন। আর এই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বেশিরভাগ কুরাইশদের। তিনি জানতেন অমুসলিমদের কাছে ইসলামের মহান বার্তা তুলে দেওয়ার জন্য এটি এক বড় ধরনের উপায়। তার এই ধরনের পদক্ষেপ আরবের সমাজ জীবনে খুবই তাৎপর্য বহন করেছিল। আর এ ধরনের কাজ নবী (সাঃ) যেমন নিজে করতেন তেমনিভাবে তার সাথিরাও করতেন। পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভোজের ব্যবস্থা বড় ধরনের ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকি এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে আবুবকর (রাঃ) আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উসমান, যুবাইর, তালহা, আব্দুর রহমান ও সাদ (রাঃ)কে, এরা তখনও কেউ ইসলামের ছায়াতলে আসেননি। নবী (সাঃ) সর্বোত্তম বিচক্ষণ ব্যক্তি, সমাজের উপর বিশাল ভূমিকা বহন করে এইরকম ভোজ সভার। তাই তিনি ও তাঁর সাথিরা ভোজসভার মধ্য দিয়ে সমাজের ধনী গরীব সবাইয়ের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করছিলেন।

দাসদের মুক্তিদানের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রচার

রসূল যখন ইসলামের আলো আরবের বুকে সর্বপ্রথম আনলেন তখন ঐতিহাসিক দাস প্রথা প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছিল। মানুষ বিক্রি হত হাটে বাজারে যেমনভাবে পশুপাখি বিক্রি হয় তেমনিভাবে। ইসলাম এসেছে সমস্ত মানুষের মুক্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই দাসদাসীরা ছিলেন সামগ্রিকভাবে পরাধীন। এদের মনিবরা ছিল ধনী ব্যক্তি তারা তাদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়ে নিত। কোন রকম প্রতিবাদ করার সুযোগ দেওয়া হত না। কোন রকম কাজের ত্রুটির জন্য তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালান হত। নবী (সাঃ) তাদের দুঃখ দুর্দশায় খুবই কাতর হয়ে পড়তেন। তাদের দুঃখে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তাই তিনি দাসদাসীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এমনকি নিজের অধীনে যে সকল দাসদাসী রয়েছে তা যেমন তিনি মুক্ত করতেন, তেমনি অন্যের কাছে থাকা নির্যাতিত দাসদের উচ্চমূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে তিনি তাদের মুক্ত করতেন। সকল সাহাবাদের তিনি উৎসাহ দিতেন দাসমুক্ত করে দেওয়ার জন্য। এটা ছিল সমাজ সংস্কারের বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি এটা বুঝেছিলেন, দুর্বিচারে জর্জরিত এই দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত হতে পারলে মানুষ অনেক কাছের হয়। অনেক আপন হয়। তাই তার এ ধরণের সমাজ সংস্কারের ভূমিকা মানব কল্যাণে অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছিল। আর এর ফলে দাসত্ব জীবন থেকে বেরিয়ে

আসতে পেরেছিল অসংখ্য মানুষ। দাসদের মুক্তির ঘোষনা দেওয়ার জন্য তৎকালীন মুসলিম ধনী ব্যক্তিরা তাদের বহু পয়সা খরচা করে দাসদের কিনে সবাইয়ের সামনে তাদের মুক্তি দান করেছিল। যেহেতু নবী (সাঃ) দাস মুক্তির জন্য এরকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাই তার পবিত্রা স্ত্রী মু'মিনদের মাতা হজরত খাদিজা (রাঃ) বহু পয়সা ব্যয় করেছিলেন দাসদাসী মুক্তির জন্য।

নবী (সাঃ)-এর বাল্য বন্ধু ছিলেন আবুবকর (রাঃ)। তার হৃদয় ছিল বড় উদার। মানুষের দুঃখ দারিদ্রে তিনি সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অকাতরে। সমাজ কল্যাণকর কাজ হিসাবে তার দানের তুলনা হয় না। তিনি দাসমুক্তির জন্য প্রচুর পয়সা খরচ করে ছিলেন, তিনি যখন মক্কা জীবনে ছিলেন তখনই তিনি নগদ চল্লিশ হাজার দিরহাম শুধু দাস মুক্তির জন্য ব্যয় করেছিলেন। তাছাড়া তিনি তার ধন-সম্পদ থেকেও কম খরচ করেননি। তিনি তার দাতব্য কাজ এত করেছিলেন যে মক্কা জীবনে তার প্রায় ধন-সম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি যখন তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন তখন তার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল তাও তিনি মুসলিমদের দিয়ে যান।

আবুবকর (রাঃ)-র মত আরও অন্যান্য সাহাবা যেমন আওফ পুত্র আব্দুর রহমান ও উমার (রাঃ) প্রমুখ একাজে বিশাল অবদান রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ নাহাম নামে এক সাহাবী দাস মুক্তির কাজে খুবই তৎপর ছিলেন। তাঁর এই মহৎ ও ব্যাপক কাজের জন্য কুরাইশরা তাঁর উপর যারপরনাই হিংসা করত। এমনকি তাকে হিজরত করতে দেয়নি এই ভয়ে পাছে মদিনায় তার এই দাস মুক্তির কাজে প্রভাবিত হয়ে দলে দলে লোকেরা ইসলামের ছায়া তলে এসে যায়। কারণ তিনি মুসলিম ও অমুসলিম উভয় দাসদের উচ্চমূল্যে কিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এমন কোন দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি ছিল না যে তার কাছ থেকে চেয়ে কিছু পায়নি। সব সময়ের জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে থাকতেন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

সর্বোত্তম শ্রদ্ধা প্রদান

নবী (সাঃ) সমগ্র আরবের ছোট বড় সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সাথে বিরাট সু-সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা নবী (সাঃ)-র কাছে সর্বোত্তম শ্রদ্ধা পেয়ে থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত লোকেরা যে সবাই তখন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন তেমনটি নয়। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল চাচা আবু তালিব। তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-র ইসলামি আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন, সেজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। যখন আবু তালিব একবারে শেষ অবস্থায় বিছানা শয্যায় ছিলেন নবী (সাঃ) তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। আবু তালিব

এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছিলেন মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন সবচেয়ে উদার-ভদ্র ও সঠিক মানুষ। নবী (সাঃ) তাঁর পাশে বসে থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বড়ই কুটিল, যে লোকটি ইসলামের জন্য এতকিছু করলেন, যিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)কে সারাটা জীবন আগলে রাখলেন তিনি কিন্তু ইসলামের ছায়াতলে আসতে পারলেন না। আবার এরকম এক ব্যাক্তিকে নবী (সাঃ) অতি শ্রদ্ধা করতেন। সব সময়ে তিনি ছিলেন নবী (সাঃ)-র কাছে গুরুজনের মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ। তার মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। পিতা, মাতা, পিতামহ সবাই যখন রসূলকে ছেড়ে চলে যান তখন এই আবুতালেবই তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ছিলেন।

আত্মপ্রত্যয়

আব্বাস (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ)-র অপর এক চাচা। তিনি তখনও ইসলামী আন্দোলনে সামিল হননি। কিন্তু তিনি সব সময় নবী (সাঃ)-র সাথে সাথে থাকতেন। নবী (সাঃ) তার উপর খুবই বিশ্বাস রাখতেন। মুসলিমদের উপর কি প্রতিক্রিয়া নেওয়া হবে ভবিষ্যতে সে বিষয়ে তিনি কুরাইশদের গোপন সভাগুলোতে থাকতেন এবং তার সিদ্ধান্তগুলি নবী (সাঃ)কে জানাতেন। এমনই সু-সম্পর্ক ছিল নবী (সাঃ)-র সাথে। এমনকি আল আকাবার দ্বিতীয় চুক্তির সময় তিনি নিজেই উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাঃ) তাকে বিশ্বাস করতেন গভীরভাবে। এমনকি তিনি তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে এত উচ্চাশা পোষণ করতেন যে হিজরতের সমস্ত কথা তিনি আব্বাস (রাঃ)কে জানিয়েছিলেন। নবী (সাঃ)ও তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন যে তিনি অনিবার্য ঝুঁকি নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) ও ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

সততা

নবী (সাঃ) ছিলেন ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি এই ঐক্য স্থাপন করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহন করেনি তাদের সাথেও। নবী (সাঃ) যখন মক্কায় জীবন কাটাচ্ছিলেন এবং আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন তিনি এতটাই সৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন যে আরবের ধনী গরীব সবাই তার কাছে তাদের অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রেখে যেত। তারা জানত যে এরকম ধরনের আমানত রক্ষাকারী সৎ ব্যক্তি আরবে আর দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। তার এ সততা যে কত মূল্যবান ছিল তার জীবনে তা একটি ঘটনা দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। হিজরতের ঠিক আগে তিনি আলি (রাঃ)কে ডাকলেন এবং উপদেশ দিলেন যাতে করে সে যেন সমস্ত পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেন তার অবর্তমানে। আলি (রাঃ)ও তাঁর এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ইসলাম যে সকল দায়িত্ব নবী (সাঃ)-র উপর অর্পন করেছিল নবী (সাঃ) তা নিজে পালন

করেছেন সার্বিকভাবে এবং সাহাবাদের ও তা পালন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। সততার এ নীতি কেবল মুসলমানদের সাথে করার কথা তিনি বলেননি বরং মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য তিনি সততার নজীর নিজে যেমন রেখেছিলেন অন্যকেও সেরকম উপদেশ দিয়েছিলেন আর তাঁরই প্রভাবে দেখা দিয়েছিল একটি সততার মূর্তপ্রতীক ইসলামী সমাজ। হাজার হাজার সাহাবা হয়ে গিয়েছিলেন সততার আকর। তাদের কেউই কারোর সাথে কোন দিন বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। তাদের এই বিশ্বস্ততার কথা সারা আরবসহ ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

বিশ্বস্ততা

প্রতিটি কাজে নবী (সাঃ) সম্পূর্ণরূপে ভরসা রাখতেন আল্লাহর উপর। তাঁর মতো আল্লাহ নির্ভরশীল মানুষ আর কাউকে দেখা যায়নি। তিনি সর্বকাজেই মহান আল্লাহকে তার সবচেয়ে বড় রক্ষক হিসাবে ভাবতেন। মদিনায় যখন তিনি হিজরত করার মনস্থ করলেন তখন সঙ্গের সাথি ছিলেন হজরত আবুবকর (রাঃ)। কিন্তু এই চরম অবস্থাতেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এক অমুসলিম পথপ্রদর্শক গাইড ম্যানকে। তিনি অংশীবাদী বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বাসভাজন দক্ষ মানুষ। তিনি এটা জানতেন কোথা থেকে গেলে সহজে সকলের নজর এড়িয়ে মদিনায় পৌঁছান যাবে। কারণ কুরাইশরা যদি জানতে পারতেন নবী (সাঃ)-র মক্কা ত্যাগের কথা তাহলে তারা তাঁর এই যাত্রাকে রুখে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা নিতেন। এই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা একশত লাল উটেরও পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, নবী (সাঃ)কে ধরে দেওয়ার জন্য। পথ প্রদর্শক একথা জানতেন। কিন্তু তিনি এত বিশ্বস্ত ছিলেন যে নবী (সাঃ)কে কুরাইশদের হাতে ধরিয়ে দেননি। কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় না নিয়ে তিনি তার কথামত নবী (সাঃ)কে মদিনায় পৌঁছে দিয়েছিলেন সঠিক নিরাপত্তার সাথে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততার এ এক অনন্য নজীর।

মহানুভবতা

নবী (সাঃ) যে কত বড় মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট করে দেখা যায়। তিনি যে পথ দিয়ে প্রতিদিন কা'বায় যেতেন সেই পথেই দেখতেন অনেক নোংরার স্তূপ জমে আছে। আর তিনি এটাও জানতেন যে এক বৃদ্ধা ইচ্ছা করেই তার যাতায়াতের পথে এই নোংরাগুলো ফেলে দিয়ে যেতেন। কারণ নবী (সাঃ)-র ইসলাম প্রচারকে সহ্য করতে পারতেন না বৃদ্ধাটি। একদিনের ঘটনা- নবী (সাঃ) সেই বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য। নবী (সাঃ)কে দেখে বৃদ্ধা তো অবাক! তিনি কখনও ভাবতে পারেননি যে নবী (সাঃ) তার বাড়িতে যাবেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি এসেছেন। নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন যে তিনি প্রতিদিন যাতায়াতের পথে নোংরা স্তুপ পথের মধ্যে দেখেন সেদিন ব্যতিক্রম ছিল, পথে কোন নোংরার চিহ্ন ছিল না। তাই তিনি ভেবেছিলেন বৃদ্ধার হয়ত বা কোন অসুখ হয়েছে তাই তিনি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। এ কথা শোনার পর বৃদ্ধা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের হীন আচরণের কথা ভেবে একেবারে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। নবী (সাঃ)-র এ ধরনের আচরণে বৃদ্ধার হৃদয় গলে গেল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি এতদিনে চিনতে পারলেন সত্য নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)কে। তাই আর বিলম্ব করতে পারলেন না। ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। এই ছিল নবী (সাঃ)-র মহানুভবতার চিত্র এবং তার বাস্তব প্রতিক্রিয়া। ইসলাম প্রচারের জন্য যে মহানুভবতার একান্ত প্রয়োজন তা অসংখ্য ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা যারা ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িত আছি তাদের সব সময় সতর্ক থাকা দরকার এ বিষয়ে।

নমনীয়তা

মক্কা বিজিত হয়েছে। বহুদিনের আকাঙ্খিত ইচ্ছা পূরণ হয়েছে মুসলমানদের। তাই সর্বত্র এক খুশির আবহাওয়া। মক্কার কুরাইশদের মধ্য থেকে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য রসূলের কাছে আসছেন। আর নবী (সাঃ) তাদের ক্ষমা করে দিচ্ছেন নিঃশর্তে। কিন্তু যারা নবী (সাঃ)-র এবং ইসলামের একেবারে চরম শত্রু ছিল তারা তাদের সংকীর্ন মনের জন্য এগিয়ে আসতে পারেনি। এই সময় নবী (সাঃ) মক্কার নেতা, তিনি গ্রাম গঞ্জের পথে ঘাটের- সব জায়গায় মানুষকে সেবা দিতে এগিয়ে এসেছেন। এমনই পরিস্থিতিতে তিনি লক্ষ্য করলেন এক বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধাকে দেখে নবী (সাঃ)-র মনে ভারি কষ্ট হল, বৃদ্ধা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছিল এক মস্ত বোঝা। আর বোঝাটা বয়ে নিয়ে যেতে বৃদ্ধার যে নিদারুন কষ্ট হচ্ছিল তা বোঝাই যাচ্ছিল। তিনি এটা দেখার পর আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজেই বোঝাটা নিয়ে নিলেন বৃদ্ধার কাছ থেকে। তুলে নিলেন আপন কাঁধে। তারপর জানতে চাইলেন বৃদ্ধা কোথায় যাবেন। বৃদ্ধা নবী (সাঃ)কে জানালেন যে তিনি মক্কার সীমানার বাইরে যেতে চান। নবী (সাঃ) তাকে এত রাত্রিতে এভাবে মক্কা ত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা স্বাভাবিকভাবে তার নিজের মনের কথা অকপটে বলে চললেন,

> "মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা বিজয় করেছেন আর আমি তো মুসলিম নই, তাই আমি ভাবছি, মুহাম্মাদ (সাঃ)-র সৈন্য বাহিনী আমাকে শীঘ্রই গ্রেফতার করবে এবং নির্যাতনও চালাবে আমার উপর। তারা এখন বিজয়ী সেই সঙ্গে তারা মক্কায় ধ্বংসলীলা চালাবে। আর আমারপক্ষে এ দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়।"

বৃদ্ধা ও নবী (সাঃ) একই সঙ্গে পথ হাঁটছিলেন। বৃদ্ধার মুখ থেকে এরপর ঝরে পড়ছিল নবী (সাঃ) ও ইসলামের উপর নানা রকমের অভিসম্পাত। নবী (সাঃ) এ কথা শুনছিলেন কিন্তু বৃদ্ধার প্রতি তিনি এতটুকু অসন্তুষ্ট হননি। পূর্বের মত তিনি পথ হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা নবী (সাঃ) কে তার পরিচয় কি জানতে চাইলেন। নবী (সাঃ) তাকে বললেন "আমিই মুহাম্মাদ।" নবী (সাঃ)-র পরিচয় জানতে পেরেই বৃদ্ধা ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন। নিজের মূর্খামীর জন্য তিনি মর্মাহত হলেন। তিনি এটা কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না যে মুহাম্মাদ (সাঃ)-র ভয়ে যে আজ গভীর রাতে নিজ গৃহ ছেড়ে লুকিয়ে পালাচ্ছে। সেই মুহাম্মাদ কি এই মুহাম্মদ যে মাথায় করে বোঝা নিয়ে তাকে সাহায্য করছে! ভাবতে পারলেন না বৃদ্ধা। যার ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে তিনি তাকে এভাবে সাহায্য করবে; এতো অত্যাশ্চর্য বিষয় বৈকি! তিনি তো ইচ্ছা করলে তাকে এখানেই হত্যা করতে পারতেন। কিংবা তাকে তিরস্কার করতে পারতেন। কিন্তু কই? এসব কোন কিছুর ধার ধারেননি সেবক মুহাম্মাদ। না হতেই পারে না তিনি সাধারণ মানুষ বরং তিনি সত্যিকারের নবী। হৃদয়ের গভীর থেকে শীতল হাওয়ার পরশ যেন বৃদ্ধাকে গভীর এক ভাবাবেগে ঠেলে দিল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নবী (সাঃ)-র কাছে নিজের মর্মবেদনা ব্যক্ত করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই হলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। আর এই হল ইসলামী আদর্শ- আজ আমারা কোথায়?

মদিনার অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

নবী (সাঃ)-র হিজরতের পরে মদিনায় এক সুদৃঢ় রাষ্ট্র পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র পরিকাঠামোয় সুদৃঢ়তা আসার পর নবী (সাঃ) মুসলমানদের আদর্শিক উন্নতিতে সার্বিক ইতিবাচক দিক অনুভব করলেন। এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) সরাসরি অমুসলিমদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা নিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টা ছিল একেবারে আন্তরিক, যা শান্তি নিরাপত্তার পত্তন অনিবার্য করে তুলেছিল সবার কাছে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে এ পরিবেশ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভৌগলিক দিক থেকে মদিনার চারপাশে বসবাসকারী যে সকল জাতি বাস করত তারা হলেন ইহুদী। স্বাভাবিকভাবে এই সকল ইহুদীরা মুসলমানদের অনেকটা কাছের প্রতিবেশী হিসাবে গন্য ছিলেন। নবী (সাঃ) প্রথমেই এই সকল ইহুদী গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রি বন্ধনের পদক্ষেপ নিলেন। তিনি অনুভব করলেন এই সকল ইহুদীদের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্ধি করা যায় ততই কল্যাণ।

এই মৈত্রিপূর্ণ সন্ধির শর্ত সমূহের মধ্যে এটাই স্বীকৃত হল, যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। কেউ জোর করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা সকলের জন্য খোলা রইল উদারভাবে, তাছাড়া কেউ কারোর ধন সম্পদও জোর করে কেড়ে নিতে পারবে না।

- বহু বছর ধরে এক ইহুদী যুবক নবী (সাঃ) এর সাথে ঘুরতেন কারণ তিনি নবী (সাঃ) এর সাহচার্য খুব ভালবাসতেন। এমনকি নবী (সাঃ) যেখানে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে তিনিও থাকতেন রসূলের নিজ সঙ্গী হিসাবে। কিন্তু ছায়া সঙ্গীর মত এই ইহুদী যুবককে নবী (সাঃ) কখনই তার ইহুদী ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে বলেননি। এমনকি এক সময় এই যুবক খুব গুরুতরভাবে কঠিন পীড়ায় পীড়িত হলেন। তার মৃত্যু শংকাও দেখা দিল। মৃত্যু শয্যার পাশে বসেছিলেন তার পিতা। এই সময় যুবকটি তার পিতার কাছে অনুরোধ জানালেন অনুমতী পাওয়ার জন্য যাতে করে সে মুহাম্মদ (সাঃ)-র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। পিতা তার কথা শুনে অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় নবী (সাঃ)-র উপর যুবকটি কত ভালবাসা পোষণ করতো এবং সে কত অনুগত ছিল রসূলের। কিন্তু নবী (সাঃ) তাকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য পীড়াপীড়ি করেননি কখনও। কারণ নবী (সাঃ)-র মিশন কি ছিল তা যুবকের কাছে অপরিচিত ছিল না। ইসলামের মৌলিক কথা মানুষের কাছে প্রচার করা যেতে পারে। সব কিছু জানার পর তা কেউ গ্রহণ করবে, কি না করবে- তা ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার।

- নবী (সাঃ)-র জীবনের এক বিরাট অংশ অমুসলিম খ্রীষ্টানদের সাথে কেটেছে। কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল মধুর। একমাত্র ধর্মীয় কারণ ছাড়া তাদের সাথে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। তাদের জীবনের সকল সুখ দুঃখে নবী (সাঃ) ঝাঁপিয়ে পড়তেন কোন রকম দ্বিধা না রেখে। নবী (সাঃ) যে পরিপার্শ্বিক খ্রীষ্টানদের সাথে সু-সম্পর্ক রেখেছিলেন সে প্রসঙ্গে আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তার ভাইপো উরওয়াকে জানিয়েছিলেন,

“নবী (সাঃ)-র কিছু খ্রীষ্টান প্রতিবেশী ছিল, তাদের অনেক দুগ্ধবতী গবাদী পশুও ছিল, তারা মাঝে মাঝে নবী (সাঃ)কে উপহার স্বরূপ এই দুধ পাঠাত। আমরা এই দুধ পানে অংশ নিতাম।”

এ হাদীস দ্বারা এটা বোঝা যায় যে নবী (সাঃ)-র সাথে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের কতটা সুসম্পর্ক ছিল।

পারস্পরিক বিশ্বস্ততা

নবী (সাঃ) অমুসলিমদের উপরেও যথেষ্ট বিশ্বাস রাখতেন, কোন মানুষ বা কোন জাতির লোক ঝট করে যে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে এটা তিনি মানতেন না। তিনি এটা বিশ্বাস করতেন যে কোন ধর্মের মানুষ হোক না কেন তার মধ্যে মানবিক কিছু প্রাথমিক গুন অবশ্য বিরাজ করে, যেমন কারোর কোন বিপদে মানুষ সব কিছু উপেক্ষা করে সাহায্যে এগিয়ে আসে। আবি সিনিয়ার নাজ্জাসী অমুসলিম ছিলেন, কিন্তু নবী (সাঃ) তার প্রতি আস্থা রেখে সাহাবীদের তার দেশে হিজরত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসলিমরা অচেনা অজানা দেশে বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও নাজ্জাসীর দ্বারা নিরাপত্তা পেয়েছিলেন সার্বিকভাবে। এ ঘটনা থেকে এটা প্রমানিত যে বিশ্বস্ততার দোহাই দিয়ে আমরা মানুষের সাথে সবরকম সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি তাতে কোন অসুবিধা নেই। এটি একটি গুরুত্বপূর্ন প্রতিপালনযোগ্য নীতি। এতে কোন ধর্মীয় বাধা থাকতে পারে না। সেজন্য নবী (সাঃ)-র প্রায় প্রতিটি সাহাবার উপর এর প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে। তারা তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং বন্ধুত্ব ,আত্মীয়তা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবীয় গুণকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এমন কি অনেক ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথিরা এ নীতির পরম অনুসারী ছিলেন।

এভাবে আমরা উম্মে সালমা রাঃ-র ঘটনা স্মরণ করতে পারি। তিনি হিজরতের সময় শিশু কন্যা সহ তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মদিনায় মুহাজীর হয়েছিলেন। তিনি তার স্বামীর কাছে বসবাস করার সুযোগ হারিয়েছিলেন। এমনকি তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন শিশু সন্তানকে। এ এক করুণ মর্মবেদনার দৃশ্য। উম্মে সালমা (রাঃ)-এ ব্যাথা সহ্য করতে পারছিলেন না। এমন কি তিনি এতটা শোকাভূত হয়ে পড়েছিলেন যে প্রতিদিন সকালে মদিনার পথে বেরিয়ে পড়তেন ও সারাদিন পথে কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন। তার এ ব্যথায় ব্যাথিত হয়ে তার এক আত্মীয় তার শিশু সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তার কাছে। ব্যাথিত বুক শান্ত হল উম্মে সালমার নিজের সন্তানকে বুকে পাওয়ার আশায়। তিনি মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে একাই উটের পিঠে চড়ে রওনা দিলেন। পথে তালহা পুত্র উসমানের সাথে তার সাক্ষাত হল। তিনি তাকে তার যাত্রাপথের সাথি হতে বললেন এবং তিনি এও বললেন যে তিনি তাকে নিরাপত্তার সাথে মক্কায় পৌঁছে দেবেন। উম্মে সালমা (রাঃ) রাজি হলেন তার সাথে পথ গমন করতে। তালহা পুত্র উসমান উম্মে সালমাকে নিয়ে তার গন্তব্যস্থানে সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে বিদায় নিলেন। উম্মে সালমা পরবর্তীকালে সব সময় ইসলামের এই বদান্যতার কথা সবাইয়ের কাছে বলতেন। এর দ্বারা বোঝা যায় উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কত উন্নতমানের ছিল।

এরকম আর একটি ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। মক্কার প্রধানদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনিও রসূলের বড় কন্যা যয়নাবকে মদিনায় হিজরত করার জন্য সাহায্য করেছিলেন। বদর যুদ্ধেও যয়নাবের স্বামী আবুল আল আস অমুসলিম ছিল। কিন্তু তিনিও তার স্ত্রীকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাহ যখন এ হিজরতের প্রস্তুতি সম্বন্ধে জেনেছিলেন তখন তাকে এ ব্যাপারে অনুমোদন জানিয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দাহকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরিশেষে তিনি যখন তার দেওর কিনার সাথে মক্কা ত্যাগ করার ব্যবস্থা নিলেন তখন কিছু কুরাইশ প্রধান জোর করে তার যাত্রাপথ আটকে দিলেন। এই সময় তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। এমন কি তার এ প্রতিজ্ঞার ফলে রক্ত স্রোত বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল। এমন সময় আবু সুফিয়ান সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াতে পরিবেশ শান্ত হয় এবং তিনি কিনা ও যয়নাবকে ফিরিয়ে আনেন মক্কাতে। কিন্তু পরে পরিবেশ স্থিত অবস্থাতে এলে আবু সুফিয়ান তাদের মদিনায় যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামি আন্দোলনে এরকম ঘটনা বহু আছে। মুহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলমানরা সব সময় এ ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সম্মান জানিয়েছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামী দেখিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে চায়নি কখনও। পরবর্তীকালে কুরআন এরকম আত্মীয়তা নীতি সুদৃঢ় করে ঘোষণা করেছে,

> *"আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না এই কাজ হতে যে, তোমরা সেই লোকেদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি হতে বহিস্কৃত করেনি, সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। তিনি তোমাদেরকে যে কাজ হতে নিষেধ করেন তা হচ্ছে এই যে, যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি হতে বহিস্কৃত করেছে ও তোমাদেরকে বহিস্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্যে সহযোগিতা করেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেন, এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা যালেম।" (কুরআন ৬০ ঃ ৮-৯)*

ইসলামের এই সুমহান নীতি সবসময় বহাল ছিল এমনকি যুদ্ধবিগ্রহ অথবা রাজবিদ্রোহের কঠিন পরিস্থিতিতেও কোন ক্ষেত্রেই মুসলিমরা সুযোগ পেয়ে অপর অমুসলিমদের উপর অন্যায়ভাবে চড়াও হয়নি। সবসময় ইসলামের নীতি মেনে অমুসলিমদের সাথে সুবিচার ও সুব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে কুরাআনই হল

মূল সূত্র। সেইসঙ্গে রসূল (সাঃ) নিজেই সমস্ত ক্ষেত্রে কুরআনের এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে কুরআন কঠোর নীতির কথা ঘোষণা করেছে সেখানে অবশ্যই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ও পরিস্থিতি। আবার এরকম পরিস্থিতিতে কুরআন অনমনীয় হয়েছে শত্রুদের প্রতি।

দয়া

ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে ইসলাম ভিন্নধর্মী মানুষের প্রতি কোন রকম হিংসা ঘৃণা বা বিদ্বেষের প্রশয় দেয়নি। নবী (সাঃ) সবসময় তার ইহুদী প্রতিবেশীদের প্রতি ছিলেন সদয় ব্যবহারের। তিনি সব সময় পাশের প্রতিবেশী বাড়িগুলিতে যাতায়াত করতেন, তাদের ব্যথা বেদনার সাথি হতেন, তাদের সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিতেন। নবী (সাঃ)-র একেবারে কাছের ইহুদী প্রতিবেশীরা ছিল বনু আরিদ গোত্র। নবী (সাঃ) তাদের প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন। তিনি তাদের জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এ ছিল ইসলাম তথা নবী (সাঃ)-র মহানতম আদর্শের একটি অনন্য নজির।

বিশ্বাস ও আনুগত্যপরায়ণতা

অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহার সব সময় ক্ষমা ও সহিঞ্চুতার নজীর পেশ করে। নবী (সাঃ)-র আশেপাশের অমুসলিম প্রতিবেশীরাও মুসলমানদের সাথে উদার সহিঞ্চুতার ভাব বিনিময় করতেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে জয়লাভের পর মক্কার কুরাইশ নেতারা একজন প্রতিনিধি আবিসিনিয়ার নাজ্জাসীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে নাজ্জাসী মুসলিমদের নিজের দেশ মক্কায় ফিরিয়ে দেন। এতে কুরাইশরা তাদের উপর অত্যাচার করার ষড়যন্ত্র করেছিল কৌশলে। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় নবী (সাঃ)ও একজন দূত পাঠিয়েছিলেন যাতে করে আবিসিনিয়ার নাজ্জাসী কেবল কুরাইশদের কথা শুনে কোন ভুল সিদ্ধান্ত না নিয়ে নেন, আর এই দূত ছিলেন একজন অমুসলিম। তিনি ছিলেন উমায়া পুত্র আমর। রসূলের পক্ষ থেকে প্রেরীত রাষ্ট্রদূত সফলকাম হয়েছিল তার কূটনীতিতে। আবিসিনিয়ার নাজ্জাসীও খুব ভাল করে অনুভব করেছিলেন কুরাইশদের চালাকি। তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কুরাইশ দূতকে ও মুহাম্মদ (সাঃ)-র দূতকে দিয়েছিলেন অগ্রাধিকার।

অমুসলিম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

শত্রু দমনে যারা রসূলের সাথি হয়েছিলেন

সত্যি বলতে নবী (সাঃ) ছিলেন অতি বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব। যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে সকল সময় ফুটে উঠেছিল তার বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি কোন সময় যুদ্ধপূর্ব অধ্যায়কে হালকা করে দেখেননি। তিনি ছিলেন এমনই সুক্ষদর্শী যে বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার তার মতো ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তার সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন বাস্তব পরিস্থিতিকে। তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যুগিয়েছিলেন উন্নতমানের নৈতিক গুণাগুণ, যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোত্তম। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতির পর তিনি তার মিলিটারি ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে আধুনিক সাজ সরঞ্জামকে তিনি তার মিলিটারী বিভাগে প্রয়োগ করেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি সামরিক শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। সেই সময়ে তার সৈন্য সংখ্যা ছিল বারো হাজার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তীরন্দাজ ও অস্ত্রবাহী মিলিয়ে একশত সৈন্য ধার স্বরূপ নিয়েছিলেন যারা ছিলেন অমুসলিম। তাদের নেতা ছিলেন সাফওয়া বিন উমাইয়া। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে এ ধরনের অমুসলিম সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করা। এ শুধু রসূলের পক্ষে সম্ভব। যে কোন মুহুর্তে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারত। সম্পূর্ণ যুদ্ধের পরিস্থিতিটা তখন মুসলমানদের অনুকূল না থেকে অমুসলিমদের অনুকূলে চলে যেতে পারত। কিন্তু নবী (সাঃ) যাদের প্রতি বিশ্বাস করা যাবে তাদের প্রতি আস্থা রাখাকে অতি সম্মানের চোখে দেখতেন।

● এই হুনাইনের যুদ্ধে দু'জন অমুসলিম ইসলামের হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের নাম হল সাফওয়ান ও সুহায়েল। নবী (সাঃ) তাদের যখন চিনতে পারলেন তিনি তাদের যথাযোগ্য সম্মান দান করেছিলেন, যুদ্ধে যে প্রাপ্ত সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি তাদের দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে তিনি তাদের ইসলাম গ্রহন করার কথাও বলেননি।

● অপর এক ঘটনা, উহুদ যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম বাহিনী এক অপরিচিত পথ ধরেই এগুচ্ছে। তারা কিছুতেই অনুমান করতে পারছে না কোন পথ ধরে গেলে ঠিকভাবে যুদ্ধ ময়দানে পৌছান যাবে? কোন পথে তারা শত্রুদের সাক্ষাত পাবেন। এরকম পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) বিশ্বাস করলেন এক অমুসলিমকে। তিনি সক্ষম ছিলেন এ অজানা পথে সৈন্যদের যথাস্থানে পৌছে দিতে। নবী (সাঃ) তারই সাহায্য নিলেন। সাময়িকভাবে তারই নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী তাকে অনুসরণ করে পৌছাল নির্দিষ্ট ময়দানে।

জঘন্য পাপ

নবী (সাঃ) যখন মদিনায় গেলেন তখন জোর করে কারো মাথায় ইসলামের বোঝা চাপিয়ে দেননি। কাউকে জোর করে মুসলমান বানানোর জন্য ইসলাম কখনও অনুমোদন দেয়না। নবী (সাঃ)-র বাস্তব মিশনও এই কথা বলে। মদিনায় তিনি যখন গিয়েছিলেন তখন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি নতুন গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা। কিন্তু পরে একে একে ইহুদীদের সাথে একের পর এক সংঘর্ষপূর্ণ অবস্থার প্রকাশ ঘটল, ভেঙ্গে পড়ল চুক্তির বিশ্বস্ততা। সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল ধীরে ধীরে।

বেশ কয়েক বছর পর মদিনায় মুসলিমদের সাথে ইহুদীদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সংঘর্ষ দেখা দিল। এই ইহুদীদেরকে তাদের দ্বিচারিতাসূলভ আচরণের জন্য মুসলমানরা সন্দেহের চোখে দেখত কারণ এদের মধ্যে রাজদ্রোহিতা ও আনুগত্যের অভাব চরমভাবে দেখা দিয়েছিল। ঠিক এই সময় এক মুসলিম নিজের চুরির দায় থেকে নিজেকে বাঁচার জন্য এক ইহুদীর ঘাড়ে নিজের দোষটা চাপিয়ে দিল। বিচার এল নবী (সাঃ)-র কাছে।

> নবী (সাঃ) মুসলিম ব্যক্তির কথায় তার পক্ষে রায় দিলেন না তিনি তৎক্ষণাতই বিচার বিভাগীয় সমন জারি করে তদন্ত চালালেন। তদন্তের ফল প্রকাশে সবাই অবাক হলেন। প্রকৃতপক্ষে চুরি করেছিল মুসলিম ব্যক্তিটিই। আবার এই চুরির দায় চাপিয়ে দিয়েছিল নির্দোষ ইহুদী লোকটির উপর। নবী (সাঃ) ইহুদীকে মুক্তি দান করলেন এ ধরনের জঘন্য অপমানের হাত থেকে। কুরাআন এ বিষয়ে দীর্ঘ আট আটটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে। *(কুরআন ৪ ঃ ১০৮-১১৫)*

উদারতা ও সহিষ্ণুতা

ভদ্রতা ও দয়া ইসলামের দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। নবী (সাঃ) এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আমাদের সকলকে এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, *"আল্লাহ হলেন উদার, তাই তিনি সর্বত্র উদারতা পছন্দ করেন।"* এ প্রসঙ্গে আর এক সাথিকে তিনি বলেছিলেন *"তোমার মধ্যে দুটি গুণ আল্লাহ পছন্দ করেন সেগুলো হল উদারতা ও সহিঞ্চুতা।"*

নবী (সাঃ) এই দুটি গুণের পরম অধিকারী ছিলেন। নবী (সাঃ)-র জীবনের নানান কঠিন ঘটনায়ও এটি প্রমাণিত হয়েছে। এক সময় এক ইহুদী খামাখা ঝগড়া-

কলহ বাঁধানোর জন্য পবিত্র মসজিদে প্রকাশ্যে পেচ্ছাব করেছিলেন, এমন সময় স্বভাবত নবী (সাঃ)-র সাথিরা উত্তেজিত হয়ে তার উপর চড়াও হতে গেলেন। কিন্তু নবী (সাঃ) তাদেরকে শান্ত করলেন। উদ্ধত আচরণ থেকে ফিরিয়ে ইহুদী বদমাইশ লোকটাকে ভাল করে পেচ্ছাব করার সুযোগ দিলেন, তারপরের ঘটনা পৃথিবীর উদারতার ইতিহাসে বিরল, তিনি নিজের হাতেই পানি এনে মসজিদের পেচ্ছাব করা অপবিত্র স্থানকে পরিস্কার করে দিলেন। তারপর তিনি শান্ত কণ্ঠে বেদুইন ইহুদীকে বোঝালেন যে এটি মসজিদ। এটি পবিত্র স্থান, এখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয় তাই এখানে কারোর পেচ্ছাব করা সমুচিত নয়। তারপর বেদুইন সেখান থেকে চলে গেলেন, নবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ তার সাথিদের বললেন,

> "তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে সমস্যাকে সহজ করার জন্য, মানুষের সমস্যাকে জটিল করার জন্য নয়।"

এ কথা দ্বারা নবী (সাঃ) সাহাবাদের কি শিক্ষা দিলেন? তিনি এর দ্বারা তাদের শিক্ষা দিলেন যে, গ্রাম্য এই বেদুইনকে ক্ষমা দেখান মহৎ কাজ। কারণ সহিঞ্চুতা জীবনের ভূষণ, সহিষ্ণুতা ও উদারতার জেরে অনেক কলহপূর্ণ অবস্থার সমাধান হতে পারে। এমনকি অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও এড়িয়ে যেতে পারা যায় এই উদারতার মাহাত্ম দিয়ে। তাই নবী (সাঃ) তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় এরকম উদারতার উদাহরণ পেশ করে গেছেন। এইগুলো নীতি বিজ্ঞানের খোরাকতো বটেই, সেইসঙ্গে সমাজ গড়ার হাতিয়ারও।

অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা বোধ

অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা ও সহিঞ্চুতা ইসলাম যেভাবে পেশ করেছে তা অন্য কোন দর্শনে স্থান পায়নি। ইসলামের এই মহান সহিঞ্চুতাবোধকে কেবল মুসলমানেরা নয় বরং বহু প্রাচীন ও বর্তমান অমুসলিম পন্ডিত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্য ধর্মের প্রতি সহিঞ্চুতা দেখাতে গিয়ে কুরআন বলেছে,

> "..এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি কর না। এমন যেন না হয় যে, এরা শেরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মূর্খতাবশত আল্লাহকে গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমি তো এভাবেই প্রতিটি মানব মন্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের নিজেদের রবেরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাজ করেছে তা তিনি তাদেরকে বলে দেবেন।" (কুরআন ৬ ঃ ১০৮)

অন্যান্য ধর্মের প্রতি নবী (সাঃ) ছিলেন খুবই সহনশীল। অন্য কোন ধর্ম বা মতামতের বক্তব্যকে আলোচনা করার প্রাসঙ্গিকতা এলে তিনি কোন সময় রূঢ় বা অসংযত ভাষা ব্যবহার করতেন না। অন্য ধর্মের দেব-দেবী কিংবা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহ যাতে কখনও কোন মুসলিমদের দ্বারা নিগৃহীত না হয় তিনি সে বিষয়ে সকলকে সর্তক করতেন। এমনকি কুরআনে বলা হয়েছে, যে আমাদের কারোও উচিত হবে না যে আমরা কোন সময়ে অন্য ধর্মের দেব-দেবীদের গালাগালি করি। আরোও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে যদি আমরা এ ব্যাপারে সংযত না হই তাহলে অন্যান্য দেব-দেবীদের সাথে আমরা আল্লাহকেই পক্ষান্তরে গালাগালি দিয়ে ফেলব।

নবী (সাঃ)-র এরকম সহনশীলতার অনেক নজীর পাওয়া যায়। তবুও কিছু কিছু ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। এরকম এক ঘটনা ঘটেছিল যখন খায়বার ত্যাগ করে মুসলিমরা মদিনায় আসছিল। এই সময় একজন ইহুদী রাব্বি দেখেছিল যে নবী (সাঃ)-র কিছু সাহাবী তাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতের কিছু পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে আর এগুলো তারা অমর্যাদার সাথে ব্যবহার করছিল। এ দৃশ্য তাকে খুব মনোপীড়া দিয়েছিল। তিনি তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাতই মুহাম্মদ (সাঃ)কে জানালেন। নবী (সাঃ) যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তিনিও মর্মাহত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সাহাবাদের আদেশ করলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহাবাদের এ ধরনের আচরণের জন্য ওই খ্রীষ্টান রব্বির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ড. ইসরাইল ওয়েলপহেনসান নামে একজন বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই ঘটনা নবী (সাঃ)-র মর্যাদাকে সুউচ্চে স্থাপন করে। তিনি যে অপর ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এতটাই উদার ও শ্রদ্ধাশীল তা ভাবাই যায় না। নবী (সাঃ)-র এ রকম সহনশীল ও ক্ষমাশীল আচরণ ইহুদী ধর্মাবলম্বী লোকেদের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছে। তারা এটা ভালভাবে অনুভব করেছে যে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা কোন সময় তাদের ধর্মের মানুষ, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মালয় আক্রান্ত হওয়ার নয়। যদিও কোন সময় কোন কিছু হয়ে পড়ে তবে সেটা দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহুদীরা তা নিজেদের চোখে দেখেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সত্তর সালে রোমানরা জেরুজালেম আক্রমণ করে সেখানকার গ্রন্থগুলি পা দিয়ে মাড়ায় ও নষ্ট করে দেয়। ইহুদীরা যখন স্পেন দখল করে তখন সেখানকার বিশাল লাইব্রেরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই দুটি ঘটনাই ইসলামের সঙ্গে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়।

ধর্মগ্রহণে কোন বাড়াবাড়ি নেই

অপরকে নিজ ধর্ম গ্রহণের জন্য কোন প্রকার বাধ্যবাধকতায় ফেলা যাবে না, কারণ কুরআনে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই।"(কুরআন ২ ঃ ২৫৬)

নবী (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন ইসলাম প্রচারের জন্য। কিন্তু তা যেন কারোর উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক করেছেন মুসলমানদের। ইসলামকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়াই মুসলমানদের কাজ এরপর কোন ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে কিংবা বর্জন করবে, তা ব্যক্তি নিজেই ঠিক করে নেবে। ভাল আচরণের দ্বারা মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দিতে হবে। কুরআন ঘোষণা করেছে,

"হে নবী ! তোমার আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকেদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার আল্লহই বেশী ভাল জানেন, কে তাঁর পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। আর কে সঠিক পথে আছে।" (কুরআন ১৬ ঃ ১২৫)

এক সময় নবী (সাঃ)-র কাছে ইয়েমেন থেকে চৌদ্দজন খ্রীষ্টান প্রতিনিধি এলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল নবী (সাঃ)-র নবুয়্যত সম্পর্কে যাচাই করা। তারা নবী (সাঃ)-র আনীত ইসলাম ধর্মের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে চাইলেন। সেই সঙ্গে ইসলাম যীশু খ্রীষ্টকে কোন দৃষ্টিতে দেখে থাকে তাও জানতে চাইলেন। নবী (সাঃ) তাদের প্রশ্নের উত্তর তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ও ইসলামী দৃষ্টিকোন দিয়ে কুরআনের যুক্তিতে পেশ করলেন। ইসলাম সুন্দরভাবে যীশুখ্রীষ্টের যে মর্যাদা দান করেছে তা তিনি ব্যক্ত করলেন কিন্তু যেখানে আপত্তিকর বিশ্বাস আছে তা তিনি খুব সাবধানে তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেলে যে ত্রিত্ববাদ প্রকাশ পেয়েছে তিনি কেবল সেখানেই বিরূপ আলোচনা করেছেন এবং এই মতবাদ যে ভুল তা তাদের বুঝিয়েছেন যুক্তি সহকারে। কেবলমাত্র তাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা তিনি তাদের মনে আঘাত দেওয়ার জন্য করেননি।

নবী (সাঃ) এক আল্লাহরই উপাসনা করার কথা বলেছিলেন। আর একমাত্র ইসলামই এই দাওয়াত মানুষের কাছে তুলে ধরে। তিনি মানুষদের বুঝিয়েছেন যে ইসলাম কুরআনের মাধ্যমে অহীর বার্তা শেষ করে দিয়েছেন আর পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ এসেছে সবকটিতেই আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষনা করেছে। হজরত মুসা, হজরত ঈসা, হজরত দাউদ, সুলাইমান, নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল আঃ সবাই

ছিলেন একত্ববাদের প্রচারক।

এ কথা শুনে খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দল ইসলামের মৌলিক কথাগুলো বুঝলেন, কিন্তু তারা মেনে নিলেন না। মসজিদে তারা বেশ কয়েকদিন থাকার কারণে তাদের উপাসনা করার জন্য অনুমতিও চেয়েছিল। মুহাম্মদ (সাঃ)-র অনুসারীরা এটা আপত্তিকর বলে মনে করলেন। তারা ভেবেছিল ইসলাম এ অনুমতি দিতে পারে না, কিন্তু নবী (সাঃ) তাদের উপাসনা পালন করার অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদের বললেন "ওদের নামাজ পড়তে দাও"। অবাক কাণ্ড তারা সবাই পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করলেন।

প্রতিনিধি দলটি যখন মদিনা ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন তারা নবী (সাঃ)-র কাছে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেন তাদের সাথে একজন দূত প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি তাদের অবশিষ্ট প্রশ্নের জবাব দেন। এমনকি বিচার কাজ সমাধা করবেন। নবী (সাঃ) তাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে আবু উবায়দাকে এ কাজে তাদের সাথে পাঠালেন।

প্রতিনিধি দলটি যখন মদিনা থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেলেন, তখন তাদের কাছে অন্যান্য খ্রীষ্টান প্রতিবেশীরা দৌড়ে এলেন, জানতে চাইলেন সমস্ত কিছু। প্রতিনিধি দলটি সবিস্তারে সব ঘটনা খুলে বললেন তাদের কাছে। তারা জানালেন মুহাম্মদ (সাঃ) যে তথ্যগুলো তাদেরকে জানিয়েছেন তাতে ইসলামের একত্ববাদ সম্বন্ধে তাদের একটি স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল। প্রতিনিধি দল আরোও জানাল যে তাদের প্রতি কোনরকম খারাপ আচরণ নবী (সাঃ) করেননি এমনি কি তাদেরকে পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়ারও অধিকার দিয়েছেন। নবী (সাঃ) যে আচরণ তাদের প্রতি করেছিলেন তা তারা কখনই ভুলতে পারবেন না। এর দ্বারা ইসলামের সহিঞ্চুতা, বিশস্ততা ও উদারতার কথা ভালভাবে অবগত হয়েছিল ইয়েমেন বাসীরা।

খ্রীষ্টানদের সাথে বা অন্যান্য ধর্মের মানুষদের সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এইভাবে দেখা সাক্ষাত আলাপ আলোচনা করায় কোন আপত্তি নেই। এইভাবে নবী (সাঃ) যে বার্তা এনেছিলেন তা সকল ধর্মের মানুষের জন্য বিশাল সহানুভূতি ও সহিঞ্চুতার স্বাক্ষ রাখে। এই প্রতিনিধি দলের সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের একত্ববাদ সম্বন্ধে যেমনভাবে আলোচনা করেছেন, তেমনিভাবে সমালোচনা করেছেন খ্রীষ্টান ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে। কিন্তু তার এই আলোচনা ছিল মার্জিত সীমারেখার মধ্যে। তার আলোচনা ও সমালোচনায় এই প্রতিনিধিদল কোনরকম মনের ব্যাথা পাননি। বরং তাদের অনেকটা ভ্রান্তি কেটেছিল। এমনকি তারা সন্তুষ্ট হয়ে মুসলিমদের এক প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন। যার কাছে তারা ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ও উত্তর পেয়েছিলেন, "ধর্মে বাড়াবাড়ি নয়" কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি বহুত্ব সমাজের এক উন্নত আদর্শ।

বহুত্ববাদ

কুরআন এত সুন্দরভাবে ধর্মীয় বহুত্ববাতের সমালোচনা করেছে তা দেখলে আমরা অবাক না হয়ে পারি না, স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করি ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি উদার বা সহনশীল নয় কিন্তু এ কথা একেবারেই ভুল। বরং বাস্তবে ঘটনা অন্যরকম। কুরআন যেভাবে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তা অন্য ধর্মে মেলা অসম্ভব। বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তার মানুষ সব সময় আছে তা থাকবেও, এটা ইসলাম আমাদের জ্ঞাত করায়। কিন্তু ইসলাম এত বিভেদের মধ্যে থেকেও কোন সময় পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মীতার কাছ থেকে পিছিয়ে আসেনি। ইসলাম উৎসাহ দেয় এ সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে সকল সময় কাজ করতে হবে যা কিছু ভাল তার জন্য। মানুষের নীতিবোধ কিসে জাগ্রত হয় তা দেখতে হবে আমাদের। মানুষের মধ্যে যে সততা, ন্যায় নীতি প্রভৃতি গুন আছে তা কাজে লাগাতে হবে। তারজন্য কুরআন ঘোষণা দেয়,

> *"হে কিতাবধারী লোকেরা, এসো এমন এক কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান.... ।" (কুরআন ৩ ঃ ৬৪)*

এই পৃথিবীতে সকল ধর্মের মধ্যে, সকল বিভেদের মধ্যে মানুষ কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য কুরআন কিছু নির্দেশিকা আমাদের দান করেছে। যদি আমরা সেগুলি পালন করে চলি তাহলে অতি সহজেই আমরা শান্তি স্থাপন করতে পারি। শুরু থেকেই এটা আমাদের জানা দরকার যে কোন সময়ে আমাদের চরমপন্থী হওয়া উচিত নয়। কুরআনের ঘোষণা,

> *"ওহে গ্রন্থধারী লোকেরা! তোমরা ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ সম্বন্ধে নির্ভেজাল সত্য ছাড়া কিছু বলো না।"(কুরআন ৪ ঃ ১৭১)*

> "হে নবী! তোমার আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর লোকেদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা উত্তম। তোমার আল্লহই ভাল জানেন, কে তার পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে রয়েছে। (কুরআন ১৬ ঃ ১২৫)

> "এবং সেই কথা বলো যা সর্বোত্তম।" (কুরআন ১৭ ঃ ৫৩)

> *"এই লোকেরা আল্লহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি দিও না। এমন যেন না হয় যে, এরা শিরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে গিয়ে মূর্খতাবশত: আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। "* (কুরআন ৬ ঃ ১০৮)

> “রহমানের বান্দাহ তারা, যারা যমীনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর অজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে তোমাদের প্রতি ‘শান্তি’। *(কুরআন ২৫ ঃ ৬৩)*

অবশ্য পারস্পরিক এই ধরনের নরম মনোভাবের আচরণ করার পরেও সমস্যা থেকে যেতে পারে। বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলিক প্রার্থক্য গুলো থাকার কারণে এ সমস্যা উদ্ভুত হয়। আর এ পরিস্থিতিতে যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে কুরআন এ শিক্ষা দেয় যে, নিজে বাঁচো আর অপরকে বাঁচতে দাও এবং এগিয়ে যাও।

> *“বলে দাও! হে অবিশ্বাসীরা, আমি সেই রবের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা কর। আর না তোমরা তার ইবাদত কর যার ইবাদত আমি করি। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই যাদের ইবাদত তোমরা করছ। আর না তোমরা তার ইবাদত করতে প্রস্তুত যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।” (কুরআন ১০৯ ঃ ১-৬)*

কুরআনের সবচেয়ে মূল্যবাণ উপদেশ- বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয়। আল্লাহ সবথেকে ভালো জানেন।

17

খায়বার

খায়বারের অবস্থান হল মদিনা থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে। এটি ছিল ইহুদীদের আঞ্চলিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। অন্যান্য সকল উপজাতির লোকেরা খায়বারকে ভয় করে চলত। কারণ এদের ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল এদের ভাল। সেই কারণে মুসলমানেরা পর্যন্ত এদের অনেকটা ভয়ের চোখে দেখত। খায়বার অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন মূলত ইহুদী গোত্রের। এই সকল গোত্রের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, বনু কুরাইজা, বনু কাইনুকা ও বনু নাজির গোত্র, মদিনায় মুহাম্মদ (সাঃ)-র অবস্থান গ্রহনকে এরা মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। তারা সব সময় ভাবত মুসলমানদের কি করে ক্ষতিসাধন করা যায়। বিশেষত ধর্মীয় কারণেই ইহুদীরা মুহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলমানদের মোটেই ভাল চোখে দেখতে পারত না। সব সময় সুযোগ খুঁজত মুসলমানদের কি ভাবে আক্রমন করা যায়। এ কাজে নানান প্রকার ষড়যন্ত্রের হীন জাল সব সময় বিছিয়ে রাখতে তারা তৎপর ছিল। তাছাড়া তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ঘটিয়ে মুসলিম শক্তিকে হীন করে দেওয়ার চেষ্টায় সব সময় ব্যস্ত থাকত।

তাই তারা চুপ করে বসে না থেকে দূত পাঠালেন। মক্কার কুরাইশদের কাছে। এমনকি তারা আর্থিক সাহায্য পাঠাল যাতে করে কুরাইশ নেতারা মদিনা আক্রমনের সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেয়। শুধু মক্কার কুরাইশদের কাছে দূত পাঠিয়ে ক্ষান্ত হল না তারা, দূত পাঠাল অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রের কাছেও। গতফান ও হাওয়াজীন গোত্রও এর অন্তভুক্ত ছিল। এদের ঐক্য মুসলিমদের সাথে খন্দকের যুদ্ধেও প্রয়োগ হয়েছিল। এমনকি নবী (সাঃ)-র প্রাণ নাশ করার জন্যও তারা ষড়যন্ত্র করেছিল। সে জন্য নবী (সাঃ) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে পনেরো দিনের মধ্যে খায়বার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বসলেন। হুদায় বিয়ার সন্ধি হওয়াতে মক্কার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-র একটি শান্তির পরিবেশ গঠিত হয়েছিল তাই তিনি এখন খায়বার আক্রমন করলেও মক্কার লোকেরা মদিনা আক্রমন করবে এটা ছিল এক ইতিবাচক দিক।

মুহাম্মদ (সাঃ) প্রথম থেকেই খায়বার আক্রমন করতে চাননি।বরং তিনি তাদের সাথে শান্তিপূর্ন চুক্তি চেয়েছিলেন। তাই তিনি খায়বারেও দূত পাঠালেন শান্তির বার্তা নিয়ে। আর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। খায়বারবাসী তার কথায় কর্নপাত করেননি। তাই পরিশেষে নবী (সাঃ) খায়বার অভিযানের মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি তার এ সিদ্ধান্ত গোপন রাখলেন। যাতে করে শত্রুপক্ষ এই প্রস্তুতির কথা জানতে না পারে।

খায়বারের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনের হাজারের মত। কিন্তু নবী (সাঃ) মাত্র পনের শ সৈন্য নিয়ে এক রাত্রিতে অগ্রসর হলেন। যদিও তিনি আরো অনেক বেশী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারতেন। শহরের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছানোর পর তিনি একজন পথ প্রদর্শকের সাহায্য নিলেন, যিনি সমস্ত অপরিচিত জায়গাগুলো চিনিয়ে দিলেন। এখন নবী (সাঃ) খায়বারের দুটি দূর্গ-ঘাটির মাঝখানে নিজের তাঁবু খাটালেন। এইভাবে তিনি দুটি শত্রু গোষ্ঠী খায়বার ও গতফান কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। খায়বার আর গতফান গোত্র এক সঙ্গে মিলিত হওয়ার আর কোন সুযোগ পেলনা। যখন সকাল হল উভয় গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের এ ধরনের অবস্থান লক্ষ করে হকচকিয়ে গেলেন। কি করবে তারা স্থির করতে পারল না। তারা উভয়েই ভয় পেয়ে গেল, শীঘ্র আকস্মিক আক্রমনের সম্ভাবনায়। এই ভাবে অবরোধ অবস্থা বেশ কয়েক দিন চলল।

দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কিন্তু মুসলমানেরা দূর্গ দখল করতে পারছিল না। নবী (সাঃ) একে একে হজরত আবু বকর রা:, ওমর রা:কে যুদ্ধে পাঠালেন, কিন্তু দূর্গ দখল কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি আলি রা:কে পাঠালেন আর বললেন, -এই ইসলামের পতাকা নাও এবং যাও যুদ্ধ কর - যতক্ষন না আল্লাহ তোমাকে বিজয়ী করেন।

কিন্তু আবার আল্লাহর উপর ভরসা করে মুসলমানেরা কামুস দূর্গ আক্রমণ করল। কিন্তু এ দূর্গেও মুসলমানরা কোন খাদ্য পেল না। তাই খাদ্যাভাব তাদের মধ্যে প্রকট ভাবে দেখাদিল। একের পর এক দূর্গ আক্রমন করেই চলছিল মুসলমানেরা। কিন্তু ফল পাচ্ছিল না। তারপর তারা আক্রমন করল আলীসাব দূর্গ। এই দূর্গেই ইহুদীরা সমস্ত খাদ্য গুছিয়ে রেখেছিল। এখন মুসলমানদের খাদ্যাভাব কাটল।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে রসূল (সাঃ) বিষ খেলেন

মুহাম্মদ (সাঃ) স্থানীয় অধিবাসীদের আপন আপন স্থানে বসবাস করার ও নিজেদের বাগান রাখার অধিকার দিলেন এই শর্তে যে তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে ও নিয়মিত কর প্রদান করবে। নবী (সাঃ)-র সাথে তারা চুক্তি করেছিল বটে কিন্তু তা বলে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে ছাড়েনি। তারা চিন্তা করল কিভাবে নবী (সাঃ)কে গোপনে হত্যা করা যায়। তারা ষড়যন্ত্র করল হারিসের কন্যা ও মিসকামের স্ত্রী জয়নাবের সাথে। তারা নিমন্ত্রন জানাল নবী (সাঃ)কে। নবী (সাঃ) ও তার কয়েকজন সাথি এই নিমন্ত্রনে তাদের বাড়িতে খেতে গেলেন। খাওয়া শুরু করলেন তারা এমন সময় নবী (সাঃ) ভেড়ার মাংস মুখে তুলে তাতে অন্যরকম স্বাদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা ফেলে দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এবজন সাহাবী কিছুটা মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন পরে মারাও গেলেন। নবী (সাঃ) অন্যান্যদের খেতে নিষেধ করলেন। এই মাংসে বিষ মিশিয়েছিল জয়নব। কিন্তু এটি পরামর্শ দিয়েছিল পুরুষেরা। যয়নবকে জেরা করার পর জানা গেল সেই নবী (সাঃ)কে হত্যা করার জন্য খাদ্যে বিষ মিশিয়েছে। মুসলমানেরা অত্যাধিক রুষ্ট হল তাদের এই হীন ব্যবহারে। কেউ কেউ বলল এখুনি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক জয়নাবের। আবার কেউ কেউ তাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলেন। কারণ যুদ্ধে তার স্বামী ও পিতা উভয়ই নিহত হয়েছিল। যাই হোক এই ঘটনার পর ইহুদীদের প্রতি তেমন আর আস্থা রাখা গেল না।

সফিয়া পছন্দ করলেন আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)কে

এই যুদ্ধে যে সকল রমনী মুসলমানদের দখলে এসেছিল তাদের মধ্যে বনু নজীর গোত্রের বিন আখতারের কন্যা সফিয়াও ছিলেন। তিনি একজন সাহাবীর ভাগে দাসী হিসাবে এসেছিল। তিনি তাকে আবার নবী (সাঃ)কে দাসী হিসাবে উপহার দেন। কিন্তু নবী (সাঃ) তাকে স্বাধীনতা দান করেন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। এরপর তিনি তাকে তার নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ইচ্ছে করলে ইহুদী হয়ে থাকার ও অনুমতী দিলেন অথবা মুসলীম হওয়ার অধিকার প্রদান করলেন। এই রকম স্বাধীনতা পাওয়ার পর সফিরা উচ্ছসিতভাবে বলে ফেললেন “আমি আল্লাহকে ও তার রসূলকে পছন্দ করি” পরে নবী (সাঃ) তার অনুমতী নিয়ে তাকে বিবাহ করলেন, এইভাবে রসূল তাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করলেন।

নবী (সাঃ)-র এ বিবাহ একটি তাৎপর্যপূর্ন বিষয়। নবী (সাঃ) আরবের প্রায় প্রখ্যাত প্রখ্যাত গোত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সমস্ত আরব জুড়ে মৈত্রি স্থাপন করেছিলেন। নবী (সাঃ)-এর এইসব বিবাহ মৈত্রীও

মুসলমানদের অনেক নিরাপত্তা দান করেছিল। আর অবশেষে অষ্টম হিজরীর শেষের দিকে সারা আরব উপদ্বীপ মুসলমানদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সর্বত্র এক মৈত্রির পরিবেশ বিরাজ করছিল। এখন মদিনা একটি অতুলনীয় আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রসূলের পরার্থপর মানসিকতা

এই সময় মক্কায় দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। বুভুক্ষ মানুষ দিশা হারাল জীবিকার সন্ধানে। ঘরে ঘরে হাহাকার দুমুঠো অন্নের জন্য। একটু বাসস্থান নেই, একটু বস্ত্রখণ্ড পাওয়া যায় না গায়ে জড়ানোর জন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই নিজে বাঁচার জন্য লড়াই করছে। শহরের কোথাও চাষবাস নেই তাই বাইরে থেকে খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আনা হবে কোথা লেকে। যেখান থেকে আনার সম্ভাবনা ছিল সে সকল জায়গাগুলো দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল আগে থেকেই।

নজদ ছিল ব্যতিক্রম অঞ্চল, আরব উপদ্বীপের কেবল এই অঞ্চলই রক্ষা পেয়েছিল এই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে। কেবল সেখান থেকেই মক্কায় শষ্য রপ্তানি করা হত।

একদিনের ঘটনাঃ মুসলমানদের ত্রিশজনের সেনা বাহিনীর প্রধান মুসলেমা একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিতে গ্রেফতার করলেন। কারণ লোকটি ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল। তাকে আনা হল মদিনায়। ব্যক্তিগতভাবে লোকটি নবী (সাঃ)-এর পরিচিত ছিল। তিনি ছিলেন নজদের নেতা এবং তার নাম ছিল সুমামা। তিনি হিজরতের পূর্বে একবার মক্কা পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। অতীতে নবী (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটি তখন ইসলাম গ্রহন করবার পরিবর্তে নবী (সাঃ)কে হত্যা করার হুমকী প্রদান করেছিল, আজ সে মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বন্দী। নবী (সাঃ) তাকে বললেন "এটা কি প্রতীমা পরিত্যাগ করার এবং সেই সঙ্গে একমাত্র স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পন করার উপযুক্ত সময় নয়?" লোকটি উত্তরে বলল,

"ও মুহাম্মদ (সাঃ) ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে পার। তা যদি কর তাহলে একজন হত্যাকারীকে হত্যা করলে, আর যদি ক্ষমা করে দাও তাহলে এক জন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলে আর যদি তুমি কোন মুক্তিপন চাও তাহলে আমি তোমাকে তা প্রদান করব।"

নবী (সাঃ) তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলেন তারপর চুপ করে রইলেন। কথোপকথন শেষ হল নবী (সাঃ) তাকে রাজবন্দীর মর্যাদা প্রদান করার জন্য আদেশ দিলেন। সেই সুযোগে লোকটি মদিনার মসজিদে থেকে মুসলমানদের দৈনন্দিন

জীবনের চিত্র পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দিনেও একই প্রশ্নের জবাবে তিনি পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, এ কথা শোনার পর তৃতীয় দিনে নবী (সাঃ) তাঁকে বলেই দিলেন "সুমামা, তুমি এখন মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পার।

নবী (সাঃ)-এর এ হেন আচরণ তার চিন্তার বাইরেই ছিল। তিনি আশা করেননি নবী (সাঃ) তাকে এরকম নিঃশর্তে মুক্তি দান করবেন, নবী (সাঃ)-এর এরকম পরার্থপর আচরণ তাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিল। সুমামা মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন তার পর নিকটবর্তী কূপ থেকে গোসল ও অযু করে পবিত্র হলেন। ফিরে এলেন মসজিদে। অবশেষে নবী (সাঃ) এর কাছে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে ঘোষনা করলেন,

> "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।"

তিনি এরপর বলে চললেন,

> "একটু আগে আমি তোমাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ মনে করতাম, আর এখন আমি পৃথিবীতে তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি, আমার চোখে তোমার ধর্মের চেয়ে খারাপ ধর্ম আর ছিল না, এখন তোমার ধর্মের চেয়ে ভাল ধর্ম আর পৃথিবীতে নেই। মদিনার মত খারাপ শহর আমার কাছে আর ছিল না আর এখন মদিনার মত ভাল শহর পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।"

সুমামা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। আর এ ঘটনা ইসলাম প্রচারের দ্বার খুলে দিল নজদবাসীদের কাছে। রাজনৈতিকভাবে নজদে ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি পেল মুসলমানেরা। সুমামা এখন সরাসরি মক্কায় শষ্য রপ্তানি করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন । বরং তিনি একটি সন্ধি করলেন যাতে করে নজদের শষ্য এখন থেকে আর সরাসরি মক্কা পাবে না বরং তা নবী (সাঃ) এর অনুমতিতে পেতে পারে মক্কার লোকেরা। এই পরিস্থিতিতে মক্কার দুর্ভিক্ষ অবস্থাকে আরোও বেশী ক্ষতিগ্রস্থ করল। বাধ্য হয়ে মক্কার অধিবাসীরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে আবেদন করল যাতে করে মৃত্যুমুখী কুরাইশদের নজদ থেকে খাদ্য সরবরাহ করে সাহায্য করা হয়। কারণ মক্কাবাসীদের অনেকেই না খেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছিল।

করুণার প্রতীক মুহাম্মদ (সাঃ) এ অবস্থায় স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তৎক্ষনাতই সুমামামর কাছে আবেদন জানাল। মক্কা থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য এবং তিনি বললেন,

"তিনিই হলেন আল্লাহ যিনি তার শত্রুকে জীবিকা প্রদান করেন, তুমি আগে যা করতে (খাদ্য সরবরাহ) তাই কর। তবে আর একটু বেশী দিও।"

নবী (সাঃ) সুমামাকে কেবল এই আদেশ দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি নিজেও পাঁচ হাজার স্বর্নমুদ্রা পাঠালেন চরম শত্রু আবু সফিয়ানের কাছে। আর এই অর্থ যাতে করে শীঘ্রই মক্কার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু আজও আবু সুফিয়ান তার শত্রু সুলভ আচরণ পরিত্যাগ করল না। একেবারে জ্বলে পুড়ে গেল। ইতিহাসে প্রমান হয়ে রইল তার প্রতিক্রিয়া "মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের যুবকদের মাথা বিগড়ে দিতে চায়" – যাই হোক না কেন মুহাম্মদ (সাঃ)কে কোন অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

নবী (সাঃ) যখন মক্কায় কুরাইশদের সাথে বাস করত তখন তারা তার এই ইসলাম প্রচার করার জন্য যে কঠোরতা আরোপ করেছিল তা বর্ণনা করা যায় না। কেবলমাত্র তিনি একাই নির্যাতিত হয়নি বরং নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। নির্যাতিত হয়েছিল তার একান্ত সাথি নিরীহ অনুসারীরা। এমনকি তাকে ইসলামের প্রচারের জন্য যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছিল তারাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই সকল মুসলিম অনুসারী তিন তিনটি বছর ধরে সামাজিক বয়কট অবস্থাতে কাটিয়েছে। এই সময় কি অমানবিক অত্যাচার না তাদের সহ্য করতে হয়েছিল। তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরকম অমানবিক আচরণের পরিবর্তেও নবী (সাঃ) এই মক্কাবাসীদের যাতে ক্ষুধায় থাকতে না হয় তার সব রকম ব্যবস্থা করেছেন, এটা কম উদারতার পরিচয় নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বেনজির ঘটনা।

সব কিছুই আল্লাহর মহান ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়। দিন যত গড়িয়ে যেতে লাগল মুসলমানদের অবস্থা ততই উন্নত হতে লাগল। এখন মক্কাবাসীরা মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার অনুসারীদের প্রতি অনেকটাই নরম মনোভাবাপন্ন হল। তারা এখন মদিনাকে নিজেদের ভাইয়ের দেশ বলে ভাবতে শিখল। আর এটার একটা সামগ্রিক প্রভাব মক্কাবাসীদের মধ্যে দেখা দিল। তারা প্রকাশ্যে মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের গুনগান গাইল না বটে কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এই ভাবেই ইতিহাসের গতি ফিরে যায়।

নীতি ও নীতিবিজ্ঞান

যে গ্রন্থ মানুষের সঠিক চলার পথ বাতলে দেয় তাই হল নীতি বিজ্ঞান। আর নীতিবিজ্ঞানে মানুষের নৈতিকতা কি করে বিকশিত হয় তাই আলোচনা করা হয়ে থাকে। তাই এটা কোন অবাক হওয়ার বিষয় নয় যে কুরআন আমাদের নীতিবিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। কারণ কুরআনের ছত্রে ছত্রে রয়েছে মানুষের ভালমন্দ পথের নির্দেশিকা। কোন পথে চললে মানুষ ভাল পথ পাবে, কোন পথে চললে মানুষ বিপথে যাবে তার বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে কুরআনের পাতায় পাতায়। যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে সারা বিশ্ব জুড়ে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অফুরন্ত করুণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এগুলো সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক নৈতিক উদ্দেশ্য।

পরচর্চা

পরচর্চা সম্বন্ধে কুরআন আমাদের সাবধান করে বলেছে,

> "হে ঈমানদার লোকেরা, খুব বেশী ধারণা পোষন থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করনা আর তোমাদের কেউ যেন 'গীবত' বা কুৎসা না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন আছ কি যে তার মৃত ভায়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে। তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষন করে থাকে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান।"
> (কুরআন ৪৯ ঃ ১২)

নবী (সাঃ)ও এ বিষয়ে বলেছেন,

> *"যদি কেউ আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে সে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রনে রাখবে এবং চরিত্রকে কলুষ মুক্ত রাখবে, মানুষকে খারাপ কথা বলবে না, অথবা নিন্দা বা পরচর্চা করবে না এবং ব্যাভিচার বা ঐ ধরনের পাপ করবে না আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দান করছি।"*

অহেতুক সন্দেহ পোষণ

আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাই আমাদের সতর্ক করে বলেন,

> *"সন্দেহ প্রবণতা থেকে সাবধান থেকো, কারণ সন্দেহ প্রবণতা ভুল তথ্য থেকে আসে। একে অপরের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখো না, কোন মানুষের গোপন ব্যাপার প্রকাশ করার চেষ্টা কর না"*

মিথ্যা কথা বলা

আল কুরআন মিথ্যার মূলতপাটনের জন্য তাই ঘোষনা করেছে, *"মূর্তির কদর্যতা থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বার্তা পরিহার কর।"*(কুরআন ২২ ঃ ৩০)

> "......তার উপর অভিশাপ বর্ষন হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়।" (কুরআন ২৪ ঃ ৭)

নবী (সাঃ) বলেছেন,

> *"এটা সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা যে তুমি তোমার ভাইকে (বোনকে) মিথ্যা কথা বলবে। আর সে তোমাকে সত্যবাদী বলে জানবে অথচ তুমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী।"*

নবী (সাঃ) মিথ্যার সূক্ষতা প্রসঙ্গে বলেছেন,

> *"তার প্রতি ঘৃনা ! যে কেবল তার ভাইকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে, তার প্রতি ঘৃনা।"*

ধারণা অনুমান পাপ

ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না, কিন্তু এই ধরনের রোগে আমরা সবাই কম-বেশী আক্রান্ত। কোন কারণ ব্যাতিত আমরা অন্যান্যদের প্রতি বেশী বেশী ধারণা পোষন করে থাকি। এটা আমাদের বর্জন করা দরকার। কিছু কিছু ধারনা আমাদের জন্য পাপের কারণ হয়ে থাকে। একজন বিচক্ষন ব্যক্তির কোন সময়েই শোনা কথায় ভর করে চলা ঠিক নয়। কোন ঘটনার সঠিক তথ্য জানার জন্য সঠিক চেষ্টা চালান দরকার। কারণ শোনা কথা, কতকটা মিথ্যা, এমনকি পুরোটাই মিথ্যা হতে পারে, বিশ্বাসীরা তাই সব সময়ে কোন ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখবে।

এ তাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আল্লাহ কুরআন পাকে তাই ঘোষনা করে বলেছেন,

> *"হে বিশ্বাসী লোকেরা! খুব বেশী করে ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক, কেন না কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে।" (কুরআন ৪৯ ঃ ১২)*
>
> "হে বিশ্বাসীগণ কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে।" (কুরআন ৪৯ ঃ ৬)
>
> "তোমরা কি দেখনা যে আল্লাহ্ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়েবাকে কোন জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন? তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলি আকাশ পর্যন্ত পৌঁচেছে। প্রতি মূহুর্তে তার প্রভুর নির্দেশে নিজের ফলদান করছে। এই ধরনের উদাহরণ আল্লাহ এই জন্য দিচ্ছেন যাতে করে লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।" (কুরআন ১৪ ঃ ২৪-২৫)
>
> "আর খারাপ কথার উদাহরণ হল একটি খারাপ জাতের গাছের মতো যা মাটির উপর থেকে সহজে উপড়ে ফেলা যায়। তার কোন দৃঢ়তা নেই।" (কুরআন ১৪ ঃ ২৬)

কুরআন আরো বলেছে,

> "হে ঈমানদার নরনারী, না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তির বিদ্রুপ করবে, হতে পারে সে তাদের তুলনায় ভাল হবে, আর না স্ত্রী লোকেরা অন্যান্য স্ত্রী লোকেদের ঠাট্টা করবে। হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ করবে না এবং তোমরা একজন অপরজনকে খারাপ উপমা সহ ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরকম আচার আচরণ হতে বিরত না থাকবে তারাই যালেম।" (কুরআন ৪৯ ঃ ১১)

বিনোদন ও অবকাশ যাপন

ইসলাম বিনোদন ও অবকাশ যাপনকে স্বীকৃতি দেয়। কারণ বিনোদন ও অবকাশ না থাকলে জীবন খুবই এক ঘেয়েমী হয়ে যায়। নতুন করে কাজে মন বসে না। উদ্যম ফিরে পাওয়া যায় না কোন কাজে। বিনোদনের অনুপস্থিতে তাই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। তাই মানুষ একটু বিনোদন খোঁজে।

নবী (সাঃ) তাই তার সাহাবীদের নিষ্কলুষ বিনোদনের স্বীকৃতি দিয়েছেন। জীবনে বৈচিত্র আনার জন্য সীমাবদ্ধ বিনোদন ইসলামে বৈধ, নবী (সাঃ) নিজেই কখনও একলা বা কখনও সাথিদের নিয়ে ঘন বাগানে প্রবেশ করতেন ও গাছের ছায়ায় বসতেন, তিনি সাথিদের সাথে এই সময় বিভিন্ন কথাবার্তায় সময় কাটাতেন। এই রকম একসময়ে তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী আবুবকর রাঃ। এমন সময় অঝোরে বৃষ্টি নামল। তিনি বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গেলেন।

অনেক সময় নবী (সাঃ) নিজেই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। অংশ নিতেন তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগীতায়ও। মাঝে মাঝে তিনি কুস্তিগীরদের সাথে কুস্তিও করতেন। আর অন্যান্যদের সাথে উচ্চস্বরে তিনি হেসেও ফেলতেন এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখে। আনন্দ ও উৎসবের দিনগুলিতে তিনি দফ বাজানো পছন্দ করতেন, এক ঈদে দু'জন ছোট বালিকা আয়েশা (রাঃ)-র পাশে বসেছিল এবং তারা গান গাইছিল। এই সময় আবুবকর রাঃ তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। কিন্তু নবী (সাঃ) তাদের পুনরায় গাইতে বললেন। তারা আগের মতো গান গেয়ে চলল। তিনি বিয়ের প্রাকলগ্নে ঢোল বাজানোর ও অনুমতী দান করেছেন। একদিন আয়েশা (রাঃ)-র পাশে বসেছিল এক আনসারী বালিকা। তারই বিয়ে অনুষ্ঠান ছিল এটা। এই উপলক্ষে দুটি মেয়ে গান গাইছিল তাকে ঘিরে। নবী (সাঃ) তাদের গান গাওয়াকে অনুমোদন দিলেন এবং বললেন "আনসাররা সঙ্গীত প্রিয় তাই কনের সাথে গায়িকা বালিকা দরকার"।

এরকম এক আনন্দ অনুষ্ঠানে কিছু বালিকা গান গাইছিল। এমন সময় একজন এসে তাদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন সাহাবা তাকে বললেন, "যদি তুমি এ গান উপভোগ করতে চাও তাহলে বসে পড়, নচেৎ চলে যাও, আমরা নবী (সাঃ)কে এরকম অনুমতি দিতে দেখেছি"।

এক ঈদ অনুষ্ঠানে নবী (সাঃ)-এর বাড়ির উঠানেই আবিসিনিয়ার কিছু খেলোয়াড় তাদের সুদক্ষ খেলা দেখছিল। এমন সময় নবী (সাঃ) তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন, এই সময় আয়েশা (রাঃ), নবী (সাঃ)-এর ঘাড়ের ফাঁকে থেকে উঁকি মেরে অবিসিনীয়দের খেলা দেখছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করে বলেছেন যে, একদিন রসূল (সাঃ)-এর সাথে তার দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তখন তিনি জিতে গিয়েছিলেন এবং রসূল (সাঃ) হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মোটা হয়ে গিয়েছিলেন তখন দৌড় প্রতিযোগীতায় হেরে গিয়েছিলেন।

১৪

উমরা

অনির্দিষ্ট সময়ে তীর্থযাত্রা

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। মুসলমানেরা অধীর আগ্রহ নিয়ে বসেছিল এর অপেক্ষায়। গত বছরেই তারা মদিনা থেকে মক্কা দর্শনে পথে বেরিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য, পথ থেকে তাদের ঘুরে আসতে হয়েছিল। পথিমধ্যেই তারা তাদের পশুগুলোকে কুরবানী দিয়েছিলেন এবং সেখানেই তারা মাথা মুন্ডন করে ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। মক্কার কুরাইশরা তখন তাদের মক্কার কাবা দর্শন করতে বাধা দিয়েছিল কিন্তু তারা চুক্তি করেছিল এ বছর মক্কা দর্শনের অধিকার থাকবে মুসলমানদের। তাই মহানন্দে এবছর দু'হাজার মুসলিম রসূলের সাথে উমরা পালনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মুসলিম সাথীদের মধ্যে একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্যাক্তি ছিলেন। কিন্তু ছিলেন খুবই বিনয়ী। তাকে 'আবু-হুরাইরা'- বিড়ালদের পিতা নামে ডাকা হত। কারণ তিনি বিড়ালদের বড়ই ভালবাসতেন। পরবর্তী কালে তিনি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছিলেন।

মুসলিম তীর্থ যাত্রিরা মক্কায় পৌঁছে গেলেন ও নির্দিষ্ট একস্থানে থামলেন। কারণ এখানেই তারা কুরাইশদের অনুমতি নেওয়ার জন্য থেমেছিলেন। পরে তাদের অনুমতি পাওয়ার পর আর কোনো বাধা রইল না। মুসলিমরা ইহরাম পরিধান করলেন। তারপর তারা মক্কায় প্রবেশ করলেন। এই সময় কুরাইশরা আশেপাশে পাহাড় থেকে তাদের দেখছিল। মুসলিমরা সন্ধির শর্তানুসারে সঙ্গে কোন ভারি অস্ত্র নিয়ে আসেননি। নবী (সাঃ) কা'বা শরীফ সাতবার চক্কর দিলেন। তারপর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়ালেন। এরপর কুরবানীর কাজ সমাধা হল। এইভাবে নবী (সাঃ) যখন উমরার কাজ সমাপ্ত করলেন তখন নবী (সাঃ)-এর সমস্ত সাথিরাও নবী (সাঃ)কে অনুসরণ করে উমরা পালন করলেন। নবী (সাঃ) কাবায় প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কুরাইশরা বাধা দিলেন। কারণ সন্ধিপত্রে কাবা শরীফের ভেতরে প্রবেশের

কোন কথা উল্লেখ ছিল না। মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সাথে কোন প্রকার বিতর্কে গেলেন না। যে কয়দিন তিনি সেখানে ছিলেন তিনি কা'বা চত্বরেই ছিলেন। কাবা চত্বরেই দাঁড়িয়ে বিলাল তার মধুর স্বরে মুসলমানদের পাঁচবার নামাজের জন্য আযান দিয়ে আহ্বান করতে লাগলেন। পাহাড়ের আশেপাশে যে সকল কুরাইশরা এ দৃশ্য দেখছিল তারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন তারা ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল তখন তারা এর সাক্ষী দিয়েছিলেন। মুসলমানদের আচার আচরণ ও দৈনিক নামাজের অভ্যাস তাদের মনে ইসলাম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিল।

আলোর ছোঁয়ায় দীপ্ত হল হৃদয়

সবে মাত্র নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথিরা মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় ফিরে গিয়েছেন। কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি যিনি উহুদ যুদ্ধে বীর সেনা ছিলেন সেই খলিদই উঠে দাঁড়ালেন তারপর বলে চললেন,

> "যাদের এতটুকু জ্ঞান বিবেক বা বুদ্ধি বলে কিছু আছে তাদের কাছে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মুহাম্মদ (সাঃ) কবিও নয় আর যাদুকরও নয় এবং তিনি যা কিছু বলেন তা বিশ্বপ্রতিপালকের কথা। সুতরাং প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত তাকে অনুসরণ করা।"

এই কথা শুনে তার একান্ত যুদ্ধ সাথি ইকরামা বললেন, "তুমি একটি শিশুতে পরিণত হয়ে গেছ"। একথা শুনে খালিদ উত্তর করলেন, "আমি শিশু হলেও মুসলমান হয়েছি"। এ কথা শুনে ইকরামা চমকে উঠলেন, তিনি বলে ফেললেন,

> "তা কেমন করে হয়? কারণ, মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার পিতাকে আঘাত করেছিলেন ও চাচা ও ভাইকে হত্যা করেছিলেন বদরের যুদ্ধ। তাই তুমি মুসলমান হতে পারনা আর কুরাইশদের উচিত হবে মুহাম্মদ (সাঃ)কে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়া।"

কিন্তু খালিদ এ কথার গুরুত্ব দিলেন না। তিনি এগুলো অজ্ঞ যুগের কাজ কারবার বলে উড়িয়ে দিলেন। তারপর আবুসুফিয়ান ও তাদের কথায় যোগ দিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে খালিদ ইসলাম গ্রহন করেছে তখন তার আর ধৈর্য্য ধরে বসে থাকার মত শক্তি থাকল না। তিনি খালিদ কে জিজ্ঞাসা করলেন 'যা শুনেছি তা কি সত্য'? খালিদ নির্ভিকভাবে উত্তর দিলেন, "অবশ্যই ! তিনি ইসলাম গ্রহন করেছেন"। প্রত্যুত্তরে আবু সুফিয়ান বললেন,

> “শপথ আল লাত ও আল উজজার, মুহম্মদ (সাঃ) যা বলছে ওগুলো যদি সত্য হত তাহলে আমি তোমার পূর্বেই মুসলমান হতাম।”

আবু সুফিয়ানের কথা শুনে খালিদ দৃঢ়তার সাথে বললেন, “সত্য সত্যই !”, এতে আবু সুফিয়ানের ধৈর্য্য আর থাকল না, খালিদকে হত্যা করতে উদ্যত হল সে। ইকরামা তাকে প্রতিহত করে বলে ফেললেন,

“আপনি কি খালিদকে তার ওই মতামতের জন্য হত্যা করে ফেলবেন? অন্যান্য সকল কুরাইশরা তো আমার মতই মত পোষণ করছে, আপনি যদি এ রকম করেন তাহলে সকল কুরাইশ মদিনায় চলে যাবে।”

তার পর খালিদ নিজেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে চাইলেন। আর দেরি করলেন না মদিনার পথে পাড়ি দিলেন।

মদিনায় ফিরে নবী (সাঃ) দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত। একদিন খবর পেলেন তিন জন ব্যক্তি যাদের সাথে ফেরার পথে সাক্ষাত হয়েছিল মদিনায় আসছেন। নবী (সাঃ) এ প্রত্যাশা কোন দিন করেননি। এই তিনজন হলেন তালাহা পুত্র উসমান, ওয়ালিদ পুত্র খালিদ ও আল আসের পুত্র আমর। এরা সবাই আসছিল নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তারাই তো দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নবী (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আজ আসছে নবী (সাঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নেবার জন্য। নবী (সাঃ) এ সংবাদ পেয়ে খুবই খুশি হলেন। কারণ তিনি জানতেন এই তিনজনের অসাধারণ ব্যাক্তিত্বের কথা। তারা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নবী (সাঃ)-এর বিরোধিতা করে চলেছিল আজ তাদের হৃদয় ইসলামের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সমগ্র মদিনার মুসলমানেরা এরকম চরম তিন শত্রুর ইসলাম গ্রহনের কথা শুনে অবাক যেমন হলেন তেমনি আনন্দিতও হলেন। এখন ইসলামি শক্তি সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত হল মদিনার মাটিতে।

সিরিয়া অভিযান

মক্কা থেকে উমরা সেরে ফিরে আসার পর কয়েকমাস কেটে গেল। নবী (সাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন সিবিয়ায় দূত প্রেরণের। তিনি চুপ করে না থেকে সিবিয়ায় পনেরজন দূত পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাথে যে মিত্রতা ছিল তা দৃঢ় করা এবং সিরিয়ার বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য পনেরজন দূতের চৌদ্দজন নিহত হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। একই সময়ে বুসরায়ও দূত পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তারা পথে বাধাপ্রাপ্ত হল এবং গাসসান জাতির নেতা দ্বারা তারাও নিহত হলেন পথিমধ্যে।

দূতদের এভাবে হত্যা করার দ্বারা এটা স্পষ্ট হল যে তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। এটা অবশ্য জঘন্য অন্যায়ই ছিল। দূতদের এভাবে কাপুরুষের মত হত্যা করাতে নবী (সাঃ) খুব দুঃখ পেলেন। পরক্ষণেই তিনি তিন হাজার সৈন্যর এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। সিরিয়ার হারিসের পুত্র ফায়েদকে তিনি এদের নেতা করে দিলেন। আর এই নির্দেশ দিলেন যে যায়েদের পর যুদ্ধের ভার নেবে সদ্য আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসা যাফর। আর যদি যাফর মারা যায় তাহলে যুদ্ধ পরিচালনার ভার নেবে রাওয়া পুত্র আবদুল্লাহ।

নবী (সাঃ) এর জীবনে যে সকল যুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে সিরিয়ার যুদ্ধ সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ন ও ভয়ংকর। বিরাট খ্রীষ্টান অধ্যুসিত এলাকা এই যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হয়। সিরিয়া সীমান্তের মুতা নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এটা ছিল ফিলিস্তিনের কাছাকাছি একটি জায়গা।

মুসলিম বাহিনী এগিয়ে গেল সামনের দিকে এবং সিরিয়ার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছাল। এখানে এসে তারা খবর পেল আরবের বেশীর ভাগ গোত্র এতে অংশ গ্রহন করেছে। আর এতে তারা সমর্থন পেয়ে গেছে বাইজানটাইনের সামরিক সাহায্য। আর এর ফলে শত্রুদের শক্তি আরোও শতগুন বৃদ্ধি পেল। কেবলমাত্র তিনহাজার মুসলিম সৈন্য কোনরকম সুযোগই পেলনা। একসময় মুসলিম দল নেতা মুতা নামক স্থানে পৌঁছাল। ভৌগলিক দিক থেকে এটা মুসলিমদের খুব সহায়ক মনে হল। তাই যায়েদ রা: এখানে সৈন্য শিবির খাটাতে বললেন। এখান থেকে এক হঠাৎ আক্রমনের পরিকল্পনা নেওয়া হল যাতে করে শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া যায়। এতে করে শত্রুরা সত্যিই হকচকিয়ে গেল। কিন্তু সম্পূর্নভাবে এটা মুসলমানদের অনুকূল হল না কারণ তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। যায়েদ নিহত হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তারপর জাফর নেতৃত্ব দিলেন মুসলিম বাহিনীর। কিন্তু তিনিও নিহত হলেন। তারপর যুদ্ধ-ভার পড়ল আবদুল্লাহর উপর। এই সময় মুসলিম সৈন্য খুবই এলোমেলো হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা খালিদ বিন অলিদও। তিনি তার বুদ্ধি বলে একত্রিত করতে সমর্থ হলেন সমস্ত ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের এবং তার নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা একত্রিত হল। মুসলিমরা পুনরায় তাদের মধ্যে ঐক্য ফিরে পাওয়াতে আসন্ন বিপদ হতে তারা রক্ষা পেল। তাদের মধ্যে মাত্র আটজন প্রাণ হারালেন কিন্তু আর সকলে রেহাই পেল ভালভাবে। খালিদ রা: কৌশলে যুদ্ধ এড়াতে পারলেন, তা না-হলে অনেক প্রাণ যেত তখন।

প্রিয়জনদের জন্য শোকাশ্রু

নবী (সাঃ)-এর সাথে যে সকল সাহাবী অনবরত সময় কাটাতেন। তারা নবী (সাঃ)-এর কাছে অনেত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তারা জানতেন কোন কাজের জন্য নবী (সাঃ) ভিতর থেকে একধরনের প্রেরণা পেতেন। এই অদ্ভূত জিনিসকে তারা এত বেশী করে পর্যবেক্ষণ করত যে এতে তারা অভ্যস্ত হয়েগিয়েছিলেন। তাই নবী (সাঃ)-এর প্রতি যে অহী আসত সঙ্গে সঙ্গে তারা তার অনুসরণ করত।

একদিন নবী (সাঃ) তাদের কাছে এলেন এবং যুদ্ধের ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করেছিলেন যেন তিনি বর্তমানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই তা বলছেন। অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কোন দূতও তার কাছে আসেনি এবং সেখান থেকে কোনওভাবে কোন তথ্যও আনা সম্ভব ছিল না নবী (সাঃ)-এর কাছে। অশ্রুতে তিনি ভেসে যাচ্ছিলেন। একে একে তিনি যায়েদ, যাফর ও আবদুল্লাহর মৃত্যু সংবাদ জানালেন সাহাবাদের। অবশেষে তিনি জানালেন বিজয়ী খালিদ বিন অলিদের কথা। তিনি তাকে সাইফ-উল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করলেন। কিন্তু তিনি চেপে রাখতে পারলেন না সেই সব মুসলিমদের নিহত হওয়ার ঘটনাকে যারা তার অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। এরপর নবী (সাঃ) যাফরের স্ত্রী সন্তানের কাছে গেলেন এবং তাকে মৃত্যু সংবাদ জানানোর আগেই কেঁদে ফেললেন। যাফরের স্ত্রীও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি তাদের স্বান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

তারপর তিনি গেলেন যায়েদের স্ত্রী উম্মে আয়মানের কাছে। যায়েদের মৃত্যু সংবাদ তাকে জানানোর সাথে সাথে তিনি ডুকরে কেঁদে ফেললেন। যায়েদকে তিনি পুত্র বাৎসল্য দিয়ে মানুষ করেছিলেন। তিনি তাকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি ভাল বাসতেন তার স্ত্রী সন্তানকেও। যায়েদের গৃহ ত্যাগ করার মুহূর্তে যায়েদের সব চেয়ে ছোট কন্যা নবী (সাঃ)-এর বাহুর উপরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নবী (সাঃ) ও শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুস্রোত।

সাদ নামে এক সাহাবী যায়েদের গৃহের পাশ থেকে অতিক্রম করছিলেন। তিনি এ অবস্থা দেখে কিছুই বুঝতে পারেননি। বিশেষত নবী (সাঃ)-এর চোখে অশ্রুধারা, বিরাট কোন কিছু ঘটে যাওয়ারই সম্ভাবনা তাই তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন, নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন "একজন তার প্রিয়জনের জন্য ফুঁপিয়ে কাঁদছেন" এর দ্বারা নবী (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের এটাই শিক্ষা দিলেন যে কেউ এ পৃথিবী থেকে চলে গেলে তার জন্য কাঁদতে হবে। সে যদি তার জন্য কাঁদতেই না পারল তাহলে তার হৃদয়ে সত্যিই ভালবাসা বলে কিছু নেই। তিনি আরও শিক্ষা দিলেন যে প্রিয়জনের জন্য অশ্রু বিসর্জন অতি মর্যাদার। মানুষের দুঃখে কষ্টে একটি পবিত্র আত্মা চুপ করে থাকতে পারে না। তারও সমভাবে ব্যাথিত হওয়া দরকার।

এই সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে ফিরে এলেন মদিনায়। নবী (সাঃ) যা যা বলেছিলেন তা একেবারে বাস্তব বর্ণনার সাথে মিলে গেল। তিনি জানালেন তিন বিখ্যাত সাহাবা কেমনভাবে যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। নবী (সাঃ) এর এই আগাম সংবাদ প্রদানকে সাহাবীরা তাঁর নবী হওয়ার অতিরিক্ত চিহ্ন বলে ভাবলেন। নবী না হলে এরকম ঘটনা পূর্ব থেকে কিছুতেই জানানো সম্ভব হত না – সবাইয়ের কাছে এ সত্য আলোচিত হতে রইল। তিনি ছিলেন অসাধারণ, তার বুদ্ধি চেতনা সম্পূর্নভাবে অন্যান্যদের থেকে অনন্য। কিন্তু তবুও তিনি রক্ত মাংসের মানুষ। আমাদের মত তিনি সঙ্গী সাথির ব্যাথায় ব্যাথিত হতেন। তাদের জন্য তার বুকেও অনুভূত হত মায়া ভালবাসা। তাই তিনিও কেঁদে ফেলতেন আমাদেরই মতন।

উত্তরের এই অবস্থা পরিস্থিতিকে জটিল করল। আরব গোত্রগুলো ভাবল মুসলিমরা এই মুতা পরাজয়কে কাজে লাগাতে পারলেও লাগাতে পারে। আর এটা তাদের জন্য পরে অনেক সুবিধারই হবে। নবী (সাঃ)-এর কাছে বিশ্বস্ত খবর পৌছাল যে কিছু কিছু গোত্র একত্রিত হয়ে মদিনা আক্রমনের প্রস্তুতিই নিচ্ছে। নবী (সাঃ) এই পরিস্থিতিতে চুপ না থেকে আমরের নেতৃত্বে শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মুসলিম বাহিনী সিরিয়া রাজ্যে অগ্রসর হতে সক্ষম হল। যখন তিনি যুদহাম প্রদেশের সালাসাল নামক স্থানে পৌঁছালেন তাঁর মনে কিছুটা ভয়ের উদ্রেক হল। কারণ তার সেনা বাহিনী ছিল খুবই ক্ষুদ্র। নবী (সাঃ)-এর কাছে আমরের এই ভয় পাওয়ার কথাটি পৌঁছালে নবী (সাঃ) তখনই আবু উবাইদা বিন জারার নেতৃত্বে সহকারী হিসাবে এক দল সৈন্য আমরের কাছে পাঠালেন। এদের সঙ্গে হজরত আবুবকর রা: ও উমার রা:ও ছিলেন। নবী (সাঃ) আবু উবাইদাহকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমরের সাথে কোন রকম মতান্তর না ঘটান। আবু উবাইদাহ যখন আমরের কাছে পৌঁছালেন তখন সার্বিকভাবে তার নির্দেশ মেনে চললেন নবী (সাঃ)-এর আজ্ঞানুসারে। পরে মুসলিমরা সাফল্য নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরে এলেন।

ভেঙ্গে গেল হুদায়বিয়ার সন্ধিশর্ত

মুতা অভিযানের কথা গোপন না থাকার কারণে ক্ষতি হয়েছিল বেশ। সেজন্য নবী (সাঃ) তার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতেন। কিন্তু এই গোপনীয়তা প্রকাশ পাওয়ার জন্য রোমানরা খুব সুবিধা ভোগ করেছিল। এর ফলে দক্ষিণ আরবে বসবাসকারী গোত্রগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হল এবং স্বাভাবিকভাবে কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিশর্ত ভেঙ্গে ফেলল।

বনু-খুজাইজা গোত্র ছিল নবী (সাঃ)-এর মিত্র শক্তি। কুরাইশরা বনু বকর গোত্রকে উস্কানি দিতে লাগল যাতে করে তারা বনু খুজাইজা গোত্রকে আক্রমন করে।

কুরাইশদের এ চালে পা দিয়ে বনু বকর গোত্রও বনু খুজাইজা গোত্রকে আক্রমন করার সব প্রস্তুতি নিল। একদিন রাতে অতর্কিতভাবে বনু বকর গোত্র খুজাইজা গোত্রকে আক্রমন করে বসল। বনু খুজাইজা গোত্রের লোকেরা তখন ঘুমন্ত অবস্থাতে ছিল তাই তারা এই আক্রমন প্রতিহতও করতে পারেননি। তাদের অনেকেই নিহত হল, তাদের ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে পালাল বনু বকরের লোকেরা। বনু খুজাইজার লোকেরা কোন রকমে মক্কায় আশ্রয় নিয়ে কুরাইশদের নিকটে এর প্রতিকার চেয়ে নালিশ জানাল। কিন্তু কুরাইশরা কোন প্রকার ব্যবস্থা নিল না বরং ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল। তাই বাধ্য হয়ে আমর বিন সালিম চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে মদিনায় নবী (সাঃ)-এর কাছে এর একটা সুব্যবস্থার অনুরোধ নিয়ে হাজির হলেন। তারা নবী (সাঃ)কে বললেন,

> "হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মদের (সাঃ)-র কাছে এসেছি। আমাদের ভালবাসা ও প্রতিজ্ঞা পত্রের শর্তগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে, হে আল্লাহর নবী আমরা আপনার সাহায্য কামনা করি, আপনি আল্লাহর দাসদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করুন।"

নবী (সাঃ) তার এ কথা শুনে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। নবী (সাঃ) মক্কায় লোক পাঠালেন কুরাইশদের কয়েকটি কথা জ্ঞাত করানোর জন্য। তিনি তাদের জানালেন যে সকল লোকদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর বনুবকর গোত্রকে কোনওভাবে সাহায্য করা চলবে না। আর সন্ধি স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছে তা আর মানা চলবে না।

কুরাইশরা ছিলেন ধূর্ত। তারা সন্ধি মেনে কাজ করছিল না কিন্তু তবুও তারা সন্ধির শর্ত বজায় থাকবে দাবি জানাল। এই পরিস্থিতিতে তারা উত্তেজনা সামাল দেওয়ার জন্য স্বয়ং আবুসুফিয়ানকে মদিনায় নবী (সাঃ)-এর সাথে আলোচনার জন্য পাঠালেন। তিনি ছিলেন অতি চালাক ব্যক্তি। এ কাজে সফল হওয়ার জন্য তিনি প্রথমে নিজ কন্যা ও নবী (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার সাথে সাক্ষাত করলেন, কিন্তু উম্মে হাবিবা তাকে কোন রকম পাত্তা না দেওয়াতে তিনি ক্ষোভে বলে ফেললেন এভাবে পিতার সাথে ব্যবহার করা ঠিক নয়। কিন্তু তাতেও তিনি নরম হলেন না, বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ান একে একে আবুবকর রাঃ ও উমার রাঃ-র কাছে গেলেন। কিন্তু কেউই তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। অবশেষে আলি রাঃ-র কাছে গেলেন তিনি তাকে পরামর্শে উপদেশ দিলেন এ ব্যাপারটা নিয়ে মসজিদে উত্থাপন করার জন্য। তিনি আলির কথামত মসজিদে একটি সাধারণ ঘোষনা দিয়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি শর্ত বজায় রাখার অনুরোধ জানালেন এবং মক্কায় ফিরে গেলেন। মক্কার কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের এ রকম কথা শুনে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকটা নীচ ধারনা করল। পূর্বের চেয়ে তার সম্মান অনেকটা নিচে নেমে গেল তাদের চোখে। আবু সুফিয়ানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল সম্পূর্নভাবে।

মক্কা বিজয়

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলে, নবী (সাঃ) তাঁর সমস্ত সাহাবাদের পরামর্শ দিলেন যুদ্ধ অভিযানের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি গোপন রাখলেন কোথায় অভিযান চালানো হবে সে সম্বন্ধে। কিভাবে এ অভিযান চালানো হবে তাও কেউ অনুভব করতে পারলেন না। নবী (সাঃ)-এর এই গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার জন্য সিরিয়া অভিযানে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মুসলমানদের। এ বারে যাতে করে একই ভুল না হয় সে জন্য নবী (সাঃ) সতর্ক রইলেন। তাই সবাই এই অভিযানের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে ধোঁয়াশায় রইলেন, কেউ ভাবলেন সিরিয়ায় এই অভিযান হবে, কেউ ভাবলেন হাওয়াজিনে এই অভিযান হবে, আবার কেউ কেউ ভাবল এই অভিযান রোমের দিকেই হবে। যাই হোক সারা আরব উপদ্বীপে এই প্রশ্ন সকলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

অভিযানের এত বড় ব্যবস্থাপনা চলছিল কিন্তু কেউ জানত না কোথায় যাওয়া হবে সবাই একত্রিত হলেন মার-আয - যাহারাম নামক স্থানে। এটা ছিল পবিত্র রমজান মাস। সবাই রোযা রেখেছিলেন কিন্তু এখানে তিনি সাথিদের রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বললেন যাতে করে শক্তির সঞ্চয় হয়। মার-আয-যাহারাম স্থানটি ছিল নযদ, তায়েফ ও মক্কা যাওয়ার সংযোগস্থলে। সবাই যখন একত্রিত হল এখানে তিনি সমস্ত সৈন্যকে এক সাথে আলো জ্বালাতে বললেন, এতে দশ হাজার সাহাবী যখন এক সাথে আলো জ্বালালো তখন চার দিকের পরিবেশ এত আলোকিত হল যে দিগন্তে আর অন্ধকার রইল না। নবী (সাঃ)-এর দ্বারা শত্রুদের মনের উপর আতঙ্ক সৃষ্টি করাল যে, বিশাল বাহিনী মক্কা অভিযানে অগ্রসর হচ্ছে। হজরতের চাচা যিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসছিলেন তিনি শুনলেন নবী (সাঃ) মক্কা অভিযানে মার-আয-যাহারাম নামক স্থানে অপেক্ষা করছেন, তখন তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যোগ দিলেন, এ খবর পৌঁছাল কুরাইশদের কাছে। এতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। আব্বাস রা:-র হৃদয়ও এক অজানা শঙ্কায় ভেঙ্গে পড়ল। তিনি লক্ষ করলেন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিশাল বাহিনী। আজ যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথিরা কুরাইশদের মত নিষ্ঠুর ভূমিকা গ্রহন করে তাহলে মক্কা তো এক বধ্যভূমি হয়ে পড়বে। নবী (সাঃ)-এর সাহাবাদের ঠেকিয়ে তারা কোন ক্রমে নিজেদের প্রান বাঁচাতে পারবে না। তিনি তো কুরাইশদের মধ্যে থেকে তাদের নিষ্ঠুর আক্রমনের সম্ভাবনা থেকে রসূল ও তার সাথিদের বাঁচানোর জন্য কতই না চেষ্টা করেছেন অতীতে। ইতিহাসের চাকা আজ উল্টো দিকে ঘুরেছে। আজ এমন পরিস্থিতি মুসলমানদের হাতে যাতে করে কুরাইশরা মার খেয়ে একেবারে শেষ হওয়ার জোগাড়। তাই তাকে রক্তস্রোত বন্ধ হওয়ার একটা ব্যবস্থা খুঁজে বের করতেই হবে। তিনি নবী (সাঃ) -এর সাথে রক্ত না ঝরিয়ে কিভাবে মক্কা বিজয় করা যায় তার পরামর্শ করলেন। আল্লাহর রসূলও আল্লাহর কাছে কাতর প্রার্থনা করলেন যাতে করে আব্বাস (সাঃ)-এর প্রচেষ্টা সফল হয়।

আবু সুফিয়ান
ভালবাসায় সম্মানিত

আব্বাস (রাঃ) শান্তি যাত্রার ব্যবস্থা নিলেন সঙ্গে নিলেন রসূল (সাঃ)-র প্রিয় ঘোড়া দুলদুলকে। তার একটাই উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের সতর্ক করা। কেন না রসূলের বিশাল বাহিনী এসেছে এ অভিযানে এখানে কিছুতেই কুরাইশদের বাধা দেওয়া উচিৎ হবে না। যদি তারা এটা করে তাহলে কেবল তাদের অসংখ্য প্রাণ নষ্ট হওয়া ছাড়া কিছুই লাভ হবে না। বরং কুরাইশদের উচিত হবে নবী (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পন করা। এদিকে প্রকৃত ঘটনা কি তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য আবু সুফিয়ানসহ কয়েকজন বের হয়েছিল ঘরের বাইরে। রসূলের ঘোড়া দুলদুলকে তাদের চিনতে ভুল হল না। আব্বাস রাঃ বললেন "আবু সুফিয়ান তোমার জন্য দুঃখ! মুহাম্মদ (সাঃ) জোর করে এখনই মক্কায় প্রবেশ করবে। দুঃখ কুরাইশদের জন্য যখন তিনি তা করবেন। শেষ পর্যন্ত তারা এই পরামর্শ করলেন যে তারা কুরাইশদের বোঝাবেন যাতে কোন প্রকার সংঘাতে না গিয়ে কুরাইশরা রসূলের কাছে আত্মসমর্পন কর। কিন্তু পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন উমার (রাঃ) তিনি ছদ্মবেশী আবু সুফিয়ান ও অন্যদের চিনতে পারলেন। তখনই উমারের (রাঃ) হাতে গ্রেফতার হলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ানের প্রান বাঁচানোর জন্য আব্বাস (রাঃ) প্রচেষ্টা চালালেন কিন্তু উমার রাঃ ছিলেন এক রোখা তিনি ছুটে গেলেন নবীর তাঁবুর দিকে শুধু অনুমতি নেওয়ার জন্য, আবু সুফিয়ানের মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে কিনা, পেছনে আব্বাস (রাঃ) ও নবী (সাঃ) -এর কাছে গেলেন এবং জানালেন যে আবু সুফিয়ান তার আশ্রয়েই রয়েছেন। সব কিছু নবী (সাঃ) শোনার পর আবু সুফিয়ান কে পরের দিন সকালে আসতে বললেন তার কাছে।

পরের দিন নবী (সাঃ)এর কাছে হাজির করা হল আবু সুফিয়ানকে । নবী (সাঃ) এর সাথে কিছু কথোপকথনের পর তিনি প্রথমত আল্লাহ এক স্বীকার করলেও মুহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহর নবী তা স্বীকার করতে চাননি। ঐতিহাসিকদের মতভেদ থাকলেও তিনি পরে মুহাম্মদ (সাঃ)কে নবী বলে মেনে নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ভয় থেকে গিয়েছিল উমারের কথায় নবী (সাঃ) তার উপর মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করেন কিনা। তাই আব্বাস (রাঃ) নবী (সাঃ)কে আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহনের সংবাদ জানালেন। এতে নবী (সাঃ) বললেন, "ঠিক আছে, আজ আবু সুফিয়ানের ঘরে যে অবস্থান করবে সে মুক্ত, যে তার নিজের ঘরে অবস্থান করবে সেও মুক্ত এবং যে মসজিদে আশ্রয় নেবে সেও মুক্ত।"

আব্বাস (রাঃ) সহ আরোও কয়েকজন চেয়েছিলেন একদম রক্তপাত যেন না হয়। আর তাই হল। বিনা রক্তপাতে মক্কাভূমি ইসলামের ছায়াতলে এল।

19

গর্বিত মহাবিজয়

মক্কা বিজয় হল জানুয়ারির ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী অষ্ট হিজরীর ১০ই রমজান। মদিনার মুসলিম সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর অন্যান্য – আরব গোত্রের আরও সাত হাজার সৈন্য মুসলিমদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মোট দশ হাজার সৈন্য বিভিন্ন ভাগে মক্কায় প্রবেশ করল । মক্কার এই বিজয়কে ‘ফাত-হুম মুবীন’ অর্থাৎ মহা বিজয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে এমন জায়গায় দাঁড় করালেন যাতে করে সহজে সমস্ত মুসলিমদের সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। তার উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ান আজ বুঝুক ইসলামের শক্তি কত মজবুত। একের পর এক গোত্রপতিরা মক্কায় প্রবেশ করছিল, আব্বাস (রাঃ) তাদের সাথে আবু সুফিয়ানের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছিলেন, এমন সময় সাদ (রাঃ) আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে যখন অতিক্রম করছিল বিগত দিনের বহু অত্যাচারের কথা স্বাদ (বাঃ) র মনে উদয় হল তিনি আবেগে চিৎকার করে বলে ফেললেন “ আজকের এটা মহা অভিযান, কাবার দখল আজ আমাদের হাতে”। নবী (সাঃ) এর কানে এ চিৎকার পৌছালে তিনি রেগে গেলেন, তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল, তিনি এ কথায় বড়ই স্পর্ষ কাতরতা অনুভব করলেন। এ ধরনের উচ্ছাসকে তিনি অনুমোদন দিলেন না। এমন কি নবী (সাঃ) তার কাছ থেকে ইসলামের পতাকা নিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। সেই সাথে ঘোষনা করলেন, “আজ হল মহান কাবার দিন। যেটা হল সততা ও উদারতার।”

কুরাইশ দলের কিছু লোক নিজেদেরকে পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে রেখে ছিল। এদের নেতৃত্বে ছিল সুহায়েল, ইকরামা এবং সাফয়ান, কিন্তু মুসলিমদের প্রথম আভিযান দেখেই তারা পরিস্কারভাবে বুঝে গেল যে এদের প্রতিরোধ করা একেবারে মুর্খামি হবে। তাই তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অপর দিকে ইকরামা ও সফওয়ান দৌড়ে পালাল সেখান থেকে।

নবী (সাঃ)-এর লোকেরা এগিয়ে চলল সামনের দিকে। তিনি কোন সংঘর্ষে গেলেন না বরং তিনি বললেন "আজ কোন যুদ্ধ নয়, আজ হল ক্ষমার দিন"।

আট বছর আগে নবী (সাঃ) এই মক্কা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন রাতের আঁধারে লুকিয়ে কিন্তু মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে। আজ তিনি ফিরে এসেছে দিনের আলোয় সবার সন্মুখ দিয়ে। আজ তিনি মহা বিজয়ী, –তার মাথা আজ সিজদায় অবনত মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। আর তিনি আবৃত্তি করে চলেছেন কুরআনের এই আয়াতগুলি,

> *"হে নবী! আমি –তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ তোমার পূর্বে ও পরের অপরাধ ক্ষমা করে দেন, এবং তোমার উপর তার নিয়ামত দান সম্পূর্ন করেন এবং তোমাকে সঠিক সরল পথ দেখান, আর তোমাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে সাহায্য দান করেন, সেই আল্লাহ মুমিনদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি নাজিল করেছেন যেন তারা ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহর কুদরতের কব্জায় রয়েছে এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও মহা-বিজ্ঞানী।" (কুরআন ৪৮ ঃ ১-৪)*

নবী (সাঃ) সবচেয়ে নমনীয় অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন মুসলিমরা যেন তাদের পূর্ব শত্রুদের সাথে একেবারে কোমল ব্যবহার করেন। এখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কয়েক রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর কাসওয়া নামক তার বিখ্যাত উটের পিঠে চড়ে কাবা চত্বরে এলেন। কাবার চারিদিকে তিনি সাত চক্কর দিলেন তারপর তিনি তার হাতের ছড়ি দিয়ে কাবা ঘরের প্রতিমা গুলি সরিয়ে দিলেন আর কুরআনের এই আয়াতের ঘোষনা দিলেন বার বার।

> *"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা দূরীভুত হয়েছে, কারণ মিথ্যা ধ্বংস হতে বাধ্য" (কুরআন ১৭ ঃ ৮১)*

নবী (সাঃ) কাবা ঘরের চাবি খুললেন তারপর সরানো হল ধর্মীয় সমস্ত প্রতীকগুলি, কারণ এখানে শুধু এক আল্লাহরই উপাসনা হওয়ার কথা ছিল। তাই এখান থেকে এক আল্লহরই ইবাদত করার ব্যাবস্থা করা হল। এই আল্লাহকে তো কেউ প্রতিনিধি করে পাঠাননি অথবা তার সাহায্যকারীও কেউ নেই।

> *বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তার অনুরূপ নয়, তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন" (কুরআন ৪২ ঃ ১১)*

নবী (সাঃ) আজ যে কাজ করলেন তা ছিল যেদিন তিনি মক্কা ছেড়ে গিয়েছিলেন তার বিপরীত। যেদিন তিনি মক্কা ছেড়ে গিয়ে ছিলেন, সেদিন কাবা ঘরটি ছিল হরেক রকম দেব-দেবী ও মূর্তি দ্বারা সজ্জিত। আর আজ তিনি তাদের সরিয়ে কাবাকে মুক্ত করলেন এক আল্লাহর উপাসনার যোগ্যস্থান হিসাবে। কয়েক শতাব্দী ধরে কাবা ঘরে স্থান করেছিল এই সকল আবর্জনা। নবী (সাঃ) সে গুলো সরিয়ে প্রকৃত মসজিদের রূপ আনলেন কাবা ঘরে, আর তার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এটি এক আল্লাহর ঘর হয়ে গেল। এখন থেকে শুধু আল্লাহরই উপাসনা হবে এই গৃহে।

কুরাইশরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। ঘর থেকে, জড় হল কাবা চত্বরে এখন নবী (সাঃ) প্রতীমাগুলো সরিয়ে তার কথা বললেন।

"এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তার কোন অংশীদার নেই। তিনি তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। তিনি তার দাসের সহযোগিতা করেছিলেন আর দমন করেছে শত্রু গোষ্টীকে। কেবল মাত্র তিনিই এটি করেছেন।"

তারপর তিনি মুখ ফেরালেন কুরাইশদের দিকে, তাদেরকে জানিয়ে দিলেন ইসলামী রীতিনীতির কথা। এবং সেই সঙ্গে পাঠ করলেন কুরআনের এই মর্মবানী,

> *"হে মানুষ! আমিই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের জাতি ও গোষ্টীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্য হতে সেই সবচেয়ে প্রিয় যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।" (কুরআন ৪৯ ঃ ১৩)*

এরপর তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন "আজ তোমরা আমার কাছ থেকে কিরকম আচরণ কামনা কর" তারা সমস্বরে বলে উঠলেন "একজন মহৎ ভাই হিসাবে! এক জন মহৎ ভাইয়ের পুত্র হিসাবে"– তিনি তাদের সাথে তাদের আকাঙ্খিত আচরণ করলেন। এই সময় তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করছিলেন যেটার প্রসঙ্গ ছিল ইউসুফ নবী ও তার ভ্রাতাদের সাথে পুনর্মিলনের বিষয় অথচ এই ভ্রাতারাই তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এসেছিল।

> *"....আজ তোমাদের কোন আপরাধ ধরবো না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক, তিনি সবচেয়ে অধিক অনুগ্রহ দানকারী।"*
> *(কুরআন ১২ ঃ ৯২)*

তারপর তার মুখে মহাবানী উচ্চারিত হল "যাও! তোমরা আজ মুক্ত।" তিনি সেখানে সকল উপস্থিত নরনারীকে তাঁর দয়ার ছায়ায় স্থান দিলেন।

ক্ষমার দিন

নবী (সাঃ) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন কিন্তু কোন বিজয়োল্লাস করলেন না। বাজল না কোন বাদ্য, ফুটল না কোন পটকা বাজী, রং ছড়ালো না ধূলোয়। তার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে সবাই মাথা নত করল কৃতজ্ঞতায়। সাধারণভাবে এটাই বলে দেওয়া হয়ে ছিল যে "সবাই মাথা নত করে প্রবেশ কর"

নবী (সাঃ) প্রিয় সাহাবী বিলাল (রা:)কে কা'বার ছাদে উঠতে বললেন। বিলাল (রাঃ) কা'বার ছাদে উঠলেন। নবী (সাঃ) তাকে নামাযের জন্য আযান দিতে বললেন, বিলাল সুললীত কণ্ঠে আযান হাঁকলেন। আকাশ বাতাস মুখরিত হল আল্লাহর এই তৌহিদী আহ্বাণে, নবী (সাঃ) নামাযে ইমামতি করলেন। তার পর নামায শেষে তিনি মক্কা বাসীদের বিগত কুড়ি বছর ধরে তারা যে অত্যাচার মুসলমানদের উপর চালিয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দিলেন, এবং জানতে চাইলেন এর পরেও তারা তার কাছে কি প্রত্যাশা করে। তিনি কি তাদের কে তার অস্ত্রের তলায় রাখবেন, না তিনি তাদের দাস দাসী বানিয়ে নেবেন, অথবা তিনি তাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেবেন? যা খুশি তিনি তা করার সামর্থ রাখেন। কিন্তু করুণার নবী, আল্লাহর শেষ নবী কোনটাই করলেন না বরং তিনি মুখ দিয়ে উচ্চারন করলেন।

"আজকে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কোন প্রতিশোধ আমি নেবনা, আজ তোমরা সকলে মুক্ত।"

নবীর এ উদারতার প্রশংসা তার চরম শত্রুও করেছে। যাঁরা তাকে উপহাস করেছিল, নির্যাতিত করেছিল চরম ভাবে। এমন কি তারা তাকে বিতাড়িত করেছিল নিজের বাড়ি থেকে পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছিল নির্মম ভাবে – সবাই আজ নবীর চরম ক্ষমার পরশ পেয়ে ধন্য হল।

আত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

নবী (সাঃ)এর আদেশ পেয়ে কাফ্রী বিলাল (রা:) কা'বা ঘরের ছাদে উঠলেন। সুললিত কণ্ঠে আযান দিচ্ছিলেন, আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল তার আযানের মধূর শব্দে। কিন্ত আসিদ পুত্র আত্তাবের মোটেই তা পছন্দ হলনা। সে ছিল ইসলামের চরম শত্রু। পাশে বসে থাকা বন্ধুর কানে ফিস ফিস করে বলল যদি আমার পিতা বেঁচে থাকত তাহলে বিলালের আযানকে কালো গাধার চিৎকার ছাড়া কিছুই বলতনা। কিন্ত একটু পরেই তার কানে পৌছল নবী (সাঃ) এর এক চেটিয়া ক্ষমা করে দেওয়ার খবর। অবাক হলেন আত্তাব। নিজের ভূল নিজেই বুঝতে পারেন। আর বসে থাকতে পারলেন না এক মুহুর্ত, উঠে পড়লেন, এক পা দু পা করে এগিয়ে গেলেন নবী (সাঃ) এর কাছে,

আত্মসমর্পন করে বলে ফেললেন,

"আমি আওাব । আমার পিতার নাম আসিদ, তিনি ছিলেন আপনার চরম শত্রু। আমি ঘোষনা দিচ্ছি–আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসূল।"

আওাবের এধরনের প্রকাশ্য ঘোষনা প্রভাব ফেলল দারুণভাবে। উদাহরণ হয়ে দঁড়াল আওাবের ইসলাম গ্রহনের ঘটনা, রাত না যেতেই মক্কার সম্পূর্ণ অধিবাসী ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল। ইসলামের চির শত্রু আত্তাব যখন ইসলাম গ্রহন করলেন তখনই নবী (সাঃ) তার নাম মক্কার গভর্নর হিসাবে উল্লেখ করলেন। আর তার জন্য প্রতিদিন এক দিরহাম করে বেতন ধার্য করে দিলেন।

সাফওয়ান

সাফওয়ানও ছিলেন ইসলামের এক ঘোর শত্রু, তিনিই উমির নামে এক জনকে নিযুক্ত করেছিল এই বলে যে তিনি তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবে যদি সে মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করতে পারে। এরকম শত্রুকে হাতে পেলে কেউই ছেড়ে কথা বলবেনা, এই শঙ্কায় সে মক্কা ছেড়ে জেদ্দার পথে দৌড় দিল, তার পর ওখান থেকে সমুদ্র পথে একে বারে ইয়েমেনে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই সময় উমীর নবী (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, " ওগো আল্লাহর রসূল, সাফওয়ান হলেন আমাদের দলের নেতা , কিন্তু সে আজ আপনার ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছে এমন কি সমুদ্রে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে " এ কথা সোনার পর নবী (সাঃ) বললেন " তাকে নিরাপওা দেওয়া হল" উমীর নবী (সাঃ) এর এ কথা শুনে আবাক হলেন এবং বললেন, "ওহে আল্লাহর রসূল তাহলে আপনী যে তাকে নিরাপওা দিয়েছেন তার কোন নিদর্শন আমাকে দিন," যাতে করে সে আমার কথা বিশ্বাস করে। নবী (সাঃ) তখনই নিজের পাগড়ী তাকে খুলে দিলেন তার বিশ্বস ফেরানোর জন্য। উমির পাগড়ী নিয়ে চলল তার কাছে। উমির তাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাল কিন্তু সফওয়ান বলল যে তার ফিরে এসে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার ভয় হচ্ছে। কিন্ত উমীর তাকে রসূলের পাগড়ী দেখিয়ে অভয় দান করলেন, "সফওয়ান তুমি জান না নবী (সাঃ) উদারতা ও ক্ষমার ব্যাপারে কতবড় হৃদয়ের," উমিরের এই কথা শুনে সে ফিরে এল রসূলের কাছে, রসূলের কাছে ভয়ে ভয়ে সে বলল "উমির আমাকে বলছে আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন," নবী (সাঃ) তৎক্ষনাতই তাকে জানালো এটা সত্য।

সাফওয়ান বুকে বল পেল, সে সত্যিই এতটা ভাবতে পারেনি, আর একটু সাহস করে বলল "আমি কি দুমাস ভাবার জন্য সময় পেতে পারি।" নবী (সাঃ) তাকে

আভয় দান করলেন, বললেন "দুমাস কেন তুমি তোমার ভাবার জন্য চার মাসই নাওনা"

তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করলেন না এবং তাকে ভাবার অবকাশ দিলেন।

হাবার

ইসলামের অপর এক চরম শত্রু ছিলেন হাবার। এমন কি নবী কন্যা জয়নাবকে সে মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছিল। জয়নাব (রাঃ) হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনার পথে পড়ি দিচ্ছিলেন। সে সময় তিনি অন্তস্বত্তা অবস্থায় ছিলেন। উটের পিঠে চেপে পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন জয়নাব। হাবার তাকে জোর করে হিচঁড়ে উটের পিঠ থেকে নামালেন। এতে তিনি পড়ে গিয়ে জোরে আঘাত পেলেন। এতে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই জয়নবের পিতা নবী (সাঃ) এর কাছে হাবার আজ এসেছে। নবীর মহত্ব দেখে, নবী (সাঃ) এর উদারতা ও ক্ষমার চরম প্রকাশ সে আজ স্বচক্ষে দেখে অভিভূত। বলেই ফেললেন,

"ওগো আল্লাহর রসূল আমি পার্সিয়ায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। পরে আপনার মহান ক্ষমার কথা শুনে আমি অভিভুত হলাম। আমি বুঝতে পেরেছি আমার নিজের অজ্ঞতা ও দোষ। এখন আমি এসেছি ইসলাম গ্রহনের জন্য।"

নবী (সাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। হঠাৎ করে যেন সমগ্র কিছু দয়ার ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হল। শত্রুরা ফিরে পেল পরম আনন্দ।

আবু সুফিয়ান

আবু সুফিয়ানের সমস্ত রকম কুকীর্তি মুসলমানরা জানত ভালভাবে। বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে এপর্যন্ত যত হত্যা ও যুদ্ধ সব কিছুই সংঘটিত হয়েছিল আবু সুফিয়ানের অঙ্গুলি হেলেনে, তার ষড়যন্ত্রে। তার পরামর্শ ব্যাতিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছুই হয়নি। মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার সাথিদের বিরুদ্ধে যত রকম অন্যায় অত্যাচার হয়েছিল তার সবটার জন্য দায়ী ছিলেন এই আবু সুফিয়ান। মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ানকে আনা হল রসূলের কাছে।রসূলের চাচা আব্বাস (রাঃ) তাকে এনে ছিলেন। কিন্তু রসূল তার প্রতি সবচেয়ে ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে উমার (রাঃ) চেয়েছিলেন তাকে মেরে ফেলতে। নবী (সাঃ) তাকে কেবল ক্ষমা করেননি। তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন " যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকলে সে নিরাপদ, তার সমস্ত অপরাফ ক্ষমা করা হল"।

হিন্দাহ

হিন্দাহ ছিল আবু সুফিয়ানেরই স্ত্রী, মুসলমানদের প্রতি হিংসায় হিন্দাহ ছিল অদ্বিতীয়া। মুসলমানদেন বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা বিরোধে তার উসকানি বড় ধরনের কাজ করত। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে যায় উহুদ যুদ্ধে হামজা (রাঃ)-র মৃত লাশের উপর তার পাশবিক আচরণ। উহুদ যুদ্ধ শেষ। মুসলমানেরা কিছু ভুলের জন্য এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে। ক্ষেত্র জুড়ে শহীদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্য থেকে হিন্দাহ খুজে বের করল হামাজা (রাঃ)–র লাশ। তখন তার কি পৈশাচিক আনন্দ, হিংস্র দানবী হামজা (রাঃ)-র বুকটা ফেড়ে ভিতর থেকে কলিজা বের করল। এখানে থামেনি পৈশাচিকতা, চিবিয়ে খেল নেকড়ের মতো। তারপর লাসের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে মালার মত গলায় ঝুলিয়ে নৃত্য করল হিন্দাহ। এ পৈশাচিক দৃশ্য বলা যায় না, শোনা যায়না, বর্ননাও করা যায়না।

যাক আজ সেই হিন্দাহ নবী (সাঃ) এর কাছে এসেছেন ক্ষমার আশায়। বুক তার দুরু দুরু। নিজেই নিজেই বিচারে বিরাট আসামী। সে তো ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়। তবুও রসূল তাকে ক্ষমা করে দিলেন, সে তো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এসেছে দয়ার নবী তাকে কি করে বঞ্চিত করবেন। হিন্দাহ ইসলাম গ্রহন করলেন, বাড়ি ফিরে গেলেন হিন্দাহ, কি আশ্চর্য ! বাড়িতে ফিরে হিন্দাহ তার পূর্ব উপাসনার মূর্ত্তি লক্ষ করে বললেন " আসলে তোরাই আমাকে ভূল পথে চালিয়ে ছিলি " এই বলে একের পর এক মূর্ত্তি গুলোকে ভেঙ্গেই ফেলল।

ইকরামা

ইকরামা ছিল আবু জেহেলের পুত্র। ইসলামের সাথে তার শত্রুতা পিতার মতো ছিল। কিছুতেই ইসলামের কোন জিনিস সে স্বীকার করত না। সে নিশ্চিতভাবে এটা ভেবে ছিল মুসলমানরা তাকে মক্কায় মেরে ফেলবে। তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গেলেন ইয়েমেনে। এখন তার স্ত্রী উম্মে হাকিমা ইসলাম গ্রহন করলেন, সে রসূলের কাছে আবেদন করল ইকরামাকে একটা আশ্রয় দেওয়ার জন্য। নবী (সাঃ) উম্মে হাকিমার আবেদন মঞ্জুর করলেন। উম্মে হাকিমা দেরী করলেন না। ইকরামাকে ফিরিয়ে আনতে ইয়েমেনে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর ইকরামা নবী (সাঃ) এর কাছে এলেন ইসলাম গ্রহন করবে বলে। নবী (সাঃ)এ খবর পাওয়ার পর সাহাবীদের সাবধান করে দিলেন,

“আবু জেহেলের পুত্র ইসলাম গ্রহনের জন্য আসছে তোমরা কেউ তার পিতাকে অপমানজনক কোন কথা বলোনা। কারন মৃত ব্যক্তিকে কটুক্তি করলে তা তার কাছে পৌঁছায় না তা জীবিতদের আঘাত করে।”

যখন তিনি দেখলেন ইকরামকে তখন তিনি তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দ্রুত উঠে পড়লেন ও এগিয়ে গেলেন যে তার কাঁধের চাদর মাটিতে লটকে পড়েছিল। তার পর ইকরামাকে স্বাগত জানিয়ে নবী (সাঃ) বলে ফেললেন,

“স্বাগত দেশত্যগী আরোহী, তোমার ফিরে আসাকে স্বাগত জানাই”

নবী (সাঃ) এর এই আচরণ দ্বারা সাহাবারা এই শিক্ষাই নিলেন যে মানুষকে শুধু ক্ষমাই নয় বরং তাকে মর্যদার স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা ছাড়া একের দোষ আন্যের উপর চাপিয়ে তার বিচার করা মোটেই সংযত নয়। এ শিক্ষা কুরআন আমাদের শিখিয়েছে, বরং কুরআন আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলে,

“একের বোঝা অন্য কেউ বহন করতে পরেনা” (আল কুরআন - ১৭:১৫)

ইতিমধ্যে আল্লাহ অহী অবতীর্ন করে মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন, যখন কোন নিপীড়িত ব্যক্তি বিজয় লাভ করে তখন যেন তার মানবিক মর্যাদা অটল অনড় থাকে। কখনই তারা যেন তাদের আচরণকে মন্দ জিনিসের সাথে মিশিয়ে না ফেলে, কুরআনের ঘোষনা,

“এরা সেই লোক যে, তাদেরকে যদি আমি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে সৎ কাজের হুকুম দেবে, এবং মন্দের নিষেধ করবে। আর সব ব্যাপারে চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে।” (আল কুরআন ২২:৪১)

নবী (সাঃ) ছিলেন এ রকম সব গুনের অধিকারি , তার মত জীবন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করতে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি পারেনি বলা যেতে পারে। তিনি মক্কায় এসেছিলেন প্রতিশোধ নিতে নয়, ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতে নয়, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য নয়। তিনি মাথা নত অবস্থায় কাবায় ঢুকেছেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানাতে, তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন নিজের ক্রুটির জন্য। প্রকাশ করেছেন আল্লাহর একত্ব বাদের সাক্ষী, তার মাহত্ব ও গৌরব। এই ভাবেই মক্কায় প্রতিষ্টিত করেছিলেন শান্তির পরিবেশ। মক্কার শত্রুপক্ষের সবাই পেয়েছিল সবকিছু নিরাপত্তা।

হৃদয়ের পূণর্গঠন
যা প্রয়োজন ছিল ইসলামি নেতৃত্বের জন্য

স্বাধারনত ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় বিজয়ীরা নিষ্ঠুর হয়,তাদের বলদর্পী আস্ফালনে ধ্বংস হয় কত নগর, কত শহর। তাদের হাতে অসহায় ভাবে প্রাণ যায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের। আর্তের আহাজারিত আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। রক্ত স্রোত বয়ে যায় অলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে। নারীর শ্লীলতাহানী ঘটে। শিশুরা হয় মাতৃ পিতৃ হারা। মাঠের ফসলে ঘটানো হয় অগ্নিসংযোগ। ঘর বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বিরোধী মতবাদের লোকেদের কুকীর্তির ফলে, বিতাড়িত হতে হয় নিজের দেশ নিজের বাড়ি থেকে।

কিন্তু মক্কা বিজয় অনন্য সাক্ষী বহন করে। এ বিজয়ে মুসলমানেরা কাউকে বিতাড়িত করেনি, বরং ঘরের বাইরে যারা ছিল তাদের ফিরিয়ে এনেছে তাদের ঘরে। কোন নারীর শ্লীলতাহানী ঘটেনি, কারোর রক্ত ঝরেনি মক্কার পবিত্র মাটিতে, কারণ নবী (সাঃ) সকলের প্রতি ছিলেন উদার। কুরাইশরা তার প্রতি একদিন নয়, দুদিন নয় – দু দশক ধরে তার প্রতি অত্যাচার চালিয়েছে। তাকে তারা উপহাস করেছে, তাকে তার পরিবার সহ সামাজিক বয়কটে আবদ্ধ করে রেখেছিল তিন তিনটি বছর। অপরাধ ছিল তার এক আল্লাহকে উপাস্য হিসাবে মেনে নেওয়া। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) – কে তারা মেনে নিয়েছিল আল্লাহর প্রেরিত রসূল হিসাবে। কুরাইশরা এতদিন ধরে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য। এর আগেও তিন তিনটি যুদ্ধ তারা করেছিল, কিন্তু সব প্রচেষ্ঠায় তারা ব্যর্থ হয়েছে চরম ভাবে। কিন্তু এই মক্কার বিজয়ে তারা একে বারে চরম ভাবে পরাজয় বরণ করে নবী (সাঃ) এর কাছে নবী (সাঃ) ইচ্ছা করলে বিগত দিনের কথা স্মরন করে কুরাইশদের উপর সমস্ত রকম প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু নবী (সাঃ) ঘোষনা করেছেন "লা তাসরিব আলাইকুমুল ইয়াম" –"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেই " এমন কি রসূল (সাঃ) কুরাইশদের মুসলিমদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তি ব্যবহার করারও অনুমতি দিলেন। মুসলমানরা যখন মদিনায় চলে গিয়েছিল তখন এ - সব সম্পত্তি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কুরাইশরা তার দখল নিয়ে ভোগ করছিল, নবী (সাঃ) মক্কা শাসনে যে যে পদে বহাল ছিল তাকে সেই পদেই বহাল রাখলেন, মক্কা দেখা শোনার জন্য যারা আগে পরিচালনা সমিতিতে ছিলেন তিনি তাদেরই পুনর্বহাল রাখলেন।

নবী (সাঃ) এর রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল দুরদর্শীর। তিনি এটা ভালোভাবে জানতেন কোন ব্যবস্থা নিলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে সর্বত্র। মক্কা বিজয় পরবর্তী পরিস্থিতিকে তাই তিনি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখেছিলেন। উদার হৃদয় না থাকলে

শান্তি প্রকৃয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়না। প্রতিশোধ স্পৃহা কেবল মাত্র প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হল মানুষের হৃদয় পরিবর্তন। আর এটা কেবল হতে পারে মানুষের পূর্ব পাপের অনুতাপের মধ্য দিয়ে।

কুরাইশদের মধ্যে ছিল উন্নত মানের গুণ, ব্যক্তিত্ব পূর্ণ এই লোকেরা মক্কার শাসন পরিচালনা করত আগে থেকেই , তাদের যেমন ছিল ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল বিচক্ষতা। বাস্তব ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখত তারা। সমাজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও কম ছিলনা, তাদের মান সম্মান সমাজের প্রতিটি স্তরে ভাল প্রভাব বিস্তার করত। এ সমস্ত কিছুকে নবী (সাঃ) খুব গুরুত্ব সহকারে অনুভব করেছিলেন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ করেছিলেন তাই তিনি একটা নূতন সমাজ গড়ার জন্য তাদেরকেই কাজে লাগালেন বিচক্ষনতার সাথে। তিনি তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না সমাজ থেকে বরং সমাজের বৃহত্তর কি কাজে লাগতে পারে এ সকল ব্যক্তিত্ব তিনি তার ব্যবস্থা করলেন। তিনি এটা ভাবলেন যে এদেরকেই কাজে লাগিয়েই আবার বিশ্বসভ্যতার চাকা গড়ানো যেতে পারে। বিকাশ ঘটতে পারে ইসলামী সভ্যতা সারা দুনিয়া জুড়ে। কুরাইশরা তাদের পূর্ব অজ্ঞ সংস্কৃতি আকড়ে ধরে জিহাদ চালিয়ে ছিল দীর্ঘ দুই দশক ধরে। অতএব তারা সত্যকে আঁকড়ে ধরে সভ্য সমাজের জন্য অনেক কিছুই করতে পারবে, এ ছিল নবী (সাঃ)-র আশা আকাঙ্খা। আর এ জন্য তাদের মান সম্মান অক্ষত থাকা দরকার। নবী (সাঃ) ইসলামী চিন্তাকে মূল ভিত্তি করে সমাজ বিকাশের আশাবাদী ছিলেন আর ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে যে নেতৃস্থানীয় বক্তিত্বের প্রয়োজন নবী (সাঃ) তা বুঝে ছিলেন। এই নেতৃত্ব এমন হওয়া দরকার যারা হবে ব্যক্তিত্বে ভরপূর। তারা হবে বিচক্ষন দক্ষ ও প্রভাবশালী, তিনি ভেবে ছিলেন কুরাইশদের উপর কোন বল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের আচরন এটা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তারা মক্কা জয় করে সব লুটপাট করে নিতে আসেনি, তারা এসে ছিল ইসলামের সৌরভ ছড়াতে। আজ তারা প্রতিশোধ স্পৃহা মেটানোর জন্য মক্কায় জড়ো হয়নি বরং আল্লাহর কাছে কামনা করতে এসেছিল বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। তাদের বুক ভরা ক্ষমার জোয়ারে আজ ভেসে গেল মক্কার কুরাইশদের যত পঙ্কিলতা। তারা দলে দলে স্থান নিল ইসলামের ছায়াতলে।

ওগো আল্লাহ আমিতো এ বিষয়ে কিছুই জানিনা

মক্কার মহাবিজয় সম্পন্ন হল। নবী (সাঃ) -মক্কায় অবস্থান করলেন আরও উনিশ দিন। তার পর ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক হল। নবী (সাঃ) একটু খোঁজ খবর জানতে চাইলেন মদিনার। যে সকল গোত্রের সাথে তিনি মৈত্রি স্থাপন করে ছিলেন তারা সব ঠিক-ঠাক আছেন কিনা। সেই সঙ্গে আরও খোঁজ নিলেন যারা ইসলাম গ্রহন করেছিল

তারা তাদের পূর্ব প্রতিমার প্রতি আসক্তিতে আছে কিনা। তদারকিতে খালিদকে নিযুক্ত করা হল। তিনি বনু যাদমিয়া গোএকে ঠিক ঠিক দেখলেও আবদার রহমানের উপর সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি তাদের গোত্রের অনেকের প্রতি খারাপ আচরণ করে বসলেন এমন কি তাদের কয়েকজনকে হত্যাও করে ফেলল ! পরে নবী (সাঃ) -এর কাছে এ খবর পৌছালে তিনি বড়ই মর্মাহত হলেন। তিনি – স্পষ্টতই এটা বুঝতে পারলেন যে খালিদের আচরণ ইসলাম প্রদত্ত ন্যায়– বিচারের ধারে কাছেও যায় না।আল্লাহর প্রতি যারা ইমান এনেছে তারা এ কাজ করতে পারেন না। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে যারা মারা গেছেন তাদের রক্তপন দিতে হবে আর তিনি বার বার এ কথা বলতে লাগলেন,

"ওগো আল্লাহ খালিদ অন্যায় কাজ করেছে যে ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না"

তার পর তিনি আলি (রাঃ) –কে দিয়ে তাদের কাছে রক্ত পণ পাঠিয়ে দিলেন, তিনি সে গুলো যথাযথ ভাবে নিহত পারিবার গুলোকে দিয়ে দিলেন, অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থও তিনি ফিরিয়ে আনলেন সে গুলো তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

এর দ্বারা নবী (সাঃ) সমস্ত বিশ্ববাসীদের কাছে এটা প্রমাণ করে দিলেন যে, কারোর ব্যক্তিগত ক্রোধ যেন কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত না করে। ধর্মের নামে কিংবা রসূলের নামে কারোর উপর অত্যচার করা যাবেনা। অথবা সন্ত্রাসী কাজকে প্রশয় দেওয়া যাবেনা। এ ধরনের কাজে ইসলামের কোন মদত নেই।

প্রকৃত পক্ষে হৃদয় ও চেতনার শিক্ষা অর্জন করতে মদিনা ও মক্কার মুসলমানদের আরোও অনেক পথ অতিক্রম করা দরকার– নবী (সাঃ) এটা অনুভব করলেন গভীর ভাবে। তিনি বুঝলেন শত শত বছরের প্রাচীন অজ্ঞতার ধারা এত সহজে দূরিভূত হওয়ার নয়। সারা আরব জুড়ে যুগ যুগ ধরে অনৈক্যের সূর বেজেছে। তা এত সহজে মোছার নয়। মক্কার মানুষদের জন্য দরকার অনেক বেশী আধ্যাত্মিক চেতনার। তাই তিনি মাআয বিন জাবাল কে মক্কার মুসলমানদের শিক্ষা দানের ভার অর্পন করলেন। যারা নূতন ইসলামের পতাকা তলে আসছিল তিনি তাদের দায়িত্ব নিলেন নুতন ধর্ম ইসলামের রীতিনীতি, বিশ্বাস- সমস্ত কিছু ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

আদর্শ সংস্কারক

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)

নবী (সাঃ) তার সকল সাহাবীদের বড় ভালবাসতেন। তিনি তাদের কাছে একান্ত ভাবে গিয়েছিলেন, তাদের সাথে তিনি কোন প্রার্থক্য গড়ে তোলেননি । তাই তারা তাঁর কাছে সাহস করে তাদের অভাব, অভিযোগ, প্রশ্ন সব কিছুই করতে পারত। তিনি কাউকে কোন দিন হাঁকিয়ে সরিয়ে দেননি। তাই তাঁর সাথিরা তাঁকে সম্মান করত, ভালবাসত একেবারে আপন করে। নবী (সাঃ)-র সমস্ত আচরণের মধ্যে এটাই ফুটে উঠত যে তিনি তাঁর সাথিদের বড়ই ভালবাসেন । তিনি তাদের বুদ্ধি মেধা ও হৃদয়কে সম্মান দেন। তাই সাথিরা তাকে অনেক সময় পরামর্শও দিতেন। নবী (সাঃ) ও তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিতেন সমভাবে।

এইভাবে নবী (সাঃ) এর মিশন হয়ে উঠেছিল মানবতার মূর্ত প্রতীক, যা কিনা সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরের চমৎকারিত্ব এনে দেয়। নবী (সাঃ) নিজেই একাজ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আর তার এই আদর্শ আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। তিনি নিজে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সেই সঙ্গে তার সাহাবীরাও উজ্জল নক্ষত্রের মত অনাগত মানব সমাজের জন্য উদ্ভাসিত হয়েছিল এ কথা ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়। তাই মানব মনোবিজ্ঞানে মুহাম্মদ (সাঃ) আদর্শ এক অতুলনীয় গ্রহন যোগ্য মতবাদ। এ মতবাদ গ্রহন করলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সাদা কালো, আরব – অনারব, নারী পুরুষ যেই হোকনা কেন সফল হবে সবাই। আশা করি আমরা ইসলামের বেশ কিছু আদর্শ তুলে ধরতে পারব যা আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এ সকল আদর্শ মুসলমানদের তো বটেই সমগ্র বিশ্বের মানুষের আনুসরণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি। আর এর মধ্যেই রয়েছে শান্তি, শৃঙ্খলা ও মানুষের মহামুক্তি।

রাজা প্রজা

সবার জন্য একই আচরণ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে নবী (সাঃ)- ছিলেন উদার দয়ালু হৃদয়ের। কেউ তার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি, তার রাজসভায় সবাই সমান ভাবে আচরণ পেয়েছে। তার দয়া ধনী, গরীব সবাই পেয়েছে। তার সভায় পারসিয়ানরা স্থান পেয়েছে, স্থান পেয়েছে রোমানরাও, গ্রীক বা মিশরীয় বলে তিনি কাউকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, তাঁর সাহাবা যেমন ছিলেন সুদানের অধিবাসী তেমনি আবিসিনিয়ারও, সলমান ফারসি থেকে সুহায়ীব

রুমী তাঁর সাহাবা ছিলেন। হামীরের সম্রাট ও ইয়েমেনের বিসপ কে না হয়েছেন তাঁর সাহাবা। সাধারণ মানুষ ও উচ্চবর্গের রাজা মহারাজা সবার প্রতি তিনি সমান আচরণ করেছেন। কেবলমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। যে এসেছে তাঁর কাছে তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণ করেছেন ।

আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে জীবন

নবী (সাঃ)এমন ধরনের জীবন যাপন করতেন যে তা অনুসরণ করার জন্য সাহাবাদের মধ্যে প্রতিযোগীতার মানসিকতা লক্ষ করা যেত। একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে কোন সময় নবী (সাঃ) এর কাছে কয়েকজন সাহাবার ধার্মিক জীবন যাপনের কিছু আচরণ নবী (সাঃ) অবগত হলেন। প্রথম জন বলল, 'আমি বিয়ে করব না', দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি মাংস খাবনা', তৃতীয় জন বলল, 'আমি বিছানা না পেতে ঘুমাব', চতুর্থ জন বলল, 'আমি সব সময় রোযা করেই কাটাব'। নবী (সাঃ) তাদের শুনিয়ে দিলেন,

"আল্লাহরই প্রশংসা! আমি বিবাহিত তবুও আমি ধর্মীয় জীবন কাটাই, আমি মাংসও খাই, রোযাও রাখি, আমি ঘুমাই আবার জেগেও থাকি"

এই ভাবে নবী (সাঃ) পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য এনেছেন, আসলে পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন দুটি একে অপরের পরিপূরক। এ দুটির কোনটাকেই বর্জন করা যায় না, তিনি একেবারে বস্তু জগতের পিছনে ছুটে বেড়ানোর কথা আমাদের বলেননি আবার একেবারে তার থেকে আমাদের দূরে থাকতেও বলেননি, আধ্যাত্মিকতার আশির্বাদ ও তিনি গ্রহন করতে বলেছেন। দুনিয়ার অতি চাকচিক্য- তিনি যেমন বরখাস্ত করেননি আবার জীবন জীবিকার জন্য প্রয়াসও একেবারে ছেড়ে দেননি। ইসলাম মানুষের আচরণে কোন প্রকার চরমপন্থা নীতি স্বীকার করে না। এটি কোন কোন সময় যুদ্ধের আনুমতি দিলেও তার মধ্যে অনেক শর্ত আরোপ করে। প্রথমত তা শান্তির জন্য হতে হবে। হতে হবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য। নিজেদের খাম খেয়ালি বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নেশায় নয়। আবার কর আদায় বা প্রতিশোধ স্পৃহা মেটানোর জন্যও নয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এটা মানুষের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যবহার হতে পারে।মনুষের ব্যবহার যাতে ভাল হয় তার জন্য এটা কাম্য হলেও এটা কাউকে উৎপীড়ন করার জন্য নয়।

শাসকের গুণ

নবী (সাঃ)-র কাছে সাহাবারা নানা রকম প্রশ্ন করতেন। তিনি প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন খুব মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং ধীর স্থির ভাবে প্রশ্নের জওয়াব দিতেন। এটাই ছিল নবী (সাঃ)-র সাধারণ শালীনতা। যতক্ষন না প্রশ্নর্কতা তার যথাযত সমাধান পেতেন ততক্ষণ তিনি চেষ্টা করতেন তাকে বোঝনোর। এক সময় এক অপরিচিত বেদুইন নবী (সাঃ)-র কাছে এলেন এবং নবী (সাঃ)-র অন্যদের সাথে আলাপ আলোচনার মাঝেই বলে ফেললেন, "কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" নবী (সাঃ) কিছুক্ষণ পর আলোচনা শেষে খোঁজ নিয়ে বললেন "কোথায় সে প্রশ্নকারী?" বেদুইনটি বলল " এইতো আমি হাজির।" নবী (সাঃ) তাকে বললেন " কিয়ামত তখন আসবে যখন মানুষ বিশ্বস্ততা হারাবে।" বেদুইনটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন করে বিশ্বস্ততা হারিয়ে যাবে?" নবী সাঃ বললেন "যখন সরাসরি কাজ অযোগ্য শাসকের হাতে অর্পিত হবে"

ধনী গরীবের মধ্যে ভারসাম্য

নবী (সাঃ) যখন তার সভা পরিষদের নিয়ে আলোচনা সভা করতেন তখন তিনি গরীবদের দিকে লক্ষ দিতেন প্রথমেই, তিনি ছোট ছোট শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন কারণ ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠলে তবেই বড় শিল্প গুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকবে। এমন কি তিনি সাধারন গরীব মানুষদের পোল্ট্রী শিল্পও গড়ে তুলতে উৎসাহ দিতেন যাদের পয়সা আছে তাদের তিনি ভেড়া ছাগল ও উটের প্রজনন ও উৎপাদনে উৎসাহ দিয়েছেন। যা কেবল বর্তমান যুগে আমরা ভাবতে শিখেছি। প্রকৃত পক্ষে ধনী শিল্পের মালিকদের জন্য এটা এক ধরণের সতর্কীকরণ বিষয়, যদি তারা ছোট ছোট শিল্পকেও গ্রাস করে তাহলে ছোট শিল্পের মালিকরা তাদের জীবিকা সংগ্রহে ব্যর্থ হবে। এটা কেবল ছোট ব্যবসায়ীদের রুজি রোজগারে ব্যাঘাত ঘটাবেনা বরং সমাজে দুটো শ্রেনীর মধ্যে সংঘাত ঘটবে। আর এর ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবতার সংঘাত অনিবার্য হবে। তখন সুস্থ সমাজ ভেঙে পড়বে, মানুষের ঐক্য বলে কিছুই থাকবে না।

আধুনিকতার ভারসাম্যতা

ইতিহাসের চাকায় ভর করে সভ্যতা গড়িয়ে চলে সামনের দিকে। আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল জিনিস পত্র, ঘরোয়া হোক বা বাইরের জীবনের হোক ব্যবহার করি- মাত্র এক দুই দশক আগে তা কল্পনাও করা যেত না। আবার মানুষের জীবনে যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার তা কেবল মুসলমানদের হাতে নেই। তাই সর্বযুগের

সব মানুষের কাছে মানুষের বাঁচার উপকরণ থাকলে তা গ্রহণ করা দরকার।

নবী (সাঃ) নিজেই মাঝে মাঝে রোমান ও পার্সিয়ান আলখেল্লা পরেছেন। এক সময় তিনি নাজ্জাসী প্রেরীত চামড়ার মোজা পরিধান করেছেন। আবি আক্কাসের পুত্রের নাম ছিল সাদ। তিনি একদিন বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। নবী (সাঃ) যখন এ খবর পেলেন তখন কালদা পুত্র হারিসের কাছে রোগীকে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। অথচ হারিস ছিলেন একজন খ্রীষ্টান ডাক্তার। যিনি ছিলেন মদিনার বাসিন্দা। এমনকি তিনি তখনও তাঁর সাহাবাদের ভারতীয় ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন

সৌন্দর্য মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে যদিও সব ক্ষেত্রে আমরা সৌন্দর্য বিশ্লেষনে সার্থক হইনা। আল্লাহর এই সৃষ্টি জগতে কত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। আকাশ যমীনের বিন্যাস, পাহাড় পর্বত নদ নদী, মরুভুমি , মরুদ্যান প্রভৃতির সৃষ্টি সৌন্দর্য কতই না শিল্প কুশলতার পরিচয় দেয়। তাই নবী (সাঃ) নিজেই বলেছেন।

"আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভাল বাসেন।"

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আবার মানুষই শ্রেষ্ঠ। এক জন মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে ভাবলে অবাক হয়ে যাবেন। কি সুন্দর তার এই দেহ সুষমা। তার চোখ দুটো যথাস্থানে প্রতি স্থাপিত হয়েছে। তার নাসিকাটি যথোপযুক্ত এগুলো যদি অন্যরকম হত বা অন্য স্থানে প্রতিস্থাপিত হত, তাহলে কি আমারা এত সুন্দর হতে পারতাম ? সর্বপরী আল্লাহ আমাদের যেহেতু সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন তাই আমাদের আচার আচরণ সুন্দর হওয়া দরকার। আর আমাদের আচার আচরণ খারাপ হয়ে থাকে তাহলে এ সুন্দর দেহেরই বা কি প্রয়োজন?

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক

মানুষের জীবনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। নোংরা, অগোছালো, অপবিত্র থাকা মুমেনের কাজ নয়। নবী (সাঃ) নিজে ছিলেন পবিত্রতার আধার। সব সময় তিনি পবিত্র থাকতেন তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর খুব তৎপর ছিলেন। পবিত্রতার উপর তিনি এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে তিনি ঘোষণা করেন,

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"

আয়েশা (রাঃ)–র বর্ননা থেকে জানা যায় নবী (সাঃ) বলেন,

“পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তি করে ইসলাম ধর্ম।”

নবী (সাঃ)-র শরীর সব সময় সুন্দর পোশাক আবৃত থাকতো। তিনি নিয়মিত অযু গোসল করতেন। সাহাবাদেরও -নিয়মিত গোসল করার উপদেশ দিতেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথাও তিনি তার সাহাবাদের বলতেন।

সাহাবা জাবীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক সময় একজন ব্যক্তি ময়লা কাপড় পরে নবী (সাঃ)- র কাছে আসে, এটি দেখে নবী (সাঃ) বললেন,

“এই লোকটি কি এমন কিছু পেলনা যা দিয়ে তার পোষাকটার পরিস্কার করতে পারত?”

উমারের পুত্র আবদুল্লাহ বর্ননা করেন, এক সময় রসূলের কাছে বললাম “ওগো আল্লাহ রসূল আমি যদি ভাল ও সুন্দর পোষাক পরি তাহলে কি আমি অহংকার ও ঐদ্ধত্যের পাপে দোষী হব ? রসূল (সাঃ) বললেন ভাল পোষাক পরা সুন্দর আর আল্লাহ সুন্দর পোষাকে সন্তুষ্ট।”

উমারের পুত্র আবদুল্লাহ আরোও বর্ননা করেছেন, রসূল (সাঃ) বলেন,

“নামাজের সময় সবচেয়ে ভাল পোষাক পর, অন্য কারোর কাছে ভাল পোষাকে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহ বেশী অধিকারী, তাঁর কাছে ভাল পোষাক পরে যাওয়ার জন্য।”

এক কথায় বলা যেতে পারে সুন্দর পোষাক পরা মানেই এই নয় যে সে উদ্ধত বা অহংকারী। অথবা সে অন্যকে ঘৃনার চোখে দেখে।

ইসলামে মদ জুয়ার স্থান নেই

একটি সমাজের সুস্থ রাখার জন্য মদ জুয়ার মত মারাত্মক ব্যাধির অপসারণ হওয়া দরকার। কোন সমাজে মদ ও জুয়ার মত ব্যাধিকে পুষে রেখে সে সমাজকে সুস্থভাবা কোন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। সমাজ সংস্কারক হিসাবে কাজ করতে গেলে সমাজ থেকে অন্যায়ের উৎখাত করার আগে এ দুটি ব্যাধিকে নির্মূল করা প্রথমেই দরকার।

প্রাক ইসলামী যুগে সারা আরব জুড়ে চলত মদের ফোয়ারা। এমন কোন বাড়ি ছিলনা যেখানে মদ খাওয়া হতনা। এই মদ পান করার অভ্যাসকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসাবে দেখা হত। যে মদ খেতনা তকে গরীব গুর্বো হিসাবে ধরা হত। মদ খাওয়াকে অভিজাত বলেও মনে করা হত। মদ পানের বদ সংস্কৃতিকে ঘিরে

কত আনন্দোৎসব হত তার ইয়ত্তা ছিলনা, মদকে তারা এত ভালবাসত মদের প্রতিশব্দ অভিধানে হাজারেরও বেশী ছিল। মদের পরে আরবে যে চরম পাপের কাজ হিসাবে বিবেচিত হত তা হল জুয়া। জুয়া খেলতে খেলতে সমাজ রসাতলে যেত কিন্তু তবুও চেতনা হতনা। নানান পদ্ধিতিতে জুয়া নির্ধারিত হত। কখনও তীর ছুঁড়ে, কখনও ঘোড়া দৌড় করে, আবার কখনও বা কুস্তি করে। জুয়াকেও সামাজিক মর্যদার প্রতীক হিসাবে ধরা হত মদ সংস্কৃতির মত। আর এগুলো চলতও দীর্ঘ দিন ধরে। এর ফলে সব সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যেত যখন তখন। রক্ত ঝরত ভাই ভাইয়ে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও। কুরআন খুঁজে বের করল সমাজের দুটি চরম ব্যাধির ভাইরাসকে। সমাজ থেকে উৎঘাত করার জন্য ফরমান জারি করল,

> "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও এ দুটোতেই রয়েছে বড় ধরনের পাপ, এতে কিছু উপকার থাকলেও থাকতে পারে মানুষের জন্য কিন্তু এতে ভাল থাকার চেয়ে মন্দই থাকে বেশি।" (আল কুরআন ২: ২১৯)

কুরআনের এই আয়াতে প্রথমে এ দুটিকে পাপ বলেই ঘোষণা করা হয়েছে। পরক্ষণে বলা হয়েছে সামন্যতম উপকার থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই একটু উপকারের চেয়ে সুস্থসমাজ মানুষের কাছে কি কাম্য নয়? মদ ও জুয়া ব্যতিরেকে যে সমাজ গড়ে ওঠে নি:সন্দেহে তা একটি সুস্থ সমাজ। সেখানে বিরাজ করে অপেক্ষাকৃত বেশি শান্তি শৃঙ্খলা। তাই সমস্ত সমাজবিজ্ঞানী মদ ও জুয়াকে এক বাক্যে উৎখাত করার পক্ষপাতি। এ ছাড়া আরও বলা হয়েছে,

> *"হে ইমানদার লোকেরা মদ জুয়া এবং আস্তানা ও পাশা এ সব অপবিত্র শয়তানি কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় তোমারা সাফল্য লাভ করতে পারবে। শয়তান তো চায় যে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করব এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখবে। এখনকি তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে?" (আল কুরআন ৫ : ৯০,৯১)*

যে জিনিসগুলো থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের আহ্বান করা হয়েছে তা শুধু মদ নয়, বরং তা মদ থেকে ড্রাগ পর্যন্ত সব কিছুই, এক কথায় যা কিছু মানুষের মস্তিষ্কে নেশার সৃষ্টি করে তা সব কিছুই বর্জনীয়। তা মদ, হুইস্কি, ব্রাউন সুগার, এল.ডিসি হেরোইন যা হোকনা কেন। কোন মাদক দ্রব্যই ইসলাম অনুমোদন করেনা।

একই ভাবে জুয়াও কুরআন নিষিদ্ধ করেছে। তা জাতীয় লটারী হোক বা

বুকিদের বেটিং হোক ! যাই হোকনা কেন এ সবই হারাম এই সব কাজের মধ্য দিয়ে সমাজে হিংসা বিদ্বেষ প্রবেশ করে। সৌভাতৃত্বের ব্যাঘাত ঘটায়।

কিন্তু নবী (সাঃ) যখন ইসলামের বার্তা নিয়ে এলেন তখন সমাজ থেকে এগুলো তুলে ফেলার ব্যাবস্থা করা হল। এর ফলে মুসলমানরা এক উন্নত চরিত্র, কষ্ট সহিঞ্জুতা ধৈর্য্য ইত্যাদি গুণ পেয়ে সমাজকে সুশৃঙ্খল করতে পারল, দাঙ্গা হাঙ্গামা বিদায় নিল সমাজ থেকে।

জুয়ার অভ্যাস অতি নিন্দনীয় এক সামাজিক ব্যাধি, বৃহওর উন্নত এক সমাজ গড়ার জন্য এ এক বড় বাধা, এটি মানুষকে উৎপাদনমুখী সমস্ত কাজের পথকে বন্ধ করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এরই উপস্থিতিতে, আর সেই সঙ্গে নৈতিক অবক্ষয়ও সমাজে ডেকে আনে এই ব্যাধি।

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সেই সঙ্গে ইতিহাসবিদ আরনল্ড-যে-টরেনবির মতে ইসলামের সবচেয়ে মূল্যবান মানবীয় উপহার হল মদ নিষিদ্ধ করণ।

লোভ

হৃদয়ের তৃপ্তি বোধ সব সুখের আধার, যার কোন কিছুতেই তৃপ্তি নেই তার হৃদয়ে শান্তি মিলতে পারেনা, তৃপ্তি না থাকার কারনে লোভ লালসার অগ্নি মানুষের সৎ গুন গুলোকে পুড়িয়ে ফেলে, তারপর তা সমাজের অন্যান্যদের গ্রাস করে।

আমরা বেশির ভাগ লোক এটাই বিশ্বাস করি যে বস্তুর উন্নতি সাধন হলে আমাদের জীবনে সুখ এসে যাবে। বাহ্যত এটা সঠিক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সব সময় এটা ঘটেনা। বস্তুর উন্নতির সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তৃপ্তি বোধের যদি সংমিশ্রন না ঘটে তাহলে শান্তি ফিরে আসতে পারেনা। হৃদয় হল শান্তির জায়গা সেখানে যদি তৃপ্তি না আসে তাহলে লোভ লালসা বেড়েই যাবে। আর লোভ লালসার শেষ নেই। এ প্রসঙ্গে নিচে বর্ণিত হাদীসটি প্রনিধান যোগ্য,

"যদি আদম সন্তান কে দুটো উপত্যকা পরিমাণ সোনা দিয়ে দেওয়া হত তার পর আরোও দুটো চাইত তবে আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছুতে ভরেনা এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন যে তাঁর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে।"

মানুষ সবসময় চায় তার সম্পদ কিসে বাড়ে। কিসে বস্তুজাত সহায় সম্পওি তার করায়ত্তে আসে। আরো বেশী কি ভাবে উপার্জিত হয় তার প্রচেষ্টা চলতে থাকে অহরহ। সে স্বপ্ন দেখে দ্রুতগামী গাড়ি ও প্রাসাদসম বিলাসবহুল বাড়ির, ও অন্যান্য

হাজার হাজার আরাম দায়ক আসবাব পত্র, যা কোন সময় শেষ হয়না, আর এর ফলে একজন মানুষের স্বাভাবিক দয়া, ক্ষমা প্রেম ভালবাসা সবকিছুই উবে যায় সমাজের কথা তার ভাবার সময় থাকেনা। এ জাগতিক বস্তুর উন্নতির পিছনে পিছনে ছুটে মানুষ যদি ক্লান্ত হয় তাহলে আখিরাতের কথা স্বাভাবিক ভাবে ভুলে যাওয়া হয়। আর আখিরাতকে ভুলে গেলে বৈধ অবৈধ কোন কিছুর দিকে মানুষের খেয়াল থাকেনা, সে সব সময় ভাবতে থাকে আমার কিসে সম্পদ বেড়ে যাবে। কিন্তু এ কথা ভুললে আমাদের চলবেনা আমরা এ পৃথিবীতে কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে এসেছি। তাই আমাদের এ পার্থিব বস্তু নাড়া চাড়ার অধিকার থাকলেও এর উপর অমর অক্ষয় অধিকার চাপিয়ে দিতে আসিনি।

আল্লাহ আমাদের পার্থিব চাকচিক্যের পিছনে ছোটাকে উৎসাহ দেননি। বরং তার থেকে উপকার নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর যদি আমরা পার্থিব চাকচিক্যতার পিছনে ছুটতে থাকি তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা আল্লাহকে ভুলে যাব। ভুলে যাব পরকালের জীবনকে। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

> *"তোমাদের এই ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তনি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবেনা। তবে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা ছাড়া। এই লোকেদের জন্যই তাদের কাজের দ্বিগুন প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিরাট আকার সুউচ্চ ইমারত সমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে।"* (আল কুরআন ৩৮:৩৭)

দুর্নীতি

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে লোভ লালসা সমাজকে কলুষিত করে। সমাজের মানুষকে শোষন করার জন্য মানুষের লোভ লালসা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নবী (সাঃ) চাইতেন যারা আল্লাহর কাছে আত্ম সমর্পণ করে মুসলমান হয়েছে তাদের জীবনে চলার পথে কোন ফাঁক দিয়ে যেন দুর্নীতি বা অবৈধ কাজের অনুপ্রবেশ না ঘটে। সাধারণ ভাবে ঘুস আমাদের সমাজকে একেবারে জর্জরিত করে তুলেছে। ঘুসের এত রমরমা অবস্থা যে ঘুসের সংজ্ঞাই হারিয়ে গেছে। একজন মানুষ অফিস আদালত থেকে শুরু করে সাধারণ কেনা বেচায়ও ঘুস দিয়ে চলেছে তা খেয়াল নেই ঐ ব্যক্তি বা সমাজের। তেমনিভাবে ঘুসের টাকায় ফুলে ফেঁপে বাড়ি গাড়ি প্রভৃতি বিলাসে অনেকে লিপ্ত হলেও তার নৈতিকতায় বাধেনি যে এটা তার অবৈধ প্রক্রিয়া। কিন্তু নবী (সাঃ) ছিলেন মুসলমানদের অতন্দ্র প্রহরী তিনি একটি ঘটনা দ্বারা আমাদের এ ব্যাপারে অনেকটা সাবধান করেছেন।

এক সময় এক যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর কাছে যাকাত সংগ্রহ করার পর এলেন এবং বললেন এগুলো আমি উপহার স্বরূপ পেয়েছি। নবী (সাঃ) এতেও দুনীর্তির গন্ধ পেয়েছেন। তিনি এটাকে সকলের কাছে জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন যাতে করে দুনীর্তির সূক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ মুসলমানেরা করতে পারে। তিনি পরিষদ সভায় ঘোষনা দিয়ে বললেন,

> *“এই যাকাত সংগ্রাহকের দিকে তাকাও। এ বলছে এই অংশ যাকাত সংগ্রহের আর এই অংশ সে উপহার স্বরূপ পেয়েছে। কিন্তু এখন সে যদি ঘরে বসে থাকত তাহলে কি এই উপহার দেওয়ার জন্য কি কেউ আসত?”*

সন্ত্রাসবাদ

এই শতাব্দীতে সন্ত্রাসবাদের সাথে আমরা ব্যাপকভাবে পরিচিত হলেও সন্ত্রাসবাদ সমন্ধে ইসলাম আমাদের সতর্ক করেনি তা নয়। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেও আল্লাহর রসূল সন্ত্রাস সমন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি আমাদের জন্য তার বানী উল্ল্যেখ করেছেন,

“আল্লাহ নমনীয়তার মধ্যে যা দিয়ে থাকেন সন্ত্রাস বা অন্য কিছুর দ্বারা তা দেননা।”

নবী (সাঃ) আরোও বলেছেন,

> *“কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় বিনা কারণে হত্যা খুব সাধারণ ব্যাপার হবে। যেখানে হত্যাকারী জানবেনা কাকে সে হত্যা করেছে, আবার নিহত ব্যক্তিও জানবে না কে তার হন্তা।”*

আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে নবী (সাঃ) -এ ভবিষ্যত বানী করেছেন আমাদের জন্য যা আমরা আজ চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি। আজ আমরা লক্ষ্য করেছি লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে। এক দেশ থেকে গিয়ে অন্য দেশে মিলিটারি বাহিনী গুঁড়িয়ে দিচ্ছে শত শত ঘর বাড়ি। ক্ষেত খামার, পুড়িয়ে দিচ্ছে মাঠের ফসল, প্রকৃতির দেওয়া অফুরন্ত সম্পদ নষ্ট করছে অত্যাচারি শাসক বর্গ। কে মরছে আর কে বা মারছে তার সঠিক হদিস পাওয়া যাচ্ছেনা। নিস্পাপ মানুষ মরছে বটে কিন্তু তারা জানেনা কি তাদের অপরাধ। যে মারছে এবং যারা মরছে পারস্পরিক কোন ব্যক্তিগত শত্রুতাতো ছিলনা তাদের মধ্যে। যাই হোক এক কথায় বলা যেতে পারে সন্ত্রাসবাদ ইসলামে কখনই কাম্য নয়। আজ সারা দিন জুড়ে সন্ত্রাসবাদের

শয়তানি রাজ্য শাসন চলছে। আর একটা দিক, প্রায় সব সন্ত্রাসবাদী কাজ কারবারে মুসলমানদের জড়িয়ে দিয়ে পক্ষান্তরে ইসলামকে অবমাননা করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। তাহলে কেন ইসলাম আজ হীন চক্রান্তের শিকার হবে? পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পরিবর্তে ইসলাম সন্ত্রাস দমন করার কথা বলে। মুহাম্মদ (সাঃ)-র আসার অল্পদিন পরেই ইসলাম প্রায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু কোথাও তো রক্তস্রোত বয়নি। ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার হলে আজ ভারতবর্ষের মত দেশে একজনও অমুসলিম পাওয়া যেতনা। মুসলমানদের দীর্ঘ শাসনের পরে অন্য ধর্মের নানান সংস্কৃতি আজও বেঁচে আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলাম সন্ত্রাস নয় বরং সন্ত্রাস দমনকারী এক মানবিক ধর্মমত।

২০

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা বিজয় হয়েছে। মক্কা বিভিন্ন গোত্রে থেকে দলে দলে লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। আল্লাহর রসূল মদিনায় ফিরে এসেছেন। মক্কা বিজয় মানে যে ইসলামী আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে বা আর কোন কাজ নেই এমন ভাবার অবকাশ নেই । নবী (সাঃ) ছিলেন বাস্তববাদী। খুব গভীর ভাবে অনুভব করলেন মুসলমানেরা আরোও অনেক আসন্ন বিপদের সম্মুখীন । আরবের সমস্থ গোত্রই যে নবী (সাঃ) এর কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছে তা বলা যায় না। এমন কি অনেকে সময়ের অপেক্ষায় থেকেছে। সময় এলে নবী (সাঃ)-কে সরিয়ে দেবে, এছিল তাদের মনের কথা। সর্বত্র গুজব ছড়াল হাওয়াজিন ও তাদের মৈত্রি শক্তি গোত্ররা মিলে কুড়ি হাজারের বেশী সৈন্য জড়ো করেছে এবং তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে মুসলমানেদের আক্রমন করার জন্য। নবী (সাঃ) গুপ্তচর নিয়োগ করলেন সঠিক খবর পাওয়ার জন্য। গুপ্তচর তদন্ত রিপোর্টে ঘটনা সত্য বলে জানা গেল। নবী (সাঃ) -ও দেরী করলেন না। মদিনার মুসলিম সৈন্যের সাথে মক্কার কুরাইশদের মধ্য থেকে আরো দুহাজার সৈন্য একত্রে মিলিত হল তারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মক্কার বেশ কয়েকটি গোত্র তখনও ইসলাম গ্রহন করেনি তাদের মধ্যে সুহায়েল ও সাফওয়ানও থেকে গেল।

এরকম পরিস্থিতিতে নবম হিজরীতে হাওয়াজিন ও সাকিয়া গোত্র সহ অন্যান্য গোত্র মিলে মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষ লিপ্ত হল হুনাইন নামক স্থানে। হুনাইনের অবস্থান ছিল মক্কা থেকে ষোল কিলোমিটার দূরে।

এদিকে নবী (সাঃ)-যে বাহিনী গঠন করেছিলেন তাতে ছিল বারো হাজার সৈন্য। এর আগে নবী (সাঃ) যত গুলো যুদ্ধ করেছিলেন সবচেয়ে বেশী সৈন্য সংখ্যা ছিল এতে। এই বাহিনীতে লক্ষ করে আবু বকরের মত অনেক সাহাবী আসন্ন বিজয় আনন্দে গর্ব বোধ করেছিলেন । কিন্তু নবী (সাঃ) তাদের উপর অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন।

হাওয়াজীন দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আওফ পুত্র মালিক নামে এক জন তরুন যোদ্ধা। সে সেই সময়ে সারা আরব উপদ্বীপ জুড়ে সম্মান কুড়াচ্ছিল। সে তার সৈন্যদের দলে তাদের বালক বালিকাদেরও সামিল করে নিতে আদেশ দিয়েছিল কারণ এতে তাদের ক্ষমতার প্রদর্শনীটা বেশি হবে বলে। মালিক তার সৈন্যের কিছু অংশ গিরিপথে রাখলেন, উপত্যকার মধ্য থেকে এদের দেখাই যাচ্ছিলনা। আর অবশিষ্ট সৈন্যদের রাখলেন উপত্যকার ঠিক পাশে। সেখান থেকে তারা সহজেই মুসলিম সৈন্যদের আগমণ পথ রুখতে সমর্থ হবে এবং নিচ থেকে উপরে উঠে আসা মুসলিম সৈন্যরা তাদের সহজেই নজরে পড়বে। সকালের আলো যখন পাহাড়ের চতুর্দিকে আলোকিত করল তখন মুসলিম সৈন্যরা পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় সুচতুর মালিক তার দু জায়গায় মোতায়েন সৈন্যদের দুদিক থেকে আক্রমন করার আদেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে আক্রমন হল। মুসলমানরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য সামগ্রীক প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু তারা –এক সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হল।

এই সময় নবী (সাঃ) কিছু দূরে খোলা স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পুরো ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি একেবারে কাছের সাহাবীদের কাছে ডাকলেন এবং আব্বাস (রাঃ) -কে জোর গলায় মুসলিমদের একত্রিত হওয়ার জন্য চিৎকার করতে বললেন। কারণ আব্বাস (রাঃ)–র কণ্ঠস্বর নবী(সাঃ)–এর চেয়ে উচ্চ ছিল। আব্বাস (বাঃ) –র চিৎকার মুসলিমদের মধ্যে পৌঁছাল। মুসলিম সৈন্যরা তড়িৎ গতিতে একত্রিত হয়ে গেল এবং পাল্টা আক্রমণ চালাল শত্রু পক্ষের উপর।

তার পর মুসলিম বাহিনী শত্রু পক্ষের মধ্যে দিয়ে প্যারেড করে এগিয়ে যেতে লাগল। এবং তাদের মধ্যে এমন ভাবে প্যারেড শৃঙ্খলা ফুটে উঠেছিল যা দেখে হাওয়াজিন সৈন্যরা সবাই হতবম্ব না হয়ে পারেনি। তারাও কল্পনাও করতে পারেনি যে আব্বাস (রাঃ)-র হাঁকে সমস্ত মুসলিম সৈন্য একত্রে মিলে যাবে এবং তাদের প্রতি এমন মারাত্মক পাল্টা আক্রমণ চালাবে।

এই মুসলিম বাহিনীতে একজন মহিলা যোদ্ধাও ছিলেন নাম তার উম্মে সুলায়েম, তিনি স্বামীর সাথে এই যুদ্ধে এসেছিলেন। ভাবা যায় আজ থেকে দেড়হাজার বছর অতীতে নবী (সাঃ) মিলিটারী বিভাগে মহিলাদের যোগদান অনুমোদন করেছেন।এ কোন মহাপুরুষ যিনি মহিলাদের শক্তি সামর্থ ক্ষমতাকে এভাবে মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তিনি যদি আজকের যুগের মানুষ হতেন তা হলে তিনি মহিলাদের জন্য কত আধুনিক চিন্তা করতেন তা সহজে অনুমেয়।

এই অবস্থাতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ সমাপ্ত করা ছাড়া উপায় ছিলনা। তারা দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিমরা তাদের পিছু ছাড়ল না। মালিক

বাধ্য হল তায়েফের সাকিয়া গোত্রের কাছে আশ্রয় নিল। ছত্রভঙ্গ অন্য সৈন্যরা আশ্রয় নিল পাহাড়ের যত্রতত্র স্থানে। এছাড়া তাদের সৈন্যদের মধ্যে নারী পুরুষদের অনেকেই প্রাণ হারাল। অনেকেই আহত হল। তারা ভাবতে পারেনি এ ধরনের পাল্টা আক্রমনে তারা হেরে যাবে। পরে কুরআনের অহী অবতীর্ন হয়ে মুসলিমদের এই সময়ের হতাশা, আবেগ, বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে নিচের ভাষায় তাদের সংশোধনী এনেছে।

> *"আল্লাহ ইতিমধ্যে তোমাদের বহুক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন, এই সেদিন হুনায়েনের যুদ্ধের দিন তোমরা দেখতে পেয়েছ। সে দিন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতা তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজ আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর তোমারা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে। অত:পর আল্লাহ তার শান্তির অসীমধারা তার রসূল ও ইমানদার লোকেদের উপর বর্ষন করলেন। আর সেই বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তিনি সত্যের অস্বীকারকারীদের শাস্তি দান করলেন। কারণ সত্যের বিরোধীদের এ হচ্ছে প্রতিফল।"*
> *(আল কুরআন ৯ ঃ ২৫-২৬)*

যুদ্ধ প্রাপ্ত সম্পদ

যুদ্ধ শেষ। বহু সৈন্য বিশেষত মহিলা ও শিশুরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হল। কিন্তু তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হল ছায়াপূর্ন বিশাল হল ঘরে। এবং তাদের যথাযথ খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হল নবী (সাঃ) –না ফেরা পর্যন্ত। তিনি ফিরে এসে দেখলেন বেশিরভাগ বন্দীর জীর্নশীর্ন পোষাকআসাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে তাদের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন।এবং তারা সকলে এই পোষাক পেল। তার পর তিনি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদগুলো ভাগ বাটোয়ারা করলেন, এর মধ্যে ছিল চল্লিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা, কুড়ি হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগল। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিলেন না ছ'হাজার বন্দীকে , কারণ তিনি জানতেন হাওয়াজীন গোত্র তাদের কে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শীঘ্রই বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাবে।

নবী (সাঃ) ভাগ বাঁটোয়ারা শুরু করলেন। তিনি কুরাইশদের যুদ্ধ লব্ধ মাল থেকে দিলেন বিশেষ করে আবু সুফিয়ান ও হাকিমকে। হাকিম ছিলেন খাদিজা (রাঃ) -এর ভাগ্না - এদেরকে আল্লাহর রসূল এই সম্পদের ভাগ দেবেন- এটা আনসারদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি এই মাল থেকে সুহায়েল ও সাফওয়ান কে

একটি অংশ দিলেন, এরা মুসলমানদের সঙ্গে থেকে হাওয়াজীনদের বিপক্ষে যুদ্ধ করলেও তখনও এরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা তা গ্রহন করতে ইতস্ততায় ভুগছিলেন। তাদের এই যুদ্ধ লব্ধ অংশ থেকে কিছু দেওয়া প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত,

> "এই সাদকা সমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য, যাদের মন জয় করা হল উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে গলদেশের মুক্তির জন্য ও ঋনভারাকান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য, এ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ, আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ।"

নবী (সাঃ) এ অর্থ দিয়েছিলেন তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার জন্য নয়। বরং তাদের সাংসারিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য। এটা ছিল তাদের শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য একটি ব্যবস্থা। এই পার্থিব সম্পদ দিয়ে তিনি তাদের হৃদয় জয় করার ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন। সাফাওয়ান ও সুহায়েল ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশয়ে ছিল। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের সাথে শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। তাই তিনি স্বাভাবিক ভাবে বড় ধরণের দান তাদের দিয়েছিলেন। তবে নবী (সাঃ) এ ধরনের উদার আচরণে ইসলামের শত্রুরা আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। আর এটা সকলে বুঝতে পেরেছিল যে এ ধরনের কাজ কেবল রসুলের পক্ষেই সম্ভব। তাই মুহাম্মদ (সাঃ), আল্লাহর রসূলই। আবু সুফিয়ান কে নবী (সাঃ) চিনতেন। আরো জানতেন তার সামাজিক মর্যদার কথাও, তাই তিনি তাকে নানান দিক থেকে সম্মান প্রদান করেছিলেন।

দাতার হাত গ্রহীতার হাতের উপর অবস্থান করে

সাহাবা হাকিম এ সময় বেশ পরিমান যুদ্ধ লব্ধ মাল পেয়েছিলেন। এতে তাকে বেশী খুশি মনে হচ্ছিল। এমন কি তিনি এতটাই আনন্দ অনুভব করছিলেন যাতে করে মনে হচ্ছিল এই সম্পদের চেয়ে আর প্রিয় কোন কিছুই তার কাছে নেই। তখন নবী (সাঃ)- তার আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য বললেন "দাতার হাত সব সময় গ্রহীতার উপর অবস্থান করে" অর্থাৎ দাতা সব সময় মহান, তার মর্যাদা অবশ্যাই– গ্রহীতাকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি হাকিমকে শিক্ষা দিলেন যে যারা অর্থ সম্পদ অন্যকে দান করার ব্যাপারে উদার এবং সেই সাথে দরিদ্র ভুখা মানুষকে তাদের ধন সম্পদ দিয়ে থাকে তারা তুলনামূলক ভাবে শ্রেষ্ঠ যারা অর্থের জন্য চেয়ে চেয়ে বেড়ায়। তিনি তাকে এ শিক্ষাও দিলেন যে সে যে সম্পদ পেয়েছে তা তার একার ভোগ করা উচিত নয়। গরীব দুঃখীদের জন্যও তার এই সম্পদ ব্যয় করা উচিৎ।

সেরা আনুগত্যের প্রকাশ

মদিনার আনসাররা নবী (সাঃ) এর এই যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টনের এরকম ব্যবস্থায় অনেকটা হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রায় বেশীর ভাগ সম্পদই ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে। এক চাপা গুঞ্জন দেখা গেল তাদের মধ্যে। মনে হচ্ছিল মুহাম্মদ (সাঃ) যেন ইচ্ছা করেই মক্কার অধিবাসী যারা নবী (সাঃ) এর আত্মীয় স্বজন ছিল তাদের মধ্যে সম্পদ গুলো ভাগ বাঁটা করে দিয়েছেন যা তাদের অনেকেরই প্রয়োজন ছিলনা। অপর দিকে মদিনা বাসীদের তা প্রয়োজন ছিল। তাই তারা হতাশ হয়ে ছিল এবং সেই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে ছিল জনসমক্ষে, এই সময়ে মদিনাবাসীদের পক্ষ থেকে সাদ উপস্থিত হলেন নবী (সাঃ) -এর কাছে এবং উচ্চকণ্ঠেই তার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, নবী (সাঃ) তার ক্ষোভ শুনলেন তার পর তাকে আদেশ করলেন সমস্ত মদিনাবাসীকে একত্রে জড়ো করার জন্য, যাতে করে তিনি তাদের যা বলবেন তা সকলে যেন শুনতে পায় ভাল করে। এর পর নবী (সাঃ) ও আনসারদের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন শুরু হল:

রসূল : হে আনসারগণ আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কি কথা শুনলাম যখন আমি তোমাদের মধ্যে এসে ছিলাম ,তখন কি তোমরা ভ্রান্তিতে ছিলেনা ? এবং আল্লাহ কি তোমাদের পথ দেখান নি ? তোমরা কি গরীব ছিলেনা? তার পর আল্লাহ কি তোমাদের ধনী করেন নি ? তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলেনা ? অতঃপর আল্লাহ কি তোমাদের পরস্পরের বন্ধু বানিয়ে দেননি ?

আনসারগণ : হ্যাঁ, আল্লাহ ও আল্লাহর দূত কতইনা বদান্য ও উদার

রসূল : হে আনসারগণ তোমরা কি আমার উত্তর দেবেনা ?

আনসারগণ : হে আল্লাহর রসূল কি উত্তর আমরা আপনাকে দেব, সমস্ত বদান্যতা ও আনুগ্রহ আল্লাহর ও তার নবীর জন্য।

রসূল : কিন্তু আল্লাহর শপথ যদি তোমরা কিছু বলতে চাও নিশ্চয় বলতে পার।

আনসারগণ : যখন আপনি আমাদের মধ্যে এলেন, আপনাকে সকলেই মিথ্যা বলেছে আমরা আপনাকে সর্বপ্রথম সত্য বলে মেনে নিলাম, আপনাকে সকলেই পরিত্যাগ করেছে, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করলাম, আপনাকে সকলেই বিতাড়িত করল, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিলাম, আপনি যখন গরীব, আমরা আপনাকে স্বান্তনা দিলাম।

রসূল : হে আনসার গন আমি ঐ সমস্ত যা কিছু করেছি, এর এক মাত্র কারণ, তাদের ভালবাসা অর্জন করতে যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলতে পারি–

হিজরতের দ্বারা আমি কি মদিনাবাসী হয়ে যায়নি ? সমগ্র মানুষ যদি একটি পথ পছন্দ করে এবং আনসারগন যদি অন্য পথ পছন্দ করে তাহলে আমি আনসারদের দলে।

হে আনসারগণ, কেউবা কতগুলো টাকা নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেউবা কতগুলো উট নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেউবা কতগুলো ভেড়া নিয়ে ঘরে ফিরছে, আর আনসার গন আল্লাহর নবীকে নিয়ে ঘরে ফিরছে। কারা বেশি খুশি হবে ? তোমরা কি খুশি নও।

এ কথা শোনার পর আনসাররা একেবারে নিরব হয়ে গেলেন তারপর রসূল আল্লাহর কাছে দেওয়া করলেন,

> "হে আল্লাহ, তোমার রহমত আনসারদের উপর, তাদের ছেলেমেয়েদের উপর, তাদের ছেলেমেয়েদের ছেলেমেয়েদের উপর, অর্থাৎ বংশানুক্রমিক বর্ষিত হোক !"

এ কথা শুনে আনসাররা মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তাদের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তারা বলেই ফেলল,

> " আর বলার কিছু নেই, আমরা সবচেয়ে বেশী খুশি, বেশী সুখী আল্লাহর নবীর সাথে।"

নবী (সাঃ) যে ভাষন আনসারদের সামনে রেখেছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক গভীরে। জীবনের অর্থ কেবল পার্থিব বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পার্থিব সম্পদ নষ্ট হয়। হারিয়ে যায়, কেনা বেচা করা যায়। কিন্তু মানুষের জন্য দয়া, প্রেম প্রীতি ভালবাসা কেনা যায়না, বেচা যায়না কোন সময় তা নষ্টও হয়ে যায়না, মানুষের আধ্যাত্মিক পাওনাই সবচেয়ে বড় পাওনা, মদিনাবাসীরা প্রথমত পার্থিব বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্থ হলেও পরে যখন তারা তাদের সাথে রসূলকে পাওয়ার নিশ্চয়তা পেল তখন তাদের কাছে এই পার্থিব সম্পদের আর কোন মূল্য রইলনা, কারণ তাদের কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল ও পরকাল অনেক বড় ছিল এই যুদ্ধের মালের চেয়েও।

কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ

কিয়ামত কবে সংগঠিত হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এ জ্ঞান সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে, যিনি অতীত ভবিষ্যত বর্তমান – সব কিছুই জানেন। আর এ ধরনের এক ঘটনার ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করা এক মাত্র আল্লাহরই সাজে।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে এর কিছু লক্ষন উদ্ভাসিত হতে পারে। যেমন বৈজ্ঞানিকেরা তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব কিছু নিদর্শন দেখে তার আসন্নতাকে অনুমান করতে পারে। তেমনভাবে নবী রসূলরাও তাদের অন্ত

নিঁহিত জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এ বিষয়ে কিছুটা অনুমান করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সাধারন মানুষ একে বারে কিছু বলতে পারেনা। তাই আল্লাহর শেষ নবী মহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জন্য কিয়ামতের কিছু কিছু লক্ষন প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ সকল সার্বিক লক্ষন দেখে আমরা অনুধাবন করে বুঝতে পারি কিয়ামতের আসন্নতাকে, এগুলো এত স্বাভাবিক লক্ষন যা বোঝার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক গনিতজ্ঞ কিংবা রসায়নবীদের প্রয়োজন হয়না, তাদের সকলের মত আমরা সাধারণ মানুষেরাও সেগুলো দেখতে পারি। কিন্তু বড় কথা হল আমরা এসকল নিদর্শণ দেখার ও বোঝার পর কিয়ামত সম্বন্ধে কতটা সচেতন হতে পারব ! এবং আমরা কতটা নিজেদের আচরণবিধিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারব?

এখানে আমরা নবী(সাঃ)– এর কয়েকটি হাদীস আলোচনা করব যেগুলো পাঠে ও বিশ্লেষনে কিয়ামতের আসার একটি ছবি ফুটে উঠবে। আজকের পৃথিবীতে যে সকল ঘটনা গুলো ঘটছে তা বিশ্লেষন করলে আমরা সহজেই বলতে পারি কিয়ামতের সময় খুব বেশী দূরে নয়। নবী (সাঃ)-এর খুব নিকটবর্তী দুই সাহাবা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় নবী (সাঃ) নিচের লক্ষণগুলিকে কিয়ামতের আসন্ন সময় বলে প্রকাশ করেছেন।

- মানুষের রক্তের মূল্য কমে যাবে।
- আইন অমান্যকারী ও সীমালঙ্ঘন কারীরা সমাজে নেতা হবে।
- সবচেয়ে দুষ্টু লোকেরা সমাজের শাসক হবে।
- হীন লোকেরা সমাজের নেতা হবে।
- পাপ কাজকে হালকা বলে মনে করা হবে।
- পশুর মত যৌন জীবন কামনা স্বীকৃতি লাভ করবে।
- সমকামীতা সমাজে বিস্তার লাভ করবে।
- গায়ক গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্রের রমরমা ঘটবে।
- গায়ক মহিলার সংখা বাড়বে।
- প্রচুর পরিমানে মদ খাবে লোকেরা।
- সমাজের সর্ব স্তরে খুন চলবে অবাধে।
- কথায় কথায় মানুষ মিথ্যা কথা বলায় অভ্যস্ত হবে।
- সত্য মিথ্যা সহজেই পার্থক্য করা যাবেনা।
- ছেলে মেয়েরা তাদের পিতামাতার অবাধ্য হবে।

- বন্ধু বন্ধুর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।
- নামায অবহেলিত হবে।
- ধর্মবিহীন শিক্ষার প্রসার ঘটবে।
- যথেষ্ট পরিমান বৃষ্টি হবেনা, এবং তা হবে অসময়ে।
- ভূকম্পনের পরিমান বেড়ে যাবে।

লোকেরা তাদের কুকীর্ত্তির ভয় থাকা সত্বেও সম্মানিত হবে,

নবী (সাঃ) আরও সতর্ক করে বললেন,

> *"তীব্র ঝড়, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং অন্যান্য চিহ্ন গুলো এমন ভাবে দ্রুত ঘটতে থাকবে যেন ছেঁড়া মালার এক একটি পুতি দানা একের পর এক খসে পড়ছে "*

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন,

> *"কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে জ্ঞান উধাও হবে অজ্ঞতা সারা দুনিয়া ছেয়ে ফেলবে, তখন ব্যাপক ব্যাভিচার হবে এবং লোকেরা খুব বেশী করে মদে অভ্যস্থ হবে।"*

বর্তমান যুগেও এটা লক্ষ করা যাচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে মদের রমরমা কারবার চলছে। তাছাড়া ব্যাভিচারের কথাতো না বলাই ভালো। দুটো জিনিস সমাজের খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

যখন সালাম পুত্র আবদুল্লাহ রসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন শেষ দিনের প্রথম নিদর্শন কি? তিনি উত্তর দিলেন,

> *"শেষ দিনের প্রথম নিদর্শন হল একটা আগুন যা মানুষ কে ধাওয়া করবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে।"*

নবী (সাঃ) এর এই হাদীস প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আসাদ এক যুগান্তকারী মন্তব্য পেশ করেছেন। মুহাম্মদ আসাদ ধর্মান্তরিত মুসলমান যিনি একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি ছিলেন। তাকে পৃথিবীর মানুষ চেনে বিখ্যাত সাংবাদিক, সমাজ সংস্কারক, কুটনীতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে। তিনি বলেছেন,

"This appears to be symbolic description of a social disaster which will destroy the foundation of Eastern cultures and will drive the people of the East towards the blind initiation

of the west. It is described as `fire' because, like fire west will consume the remaining culture strength of the Eastern people, and turn their past into dead history without connection with the present."

> "সম্ভবত এটা একটি প্রতিকী বিপর্যয়ের বর্ননা যেটা প্রাচ্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবে। এবং এর ফলে মানুষ অন্ধের মত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহন করবে, একে আগুন বলে বর্ননা করা হয়েছে কারন আগুনের মতই পাশ্চত্য সভ্যতা প্রাচ্যের মানুষকে গ্রাস করবে। বর্তমানের সাথে কোন সংযোগ না রেখে তা ফিরে যাবে অতীতের মৃত ইতিহাসে।"

অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রসূলের আসন্ন কিয়ামত সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী।

কুরআনে কিয়ামতের ভীষন ভয়াবহ সব লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই সঙ্গে আল্লাহর রসূল ও আমাদেরকে কিছু ভবিষ্যত বানী করে বলেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেড় হাজার বছর পরেও তার কথার সত্যতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে দেখেছি সারা বিশ্ব জুড়ে। বিশেষ করে মদ পানের ব্যাপকতা ও ব্যভিচারের প্রকাশ্য উৎপাত যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। হত্যা, সন্ত্রাস সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি উদ্ভুত হয়েছে তাতে কিয়ামত যেন আমাদের আহ্বান করছে।

এগুলো থেকে কি বোঝা যাচ্ছে ? আল্লাহ তার অতিব দয়ার ছায়ায় স্থান দেওয়ার জন্য আমাদের সাবধান করছেন যাতে করে তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষ আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তাহলে কে আছে এমন যারা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারবে ? আমরা হাজার চেষ্টা করলেও কিয়ামত ঠেকাতে পারবনা কিন্তু নিজেদের কর্মকে সংশোধন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে আমাদের ক্ষতি কোথায়? নবী (সাঃ) বলেছেন,

"মানুষের কাজ তার অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে"

কমপক্ষে আমাদের সবাইয়ের উচিত ভাল পথে চলার আভিপ্রায় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এই টুকু অভিপ্রায় হয়তো আমাদের বাঁচিয়ে দেবে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকে।

এক বেদুইন ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথোপকথন

বিখ্যাত সাহাবী খালীদ (রাঃ) বর্ননা করেছেন এক সময় এক বেদুইন রসূলের কাছে এলে তাদের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন হয়েছিল।

বেদুইন :ওগো আল্লাহর রসূল আমি আপনার কাছে এসেছি পরকালের জীবন সমন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

রসূল (সাঃ)	:	বল তোমার ইচ্ছা।
বেদুইন	:	আমি সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তুমি সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী লোক হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	তৃপ্ত মনের অধিকারী হও, তাহলে তুমি সবচেয়ে ধনী লোক হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি সবচেয়ে নিঁখুত মানুষ হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	নিজের জন্য যা আকাঙ্খা কর, অপরের জন্যও তা আকাঙ্খা কর। তাহলে তুমি সবচেয়ে নিঁখুত মানুষ হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি সবচেয়ে শক্তিশালী হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখ তাহলে শক্তি শালী মানুষ হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	বেশী করে আল্লাহর স্মরন কর তাহলেই আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ করতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি ভাল আচরনের হয়ে থাক তাহলে তুমি তোমার বিশ্বাস সম্পূর্ন করতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি তাদের দলে যুক্ত হতে চাই যারা ভাল কাজ করে।
বেদুইন পাওনা কিন্তু	:	আল্লাহর আনুগত্য কর। যদিও তুমি তাকে দেখতে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। এই ভাবে তুমি

		তাদের দলে হতে পারবে যারা ভাল কাজ করবে।
বেদুইন	:	আমি আল্লাহর অনুগত হতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি আল্লাহর আদেশ পালন কর তাহলে তুমি আল্লাহর অনুগত হতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি আমার জীবিকা বাড়াতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি নিজেকে খাঁটি বানাও তাহলে তুমি তোমার জীবিকা বাড়াতে পারবে।
বেদুইন	:	আমি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রিয় হাতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি আল্লাহর এবং আল্লাহর রসূল যা ভালবাসেন তাই ভালবাস তাহলে আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে?
বেদুইন	:	**আল্লাহর ক্রোধ ও কিয়ামতের খারাবি থেকে বাঁচতে চাই।**
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি তোমার কাছের সৃষ্টির প্রতি মেজাজ না দেখাও তাহলে তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও কিয়ামতের খারাবি থেকে রক্ষা পাবে।
বেদুইন	:	আমি পছন্দ করি যাতে করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন অপমান না করেন।
রসূল (সাঃ)	:	যদি তুমি তোমার চরিত্রকে রক্ষা কর, আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন অপমান করবেন না।
বেদুইন	:	আমি কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপূর্ণ পোষাক পেতে চাই।
রসূল (সাঃ)	:	তুমি তোমার কাছের লোকদের দোষকে প্রকাশ করো না, তাহলে আল্লাহ তোমার কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপূর্ণ পোষাক পরাবেন।
বেদুইন	:	আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাল কাজ কোনটা ?
রসূল (সাঃ)	:	নমনীয় আচরণ, উদারতা ও ধৈর্য্য।
বেদুইন	:	কোন জিনিস আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ ?
রসূল (সাঃ)	:	বদ মেজাজ ও লোভ।

21

মদিনার প্রতি রসূলের ভালবাসা

মক্কায় দু সপ্তাহ অবস্থান করার পর নবী (সাঃ) মদিনায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি ওমরার কাজটাও সেরে নিলেন। এই কটা দিন তিনি মদিনা ছেড়ে এলেও এখন তার মন মদিনায় ফিরে যেতে চাইল। একদিন তিনি মদিনায় কেবল বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজে এসেছিলেন। এখন তিনি সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছেন। সেখানকার টান গৃহ টানের মতই তার কাছে। যদিও মদিনার কৃষ্টি সংস্কৃতি মক্কা থেকে সম্পূর্নরূপে আলাদা রকমের ছিল কিন্তু এখন তার সব কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন তিনি পরিবেশগতভাবে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, তাছাড়া তার মানসিক ভারসাম্যও এসেছে মদিনার মানুষদের একান্ত কাছে পেয়ে। ক্রমে ক্রমে মদিনাবাসীদের সাথে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে তা অতি মজবুত। এখন মদিনাকে ঘিরেই তার সমস্ত আশা আকাঙ্খার উত্থান পতন ঘটে। আর সব দিক থেকে তিনি এখানে বিশাল ব্যাক্তিত্বের অধিকারী। মদিনাবাসীদের জন্য রসূলের ভালবাসা এখানে প্রগাঢ়। আর এই আধ্যাত্মিক ভালবাসার প্রভাবে সমস্ত গোত্র আজ থেকেই একই সূত্রের বাঁধনে বাধা।

দৈনন্দিন জীবন গড়িয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েই চলল। সে জন্য নবী (সাঃ) তাদের ধর্মীয় শিক্ষা দীক্ষা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বস্ত সাহাবাদের নিয়োগ করলেন। যারা নব মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা, কুরআনের শিক্ষা, নবীর শিক্ষা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

অপরদিকে এদিক ওদিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বিশৃঙ্খলা। নবী (সাঃ) সেগুলো দমন করার জন্য ছোট ছোট দলের সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। তারা সার্থকতার সাথে এ সকল বিশৃঙ্খলা দমন করল। অবশ্য মাঝে মাঝে ছোট খাট যুদ্ধ চালিয়েও বিশৃঙ্খলা আয়ত্বে আনতে হয়েছিল। এতে তিনি মদিনার শাসনকে যথাযথ সার্বভৌমত্ব প্রদান করেছিলেন।

হৃদয়ের গোপনীয়তা

নবী (সাঃ) উত্তর দিকে বেদুইন গোত্রগুলির দিকে অভিযান পাঠিয়ে ছিলেন। বিশেষ করে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোত্রটি হল বনু মুররা নামে একটি গোত্র। এরা আক্রমন চালিয়ে ছিল ইহুদী কৃষকদের উপর অতর্কিতভাবে। তখন এই চাষিগুলো তাদের ফাদাক নামে মরুদ্যানের মাঠে চাষের কাজে ব্যস্ত ছিল, ফাদাক অঞ্চলটি মুসলিমদের অধীনে ছিল। মুসলিমরা যখন এই অভিযানে গিয়েছিল তখন তারা খুব বিরোধিতার সন্মুখীন হল। এমনকি সেখানে যে ত্রিশজন সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তারা সবাই নিহত হলেন। নবী (সাঃ) পুনরায় দুই শত মুসলিম সৈন্যকে পাঠালেন। এদের সঙ্গে যায়েদ পুত্র উসামাও ছিল। উসামার বয়স ছিল কম। মাত্র সতের বছর বয়সের। ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল। সমস্ত গোত্রগুলি একত্রিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। তাদের সবাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের পরাজিত করা এবং সেই সাথে ফাদাক অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে তার সম্পদের মালিক হওয়া।

কিন্তু এরকম কঠিন পরিস্থিতিতেও অবস্থা মুসলিমদের অনুকুলে এসেছিল। বনু মুররা গোত্রের এক নেতা উসামাকে এই বয়সে যুদ্ধে আসার জন্য উপহাস করছিল। এ কথা শুনে উসামা নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন সময়ে দেখিয়ে দেবার জন্য। সত্যিসত্যিই একটা সময় এল যখন ঐ বেদুইন নেতা উসামার আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ল। উসামা তখন তার পেছনে ধাওয়া করল এবং অবশেষে তাকে ধরেই ফেলল। তারপর তাকে জোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল। এর ফলে বেদুইনটি বেশ আঘাত পেল এবং করুনস্বরে জানাল যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কিন্তু উসামা তার এই কলেমা পাঠ কে কোন গুরুত্ব দিলনা বরং তাকে শত্রুভেবেই হত্যা করে ফেলল। যখন উসামা যুদ্ধ শিবিরে ফিরে গেল তখন তার এই নিষ্ঠুর আচরণ শুনে সবাই খুব মর্মাহত হল। পরে অবশ্য উসামা নিজের বাড়াবাড়িটা বুঝতে পারলেন।

এরপর উসামা মদিনায় ফিরলেন। তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে তৎপরতার সাথে সাক্ষাত করলেন। নবী (সাঃ) তার বিজয় কাহিনী শুনে খুবই খুশি হলেন। এবং সাদর সম্ভাষন জানালেন তার এই বিজয়ের জন্য। কিন্তু পরক্ষনে যখন তিনি ঐ বেদুইনের কথা শুনলেন এবং সে মৃত্যুর আগে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা নেই।' মুখে বলে শুনিয়েছে। উসামা তবুও তাকে শত্রুর মত সন্দেহ করে হত্যা করেছে তখন তাই আল্লাহর রসূল তার এ কাজকে অনুমোদন করলেন না। রসূল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "উসামা তুমি তাকে হত্যা করলে এর পরেও যখন সে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা বা উপাস্য নেই' – বলেছিল। উসামা নবী (সাঃ) কে

উত্তর দিয়ে বলল বেদুইনটা কেবল হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্য এই শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করেছিল। নবী (সাঃ) এ কথা শুনবার পর ভীষণ রেগে গেলেন এবং বললেন "তুমি কি তার হৃদয় ফেঁড়ে দেখেছিলে যে সে সত্য কিংবা মিথ্যা বলছে"। নবী (সাঃ) এর এই ধমকে উসামা ভয় পেয়ে গেলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তাই নবী (সাঃ) তাকে এবারের মত ক্ষমা করে দিলেন।

নবী (সাঃ) এর এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি। নবী (সাঃ) কত উদার ছিলেন মানুষের প্রতি। মানুষ মানুষের জন্য। মানুষ শত্রু হোক বা মিত্র হোক তার প্রতি জুলুম করা যাবে না। বেদুইনের এই স্বীকৃতি দান দ্বারা তাকে ছেড়ে দিতে হয়। উসামার ঐ ব্যাক্তিকে হত্যা করা ঠিক হয়নি। তিনি যদি সঠিক ব্যাপার নির্ণয় করতে পারতেন তাহলে বেদুইনের প্রাণনাশ হত না। এখানে উসামার চিন্তা ভাবনা সঠিক জায়গায় পৌঁছায় নি। শান্তির জন্য সব সময় ইতিবাচক ভাবনাতো ভাবতে হয়। এই রকম অবস্থাকে কুরআন ইতিমধ্যে মুসলমানদেরকে যুক্ত করেছে শান্তিপূর্ন কাজে। যাতে করে মানুষ শান্তির মধ্যে স্থিতিলাভ করে। কুরআনের ঘোষনা,

> *"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হবে, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো, কেউ তোমাদের সালাম দিলে তাকে বলে ফেলনা যে, তুমি মুমিন নও। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ পেতে চাও তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর পরিমানে গনিমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো এর আগে ঠিক এমন অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই সতর্কতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার সাথে কাজ করো। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।" (কুরআন ৪ ঃ ৯৪)*

যখন বেদুইনটির মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়েছিল তখন সে শান্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছিল কিন্তু উসামা তার পূর্ব অভ্যস্ত গোত্রীয় অহংকার প্রয়োগ করতে তৎপর হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের মহান আদর্শের কথা তিনি সেই মুহুর্তে ভুলেই গিয়েছিলেন। তার মনে আপাতদৃষ্টিতে যে বিচার বিবেচনা উপস্থিত হয়েছিল সেইভাবে আকস্মিক আচরণ ঘটিয়ে ছিল। যেহেতু তাকে ছোট বলে উপহাস করা হয়েছিল তাই তার মনে সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেব অজ্ঞ মনোভাবের বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল। যা ছিল পূর্বকালীন অজ্ঞ যুগের ফসল। ইসলাম যে আদর্শ নিয়ে মানুষের সংস্কার চেয়েছিল তা সে নিজের কাজের মধ্যে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর থেকেই উসামা ভাল আচরণ করবে বলে শপথ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি যে কাজ কারবার করতেন তা খুব সুক্ষ্ম বিশ্লেষন ও ন্যায় নীতির সাথে করতেন। মাত্র তিন বৎসর পরে আল্লাহর রসূল

যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন এই উসামাকেই ইসলামি যুদ্ধ নীতির সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কোন মানুষের মধ্যে কোন সত্য লুকিয়ে আছে তা আমরা কেমন করে বলতে পারি ? এক আল্লাহ ছাড়া কেউ এ কথা বলতে পারে না। এ জ্ঞান মানুষ কে দেওয়া হয়নি। এমন কি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও এরকম ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়তেন ও ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। কোন ঝোঁকের বশে কোন কাজ তিনি ঝট করে করতেন না। নবী (সাঃ) -এর চারপাশে কপটদের ঘোরাফেরা কম ছিল না। কিন্তু তিনি কখনই তাদের প্রতি চটজলদি কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন না। তিনি তাদের প্রতি সতর্ক থাকতেন। সচেতন থাকতেন তাদের চলাফেরায়। তাদের শাস্তির জন্য একেবারে চরম সিদ্ধান্ত নিতেন না।

তাবুক অভিযান

নবী (সাঃ) -এর মক্কা বিজয় এক গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। মক্কা বিজয়ের দ্বারা এটা স্পষ্টত সমগ্র আরব বিজয়ের সমকক্ষ বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এবং তার সাথিরা এটা জানতেন যে উত্তরাঞ্চলের বিপদ কম নয়। যে কোন মূহুর্তে বিপদ আসতে পারে। কেননা মুতা-যুদ্ধ একপ্রকার অমীমাংসিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। সত্যি সত্যি উত্তরাঞ্চল থেকে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। এটা পরিস্কারভাবে বোঝা গেল যে রোমে হিরাক্লিয়াস অন্যান্য আরব গোত্রদের সাথে একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আক্রমন করতে সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা করে ফেলেছে। তাই তিনি সামনে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। এই মূহুর্তে আর বসে থাকা চলবেনা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার সমস্ত সাথিদের জমায়েত করালেন নিজের বাসস্থানে। তারপর দীর্ঘ আলোচনার পর নবী (সাঃ) উত্তরাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা ছিল গ্রীষ্মকাল। গত কয়েক বছর ভাল ফসল হয়নি। আর এ বছর অভিযানের খরচ হিসাবে অর্থ ও ফসল উভয়ই প্রয়োজন ছিল। নবী (সাঃ) অনুচরদের কাছে খবর পাঠালেন যাতে করে সকলের প্রচেষ্টায় রোমান শক্তির পতন ঘটানো যায়।

ফসল তোলা হয়নি তা ছাড়া গ্রীষ্মকাল। কিন্তু নবী (সাঃ) হতাশ হলেন না। বিরাট অভিযান হলেও, সাহাবারা ছিলেন উদার হস্তের। তারা এ অভিযানে খরচ জোগাবেন বলে নবী (সাঃ) -কে আশ্বাস দিলেন। তারা বললেন খাদ্য পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হজরত আবুবকর (রাঃ) দানের দিক থেকে ছিলেন খুবই মর্যাদার অধিকারী। তিনি তার সমস্ত সম্পদ হজরতের সামনে নিয়ে এসে হাজির করলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তার সম্পদের অর্ধেক এই জিহাদে দিয়ে দিলেন। হজরত ওসমান গনি (রাঃ)

দিলেন দশ হাজার উট, দশ হাজার সৈন্য সেই সঙ্গে দশ হাজার উটের খাদ্য সামগ্রী। তাছাড়া অন্যান্য সাহাবীরা যে যা পারলেন সবাই তাদের অর্থ দিয়েছিলেন এই অভিযানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সামগ্রী যথেষ্ট হল না। নবী (সাঃ) সাহাবাদের কাছে আরোও কিছু প্রার্থনা করলেন। এতে যারা আর দিতে পারলেন না তারা হৃদয়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললেন। তারা অনুভব করতে পেরেছিলেন এই মুহূর্তে তাদের এই দান কত প্রয়োজনীয়।

যাই হোক ধীরে ধীরে মুসলিম যুদ্ধ কাফেলা এগিয়ে চলল। তাবুকের পথে, তাবুক ছিল রুক্ষ পরিবেশের। সিরিয়ার পথে মদিনা থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। সময়টা ছিল নবম হিজরীতে। ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্য কুচকওয়াজ করে এগিয়ে চলল এক বিরাট আশা নিয়ে। মুসলিমদের নেতৃত্বে রয়েছেন নবী (সাঃ) স্বয়ং। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার কিন্তু রোমান বাহিনীতে সব মিলিয়ে একলাখের ও বেশী সৈন্য ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম মিলিটারী প্রদর্শন ছিল এই অভিযান। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোমান শক্তির কাছে এটি অনেকটা দুর্বল মনে হচ্ছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) -এর প্রভাব তার সাহাবীদের উপর এমনভাবে পড়েছিল যে তারা কেউই যুদ্ধ ক্ষেত্রের মুখোমুখি হতে সাহস হারাননি। নবী (সাঃ) যে সাহসী উৎসাহ তার সাহাবীদের দিয়ে এসেছেন তার ফল এর আগে অনেক দেখা গিয়েছে। এমনকি নবী (সাঃ)-এর উপদেশ শুনেই আরবের বিবাদশীল গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়েছে রাজনৈতিকভাবে। তারা লড়েছে আরবের অন্যান্য শক্তিশালী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে যারা ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু।

কিন্তু নবী (সাঃ) -এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও হতভাগ্য কয়েকজনের ভাগ্যে এই অভিযানে যাওয়ার সৌভাগ্য জুটল না। তারা জীবন ও ধন সম্পদ দিয়ে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হল না। একে অপরকে গরমের অজুহাত দেখিয়ে ঘরে বসেই রইল। কিন্তু মহান রব্বুল আলাআমীন সকলের ঘরের খবর জানতেন। তিনি অহী অবতীর্ন করে মুসলমানদের জানিয়ে দিলেন,

> *"যারা পেছনে রয়ে গেল তারা রসূলের বিরুদ্ধচারণ করে বসে থাকতেই আনন্দ পেল এবং তাদের ধন সম্পদ জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করল না। তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না'। তুমি বল জাহান্নামের আগুন অধিক উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতো।" (কুরআন ৯ ঃ ৮১)*

যারা এ অভিযানে অংশ গ্রহন করল না তারা প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত হলেন। তবে তিন জন প্রকৃতপক্ষে তাদের অসুস্থতার জন্য এই অভিযানে যোগ দিতে পারেনি। তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

দীর্ঘ দিনের জন্য নবী (সাঃ) মদিনা ত্যাগ করবেন তাই তিনি একটি অস্থায়ী সরকার ও গঠন করে রাষ্ট্র চালানোর ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া আবুবকর (রাঃ)-কে ইমামতির দায়িত্ব দিলেন। আলি (রাঃ) কে দায়িত্ব দিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী পরিবারগুলির দেখা শোনার জন্য। আর শহরের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করে গেলেন মুহাম্মদ বিন মাসালামকে।

আল্লাহর পথে মুসলিমদের এ বিরাট বাহিনী এসে থামল হিজর নামক এক স্থানে। এই জায়গায় আল্লাহর আর এক নবী সালেহ এসেছিলেন কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মুসলিম বাহিনীরা এখানে বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল কিন্তু নবী (সাঃ) তাদেরকে এখানে বিশ্রাম করতে দেননি বরং তাবুকে গিয়ে পৌঁছালেন। রোমানরা বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পেলেন যে রসূল (সাঃ) বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুকে পৌঁছে গেছেন। তৎক্ষনাতই তারা সিরিয়া অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় নবী (সাঃ) এসেছিলেন রোমানদের হাত থেকে আরবকে মুক্ত করতে। তিনি সিরিয়ার দখল নিতে আদৌ আসেননি বরং আল্লাহর একত্ববাদ সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ারই পরিকল্পনা ছিল তার। সীমান্তে যে সকল নেতা নিযুক্ত ছিল তাদের মধ্যে জোহান বিন রুবা নামে এক নেতা নবী (সাঃ)-এর কাছে আত্মসমর্পন করে পত্র লিখলেন।

"পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, ইহা আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) নবী এবং আল্লাহর দূত এবং আইলা গোত্রের জোহান বিন রুবার নিকট হতে নিরাপত্তার দলিল, জল ও স্থলের উপর তাদের নৌকা ও অন্যান্য যানবাহনগুলো আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের সংরক্ষনে থাকল এবং সিরিয়া ইয়ামেন ও সমুদ্রবাসী যে লোকজন তাদের সাথে থাকবে সবাই যদি কোন আক্রমনের শিকার হন তাহলে নবী (সাঃ) তাদের সাহায্য করবেন।"

নবী (সাঃ) ও রুবা-র মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব এতই সুদৃঢ় হল যে পরস্পর উপঢৌকন বিনিময় করলেন। আরোও কয়েকজন খ্রীষ্টানও ইসলাম গ্রহন করলেন। আর এখান থেকে নবী (সাঃ) খালেদ-বিন ওয়ালিদকে জুমাতুল জানদালের শাসক উবাইদা বিন আব্দুল মালেক আলকেন্দীর কাছে পাঠালেন। তিনি তাকেও তার ভাইকে বন্দী করে মদিনায় ফিরলেন। নবী (সাঃ) খালিদের প্রত্যাবর্তনের কুড়ি দিন আগে ফিরেছিলেন। নবী (সাঃ) যুদ্ধ লব্ধ কোন সম্পদ আনেননি। তাই কপটরা বলাবলি করতে লাগল এ যুদ্ধে কি লাভ হল শুধু সন্ধি ছাড়া ? কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ যখন যুদ্ধ লব্ধ বহু ধন সম্পদ নিয়ে ফিরলেন তখন কপটরা অবাক হয়ে গেলেন, তখন তারা মুসলিমদের সাথে মিশতে চেষ্টা করল কিন্তু তখন তাদের ক্ষমা করা হল না। অবশ্য যে তিনজন সত্যিই অনুতপ্ত ছিল ও অসুবিধার জন্য এই অভিযানে অংশ গ্রহন করতে

পারেনি তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হল। কুরআনের ভাষায়,

"অবশ্য আল্লাহর নবী মুহাজির ও আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যারা সংকটকালে তার অনুসরণ করেছে, পরে তাদের একজনের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ ওদের ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়াদ্র দয়াময় এবং তিনি ক্ষমা করলেন, অপর জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল যে পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য উহা সংকুচিত হয়েছিল। তাদের জীবন তাদেরই জন্য দুর্বিসহ হয়েছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে অবশ্য তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন- যেন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।"

তাবুক অভিযানের আগে থেকে কপট মুসলিমরা নানা দিক থেকে মুহাম্মদ (সাঃ)কে কষ্ট দিচ্ছিল। এই অভিযানের আগে তারা একটা মসজিদ তৈরী করে নবী (সাঃ)-কে তা উদ্বোধনের জন্য আহ্বান করেন। নবী (সাঃ) এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন এটা প্রকৃত মসজিদ না হয়ে কেবল ষড়যন্ত্রের আখড়া বানানো হয়েছে তখন তিনি ঐ মসজিদটি ভেঙ্গেই দিলেন। কুরআনের ঘোষনা,

> "কিছু লোক আরও আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে (দ্বীনের আন্দোলন) ক্ষতিসাধন করবে এবং কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকেদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। সেই ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি বানাবে যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করেছে। তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, ভাল কাজ করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহই সাক্ষী যে তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" (কুরআন ৯ ঃ ১০৭)

ইতিমধ্যে মুনাফেক নেতা ইবনে উবাই মারা যান, সেই সঙ্গে এই কপট দলের বিদায় ঘটে।

প্রতিনিধি দল

হিজরীর নবম বৎসরকে বলা হয় 'প্রতিনিধিদের বছর'। মুসলিমরা এমন ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হল যে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি দল তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। প্রথমে এল বানু তাফিক গোত্রের প্রতিনিধি। হাওয়াজিন গোত্র প্রধান মুহাম্মদ (সাঃ)-র সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইল। কিন্তু

অন্যান্য গোত্রের মতো নি:শর্তে ইসলাম মেনে নিতে রাজি হল না। তারা ঘোষণা করলো যে তারা ইসলামকে মেনে নিতে রাজি আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাস ও উপাসনা পদ্ধতিকে পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে পারবে না। তারা তাদের দেবতা লাত-এর পূজা চালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নবী (সাঃ) এই ধরণের প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। ইসলাম গ্রহণ করা মানেই সমস্ত ভ্রান্ত দেব-দেবী থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহকে প্রভূ হিসাবে মেনে নেওয়া। মুহাম্মদ (সাঃ) জোরের সঙ্গে কুরআনের এ কথা জানিয়ে দেওয়ার পর তারা ইসলামকে নি:শর্তে গ্রহণ করে।

এরপর ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের এক প্রতিনিধি দল মুহাম্মদ (সাঃ)-র নিকট আসে। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। তারা উভয়ে ছিল উত্তরের গোত্র। মুহাম্মদ (সাঃ) জিজিয়ার বিনিময়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি করলেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ইহুদি-খ্রীষ্টানদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করবে। বিনিময়ে তারা ইসলামী সরকারকে কর দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) উপদ্বীপে বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের সহাবস্থানের সুযোগ করে দিলেন।

মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কখনোই আপোষ করেননি। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রাচীন রীতি নীতি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এবং ইসলামী রীতি নীতি পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। নামায, রোজা, যাকাত, হজ্ব সবই তার উপর বর্তাবে। যখন কোন গোষ্ঠী তাদের পূর্বতন বিশ্বাসের উপর জমে থাকতে চেয়েছে মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সঙ্গে পরিস্কার চুক্তি করেছেন– নিরাপত্তার বিনিময়ে কর প্রদান– এটাকেই বলা হয় জিজিয়া। মুহাম্মদ (সাঃ) দুটি পদ্ধতির একটিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে স্পষ্ট অবস্থান নিয়ে ছিলেন। হয় পূর্ণরূপে ইসলামকে মেনে নাও, না হলে কর দিয়ে নিরাপদে থাকো। আরবের অনেক গোত্র তা গ্রহণ করেছিল। তাবুকে তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) তার প্রতিশোধ নেননি।

মানুষের অধিকার

নবী (সাঃ) এর উচ্চ ধারণা

পাশ্চাত্য দর্শনে খুব ঘটা করে বলা হয়ে থাকে যে মানুষের অধিকারের ধারণা সর্বপ্রথমে ব্রিটিশদের মাগনা কার্টার চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু এই সকল দার্শনিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এটা অবশ্য জেনে রাখা দরকার যে মাগনা কার্টার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের ছ'শ বছর পরে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিরা যাই বলুক না কেন, মানুষের অধিকার বলতে কি বোঝায়? মানুষের অধিকারই বা কি ? মানুষের অধিকার কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে – এ সকল নানান ব্যাপারে ইসলাম দীর্ঘ দেড় হাজার বছর আগে পরিস্কারভাবে আলোচনা করেছে। আর এই আলোচনা বংশ, গোত্র, বর্ণ, দেশ – সব কিছুকে ছাড়িয়ে মানবধিকারের এক পূর্ন চিত্র তুলে ধরেছে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির কাছে। কুরআন ঘোষনা করেছে –

> *"হে মানুষ! আমিই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে পরস্পর ভাই বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত: আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানের সেই- যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নীতিপরায়ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত" (কুরআন ৪৯ ঃ ১৩)*

কুরআনের এই ঘোষনা সমগ্র মানুষের জন্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে। এ আহ্বান কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য করা হয়নি। এখানে মানুষের সমান হওয়ার বিষয়টাকে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সমস্ত মানুষের আগমন উৎস একই। সবাই আদম ও হাওয়ার বংশধর হিসাবে একই রক্ত বহন করে চলছে হাজার বছর ধরে। আর চোখের সামনে যে এত গোত্র, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্য আমরা দেখতে পাই তা কেবল পরস্পর চিনে নেওয়ার জন্য। এগুলো ভেদ সৃষ্টি করার জন্য নয়। সারা বিশ্বে যদি এই পার্থক্য না থাকত তাহলে আমরা কাউকেই চিনতে পারতাম না।

নবী (সাঃ) যখন আরাফাত ময়দানে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন তখন তার ভাষনের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছিলেন,

"হে লোকেরা তোমাদের প্রভু হলেন এক, এবং তোমাদের পিতাও এক। তোমরা সবাই আদমের বংশধর। আর আদম মাটি দিয়ে সৃষ্টি। খেয়াল রেখো, আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আবার অনারবের উপর আরবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। লাল বর্ণের মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই কালো বর্ণের মানুষদের উপরে আবার কালো মানুষদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই অন্যদের উপর। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে মহৎ মানুষ হল সেই যে সবচেয়ে বেশি নীতিপরায়ণ।"

নবী (সাঃ)-এর এ উক্তি অতি গুরুত্বপূর্ন, জীব বিজ্ঞানের আলোচনায় এ উক্তির যথার্থতা আছে। এখানে সমগ্র মানুষের মধ্যে যে ঐক্যের কথা বলা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য। নবী (সাঃ) বলেছেন,

"ওগো আল্লাহ! আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি সমস্ত মানুষ ভাই ভাই।"

নবী (সাঃ) তার এই ধারণাকে কত মর্যাদা দান করেছিলেন তা আমাদের ভাবলেও অবাক লাগে। তার জীবনে এরকম বহু ঘটনা আছে যার দ্বারা তার এ ধারনার সত্যতা পাওয়া যায়। এক সময় নবী (সাঃ) তার প্রিয় সাথিদের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় একটি শব মিছিল তার পাশ থেকে অতিক্রম করছিল। এই দেখে নবী (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। মুসলিমরা নবী (সাঃ) -এর এই উঠে দাঁড়ানো দেখে অবাক হয়ে গেলেন, তারা তৎক্ষনাৎ নবী (সাঃ)-কে বললেন যে ঐ শব দেহটি এক ইহুদীর ছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) সারা পৃথিবীর মানুষকে সমান মর্যাদার ভাবেন, তাই তিনি সাথিদের কাছে একটি বিরাট দার্শনিক প্রশ্ন তুলে ধরলেন।

"এটা কি মানবাত্মা ছিল না?"

ইসলাম মানুষের মর্যাদাকে এভাবেই দেখে থাকে, কুরআনের ঘোষণা,

> "....... যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল, আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে আমাদের রসূল উপর্যুপরি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে আগমন করে তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে।" *(কুরআন ৫ ঃ ৩২)*

নবী (সাঃ) মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন,

"ইসলামী রাষ্ট্রে যে কেউ অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করবে আমি কিয়ামতের দিন সেই অমুসলিমদের হয়ে ওকালতি করব।"

কুরআন ও মানুষের মর্যাদা

কুরআন থেকে আমরা এটা জানতে পারি, মানুষ এবং আল্লাহর মাঝে কোন মাধ্যম বা যোগাযোগ নেই। বরং বান্দাহর সরাসরি যোগ আল্লাহর সাথে, মাঝে নেই কোন মোল্লা, পুরুত, পাদ্রী বিশপের বুজরুকি কিংবা সুপারিশের হাত। মধ্যপন্থী এই সকল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে কারোর পূণ্য আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। অথবা কারোর পাপ মোচন হয় না এদের সুপারিশদের দ্বারা বরং আল্লাহর সাথে বান্দাহর থাকে সরাসরি যোগ, প্রতিটি মানুষ সরাসরি তার কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ

থেকেও সে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। প্রতিটি কাজই আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির সম্মুখীন। কুরআনের ঘোষণা,

> *"প্রতিটি আত্মাই তার কাজের জন্য দায়িত্বশীল, কোন আত্মাই অন্যের বোঝা বইবে না।" (কুরআন ৩৫ ঃ ১৮)*

অবশ্য আমরা সকল সময় অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। কারণ তিনি দয়ার আধার, করুণার অসীম ভাণ্ডার। তার দয়া কোনদিন শেষ হওয়ার নয়। প্রতিনিয়ত করুণাধারা তার সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর অহর্নিশ ঝরে পড়ছে। আমরা অপরের জন্য যেমন অনবরতঃ কল্যাণ কামনা করি তেমনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও প্রার্থনা করব মহান প্রভুর কাছে।

কুরআনে মানুষের অধিকার স্থাপন করার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের মর্যাদার উপর ভিত্তি করে। কুরআন কোন রকম আপোষ রফা না করে সরাসরি মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। আর তার মর্যাদা আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির উপর মর্যাদাশীল ও সুউচ্চ। কোন সৃষ্টির মর্যাদাই মানুষের মর্যাদার চেয়ে বেশি হতে পারে না।

> *"আদম সন্তানকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি। তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাকসাফ জিনিস দ্বারা জীবিকা দিয়েছি, আমার বহু সংখ্যক সৃষ্টির উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি। এ সব আমারই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ।" (কুরআন ১৭ ঃ ৭০)*

এ মর্যাদা এমন জিনিস নয় যেটা অর্জিত হয় অথবা এটা ভালগুণের উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে। বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক প্রাকৃতিক সম্পদের মত। এটা সকলকে দেওয়া হয়েছে বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় সব কিছুর উর্দ্ধে মানুষ মানুষই। এমনকি ধার্মিক অধার্মিক সৎ পাপী –সবাই মানুষ। কেউ আলাদা নয় কারোর থেকে। আর মানুষের মর্যাদার সাথে কুরআনের শিক্ষা মিলে মিশে একাকার,

> *"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর ওয়াস্তে সত্যনীতির উপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে তার ফলে ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুত: আল্লাহ মান্যতার সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।" (কুরআন ৫ ঃ ৮)*

কুরআনের এই ঘোষনা নিয়ে আমরা আজ মানবতাবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে চ্যালেঞ্জ করার সাহস দেখাতে পারি। যে মানবতার কথা আমরা ইউরোপীয়দের দান বলে গর্ব করে বেড়াই তা মূলত ইসলামের মধ্য দিয়ে ঘোষনা হয়েছিল দেড় হাজার বছর আগে। ১৯৪৮ সালের মানুষের অধিকার সম্বন্ধে Universal Declaration ড়ভ Human Rights-এ একথা বলা হয়েছে।

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

> "মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে সব মানব সত্তা জন্মগতভাবে সমান। তাদেরকে যুক্তিতর্ক ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাই তাদের পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃস্বরূপ আচরণ করা উচিত।"

কুরআনে মানুষের অধিকার নিয়ে আরোও বহু জায়গায় খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই নীতি-বিজ্ঞানীদেরও নীতি নির্ধারণে এগুলি সহায়ক হবে। নিচের কয়েকটি উদাহরণ-ই এ জন্য যথেষ্ট।

> "প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।" (কুরআন ১৭ ঃ ৩৩)

কুরআনের এই আয়াতটির সাথে হিউম্যান রাইটস -এর তিন নম্বর অনুচ্ছেদের যথেষ্ট সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় – এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

.... every one has the right to life liberty and security of person

প্রতিটি মানুষের আছে তার জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষা করার অধিকার।

> "আর লোকেদের মধ্যে যখন ফয়সালা করবে তখন তা সু বিচারের সাথে করো।" (কুরআন ৪ ঃ ৫৮)

আল কুরআনের এই উপদেশ কি নিচের উক্তির সাথে সাযুজ্য রাখেনা ? হিউম্যান রাইটসের ছয় ও সাত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> ".....every one has the right recognition everywhere as a person before the law and all are equal before the law and are entitled

without any discrimination to equal protection of the law" (Human Rights-articles 6,7)

"…..সকল স্থানের সকল মানুষের ব্যক্তি হিসাবে আইনের কাছে স্বীকৃতি আছে। এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কোন পার্থক্য ছাড়া সবাই আইনের নিরাপত্তা সমানভাবে পাবে। প্রত্যেকের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে। এবং কেউ খামখেয়ালী ভাবে কারোর সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"

"এবং তোমরা পরস্পরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না, আর শাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছে করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে শুনে ভক্ষন করার সুযোগ পাবে।" (কুরআন ২ ঃ ১৮৮)

অপরদিকে Human Rights -এর ১৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে-

"…..everyone has the right to own property and no one shall be arbitrarity deprived his property."

কুরআন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে খোলাখুলি ঘোষণা করে বলেছে,

"হে ঈমানদার লোকেরা ! কোন পুরুষ ব্যক্তি অন্য কোন পুরুষ ব্যক্তিকে বিদ্রুপ করবেনা, হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে। আর কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন স্ত্রীলোককে ঠাট্টা করবে না। হতে পারে যে সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন আর একজনের উপর দোষারোপ করো না এবং তোমরা একজন অপরজনকে খারাপ উপমাসহ ডাকবেনা। ইমান গ্রহণের পর কোন ফাসেকি কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা, যে সব লোক এরকম আচরণ করা থেকে বিরত না থাকে, আসলে তারাই অত্যাচারী।"

"হে ঈমানদার লোকেরা ! খুব বেশি ধারণা পোষন হতে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারনা পাপ হয়ে থাক, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কুৎসা না করে।" (কুরআন ৪৯ ঃ ১২)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য

লোকেদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষন পর্যন্ত ঘরের লোকেদের কাছ থেকে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকেদের প্রতি সালাম না পাঠাবে, এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়, আশা করা যায় যে তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।"
(কুরআন ২৪ ঃ ২৭)

এই আয়াতের সাথে এর ১২ নম্বর ধারার তুলনা করুন, এতে উল্লেখিত হয়েছে। ".....no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family home or correspondence, nor to attact upon his honour and reputation every one has the right to the protection of the law against such interference or attack."

(Human Rights-articles 6,7)

"কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে কারোর গোপনীয়তায় পারিবারিক ব্যাপারে গৃহস্থলীয় কোন বিষয়ে অথবা এমনি কিছুতেই নাক গলাতে পারবে না। অথবা তার সুনাম ও সম্মানের ব্যাপারেও নয়। প্রত্যেকেরই এ ধরনের অনধিকার চর্চা থেকে বাঁচার জন্য আইনের নিরাপত্তা আছে।" (হিউম্যান রাইট্স-১২)

এটা সত্য যে মানুষের অধিকার যা **U.N.O** দ্বারা সবে সেদিন স্বীকৃত হল, কুরআন তা অনেকদিন আগেই ঘোষনা করেছে। এমনকি রসূল (সাঃ) ও তার খলিফাদের শাসনেও এর পূর্ন প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু কুরআনে আরো বেশি করে এটির প্রয়োগ দেখা যায়। কুরআন মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারকে আরোও বড় করে দেখে। কারণ মানুষের জীবনে এই বেঁচে থাকার উপাদান হিসাবে আরোও অনেক কিছু প্রয়োজন রয়েছে। আর প্রাথমিকভাবে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তো একান্তভাবে দরকার। খাদ্যহীনকে খাদ্য দিতে হবে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে হবে – এ কথা বার বার করে কুরআনে বলা হয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) বহু উপদেশ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তার জীবনের বহু ঘটনা এই সত্য বাস্তবায়ন করার নজির হিসাবে আমাদের সামনে আছে। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খালিফাদের আমলে তার নজির গুনে গুনে শেষ করা যাবে না। কুরআনের ঘোষনা,

"দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের তাদের সম্পদের উপর অধিকার আছে।" (কুরআন ৫১ ঃ ১৯)

আর মানুষের এ সকল অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকা দরকার তেমনি দরকার সামাজিক সামষ্টিক প্রচেষ্টারও।

মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে কুরআনের দৃষ্টিকোন অনেক ব্যাপক ও চরম ও পরম নির্দেশনা। যেগুলো বাদ দিলে কোন ব্যক্তির জীবন ধারণ সম্ভব হত না। বলা যেতে পারে এ সকল অধিকার ছাড়া ব্যক্তির জীবন কীট পতঙ্গ বা পশুপাখির সমান হয়ে দাঁড়াবে কারণ আল্লাহর অফুরন্ত দয়া সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া প্রত্যেকের অধিকার থাকা চাই। সে অভাব থেকে মুক্ত যে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত। কারণ এগুলোই তাকে সমাজে হীন বানায়, নীচ বানায়। সে স্বীকার হয় হীনমন্যতার। আর এই হীনমন্যতার চোরা পথ বেয়েই তাকে একদিন পা বাড়াতে হয় সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে। তাই আমরা এটা জোরের সাথে বলতে পারি ইউনাইটেড নেশন স্বীকৃত মানুষের অধিকারের সাথে কুরআন প্রদত্ত অধিকারের বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে। বরং একথা বললে ভুল হবে না যে কুরআন প্রদত্ত অধিকার আরোও বেশী কল্যাণকর।

ইউনাইটেড নেশনস্ স্বীকৃত মানুষের অধিকার ও কুরআন বর্ণিত অধিকারের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে আর সেটা হল কুরআনের অধিকার কর্তব্যের সাথে সমীকরণের স্বরূপ। এবং এ দুটো পারস্পরিক নির্ভরশীল বিষয়। মানুষের বাঁচার অধিকার আছে আর তা আল্লাহ খলিফা হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করে তার উপর এ দায়িত্ব অর্পন করেছেন। মানুষ প্রকৃতপক্ষে একজন খলিফা বা আল্লাহর প্রতিনীধি তাই অন্য মানুষের অধিকার সম্বন্ধে সংবেদনশীল হওয়া দরকার।

পাশ্চাত্য ধ্যান ধারনায় অধিকার ব্যক্তি বিশেষের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনে ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে সামগ্রিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যাকে বলা যেতে পারে কোন ব্যক্তির অধিকার যেন সমষ্টির অধিকারকে কখনই নষ্ট না হতে দেয়। আবার ব্যক্তি বা সমাজকে এটাও খুব গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে এই অধিকার ভোগের সূদূর প্রসারী ফলাফল কি ? কারণ শুধু তাৎক্ষনিক অধিকার ভোগ করতে গিয়ে মানুষ ছাড়া আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টির অধিকার বা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় কিনা তা খেয়াল করা দরকার। কুরআনের প্রদত্ত অধিকার তাই মানুষের চেয়ে মনুষত্বের উপর গুরুত্ব দেয় অনেক বেশী। কুরআনের নির্দেশ সব সময় এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমস্ত সৃষ্টি জগতই আল্লাহর পরিবার। অতএব এখানে নিজের অধিকার ভোগ করতে গিয়ে এই সৃষ্টি জগতের যেন এলোপাথাড়ি ভারসাম্য নষ্ট না হয় তা খেয়াল রাখা দরকার।

ইসলামের সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ

সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবদানের শেষ নেই। বিশ্ব

ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে মানুষে মানুষে সমতা আনার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল নিরলস। সবসময় মানুষের জন্য তার মন কাঁদত। মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দেখলে তিনি খুবই দুঃখ পেতেন। তবে একথা সত্য যে প্রায় সকল ধর্ম কম বেশী মানবতার এই মৌলিক কথা বলে, কিন্তু আদর্শকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত এত বাস্তব প্রয়োগ করে কোন ধর্ম দেখাতে পারেনি। তাই তো তার এই মতবাদ প্রায় সকলের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এরই অনুপ্রেরনায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ এ ব্যাপারে জেগে উঠেছিল বলা যেতে পারে। পরবর্তীতে একটি ভারসাম্যপূর্ন সাম্যবাদী ভ্রাতৃত্বের চিন্তাধারা বাস্তবতা অর্জন করেছিল।

মাঠের চাষা ও রাজা দু'জনই আল্লাহর কাছে সমান

পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ পন্ডিত মানুষ ইসলামকে খুব গভীরভাবে জেনেছেন, পর্যবেক্ষন করেছেন। এর গুনাগুন নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন কিন্তু কোনও অজানা কারণে তারা ইসলাম গ্রহন করার সুযোগ পায়নি। এটা তাদেরই অদৃশ্যেরই পরিহাস। এমনিই একজন ভারতীয় বিখ্যাত মহিলা কবি হলেন সরজীনি নাইডু। ইসলামের সাম্যনীতি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাই চুপ করে থাকতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,

"It was the first religion that preached and practiced democrcy for in the mosque, when the Azzan (call for prayes) sounded and the worshipers are gathered together, the democracy of Islam is embodied five times a day when the peasant and king kneel side by side and proclaim God alone is great .... I have been struck over and again by this indivisible unity of Islam that makes man instinctively a brother when you meet an Egyptian, an Algerian an Indian and Turk in London, what matters is that Egypt is the mother land of one and India is the mother land of another."

"সর্বপ্রথম এই ধর্মই গনতন্ত্রের ঘোষনা ও বাস্তবায়নের কথা বলে। মসজিদ থেকে যখন আযান ধ্বনি "আল্লাহ মহান" শুনে মাঠের চাষা থেকে দেশের রাজা সবাই যখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সিজদা অবনত হয় তখন বাস্তবিক পক্ষে গনতন্ত্রের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। আমি অবাক না হয়ে পারি না ইসলাম এক অদৃশ্য ঐক্য শক্তি দ্বারা কিভাবে সকলকে ভাই বানিয়ে ছাড়ে। যখন মিশরীয়, ভারতীয়, আলজিরিয়ান তুর্কী কিংবা লণ্ডনবাসী যেই হোক না কেন সবাই একসাথে মিলিত হয় তখন সবাই একে

অপরের ভাই।”

ইসলামের এই গনতান্ত্রিক চেতনাকে পৃথিবীর বহুমানুষ শ্রদ্ধা করেন। মসজিদের দৃশ্য যদি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি খুব ভাল করে পর্যবেক্ষন করেন তাহলে তার কাছে আরোও অনেক গনতান্ত্রিক মূল্য বোধের কথা ফুটে উঠবে। মসজিদে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তিকে সরিয়ে কোন ব্যক্তি নিজের স্থান করতে পারে না। এক্ষেত্রে সে যদি রাজা বাদশা শাসক খলিফা যে হোক না কেন সবাইয়ের এক নিয়ম দাসের পায়ের কাছে মালিক মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে। নামাযের মধ্যে যে প্রার্থনা করা হয় তা সকল মুসলমানের জন্য। এমনকি যারা মৃত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের জন্যও। পারস্পরিক শান্তি কামনা করেই নামাযের সমাপ্তি ঘটে।

হজ্বের ময়দান-এর উজ্জ্বল সাক্ষী

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্বের সময় মক্কায় হাজির হন। সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে জমায়েত হয় নির্দিষ্ট কয়েক দিনে। সাদা, কালো, লম্বা, বেঁটে, দেশি, বিদেশী প্রভৃতির ভেদাভেদ টপকে সবাই আসে এই মহা মিলনস্থলে। এখানে প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্য সব একাকার। ভারত, বাংলাদেশ থেকে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় তেমনি আসে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া থেকেও। মোট কথা পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশের মানুষ প্রতি বছর হজ্বের ময়দানে সমবেত হয়। সবাই একই পোষাক পরে একই ভাষা, “আল্লাহ আমি হাজির আছি’ - বলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে, সে দৃশ্য অবর্ননীয়। মাত্র দু-খণ্ড সাদা বস্ত্রে তারা ঢাকা দেয় শরীর, মাথা থাকে খোলা, মনে থাকে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেওয়ার অনুভূতি। এইভাবে ঘুচে যায় সব রকমের পার্থক্য। একজন হাজি যখন ফিরে আসে হয সেরে তখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এক আন্ত র্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ। এ মোটেই কম তাৎপর্যের বিষয় নয়।

স্নোক হারগ্রোঞ্জ নামে একজন খ্রীষ্টান ডাচ পণ্ডিত হজ্বের এই তাৎপর্যের প্রতি আপ্লুত হয়ে লিখেছেন,

“ The League of Nations founded by Prophet Muhammad (s) put the principle of international unity and human brotherhood, universal brotherhood on such universal foundations as to show a candle to other nations”

“............The fact is that no nation of the world can show a parallal to what Islam has done towards the realization of

the idea of league of nations."

াতৃত্ব ও মানবিকতা বহন করে তাতে করে একটি জাতি থেকে অন্য জাতি আলো পেতে পারে সহজেই। এটাই সত্য কথা যে পৃথিবীর কোন জাতিই এরকম জাতি সংঘের বাস্তব উদাহরণ পেশ করতে পারে নি যেমনভাবে ইসলাম পেরেছে।"

বাস্তবিকপক্ষে হজ্বের তাৎপর্য অনেক বিশাল। আজ দেড় হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ একই জায়গায় একই লক্ষ্যে একই ভিসন নিয়ে একত্রিত হয়, এটা কম কথা নয়। হাটে বাজারে সভা সমিতিতে মানুষ একত্রিত হয় কিন্তু তাদের লক্ষ্য কোন সময় এক থাকে না। এটা বর্তমান বিশ্বে চ্যালেঞ্জ যে একই ইউনিফর্মে এতগুলো মানুষকে একত্রিত করতে কোন ধর্ম, কোন রাজনৈতিক মতবাদ কিংবা অন্য কিছু সক্ষম হয়নি। যদিও তা আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েই থাকে। সারা পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সাথে অন্য প্রান্তের মানুষের -এর চেয়ে বড় মেলবন্ধন আর কি করে পাওয়া যেতে পারে ?

বর্ণবাদ

কালোদের উপর সাদাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই

নবী (সাঃ) বংশ গৌরবকে মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি ঘোষনা করেন যদিও আবিসিনিয়ার একজন কালো মুসলিম নেতা নির্বাচিত হন তবে তার শাসন অন্যান্য মুসলিমদের মেনে নিতে হবে। বংশের বড়াই দেখিয়ে কাউকে হীন ভাবা চলবে না। নবী (সাঃ) সব ধরণের বংশ গৌরবকে উচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। তার কাছে সাদা কালো সবাই সমান ছিল। বর্ণবাদ বা বংশবাদ একে অপরকে সংঘর্ষে লিপ্ত করায় পরস্পরের রক্তে রঞ্জিত হয় মানবিকতা। নবী (সাঃ) এই বিভেদ উচ্ছেদ করে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার দু-একটি উদাহরণ নিচে আলোচনা করা হল।

● এক সময় দ্বিতীয় খালিফার পদ অলংকৃত করছিল উমার (রাঃ)। এমন সময় বিলাল (রাঃ) আসলেন তাঁর কাছে। তিনি তখন সবাইয়ের সামনে বিলাল (রাঃ)-র সম্মানে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে বললেন "এই যে আমাদের প্রভু এসেছে, এই যে আমাদের মালিক এসেছে" কি অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন এসেছিল সমাজে। যে যুগ ইতিহাসের পাতায় অন্ধকার যুগ হিসাবে খ্যাত হয়েছিল তা এখন কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ যুগ হিসাবে খ্যাত হতে থাকবে। কুরআনের এ কি যাদুস্পর্শ।

● রোম সামাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান। মোটেই ছোট খাট ব্যাপার নয়। তৎকালীন সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু আশ্চর্য এই অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত

হলেন যায়েদ। তিনি ছিলেন একজন দাস।

হ উসামাও ছিলেন একজন দাস। কিন্তু তাকেও নবী (সাঃ) সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। একজন দাসের কমান্ডে চলবে সমস্ত সৈন্য।

হ আবু জর গিফারী (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ)-এর খুব কাছের সাহাবী। তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন। এক দিনের ঘটনা আবু জর গিফারী (রাঃ) তার পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তিকে 'কেলো' বলে সম্বোধন করলেন। নবী (সাঃ) তার এই কথাটা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি ভাবতেই পারেনি যে তার সাহাবীদের মধ্যে এখনও এরকম জাহেলী অভ্যাস থেকে যাবে তাই তিনি তৎক্ষনাৎ শুধরে দেওয়ার জন্য আবু জর গিফারী (রাঃ)কে বললেন,

"সাদা চামড়ার মানুষ কালো চামড়ার মানুষদের চেয়ে উন্নত নয়।"

আবু জর গিফারী (রাঃ)র চেতনা ফিরল – ঠিকই তো এ ধরনের কথাবার্তা তো মূর্খরাই বলে থাকে। এ হীন আচরণ নবীর সাহাবী হয়ে কি করে করতে পারে। নিজের বিবেকের দংশনে জর্জরিত হলেন তিনি, পাগলের মত মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। আর ঐ কালো লোকটিকে বললেন "উঠ ! আর লাথি মার আমার মুখে"

হ নবী (সাঃ)-র কাছে সব শ্রেণির মানুষ আসতেন। ধনী, গরীব, নারী, পুরুষ সবাই তাঁর কাছে আসতেন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। একদিন এমনি এক সভায় একজন ধনী ব্যক্তি তার জাঁকালো ঝলমলে আলখেল্লাটা গুটাতে ব্যস্ত ছিলেন। পাশে বসেছিল এক দরিদ্র লোক। নবী (সাঃ) লক্ষ্য করলেন ধনী লোকটির আলখেল্লায় যেন গরীব লোকটির স্পর্শ না লাগে সে জন্যই ধনী লোকটি ঐরকম করছে। তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন,

"তুমি কি ভয় করছ যে ওর দরিদ্রতা তোমার সঙ্গে আটকে যাবে ?"

এমনকি আজো কালো চামড়ার নিগ্রো মানুষরা ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষরা সভ্য সাদা চামড়ার মানুষদের নিকট থেকে কি জঘন্য ব্যবহার পেয়ে থাকে।

কিন্তু নিগ্রো বেলালই ভার পেলেন নামাযের জন্য আযান দেওয়ার। যার 'হাই আলাস স্বালাহ' - নামাযের জন্য দৌড়ে আসুন। 'হাই আলাল ফালাহ' - কল্যাণের জন্য দৌড়ে আসুন – শুনে সবাই কাজ কারবার স্তব্ধ করে ছুটে আসছে দলে দলে। এ দৃশ্য কোথায় দেখা যাবে ? ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও কি ? এমন কি আজও। আমরা সবাই জানি কেমনভাবে কালো বর্ণের নিগ্রোরা সাদা চামড়ার মানুষদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। কিন্তু মক্কা বিজয় হওয়ার পর এই কালো মানুষকে মর্যাদার সিংহাসনে তুললেন

নবী (সাঃ)। কাবার ছাদে উঠলেন বিলাল (রাঃ)। আযান দিলেন তিনি। যে কাবা ছিল সবচেয়ে ঐতিহাসিক ও পবিত্র স্থান সেখানে একজন কালো মানুষের প্রবেশ ? একেবারে এই পবিত্র গৃহের ছাদে উঠে আযান ? ভাবাই যায় না। সমাজ বিজ্ঞানীদের এ আদর্শ নিয়ে একটু ভাবার দরকার আছে।

নবী (সাঃ)-র আগমনের পর হাজার হাজার বছরের পূরানো ব্যধি দূর হয়েছিল সমাজ থেকে। সমাজের মানুষ হয়েছিল খাঁটি সোনার মত। তাদের ছিল না কোন ধরনের বড়াই। ছিল না কোন জাত্যাভিমান। বংশীয় গৌরবকে তারা পদদলিত করতে পেরেছিল ইসলামের মহান আদর্শ পেয়ে। এমনকি আরবের কুরাইশ গোত্রপতিরা তাদের কন্যাদের বিবাহ সম্পাদন করেছিল কালো নিগ্রো দাসদের সাথে। তাইতো ইসলামের এই মহান আদর্শ হাজার হাজার অমুসলিম মনীষি পণ্ডিতদের হৃদয় স্পর্শ করে গেছে। বিখ্যাত জার্মান কবি গেটে বলেছেন,

This book will go on exercising through all ages a most potent influence

> "এ গ্রন্থ (কুরআন) সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সব যুগেই কার্যকরী হয়েই চলবে।"

মানবদরদী নোবেল বিজয়ী বার্নাড'শ' বলেছেন,

If any religion has a chance of ruling over England nay, Europe, within the next 100 years, it is Islam.

> "যদি পরের ১০০ বছরের মধ্যে কোন ধর্ম ইংল্যান্ডের উপর শাসন চালায় তবে তা ইউরোপ নয় বরং তা হবে ইসলাম।"

যুবশক্তিকে উৎসাহ দান

তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (সাঃ) ফিরে এসেছেন মদিনায়। সবেমাত্র কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। একাদশ হিজরীতে নবী (সাঃ) উত্তরাঞ্চলে আর এক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা ছিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের কাছাকাছি এলাকা। মাত্র কয়েক বছর আগে মুসলিমদের জন্য খুবই এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এখানে। এখানেই হত্যা করা হয়েছিল যাফর, আবদুল্লাহ এবং যায়েদ (রাঃ)কে। কিন্তু সবাই অবাক হলেন নবী (সাঃ) এর সেনাপতি নির্বাচন করা নিয়ে। নবী (সাঃ) এই অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন যায়েদ পুত্র উসামাকে। উসামার বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। উসামা

হলেন নেতা আর তার পেছনে থাকলেন আবু বকর, উসমান, উমার (রাঃ)-র মত বিখ্যাত বিখ্যাত সাহাবী। এ যেন কেমন বেমানান মনে হল সাহাবাদের তাই তারা এ ব্যাপারে নানান প্রশ্ন তুললেন। তাদের কাছে উসামার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়া বিস্ময়ের। নবী (সাঃ) সমালোচনার কথা শুনলেন এবং তৎক্ষনাতই সাহাবাদের একত্রিত করে বললেন,

"তোমরা উসামাকে সেনাপতি নির্বাচনে প্রশ্ন তুলছ। এর আগে তার পিতার সেনাপতি নির্বাচনেও তোমরা প্রশ্ন তুলেছিলে। উসামা তো প্রকৃতপক্ষে সৈন্য পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তি। আমি তার উপর বিশ্বাস রাখি যেমনভাবে তার পিতার উপর রেখেছিলাম।"

উসামাকে সেনাপতি নিয়োগের আগে নবী (সাঃ) তার পিতাকে এক অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। ঠিক একইভাবে তখনও সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল। সবাই তখন অভিযোগ দিয়েছিল যে যায়েদ দাস ছিল অতীতে, তাই যুদ্ধের সময় তার কথা কেউ শুনবে না। কিন্তু নবী (সাঃ) তাদের এই অভিযোগের কারণ শুনে অবাক হয়েছিলেন তিনি ঘৃনা করেছিলেন এ ধরনের হীন মনোভাবের জন্য। বর্তমানে উসামার যেহেতু বয়স কম ছিল তাই অভিযোগ উঠেছিল একইভাবে। কিন্তু নবী (সাঃ) তাঁর এই সেনা নির্বাচনে আরোও দৃঢ় হয়ে জানিয়ে দিলেন যে, কে কোন সমাজ থেকে এসেছে অথবা বয়স কত হয়েছে এখানে তা দেখার বিষয় নয়। বরং এ কাজের দক্ষতা নিয়েই মূল প্রশ্ন। যেহেতু উসামা শক্তি সামর্থের দিক থেকে যোগ্য তাই তার সেনাপতি হওয়াতে কোন রকম বাধা থাকতে পারে না। তাছাড়া তার বুদ্ধির প্রখরতা ও আধ্যাত্মিকতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না তাহলে তিনিই হতে পারেন সেনাপতি। সমাজে প্রকৃতপক্ষে যে সবচেয়ে গরীব আর তার কিছু না থাকলেও যদি তার মেধা শক্তি সামর্থ যুদ্ধের জন্যও উপযুক্ত হয় তবে তাকে সেনাপতির মত পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এ ছিল নবী (সাঃ)র শিক্ষা, ইসলামের আদর্শ, তাছাড়া সমাজের কোন কিছু করার জন্য যুব শক্তিরতো একান্ত প্রয়োজন। যুবশক্তি ছাড়া সমাজের কোন কিছু অগ্রগতি হয় না। এখানে বড় বড় নেতারাও ছিলেন যারা তাদের সন্তানের নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেনি। এই সেনাপতি নিয়োগ দ্বারা নবী (সাঃ) বোঝালেন যে মানুষের শক্তি সামর্থ সব সময় থাকে না। আজ যে তরুন যুবা কাল তাকে শরীরের শক্তি হারিয়ে বৃদ্ধে পরিণত হতে হবে। তাহলে সমাজ কি রসাতলে যাবে। না তা কখনই হতে পারে না। বয়স্কদের উচিত নবাগত যুবশক্তিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা। কারণ যুব শক্তিই নুতন যুগ সৃষ্টি করতে পারে।

যুদ্ধে নৈতিকতা

মুহাম্মদ (সাঃ) উসামাকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন যদিও কিছু প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু নবী (সাঃ) সব কিছুর সমাধান করে ফেললেন। কিন্তু তিনি কয়েকদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই অভিযান কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে স্থগিত থাকল এবং মদিনার কাছে সৈন্য বহর অপেক্ষা করে রইল। কয়েক সপ্তাহ পরে নবী (সাঃ) আবু বকরের উপর ভার দিলেন উসামাকে অভিযানে পাঠানোর জন্য। আবুবকর (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ইচ্ছানুসারে উসামাকে ডাকলেন এবং এই অভিযানে গমন করার আদেশ দিলেন। উসামা (রাঃ) অভিযানের জন্য একেবারে প্রস্তুত এমন সময় আবুবকর (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে নবী (সাঃ) শিক্ষা অনুযায়ী শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের হত্যা না করার কথা'– স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) আরোও আদেশ করলেন,

"বিশ্বাসহীন কোন কাজ করো না, সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়োনা কখনও ক্ষতি করো না, গাছপালা ধ্বংস করো না, ঘরবাড়ি ও ভুট্টাক্ষেত ধ্বংস করো না। ফলবান গাছ কাটবে না। যদি না খাবারের প্রয়োজন হয় তাহলে গবাদি পশু হত্যা করবেনা। আর পথে যেতে যেতে তুমি যদি সাধু সন্ন্যাসীদের দেখতে পাও যারা গীর্জা কিংবা মন্দির আস্তানায় বাস করছে তাদের হত্যা করো না এমনকি তাদের ঐ সকল মঠ গীর্জাও তুমি ধ্বংস করবে না। তাদেরকে একাকী থাকতে দিও।"

আবুবকর (রাঃ) তাকে এই সব উপদেশ দিয়েছিলেন, এগুলো মূলত নবী (সাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। যুদ্ধে বিজয় গর্ব বড় মারাত্মক জিনিস। মানুষ সব কিছুকে পরাজিত করতে পারে কিন্তু বিজয়-গর্ব দমন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। বিশেষত যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ ধরনের ত্রুটি সৈন্যদের মধ্যে ঘটে থাকে। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) আগে ভাগেই এ ধরনের সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতেন তাঁর সাহাবীদের। সংগ্রাম যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করা যেতে পারে। তার বেশি মোটেই নয়। নিস্প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ, গবাদি পশু, গাছপালা কোনকিছুই নষ্ট করা যাবে না। আর সব সময় অসহায় দুর্বল মানুষ যেমন শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ-মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। এ হল ইসলামি যুদ্ধ নীতির আদর্শ। বাড়াবাড়ি মোটেই করা যাবে না।

22

যুদ্ধ সম্বন্ধে নবী (সাঃ)এর ধারণা

ইসলাম আসার পূর্বে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটত তা থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুদ্ধ নীতি ছিল সম্পূর্ন আলাদা। ইসলাম প্রাক যুদ্ধ ছিল বিভিষিকা, রক্তের বন্যা। এই যুদ্ধগুলিতে মানুষ মরতো অগুনতি। নির্বিচারে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করত। ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। অসহায় মানুষের কথা কেউ ভাবত না। এমনকি শিশু বৃদ্ধদের প্রতিও কেউ নজর দেওয়ার সময় পেত না। নারীদের শোচনীয় ঘটনা ঘটত সবচেয়ে বেশি। তাদের প্রতি অশালীন আচরন করা হত পশুর মতো। প্রকাশ্যে তারা ধর্ষিতা হতেন পুরুষদের দ্বারা, যুদ্ধের বিধ্বংসী গ্রাস গাছপালা মাঠের ফসল সব কিছু নষ্ট করে একেবারে শেষ করে দিত। বিধর্মীয় মানুষদের কোন কথাই শোনা হতনা। হত্যা করা হত তাদের। ধর্মীয় স্থান ধংস ও অপবিত্র হত বিজয়ীদের দ্বারা। এমন কি হাজার হাজার বছর ধরে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধ গুলোও গুঁড়িয়ে দেওয়া হত মাটির সাথে। ইতিহাসের পুথিপত্রও লোপাট করে দেওয়া হত। পুড়িয়ে দেওয়া হত অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুঁথিপত্র। এক কথায় বলা যেতে পারে চরম অরাজকতা নিঃশেষ করে দিত একটি সভ্যতাকে, একটি সংস্কৃতিকে। মানুষের বিবেক বুদ্ধির কোন স্থান পেতনা এখানে। নৈতিক যত গুণ আছে সবই বিসর্জন করা হত নোংরা বিজয়োল্লাসের সমুদ্রে।

কিন্তু ইসলাম ভিন্ন ধরনের ধারনা পেশ করল। ইসলাম কখনই প্রাক যুগের যুদ্ধ নীতিকে সমর্থন করেনা। ইসলামের যুদ্ধ কথাটার মধ্যে পবিত্রতার ছাপ আছে। যুদ্ধ মানে একটা সমাজের উন্নতি সাধন, যেটা মানুষকে মুক্ত করে নিষ্ঠুরতার করাল গ্রাস থেকে। আগ্রাসন ও নির্যাতনের শিকার হয়ে যে সময় মানুষ নির্যাতিত হয় তখন ইসলামি যুদ্ধ তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়। নবী (সাঃ) সম্পূর্নভাবে পরিবর্তন এনেছিলেন বর্বর যুদ্ধ নীতিতে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাতে করে নৈতিকতার সার্বিক প্রয়োগ ঘটে সে ব্যাপারে তিনি তৎপর ছিলেন। নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে তিনি কখনও যুদ্ধ করেননি। তিনি যুদ্ধের মৌলিক বাস্তবতা গুলো প্রথমে খুঁজে বের করেছেন তার পর যুদ্ধ করেছেন, কেবল খামাখা বিজয় স্পৃহার বশবর্তী হয়ে তিনি কোথাও যুদ্ধের অনুমতি দেননি।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ- আল্লাহর পথে নিরাপত্তা লাভ

নবী (সাঃ) 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'– বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ন বিষয় উত্থাপন করেছেন। বিশেষভাবে অতীতের যে ধারণা যুদ্ধকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল তা সামগ্রিকভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুদ্ধ ধারনার কাছে একেবারে মলিন হয়ে গেছে। আল্লাহর পথে সংগ্রামের কথা যুদ্ধের সাথে জুড়ে যাওয়াতে যুদ্ধ ইতিহাসে যে লাগাম ছাড়া একটা রীতি ছিল তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ইসলামের শিক্ষার দ্বারা এটা পরিস্কার হয় যে যুদ্ধ কোনদিন নিজের স্বার্থের জন্য হবেনা। কোন মানুষের অহংকার প্রকাশের জন্য হবেনা। হবেনা কোন নির্যাতন বা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে। মানুষকে গোলাম বানানোও যুদ্ধের লক্ষ্য থাকবেনা। তা কেবল হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাই যখন তখন যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায়না। মূলতঃ সঙ্গত কারণ ছাড়া যুদ্ধের অনুমোদন নেই।

যুদ্ধের এই নুতন ধারনা পেশ করে নবী (সাঃ) আসলে বেঁধে দিয়েছিলেন যুদ্ধের নীতিমালা, যুদ্ধের সীমারেখা, যুদ্ধের অধিকার সমূহ। যুদ্ধ বন্দীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা আগে জানতে হবে তার পর তার সাথে আচরণ করতে হবে। সমস্ত রকম নিয়ম নীতি নবী (সাঃ) একেবারে পুঙ্খনুপুঙ্খভাবে সমস্ত মানব সমাজের কাছে পেশ করেছেন আর তার প্রভাবও পড়েছিল সাহাবাদের উপর। তাঁরা যুদ্ধ বন্দীদের উটের পিঠে চড়িয়ে এনেছেন, নিজেরা এসেছেন পায়ে হেঁটে। নিজেরা খেয়েছে শুকনো খেজুর কিন্তু তাদের খাইয়েছে দুধ রুটি। যুদ্ধ লব্ধ ধন নিজেরা ভোগ না করে তা দিয়ে বন্দীদের পোষাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে আগে।

নবী (সাঃ) মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকল মানুষের জীবনের মূল্যকে সমান করে দেখতেন। তাদের জীবনকে তিনি পবিত্র বলে ভাবতেন। জীবনকে তিনি কখনই অবহেলার চোখে দেখতেন না। প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব নিয়মে কোন কিছুর মোকাবিলা করতে হয় পরিস্থিতিকে, এমনকি এক নবীর কর্মপদ্ধতিকে অন্য নবীর কর্মপদ্ধতির সাথে তুলনা করা যায়না। কুরআনও আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে। তবুও প্রাসঙ্গিকতার কারণে কিছু বলতে হয়। ঈসা আঃ (যীশু) কোন যুদ্ধ করেন নি। তাঁর জীবনে এমন কোন পরিস্থিতি আসেনি যে তাকে যুদ্ধ করতে হত। কিন্তু নবী (সাঃ)এর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল, জীবনে একাধিক বার তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়ে ছিল।

যখন নবী (সাঃ) নবুয়্যত পেলেন তখন তিনি আল্লাহর বাণী নিয়ে মানুষকে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু লোকেরা তার কথা শোনেনি, কুরাইশ নেতারা তাকে নির্যাতন করল। তাঁকে বয়কট করল, তাঁর সঙ্গিসাথিদের উপরও

চালাল অমানুষিক নির্যাতন। বছরের পর বছর ধরে চলল এরকম নিপীড়ন। শেষে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজের বাড়িঘর ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলেন। তারা মদিনা বাসীদের ডেকে বললেন, হয় তাদের শত্রুদের হটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক নচেৎ তাদের সম্পূর্নভাবে ত্যাগ করা হোক। এরকম পরিস্থিতিতে মদিনাবাসীরা খুবই শংকটপূর্ণ অবস্থাতে পড়েছিল। মক্কার কুরাইশ নেতারা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে লোক পাঠালেন এই মর্মে যে নবী (সাঃ) তাদের আসামিকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন। তাদের হত্যা করা তাদের উচিত, না হলে তারা মদিনা আক্রমন করবে। এরকম পরিস্থিতিতে যখন মৃত্যু ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিলনা তখন মুহাম্মদ (সাঃ) নিজ বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা বেছে নিয়েছিলেন।

এই ভাবে তিনি যুদ্ধ শুরু করেননি বরং তার উপর যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলা যেতে পারে। তাই তিনি তার জীবনে যে সকল যুদ্ধ চালিয়ে ছিলেন তার পিছনে ছিল বড় ধরণের ঐতিহাসিক কারণ সমূহ। তার যুদ্ধ করার মানসিকতা কোন সময় ছিলনা। তার এই যুদ্ধ গুলোকে নিঃসন্দেহে ধর্মের যুদ্ধ বলা যেতে পারে। আর এই ইসলাম আক্রান্ত হওয়ার পরিপেক্ষীতে তা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল বার বার।

মিলিটারি আক্রমনের আতঙ্ককে কোন সময় এক জন নেতার লঘু করে দেখা উচিত হবেনা। নবী (সাঃ) আগত সব নেতা ও শাসকের কাছে এ ব্যাপারে বড় ধরনের আদর্শ পেশ করে গেছেন।

নবী (সাঃ) কোন সময় যুদ্ধকে আগে থেকে একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসাবে সামনে পেশ করেন নি। তবে এটাও সত্য যে কখনও ইসলামী শাসনের সার্বভৌমত্বে আঘাত লাগবে অথচ চুপ করে বসে থাকতে হবে তা ঠিক নয় বরং তার মোকাবিলা করার জন্য জিহাদের প্রয়োজন আছে। একজন সংস্কারক বা রাষ্ট্র নেতা যুদ্ধের হিংস্রতাকে সবচেয়ে কম প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে। আল্লাহর নির্দেশানুসারে নবী (সাঃ) যুদ্ধ নীতি প্রয়োগ করেছিলেন যাতে করে যুদ্ধ ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি মানবিক হয়ে ওঠে। তিনি আরও চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে সব চেয়ে কম ক্ষতি স্বীকার করে সবচেয়ে বেশি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবং মানুষের জীবনে শান্তি আসতে পারে।

এই ভাবে নবী (সাঃ) অনেক অভিযানে বিজয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বিজয়ের জন্য তাকে প্রচুর রক্ত ক্ষয় করতে হয়নি। উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কম নিহত হয়েছিল। অথচ তার বিপক্ষ ছিল খুবই শক্তিশালী।

মাত্র সাত আট বছরের মধ্যে তাঁর শত্রুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের শক্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। কিন্তু তাঁর এই বিরাট সাফল্যে ক্ষতির

পরিমান খুবই নগন্য বলা যেতে পারে। নিজ পক্ষের মাত্র ২৫৫ জন নিহত হয়ে ছিল এবং শত্রু পক্ষের নিহত হয়েছিল ৭৫৬ জন। বন্দী হিসাবে মুসলিমরা ধরে এনেছিল ৬৫৫৪ জনকে। মাত্র দুজন ছাড়া সবাইকে পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে। আট বছর ধরে এতগুলো যুদ্ধে মাত্র প্রাণ দিয়েছেন ১০১৪। আর এর বিনিময়ে সারা আরব জুড়ে এসেছিল শান্তির আবহাওয়া। জাহেলী যুগের সমস্ত বদগুন গুলো বিদায় নিয়েছিল আরব থেকে। মদ, জুয়া, ধর্ষন, হত্যা, রাহাজানি কি অপরাধ চলতনা সেখানে। সামান্য গবাদি পশুর পানি খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেধে যেত এবং স্থায়ী হত অর্ধ শতাব্দী ধরেও। কিন্তু নবী (সাঃ) যখন ইসলামের বার্তা নিয়ে এলেন তখন সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল। ধর্ষণকারী মহিলাদের এখন সম্মান দেয়া হয়, চুরি ডাকাতি রাহাজানির পরিবর্তে বর্বর মানুষেরা আজ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দান করে এ সবই যেন যাদু স্পর্শ। সবচেয়ে অল্প ক্ষতি স্বীকার করে সবচেয়ে বেশি ফায়দা ওঠানো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ ল্যামেন্স বর্ননা করেছেন।

“In the middle ages, when wars consumed thousands of men on either side, there figures (1014) indicates the restrainrestraint, compassion and consideration for human life that Muhammad exercised. He can not therefore, termed a warrior. He held every life sacred, and he abhorred the sheding of blood unless for just a cause. His life was dedicated to peace”

“মধ্য যুগে যখন যুদ্ধ কেড়ে নিত শত্রু মিত্র উভয় পক্ষের হাজার হাজার প্রাণ তখন এই সংখ্যা (১০১৪) অতি নগন্য বলা যেতে পারে। এর দ্বারাই বোঝা যায় নবী (সাঃ) মানুষের জন্য দয়া ও প্রীতির আধার ছিলেন। তাকে কিছুতেই একজন যুদ্ধবাজ মানুষ বলা যেতে পারেনা। তিনি প্রতিটি প্রাণকে পবিত্র ভাবতেন। যদি কারণ না থাকত তাহলে কারোর প্রাণ নাশের জন্য তিনি তৎপর হতেন না। তার জীবনটাই ছিল শান্তির জন্য উৎসর্গকৃত।

পৃথিবীর যেকোন বিপ্লবের সাথে ইসলামি বিপ্লবের তুলনা করে দেখুন, কি অবস্থা। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া কোন বিপ্লব সাধিত হয়নি। শুধু যুদ্ধ বললে ভূল হবে বরং বলতে হবে বড় যুদ্ধ, যা হাজার হাজার মানুষকে খতম করেছে এক এক দিন। স্থায়ী হয়েছে বছরের পর বছর। নিষ্পাপ অসংখ্য মানুষই বলি হয়েছে এ সকল যুদ্ধে।

হিন্দু মতে যুদ্ধ একে বারে নিরুপায় অবস্থায় অনুমোদিত। শান্তি পূর্ন সমস্ত প্রচেষ্টা যখন একেবারে শেষ হয়ে যায়। যখন করার আর কিছু থাকেনা তখন কেবল যুদ্ধ অনুমোদন লাভ করতে পারে। কিন্তু বাস্তব সময় যখন উপস্থিত হয়েছে তখন তা

অন্য রকমভাবে দেখা দিয়েছে, তখন একেবারে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাবল্য দেখা গেছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই

উইকিপিডিয়ার বর্ননানুযায়ী বোঝা যায়।

"The most destructive wars in Hindu Traditions were driven with the mission of good triumphing over evil. The Kurukhetra war has its unique record in terms of casualities. Forty lakh soldiers perished in a span of 18 days. This equals to around two lakh twenty thousand deaths per day. That too without, weapons of mass destruction like atom bombs or chemical gases. These deaths were caused using bows arrows and maces only.

"হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে প্রাণনাশি যুদ্ধ হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয় বলে বলা হয়ে থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতুলনীয় কারণতত্বও বিদ্যমান। চল্লিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতিদিন দু লাখ চল্লিশ হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখন যুদ্ধে কোন ধংসাত্মক পারমানবিক বোমা বা রাসায়নিক বোমা ব্যবহার করা হয়নি। কেবল মুখোমুখি যুদ্ধ, তীর ধনুক ও রনদা বা গদা নিয়েই সংঘটিত হয়েছিল"।

বিংশ শতাব্দী ঃ বিধবংসীতম শতাব্দী

প্রাচীন যুগের কথা আমরা নাও আলোচনা করতে পারি। কিন্তু একেবারে হালে বিংশ শতাব্দীতে যে হারে মানুষের জীবন নাশ হয়েছে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অনেক গবেষকের মতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরেছে বিংশ শতাব্দীতে।

William Golding-এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে কলহ বিবাদের সময় হল এই বিংশ শতাব্দী"। জেডবারজেজ ইনিস্কি নামে এক রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তার বিখ্যাত গ্রন্থ Out of Golbal Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century-তে বিংশ শতাব্দীর মানুষের জীবন হানীর একটি খতিয়ান পেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সরাসরি মানব হত্যা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা অথবা মানুষের সৃষ্টি দাঙ্গায় এক কোটি সত্তর লাখ প্রাণ নষ্ট হয়েছে। Britis Royal Society- এর প্রেসিডেন্ট Lord Martin Rees তার Our Final

Century নামক গ্রন্থে লেখেন,

"Will the human race survive the 21st century that for the first time since the dawn of history, mankind has acquired the capability to destroy the entire human race and believers that human civilization could experience an `irreversible setback?"

"মানব বংশ কি একবিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকবে ততটা যতটা মানব ইতিহাসের উষালগ্নে ছিল? কারণ মানুষ এখন নিজের সমস্ত মানব জাতিকে ও বিশ্বাসীদের শেষ করে দিতে পারে। কারণ মানুষ এখন অনুভব করেছে অপ্রত্যাবর্তনীয় এক অন্তরায়ের"।

পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো লুকিয়ে হোক, প্রকাশ্যে হোক অস্ত্র জমাচ্ছে। এতে অনেকের বৈধতা আছে আবার নেই । সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল– এগুলো সবাই তো মরনাস্ত্র, মানুষ ধংস করার ষড়যন্ত্র।- রাসায়নিক অস্ত্র থেকে পরমানবিক অস্ত্র। পরমানবিক অস্ত্র থেকে বীজানু ক্ষেপন অস্ত্র। কি নেই মানুষের হাতে। বুদ্ধিজীবীগণ বলেছেন এগুলো যদি কেউ কোন দিন শত্রুর উপর নিক্ষেপ নাও করে তবুও এর পরিণতি মানব বংশের ধংস সাধন। কারণ, এ গুলো এক দিন না একদিন প্রাকৃতিক নিয়মে ফাটবেই। আর অস্ত্র সরবরাহ করায় আমেরিকার নামতো সর্বাগ্রে। সারা পৃথিবীতে যত মারণাস্ত্র উৎপাদন হয় তার ষাট শতাংশ প্রস্তুত হয় আমেরিকায়। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তার দেশের তৎকালীন অস্ত্র সম্ভারের যে হিসাব দিয়েছিলেন তাতে জানা যায় আমেরিকায় বারো হাজারের মত পারমানবিক বোমা মজুত আছে। রাশিয়ায় ও প্রায় ঐ পরিমান পারমানবিক অস্ত্র ছিল।ফ্রান্সে, গ্রেট ব্রিটেনে পারমানবিক অস্ত্র শতশত। ইজরাইলের বাঙ্কারে রয়েছে দেড়শ'র বেশি অস্ত্র। কিন্তু মজার ব্যপার আমেরিকা পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশের অস্ত্র সম্ভার নিয়ে চিন্তিত কিন্তু নিজের দেশের অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে কোন সময়েই চিন্তা-ভাবনা করেনি। অন্য দেশের অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে মানব জাতির ধ্বংস হবে আর আমেরিকার অস্ত্র বিস্ফোরণে পুষ্পবৃষ্টি পড়বে ? কি জানি তাই হয়ত হতে পারে।

পৃথিবীর বর্তমান অস্ত্র সস্ত্রের সমন্ধে আরোও জানার জন্য নিচের ওয়েবসাইড গুলো সার্চ করা যেতে পারে।

www.timesonline.co.uk/tol/news/world/midle-east/ article4004300.ece/w.w.w.bbc.news.

এইভাবে বলা যেতে পারে আগ্রাসন, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা এক আন্তর্জাতিক

ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এটি প্রথমে আঞ্চলিক সীমায় সীমাবদ্ধ থাকত কিন্তু বর্তমানের মিডিয়ার যুগে এর সংক্রমণ সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছে দু' দুটি বিশ্ব যুদ্ধ যেখানে প্রাণ গেছে অসংখ্য মানুষের। শুধু হত্যালীলায় ক্ষান্ত হয়নি এর পরিণাম। লক্ষ লক্ষ মানুষকে করেছে পঙ্গু, গৃহহারা।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি আমরা দেখলে অবাক হব। একটি হিসাবে দেখা গেছে এক কোটি মানুষ নিহত হয়েছে। দু'কোটি দশ লাখ মানুষ আহত হয়েছে। আর সাতাত্তর লক্ষ মানুষের হদীসই পাওয়া যায়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে তারাও মরেছিল কিন্তু তাদের লাশ পাওয়া যায়নি কিংবা লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কোন মুখে আমরা 'সভ্যতা' 'সভ্যতা' বলে বেড়াব ?

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ছ'কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল । আর আহত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ আর ঘর ছাড়ার সংখ্যাও মোটেই কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মুহূর্তে আমেরিকার দুটি পরমানু বোমা আছড়ে পড়েছিল জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুটি শহরে। নিষ্পাপ দু'লক্ষ মানুষের জীবন সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত ও গৃহহীন হয়েছিল এই আক্রমনে।

আর রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব? যে সমাজ তন্ত্রের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষকে ধোকা দিয়েছিল। এই বিপ্লব আনতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণ নিয়ে নিল। ফ্রান্সের বিপ্লবে প্রাণ হারায় দু লক্ষ মানুষ। চিনা বিপ্লবে কতজন মানুষ নিহত হয়েছিল তা একেবারে সঠিক ভাবে বলা না গেলেও তা চৌদ্দ থেকে কুড়ি লাখের মধ্যে।

ইতালির মুসোলিনী উত্তর আমেরিকার সমস্ত মুসলিম দেশগুলো গুঁড়িয়ে দিল। আর এর শিকার হয়েছিল আলজিরিয়া , ভিটনিশিয়া, লিবিয়ার মত দেশগুলো । নিহত হল চার লাখের বেশি মানুষ। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে খতম করা হয় দু কোটি মানুষকে। আর তার মধ্যে বেশির ভাগ ছিল মুসলমান।

এক বলদর্পি হিটলারের হত্যা লীলা কাউকে আর বলতে হবেনা। এক কোটিরও বেশি মানুষ নিহত হয় তাদের হাতে। শুধু ইহুদি হওয়ার অপরাধে ছ' লাখ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে তিনি শেষ করে দেন।

অপর দিকে বসনিয়া ও হারজাগেভিনা দু লাখেরও বেশি মুসলিমদের হত্যা করেছিল। আর এসকল মুসলিম সম্প্রদায় সম্পূর্ন ভাবে নির্দোষ ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষ হত্যার এই জঘন্য স্পৃহা আজও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। যত্রতত্র সন্ত্রাস তারই প্রমান। এক জাতি অন্য জাতির উপর নির্বিচারে হত্যা

চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও শান্তি নেই। পৃথিবীর সর্বত্র এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। উপরের তথ্যে কেবল মানব হত্যার চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু এর সাথে মানুষের সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষতির পরিমানও তো যুক্ত হবে। তাহলে সার্বিক ক্ষতির পরিমান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তাই প্রতিটি দেশের আঞ্চলিক স্তর থেকে রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে বিধ্বংসীযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য। সকল দেশের রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত এ কাজ সম্পন্ন হলে রাষ্ট্র নেতাদের উচিত এটি আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ

এখন মানব ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ) পরিচালিত ইসলামি যুদ্ধের তুলনামূলক আলোচনা লক্ষ্য করা যাক। পূর্বের পরিসংখ্যানে তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক সভ্যযুগে, এই বিংশ শতাব্দীতে কত মানুষ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে।

অপরপক্ষে মুহাম্মদ (সাঃ) সারা জীবন ধরে যত গুলো যুদ্ধ চালিয়েছিলেন তাতে মাত্র এক হাজার চৌদ্দজনের অর্থাৎ যারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ মানুষ নিহত হয়েছিল। তবুও এই সকল যুদ্ধে নবী (সাঃ) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করেছিলেন। এ সকল ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তিনি নির্দয় বর্বর হিংসাত্মক যুদ্ধ চাননি। তিনি চাননি দিগ্বিজয়ী বীর হতে। তার কখনও ইচ্ছা জাগেনি যে তিনি বলদর্পী স্বৈরশাসক হন। মানব ইতিহাসে এরকম কোন ধরনের চিহ্ন তিনি রেখে যেতে চাননি। এরকম কোন কিছু হওয়ার থেকে তিনি অনেক দূরেই ছিলেন। কিন্তু দুভার্গ্য ! পক্ষপাত দোষে দুষ্ট অনেক ঐতিহাসিকই তাকে রক্ত পিপাসু, যুদ্ধবাজ হিসাবে দেখিয়েছেন, সব সময় তিনি যেন যুদ্ধ করতে ভালবাসতেন এই ধরণের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই ঐতিহাসিকরা। তা সত্ত্বেও অনেক সময় দেখা গেছে তাদের বক্তব্য থেকেই সত্য ফুটে উঠেছে। তারা তাঁকে পেশাদার যোদ্ধা হিসাবে দেখালেও এটা সত্য যে তিনি ছিলেন সমাজ গঠনের এক রূপকার। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে যে তিনি দশ বৎসর কাটিয়েছিলেন মদিনায়। কিন্তু মাত্র ৭৯৫ দিন কাটিয়েছিলেন যুদ্ধ অভিযানে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মাত্র একদিনের মধ্যেই তিনি বিজয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে ৭০০ দিন তাঁকে কেবল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পথে ব্যয় করতে হয়েছে। দশ বছরের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি একেবারে সমাজ বিপ্লবের কাজে ব্যয় করেছিলেন। আর এই উদ্ভট বিকৃত সমাজ পরিবর্তন করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে এড়িয়ে গেছেন অনেক পক্ষপাতদুষ্ট

ঐতিহাসিক।

পূর্বেই একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে যে নবী (সাঃ) ছিলেন বিচক্ষন। প্রতিটি কাজে তিনি বিচক্ষনতার ছাপ ফেলেছেন। যুদ্ধ নীতিতে তিনি যে বিচক্ষনতা দেখিয়েছেন তা আরোও আশ্চর্যের। তার পরবর্তী উত্তরসূরী সামরিক নেতাগত তার এই বিচক্ষনতার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারেননি। প্রতিটি যুদ্ধ অভিযানে সর্বাগ্রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিতেন। কোথাও কোন ত্রুটি রাখতেন না। তিনি তার এই যুদ্ধ পরিকল্পনার সমস্ত বিষয় গোপন রাখতেন। এমন কি কোথায় যুদ্ধে যাওয়া হবে তার সৈন্যরা অভিযানের আগে পর্যন্ত জানত না। যার ফলে শত্রুরাও ভাবতে পারত না তাদের উপর আকস্মিক অভিযানের কথা। তিনি শত্রুদের মনোস্ত াত্ত্বিক অবস্থা ভাল করে পর্যবেক্ষন করতে পারতেন। আর তার এই বিচক্ষনতা শত্রুপক্ষ স্বপ্নেও জানত না। আর এ জন্য তিনি এক কমান্ডো ইউনিট গঠন করেছিলেন যা এর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তৎপর থাকত।

নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবা সৈন্যদের যুদ্ধের প্রকৌশল ও নীতি সমূহ এত ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে নিতেন যে শত্রুপক্ষ এই সমর কুশলতার ধারে বাড়েও যেতে পারতেন না। এমনকি নবী (সাঃ) যুদ্ধাস্ত্র গুলোকেও ভাল করে পরীক্ষা করে নিতেন। সব কিছু অতি বিচক্ষনতার পর শেষে তিনি যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতেন। বিশেষ করে তাদের নৈতিক বলকে সুদৃঢ় করার জন্য আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষন দিতেন। যার ফলে তাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখা দিত।

শত্রুপক্ষ অথবা পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকগণ মুসলমানদের গোঁড়া ও মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে থাকেন। এটা মূলতঃ তাদের পূরানো রোগ, অতীতের ভুল ধারনা থেকে তৈরি হওয়া এক জাত্যাভিমানের ফসল এটি। অতীতের একটি কথা এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যাতে করে বুদ্ধিজীবিদেরও বুদ্ধিনাশ ঘটেছে। গুজব রটেছিল মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিমদের জন্য দুটি অপশান দিয়েছিলেন। "হয় কুরআন ধর নচেৎ তরবারির নিচে স্থান নাও" অতি হীন ষড়যন্ত্র এটি। আজও আমরা এ মিথ্যার শিকার হয়ে রয়েছি।

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক Sir Thomas Arnold অতি গবেষনা লব্ধ প্রচেষ্টায় অনেক কিছু সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তার এই প্রামান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ গুলির মধ্যে The Preaching of Islam গ্রন্থ একটি প্রমানান্য দলীল বলা যেতে পারে। এতে তিনি লিখেছেন,

"Islam was spread, not by the exploits of that mythical personage - the Muslim Warrior with a sword in one hand and the Quarn in the other - but by the force of the teachings of the Quran and the charecter of Muhammed (s)"

"ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল, এরকম কোন কল্পকাহিনীর ভিত্তিতে নয় যে-মুসলিম যোদ্ধারা এক হাতে নিয়েছে কুরআন অন্য হাতে নিয়েছে তলোয়ার। আসলে কুরআনের শিক্ষা এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র একাজে সফলতা দিয়েছে।"

ইতিহাসের পাতায় এমনি ধরনের অন্য কোন সামরিক কমান্ডারকে কি পাওয়া যাবে যিনি তার সামরিক অভিযানকে ও বিজয়কে এত উদারভাবে দেখেছিলেন ?

কোন সামরিক নেতা কি আছে যিনি এত উদার, মহৎ এবং বিজয়লাভ করেও এত ক্ষমাশীল ?

কোন কমাণ্ডারকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি এত অল্প জীবন নষ্ট করে এত বড় সফলতা এনেছিলেন ? মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর অন্য কোন সামরিক প্রধানকে কি পাওয়া গেছে যিনি যুদ্ধের মধ্যে নিয়ম নীতির নানান সহজধারা সংযোজন করেছেন, যেগুলো কেবল মানুষের কল্যাণের কথা বলে ? এমন কোন বীরপুরুষকে পাওয়া যায়নি যিনি নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত এত মহৎবার্তা আগত অনাগত সমস্ত মানব জাতির জন্য রেখে গেছেন। এক কথায়, নবী (সাঃ)-এর আদর্শ এক শান্তিপূর্ন সমাজ গঠনের জন্য এক পরম ও চূড়ান্ত মতবাদ।

কিন্তু এটা অতি দুঃখের বিষয় যে মুহাম্মদ (সাঃ) কে কেবল একজন ধর্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হিসাবে দেখানো হয়েছে। এটা খুব সংকীর্ণ ধারণা, এ ধারণার শিকার মুসলমানেরাও। নবী (সাঃ) -এর আগমনে সমস্ত মানব সমাজে যে একটা গতিশীল প্রবাহ এসেছিল সেটা আমাদের কাছে যে কারণেই হোক অজ্ঞাত থেকে গেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ভুলতে বসেছি যে তিনি মানুষের মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন এবং একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি যে এক নৈতিক শিক্ষাদাতা ছিলেন তাও আমাদের অগোচরে।এইভাবে ইসলামের মূল মিশন থেকে আমরা সবাই এক প্রকার দূরে রয়েছি।

মানবজাতির সুস্থ বিকাশের জন্য নবী (সাঃ) এর এক গতিশীল প্রভাব সমস্ত যুগের জন্য প্রযোজ্য। মানুষ এর দ্বারা তাদের জীবনকে আলোকিত করতে পারে। সমৃদ্ধ করতে পারে মানবিকতা, যা কিনা শান্তিপূর্ন, সুস্থ ও কল্যানকামী। তিনি মানুষের কল্যাণ চেয়েছিলেন, কল্যাণ চেয়েছিলেন পশু পাখি কীট পতঙ্গের কল্যাণ চেয়েছিলেন মানুষের পরিবেশের। এক কথায় তার পরিকল্পনায় আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি জগতের কল্যানের চিন্তা লুকিয়ে ছিল।

আমেরিকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও জীবনিকার Washington Irving Zvi

Life of Mohomet নামক গ্রন্থে লিখেছেন–

"Prophet Muhammads military triumphs awakened no pride nor vain glory, as they would have done had they been effected for selfish purposes. In the time of his greatest power, he maintained the same simplicity of manners and apperance as in the days of his adversity"

"মুহাম্মদ (সাঃ) -এর সামরিক বিজয়গুলো কখনো অহংকার ও মিথ্যে গৌরব স্পৃহা জাগিয়ে তোলেনি। যদি তাঁর অথবা মুসলিমদের মধ্যে এ-জিনিস দেখা দিত তাহলে তার মধ্যে অবশ্যই স্বার্থপরতা বাসা বাঁধত। যে দিনগুলোতে তিনি সামরিক ক্ষমতার চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন তখনও তার আচার আচরণ একেবারে পূর্বের সরল সাধাসাধি জীবনের মত ছিল।"

নবী (সাঃ) তাঁর বিজয়ী জীবনে কত উদার ছিলেন, কত মহৎ ছিলেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রতি যতই ঘৃনা উদ্রেক করা হোক না কেন, প্রাচ্য থেকে শুরু করে পাশ্চত্যের বহু অমুসলিম ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজবাদী এই মহামানবের গুনকীর্তন না করে পারেননি। এরকমই আর একজন আমেরিকার ঐতিহাসিক H. Lammes লিখেছেন,

"Even at the zenith of his glory and success, when at the time of the great conquest of makkah, the prophet looked and behaved a very humble soul. Makkah lay at his feet and the defeated quraysh came forward one after another to take the oath of loyalty, he saw an old man approaching him rather timidly with flatering steps. Muhammad the conquest the Makkah in a very humble manner consoled him and said. 'I am not a king', I am an ordinary man, humble as you are. I, also eat what you eat, the some sun shines upon me as on you'.

When this most successful statesman, Prophet Muhammad departed from this world, he was the custodian and ruler of thirty lakh square miles of the Arabian peninsula, during his ten years of stay in Medina, on an average 845 square miles of land had been added to the Islamic state every day. When this greatest saviours of humanity left this world, he did not even have oil to light a lamp in his house."

“এমনকি যখন তিনি চরম সফলতার গৌরব সিংহাসনে আরোহিত, যখন তিনি মক্কার সবচেয়ে বড় বিজেতা তখনও তিনি জীবন যাপন করেছেন অতি সাধারণভাবে। তাঁকে দেখা গেছে বিনয়ী আচরণে। মক্কা বিজয় হয়ে গেছে লোকেরা দলে দলে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর আনুগত্য আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়ার জন্য আসছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন এক অতিশয় বৃদ্ধ তাঁর কাছে আসছেন কাঁপতে কাঁপতে। নবী (সাঃ) তাকে ধরে ফেললেন। তাকে স্বান্তনা দিয়ে বললেন,‘আমি তো রাজা নই’। আমি সাধারণ মানুষ যেমন আপনি সাধারণ, আপনি যা খান আমিও তাই খাই। আপনার গায়ের উপর যে সূর্য আলো ফেলে সেই আলো আমার উপরেও ফেলে।’

যখন এই মহান সফলকাম রাষ্ট্রনেতা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তার অধীনে ছিল আরব উপদ্বীপের ৩০ লাখ বর্গ কিমি ভূখণ্ড। দশ বছর তিনি মদিনায় থেকেছেন আর এই সময়ের মধ্যে প্রতি দিন গড়ে ৮৪৫ কিমি ভূখণ্ড তার অধীনে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। কিন্তু এই মানবদরদী মুক্তিদাতা নবী যখন চলে গেলেন তখন তার ঘরে বাতি জ্বালানোর তেলটুকুও ছিল না।”

23

বিবাহ দর্শন

বহু বিবাহ ও এক বিবাহ

সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলা যায় বহু বিবাহ মানে পুরুষদের জীবন সঙ্গী হিসাবে একাধিক মহিলাকে স্থান দেওয়া। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যদি একজন পুরুষ এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহন করে তবে তাকে বলা যায় বহু বিবাহ। আর এরই ঠিক বিপরীত কথা হল এক বিবাহ , অর্থাৎ এক জন পুরুষ যখন এক সঙ্গে কেবল একটি মাত্র নারীকে জীবন সঙ্গী হিসাবে রাখবে।

পাশ্চাত্যের অস্ত্র

ইসলাম বিদ্বেষী কিছু বুদ্ধিজীবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু বিবাহ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তবে এটা আমাদের জেনে রাখা ভালো যে তাদের কেউই নবী (সাঃ)এর বহু বিবাহের কারণ, ধরণ ও পরিস্থিতির উপর পর্যালোচনামূলক পড়াশোনা বেশী করেছে বলে মনে হয়না। কোন কিছুর সমালোচনা করার আগে বিষয়টির কারণ কি ছিল তা জানা একান্তভাবে দরকার। এই সকল সমালোচকগন অনেক ঐতিহাসিক সত্যকে পাঠকদের কাছে তুলে না ধরে সমালোচনা করে গেছেন।

নিতান্ত অজ্ঞতা। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও মুহাম্মদ (সাঃ)এর আনীত ইসলামকে আক্রমন করার জন্য তারা এ ধরনের সমালোচনা করে থাকে। আর এই সকল সমালোকদের স্পর্ধা এতটাই এগিয়েছে যে নবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবন নিয়েও কটুক্তি করেছেন। যার ফলে ইসলাম যে মানব সভ্যতায় অসাধারন অবদান রেখেছিল তা অজানা থেকে গেছে অগুণিত মানুষের কাছে। আর মুহাম্মদ (সাঃ)কে সমালোচনার শিকার করে তারা ইসলামের মহান আদর্শকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে মানব

জাতির কাছ থেকে।

প্রথমেই আমাদের বোঝা দরকার যে পাশ্চত্য সমালোচকরা নৈতিকতার উপর কালিমা লেপন করার জন্য মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বহু বিবাহকে হাতিয়ার বানিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বহু বিবাহ ব্যাপকহারে প্রচলিত ছিল। যা ছিল তখন কার যুগের একটি স্ট্যাটাস। রাজা প্রজা থেকে সাধারন মানুষ সবাই বহু বিবাহে অভ্যস্থ ছিল।এমন কি একজন পুরুষ একশ'রও বেশী মহিলাকে একই সঙ্গে বিবাহ করত। বেশির ভাগ ক্ষেএে নবীদেরও একাধিক স্ত্রী ছিল। কেবল যিশু খ্রীষ্ট ছিলেন ব্যতিক্রম। এমন কি সাধু সন্ন্যাসীরা উপপত্নী রাখতেন। আরবে নারী জাতির প্রতি তখন এমন নীচ ধরনের ব্যবহার করা হত তা বর্ননা করা যায় না। গবাদি পশুর চেয়েও তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হত। নিজের পিতা তার জীবন্ত কন্যাকে মাটিতে পুঁতে দিত কেবলমাত্র সামাজিক স্টাটাস বজায় রাখার জন্য। বিয়েটা কেবল সমাজের সুবিধার জন্য করা হত। অপরদিকে বিবাহ বিচ্ছেদটা ছিল একেবারে সাধারন ব্যাপার। বিবাহ বিচ্ছেদকে কেউ তেমন গুরুত্ব দিয়েও দেখতনা। বর্তমানে পাশ্চাত্য পাঁচমিশালী যৌন জীবনে প্রায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আজও প্রাচ্য কিংবা পাশ্চত্যে সর্বত্রই বহু বিবাহের প্রশংসা করেছে অনেকেই। তা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং অমুসলিমদের মধ্যেও এর অবস্থান চোখে পড়ার মত। মুসলমানদের মধ্যে এটা স্বীকৃত কাজ হলেও অন্য ধর্মের অনুসারীরা লুকিয়ে ছাপিয়ে বৈধ অবৈধতার প্রশ্ন দূরে সরিয়ে বহু বিবাহে বেশ অগ্রসর হয়ে আছে। আর এটা এতটা সাধারন ব্যাপার যে এটা অনুসন্ধান করার জন্য গবেষনা পত্রের প্রয়োজন হবেনা। স্ত্রী ছাড়া একাধিক মহিলাকে ভোগ করা হচ্ছে নামের আড়ালে। কোথাও সুইট লাভ, বিলাভড় লাভ আবার কোথাও অবাধ মহিলা নিয়ে ভ্রমন, যাই হোকনা কেন, এটি হচ্ছে। এখানে নৈতিক প্রশ্নকে দূরে রেখেও বলা যেতে পারে একাজটি হচ্ছে সব জায়গায়।

ইহুদিবাদে বহুবিবাহ

বাইবেলের বর্ণনায় এটা জানা যায় যে ঐ সময় পুরুষেরা বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শতাধিক নারীর কাছে একজন পুরুষের গমনাগমন ছিল বলে জানা যায়। বাইবেলীয় শাসনে পুরুষকে একাধিক বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এমন কি বাইবেলের বর্ণনায় যে সকল নবীদের পরিচয় মেলে তাদের বেশির ভাগ ছিলেন বহু পত্নীক। রিশরঢ়বনরধ- থেকে জানা যায় যে আব্রাহাম (আঃ) এর দু'জন পত্নী ছিলেন। একজনের নাম হল সারাহ এবং অন্যজনের নাম ছিল হাজরা। সলোমনের ছিল সাতশ' স্ত্রী এবং

তিনশ–উপপত্নী। জ্যাকবের ছিল চারজন স্ত্রী। ডেভিডের ছিল আটজন স্ত্রী, আর মোজেসের ছিল চারজর স্ত্রী। এরা হলেন সেফায়ার, গিবসিয়া, বিল্ট কিনি ও বিল্ট হাবাব। বাইবেলীয় এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে জানা যায় যে সাধারণ ইহুদিরা চার জনের মত স্ত্রী গ্রহণ করত এবং রাজা আশি জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করত।

বহু বিবাহের এই ধারা একেবারে চলে এসেছিল রাব্বি জারসন বিন ইয়াহুদার সময় কাল পর্যন্ত। আর ইহুদীদের সেফার্ডিক সম্প্রদায় একেবারে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাধিক বিবাহ করে আসতেন। 1950 সালে Ô Act of the Chief Rabbinate of Israil নামে এক আইনের দ্বারা একাধিক বিবাহ বন্ধ করা হয়।

অবশ্য এ কথা একেবারে সত্য নয় যে ইহুদিও খ্রীষ্টানরা এক বিবাহে সন্তুষ্ট আছে সব সময়। বরং তাদের মধ্যে বহু বিবাহের ঝোঁকটাই প্রবল। A Short History of Marriage নামক গ্রন্থখানিতে ইহুদি পন্ডিত S.D.Goitien ছাড়াও আরও অনেকের এ বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। খ্রীষ্টান মরমনস সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তো ঐতিহ্যগত ভাবে বহু বিবাহ করে থাকে। আর যখনই এটা রোখার চেষ্টা করা হয়েছে তখন দেখা গেছে , লুকিয়ে প্রেম, সমকামিতা বা আরোও অন্যন্য যৌন বিকৃতি সুলভ কাজ করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক নথি বিশ্লেষনেও দেখা যাচ্ছে গ্রীক রোমান ও ইহুদি খ্রীষ্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হোমোসেক্স, প্রসটিটিউশান গমন, রাত্রিবাস ইত্যাদির মত জঘন্য ব্যাধি মারাত্মক ভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে বহু বিবাহ

বাইবেলীয় যুগে বহু বিবাহ এতটা বিস্তার লাভ করেছিল যে যিশুখ্রীষ্ট কোন দিক থেকে তা উচ্ছেদের পদক্ষেপ নেবেন তা ঠিক করতে পারেন নি। কারন, কি সামাজিক, কি রাজনেতিক, কি নৈতিক সমস্ত দিক থেকে বহু বিবাহ অনুমোদিত ছিল। সমাজের কেউ এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত না। বরং সবাই এই প্রথার উৎসাহ প্রদান করত। সে কারনে হয়তো বাইবেল এ বিষয়ে কোন আলোচনা করেনি। বাইবেলে এর সংখ্যা কিংবা নিষিদ্ধ করণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই।

বাইবেলের পাতায় কিছু লোককে দশ কুমারীর বর্ণনা করতে দেখা যায় মূলত এটি এক সাথে দশ মহিলা গ্রহনের স্বীকৃতি জানায়। বাইবেলের গল্প গুলোতে যে, বিশপ, প্রিস্ট ও প্যাট্রি আর্চদের দেখতে পাওয়া যায় তারা সকলেই বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন।

বাইবেলীয় বহু রাজার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা একের অধিক

নারী গ্রহন করেছে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং ফিলিপও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেটা একেবারে ধর্মীয় চার্চে, সেটা লুথারের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৬৫০ সালে The Nuremburg Conference এ জনসংখ্যার কম হওয়া রোধ করার জন্য বহু বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান চার্চগুলো বহু বিবাহকে অনুমোদন দান করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে মরমনস খ্রীষ্টান সম্পদায় একেবারে বংশগতভাবে বহু বিবাহের পক্ষপাতি।

এই সকল ঘটনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে বহু বিবাহ সমাজে কদর পেয়েছিল, এমন কি এটা বৈধ প্রথা হিসাবে ছিল ও বর্তমানেও বেঁচে আছে। এমন কি বাইবেলে এর অনেক প্রমাণ আছে , বাইবেলীয় যে নবীদের কথা বলা হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ছিল বহু পত্নীক। যিশু খ্রীষ্ট নিজে এর কোন প্রতিবাদ করেন নি।

পাশ্চত্যবাসী যে এক বিবাহের সাফাই গায় তা পলের আমলেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল খ্রীষ্টানদের মধ্যে। আর এটার ভূমিকায় ছিল চার্চগুলো। যেখানে একটি স্ত্রী গ্রহন করার কথা। কিন্তু মজার কথা একটি স্ত্রী অনুমোদিত থাকলেও বহু দাসী কিংবা উপপত্নী ভোগ করা কোন দোষের ছিলনা। এক কথায় বলা যেতে পারে সীমাহীন অসংখ্য নারী ভোগ একেবারে আধুনিক কালে খ্রীষ্টানদের মধ্যে অদ্ভুদ এক জীবন দর্শন এনেছে, তা হল নারী মূলত পাপ। অতএব তাকে একেবারে এড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই কোন রকমে একটা বিয়ে করে যত পারা যায় পাপ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

হিন্দু মতবাদে বহু বিবাহ

পৃথিবীর পরিচিত সব সভ্যতার কাছে বহু বিবাহ ছিল প্রচলিত। একেবারে অতীত কাল থেকে এটা চলে আসছে। আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা খুবই পরিচিত এক দৃশ্য। এটা কেবল সাধারণ প্রথা নয় বরং সাধারণভাবে প্রায় সকল মানুষই এর পক্ষে এবং তাদের জীবনে বহু বিবাহ সমর্থিত। উইকিপিডিয়া থেকে জানা যায় যে বহু হিন্দু মনিষীর একাধিক বিবাহ ছিল। ঋগ্বেদ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে এর অনেক প্রমান মেলে। শ্রী রামচন্দ্র রামায়নের মূল চরিত্র। তার পিতার নাম ছিল রাজা দশরথ, তার স্ত্রী ছিলেন তিন জন। তারা হলেন কৈশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা। কৃষ্ণের ছিল ১৬১০০ স্ত্রী বা গোপিনী, যাদের মধ্যে রাধা, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্বাবতী, সত্য, কালিন্দি, ভাদ্র প্রমুখ উল্ল্যেখযোগ্য।

যদিও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বেদই মূল, তবুও রামায়ন, মহাভারত ও গীতাকে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে স্থান দেওয়া হয়। যাইহোক এগুলোতে বিবাহে পত্নী সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়নি। বরং এটা স্বীকৃত হয় যে একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করলেও করতে পারে। এই সে দিন **১৯৫৫** খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিবাহ আইনে একের অধিক স্ত্রী গ্রহন করা যাবে না বলে আইন পাশ করা হয়। ভারতীয় হিন্দু আইন অনুযায়ী বর্তমানে হিন্দুদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহন বৈধ নয়। কিন্তু এটা বিধিবদ্ধ হলেও ধর্মীয় গ্রন্থে একাধিক বিবাহে কোন বাধা নেই।

পাশ্চাত্য সমাজে বহু বিবাহ

বর্তমান পাশ্চাত্যে বিবাহ সম্পর্কের কথা এক প্রকার ভাবাই যায় না। সাধারণভাবে একজন পুরুষ অল্পদিনের মধ্যে স্ত্রীকে নির্বাসন দেয় নিজের কাছ থেকে, তার পর যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নিজের সঙ্গী হিসাবে, এতে কোন অনুমোদন নেওয়া হয়না। সাধারণত তিন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে বহু নারীগমন সমর্থন করা হয়।

প্রথমতঃ কোন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করে আবার ডির্ভোস দেয় আবার অন্যজনকে বিবাহ আবার ডির্ভোস – এইভাবে চলতে থাকে। **দ্বিতীয়তঃ** একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বৈধ্যভাবে বিয়ে করলেও তার জীবনে জড়িয়ে থাকে একাধিক উপপত্নী বা মিসট্রেস। আর **তৃতীয়** প্রকার হল একজন পুরুষ কোনও বিয়ে করেনা কিন্তু তার সব সময় থাকে একাধিক রক্ষিতা। যারা একেবারে আইন স্বীকৃত নয়। পাশ্চত্যরা বহু বিবাহ নিয়ে খুবই সমালোচনা করে থাকে। মিডিয়ায় তাদের এ ব্যাপারে হৈ চৈ দেখা গেলেও বহু নারীগামিতার সম্পর্কে কোন রকম আলোচনা হয়না। বিখ্যাত ব্রিটিস সমাজ সংস্কারক বিশেষত নারী কল্যানকামী Dr. Annie Bassant বলেন,

There is pretentious monogamy in the West,but there is really a polygamy without responsiblity, the mistress is cast off when a man is weary of her. and sinks gradually to be a woman of the street; for the first lover has no responsibilities for her future and she is hundred times worse off than the sheltered wife and mother in a polygamous home. When we see thousands miserable women who crowd the streets of western towns at night, we must surely feel that it does not within the westerners mouth to reproach Islam for polygamy. It is better for women and more respectable for women, to live in polygamy, united to one man only, with the legitimate child in her arms, and surrounded by respect than to reduced, cast out in the

streets, perhaps with an illegitimate child outside the pale of law unsheltered than uncared for to become the victim of any passerby night after night and rendered in capable of motherhood and despised by all.”

‘এক বিবাহের মুখোস পরে যারা সাফাই গায় তাদের মূলত বহু নারী গমনে অভ্যাস হয় কোন দ্বায়িত্ব ছাড়াই। তারপর এই সকল উপপত্নী বা মিসট্রেসকে সময় মত ছুড়ে দেওয়া হয় একেবারে রাস্তায়। তখন ঐ নারীদের রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। তাকে প্রথম যে ভালবেসে ছিল তার কোন দায়িত্বই থাকেনা তার ভবিষ্যতের জন্য। এতে তার দূরাবস্থা শতগুন বেশি হয় বহুপত্নীক স্বামীর ঘরে থেকে মাতৃত্ব লাভ করার চেয়ে। আমরা যখন অসংখ্য অসহায় নারীকে পাশ্চত্যের শহরগুলোর রাস্তাতে এভাবে ঘুরতে দেখি তখন বহু বিবাহের সাফাই গাওয়া আমাদের মুখে শোভা পায়না, যা বিশেষত ইসলামের সাথে জুড়ে আছে। ইসলামের এই প্রথা নিশ্চয় ভাল। শুধু ভাল নয় সম্মানীয় বটে’।

‘এই রকম পথে পথে লাঞ্ছিত হওয়া মহিলা হওয়ার চেয়ে,বহুপত্নীক স্বামীর কাছে বৈধভাবে থাকা অনেক ভালো। পথের পথিকদের দ্বারা শ্লীলতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে নিজের কোলে বৈধ সন্তান নিয়ে মর্যাদার সাথে বাস করা তুলনামূলকভাবে অবশ্যই ভাল’।

বর্তমান পাশ্চত্য দেশগুলোতে কিশোর কিশোরীরা পরস্পর সম্মতিতে যে অবাধ যৌন সম্বন্ধ গড়ে তুলছে তাতে পিতাহীন সন্তানদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এদের বড় করে তোলার দায়-দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে ভুগতে হচ্ছে গোটা সমাজকে। এমনকি অবিবাহিত টিনএজার মা’গুলি এখন দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

কিছু কিছু পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীগণ এক বিবাহের আইন রক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু নারীরা প্রৃকত আইন কি তা নিজেরাই জানে না। এদের সমাজে বহু কিছু আছে যা সরাসরি নারী নির্যাতন ও নারী শোষনের বড় হাতিয়ার। বর্তমান যুগে নারীবাদী যে আন্দোলন চলছে তা মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নারী আন্দোলন।

আসল কথা পাশ্চত্যে এক বিবাহ লোকেদের বাঁচিয়ে রেখেছে কোন দায়িত্ব ছাড়া অথচ তারা বিবাহ না করলেও একাধিক নারীর সঙ্গে জীবন ভোগ করছে। এটি বড় সুবিধা বাদী দর্শন। সহজে জন্ম নিয়ন্ত্রন ও গর্ভপাতের রমরমায় আজকে সমাজে খোলা যৌন জীবন যাপনের প্রসার এত ব্যাপক, যে ভাবা যায় না। কিন্তু নারীকে একাই ভোগ করতে হচ্ছেট্রমার মত অন্যান্য রোগকে। তা ছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

স্বরূপ অনেক ব্যাধি নারির ভবিষ্যত জীবনকে পঙ্গু করে ছাড়ছে। তা ছাড়া যৌন জীবনের এ নোংরামি আচরণের জন্য অওউঝ এর মত মরন ব্যাধিও সমাজকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ইসলামের বিবাহ দর্শন

ইসলাম ধর্মের বিবাহ দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় বহু পাশ্চত্য মনিষী এটার উপর অনেক নেতিবাচক আলোচনা করেছেন। তারা এটা মনে করেণ যে , মুসলিম পুরুষেরা খুবই যৌনপ্রবন, তাই তারা তাদের দৈহিক আবেগকে ধরে রাখতে পারেনা, সে জন্য তাদের প্রয়োজন হয় একের অধিক বিবাহ, এমন কি তারা এটা অভিযোগ করে থাকে যে মুসলিম পুরুষরা একের অধিক তো বটেই অগুন্তি নারীকেও বিয়ে করতে পারে। তারা এটা মনে করে যে মুসলিম একাধিক নারীকে যেমন গ্রহণ করতে পারে তেমনি বর্জনও করতে পারে ইচ্ছা মত। আর এধরণের চরিত্রগুলোকে সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে নানা রকম মিডিয়ার সাহায্যে, যেমন ভাবে খবরের কাগজে, টি ভি সিরিয়ালে, ফিল্মে ও অন্যান্য হাজারো মাধ্যমে।

ইসলামের জন্য এ অপবাদ খুবই দুঃখের। ইসলাম কি শিক্ষা দিয়েছিল এ ব্যাপারে অনেক মুসলিম শাসকেরা জানতেন না। তারা ব্যর্থ হয়েছিল কুরআনের শিক্ষা ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর মিশনকে হাজার কোটি মানুষের কাছে তুলে ধরতে যেমনভাবে নিজেরা বোঝেনি তেমনিভাবে অপরকে বোঝাতেও পারেনি। তাই তারা নিজেদের জীবনেই এটাকে লঙ্ঘন করে বেপরোয়া ভাবে। যার ফলে ইসলামের বিবাহ দর্শন সম্বন্ধে ভিন জাতির উপর এক বড় ধরনের খারাপ প্রভাব পড়েছে। অমুসলিম সমাজের পন্ডিতবর্গ তাই ইসলামের মহান আদর্শের পাঠ থেকে বঞ্চিত থেকেছে যুগ যুগ ধরে। ইসলাম যে মহৎ সমাজ দর্শন সমস্ত মানব জাতির জন্য এনেছিল তা কেবল নামকা ওয়াস্তে মুসলমানদের হাতে থেকে গিয়েছে কিন্তু তা আর প্রস্ফুটিত হয়ে সমস্ত মানব সমাজের মধ্যে সৌরভ বিতরণ করেনি। আর এর ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাও ইসলাম সম্মন্ধে অনেক অজ্ঞ থেকে গেছে। তাদের কোন গবেষনায় ইসলামের এই দিকটি তেমন কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারি প্রভাব ফেলেনি।

নবী (সাঃ) যখন ইসলামী আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন সমাজের এই দিকটি ছিল আজকের দিনের চেয়ে সম্পূর্ন আলাদা এক যুগের রূপরেখা। আরব কেন সারা পৃথিবীর মানুষ তখন বহুবিবাহে অভ্যস্ত। এমনকি একাধিক বিবাহ নয় বরং একশতাধিক বিবাহ বা নারী সঙ্গ একই সঙ্গে অনুমোদিত ছিল। কুরআন এহেন সমাজের এই বিবাহকে একেবারে অস্বীকার করল না, আবার লাগামছাড়া বিবাহের আনুমোদনও দিলনা।

কুরআন তৎকালীন সামাজিক এই দিকটাকে একেবারে উপেক্ষা করল না বরং তাকে যথাযথ নিয়মের মধ্যে এবং সীমার মধ্যে এনে ভারসাম্যের ব্যবস্থা করলো। যেহেতু সমাজে এটা প্রচলিত আছে তাই নবী (সাঃ) এটাকে একেবারে উচ্ছেদ করলেন না আইনি বল দ্বারা, বরং তিনি উৎসাহ দিলেন এর বিপরীত দিকে। অর্থাৎ একটি বিবাহের দিকে অথবা একান্ত প্রয়োজনে চারটি পর্যন্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে। এটা একাধিক বিবাহের উৎসাহ কিংবা আদেশ নয়।

কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা একটি বিবাহের কথা বলে,

> *"তোমরা যদি অনাথদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না তবে এক জন স্ত্রীই গ্রহণ করো।" (কুরআন ৪ : ৩)*

আগেই বলা হয়েছে যে প্রাক ইসলামী যুগে বিবাহের উর্দ্ধ সংখ্যা বেঁধে দেওয়া ছিলনা। এক একজন একাধিকতো বটেই শতাধিক বিবাহ করার উদাহরন সর্বত্র দেখা যেত। কিন্তু কুরআন পুরুষদের বিবাহ সংখ্যাকে একটি সীমায় আবদ্ধ করেছে মাত্র। এতে কোন আদেশ উপদেশ বা একাধিক বিবাহে কোন কল্যাণ নিহিত আছে এ কথাও বলে নি। একান্তভাবে যদি কোন মুসলিম পুরুষ একাধিক বিবাহ করেও থাকে তবে তা হতে হবে কয়েকটি অতি আবশ্যক শর্তের ভিত্তিতে। প্রথমত: প্রতিটি স্ত্রী যেন স্বামীর কাছে সমান ধরনের আচরণ পেয়ে থাকেন কিংবা সমান ব্যবহার পাওয়ায় তাদের কোন রকম ত্রুটি না হয়। এমন কি ভালোবাসা প্রদানের ক্ষেত্রেও স্বামীর থাকতে হবে নিরপেক্ষতা। কুরআন এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে এটি বড় শক্ত কাজ। কুরআনের ঘোষনা,

> *"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সম্ভব হবেনা, অতএব একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর জনের দিকে একে বারে ঝুঁকে পড়বেনা। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে আল্লাহ তো মার্জনাকারী ও মেহেরবান।" (কুরআন ৪ ঃ ১২৯)*

সকল স্ত্রীদের প্রতি ভালব্যবহার ও নিরপেক্ষ আচরণ করার অঙ্গীকার করার পরও বহু বিবাহের জন্য আরোও কতকগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নিচে এগুলো

আলোচনা করা হল।

(১) কোন স্ত্রী যদি সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে থাকে, আর স্বামী যদি সন্তান কামনা করে তাহলে স্বামী অন্য স্ত্রী পূর্ব শর্তানুয়ায়ী বিবাহ করতে পারে। তবে প্রথম স্ত্রী ইচ্ছা করলে ঐ স্বামীর থেকে আলাদা থাকতে পারে।

(২) স্ত্রী যদি শারীরিকভাবে একেবারে অসুস্থ থাকে যাতে দাম্পত্য সহাবস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় তাহলে স্বামী নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। অথবা সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেও এই স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব না হয়ে ওঠে তখন দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি আছে।

(৩) সাধারণ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ফলে সমাজে নারীর প্রাধান্য যখন বেশী হয়ে যায় তখন সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্য আনার জন্য বহু বিবাহের প্রয়োজন হয় । বিশেষ করে এই সময় বিধবা ও অনাথ বালিকাদের দেখভাল করা বা দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি সাধারণত উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। তাই এইরূপ বিবাহ অনুমোদিত। উহুদ যুদ্ধের পরে এমনই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। আর এই পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এধরনের অবস্থা বহু বিবাহের বাস্তবতাকে বহুলাংশে প্রমাণ করে। এই সময় হাজার হাজার বিধবাদের ঘরের সামনে ডধহঃবফ ঐঁংনধহফ লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছিল। আর বহু বিবাহের দ্বারা সমাজে একটা ভারসাম্য এসেছিল। নি:সঙ্গ জীবন বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়ে একাধিক বিবাহের অনুমোদনের ফলে স্বামীর ঘরে দিন কাটানো নি:সন্দেহে উত্তম ব্যবস্থা।

(৪) ইসলামে বিবাহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নারীর সাথে সঙ্গ দেওয়া একবারে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্দেশ একেবারে চরম ধরণের নারী উপভোগ করার সমস্ত রকম পথই বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে। তাই ইসলাম বহু বিবাহে প্রতিটি স্ত্রীর যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। দায়িত্ব এড়িয়ে কোন রকম স্ফুর্তির অবকাশ নেই ইসলামে। পিতৃত্বের দায় এড়িয়ে আনন্দ উপভোগ সত্যিই কি অনুমোদিত মানবিকতার কথা বলে ?

(৫) এক জন মহিলা যে কোন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে যাচ্ছে- ইচ্ছা করলেই এমন বিবাহ না করতে পারেন। শুধু এই কারণ দেখিয়ে যে তার অন্য স্ত্রী বর্তমান। স্বাভাবিকভাবে এখানে বহু বিবাহের লাগাম কষা হয়ে যায়। অপরপক্ষে পূর্ব স্ত্রী খুশির সাথে স্বামীকে নূতন বিবাহে অনুমোদন করলে বহু বিবাহের আপত্তি থাকতে পারেনা।

ইসলাম কেবল মাত্র অনুমতি দিয়েছে বহু বিবাহে। নবী (সাঃ) বললেন, যদি কোন পুরুষের দুটি স্ত্রী থাকে আর সে যদি একজনের দিকে ঝুঁকে থেকে

ব্যয় নির্বাহ করে তাহলে কিয়ামতের দিনে তার শরীরের অর্ধাংশ ঝুলে থাকবে। তাই আমরা এটা বলতে পারি ইসলামে এক বিবাহের অনুমোদন স্বাভাবিক আর বহু বিবাহ কেবল ব্যতিক্রমী অনুমোদন।

ইসলামী আইনবিদ ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন, রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

> "একজন ব্যক্তি যার একটি স্ত্রী আছে সে সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবন ভোগ করে। অপরপক্ষে যার দুটো স্ত্রী আছে সে কলহ দুঃখ দুর্দশার শিকার হয়।"

তবে এটা সত্য যে মুসলিমদের মধ্যে একটি মাত্র বিবাহই সাধারণ। একাধিক বিবাহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায় কিন্তু যারা সমালোচনা করতে ভালোবাসে তারা মুসলিমদের বহু বিবাহের আধিক্য নিয়ে মিথ্যা প্রচার করে থাকে।

সাধারণ পরিসংখ্যানও বলছে যে মুসলমানদের সাধারণ নিয়ম ও একটি বিবাহের কথা বলে। বহু বিবাহের কথা ইসলাম বলে না। কেবল মাত্র কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তা কেবল অনুমোদন যোগ্য হিসাবে গৃহীত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যারা মিথ্যা সমালোচনা করে থাকে তারা প্রচার করে যে এটা যেন মুসলমানদের একটি ধর্মীয় কাজ। অনেককেই বলতে শোনা যায় মুসলমানদের চারটি বা একাধিক বিবাহ করা একটি ধর্মীয় কাজ এবং তা জীবনের আবশ্যিক বিষয়।

দীর্ঘ আলোচনায় এটা বোঝা গেল যে বহু বিবাহে ইসলামের সায় নেই। কিন্তু প্রয়োজনে এর অনুমোদন আছে। যদি ইসলাম বহু বিবাহের এই অনুমোদনকে আইন করে একেবারে উচ্ছেদ করে দিত তাহলে তা সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করতো। যা রোধ করার আর কোন পথ থাকত না। এটা ইসলাম যথাসাধ্য থিওরী হিসাবে রেখেছে আর প্রাকটিক্যাল প্রয়োগ হিসাবে যতটা কমানো যায় সে দিকে বিধিবদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।

ইসলাম এক বাস্তব ধর্ম। তাই বাস্তব জগতের সমস্যা এড়িয়ে ইসলামের কোন বিধি বিধান আরোপিত হয়নি। তাই আমরা একথা জোর গলায় বলতে পারি ইসলাম যে বহু বিবাহের আনুমোদন দিয়েছে তা কোন অযৌক্তিক আইন নয়। তবে তার প্রয়োগে যদি কোন ক্রটি হয়ে থাকে সে দোষ আমাদের। তার জন্য ইসলাম, কুরআন বা মুহম্মদ (সাঃ) দায়ী থাকবেন কেন ? ইসলামের এই সুযোগ নিয়ে কেউ এর অপব্যবহার করে থাকলে ইসলামী আইনে অবশ্যই তার বিচার হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তো ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি পলে পলে, পদে পদে।

ইসলামে বিধবাদের পুণঃবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা

পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে নানাবিধ কারণের জন্য ইসলাম বেশ কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমোদন দান করেছে। তেমনিভাবে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদকেও ইসলাম সমর্থন করে। বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ জীবনে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সচরাচর অনেকের পক্ষে এটা সম্ভব হয়না অনুভব করার। অথচ সমাজের এটা প্রতিদিনের ঘটনা, সর্বত্র এর বাস্তবতা রয়েছে, এর কিছু কারণ আমাদের আলোচনা করা দরকার।

Encyclopedea Britanica এর তথ্যানুযায়ী,

In general, the risk of death at any given age is less for female than for male

"সাধারণভাবে যে আয়ু পুরুষ ও নারীকে দেওয়া হয় তার মধ্যে মহিলাদের মৃত্যু হার কম পুরুষদের তুলনায়।"

নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে দিন দিন বিধবাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বড় বড় কারণগুলি হল যুদ্ধ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন আশি লক্ষ মানুষ। বলতেই হয়না এরা ছিল পুরুষ। এখন এদের মৃত্যুর ফলে নারী পুরুষের ভারসাম্য কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বিবেচনা করা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুর পরিসংখ্যানও কম নয়। ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বলতেই হবে এদের বেশির ভাগ ছিল পুরুষ।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরাক-ইরান যুদ্ধ হওয়ার ফলে দুটি দেশে বিধবা হয়েছিল এক লাখ বিরাশি হাজার মহিলা।

এমন কোন দেশ নেই যেখানে পথে দুর্ঘটনা নেই। আমাদের দেশের ২০০৯ সালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা তিন লাখ ষাট হাজার। এদের মধ্যে পুরুষ মারা গিয়েছে ৭৭% অপর পক্ষে মহিলারা ২৩%।

অপরপক্ষে বন্দী আসামী হিসাবে বিরাট অংশ পুরুষ কারাগারে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। আমেরিকার ইঁৎবধঁ ড়ভ ঔঁংঃরপব ঝঃধঃরংঃরপং এর রিপোর্ট বলছে, ষোল লাখ লোক বন্দী জীবন কাটাত। এখানেও পুরুষদের ৯২% বন্দী হিসাবে আসে| (উৎস Bureau of justice Statistics , US department of justice , prisoners in 2009 by Heather C. West and others)

সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু কয়েদি শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদন্ড ভোগ করে। এটা অবশ্য সুস্থ সমাজের জন্য একান্ত দরকার হয়। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা তো আর এর জন্য দোষী থাকেনা। তাই তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বহু বিবাহের প্রয়োজন অবশ্যই অনুমোদন করতে হবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে ইসলাম বহু বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষকে অনুমোদন দিয়ে কোন ভুল করেনি। এই রকম পরিস্থিতিতে মহিলারা পুণঃ বিবাহের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে অনুভব করে থাকে। আর এইভাবে বহু বিবাহ নারী জাতির প্রতি অনেক সময় করুণা এনে দেয়।

এখন যদি কোন সমাজ এরকম বৈধ আবশ্যিক প্রয়োজনে বহু বিবাহের পথকে রুদ্ধ করে দেয় কিংবা এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ করে দেয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে সমাজে এক সংকট দেখা দেবে। সমাজ দার্শনিকরা এর কি জবাব দেবেন? এইরকম পরিস্থিতির শিকার নারীরা কোথায় কীভাবে কার কাছে এর সমাধান খুজে পাবে? সঙ্গবিহীন জীবন প্রবাহ জীব মাত্রই চায়না। সমস্যাতো কেবল দৈহিক চাহিদায় থেমে থাকে না। এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীতির প্রশ্ন, সামাজিক প্রশ্ন এবং আরোও হাজার প্রশ্ন। এটা একটা বিদেশে থাকা চাকুরিজীবী মহিলা হোক কিংবা বাড়িতে অবস্থানকারী যে কোন মহিলা হোক না কেন সমস্যা তার থেকেই যাবে। এটা স্বাভাবিক, তাকে কারোর না কারোর যত্নে থাকতে হবে অর্থাৎ কাউকে তার দেখা শোনার দ্বায়িত্ব নিতে হবে। আর যদি আমরা শারীরিক প্রয়োজনের কথা ভাবি তাহলে তো কথাই নেই। তাকে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতেই হবে। এর মধ্যে মনোস্তাত্ত্বিক দিক লুকিয়ে আছে। আর এই সুবিধা যদি সমাজে না পাওয়া যায় তাহলে মহিলাদের নার্ভাস হতে দেখা যাবে। তারা সমাজে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হবে। যার ফলে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা একশ'ভাগ।

এই সব মানবিক আশা-আকাঙ্খা দমন করে কোন সমাজ চলতে পারেনা। সমাজ অগ্রগতির পথ দেখতে পায় না। সমাজকেই এ সব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সমাজে সকলে সমান। কেউ যত্ন নেয় আবার কেউ যত্ন পায়। হতাশ পরিস্থিতির শিকার হলে সকল মহিলার মধ্যে এমন কোন আধ্যাত্মিক গুণ আসতে পারে না যে এ

অবস্থায় বিবাহ না করেই সমাধান হয়ে যেতে পারে। অল্প দিনের মধ্যেই এরকম পরিস্থিতিতে একজন মহিলার মনে মানসিক কিছু চাহিদার কথা উঁকি মারবেই কারণ এটা তার বৈধ অধিকার। একে সে দমন করে রাখতে পারবেনা। আর সে যদি এই অধিকার সামাজিকভাবে বৈধ পথে না পেয়ে থাকে তাহলে তাকে অবৈধ বিকল্প পথ খুজে বের করতে হবে যা অল্পদিনের জন্য স্থায়ী এবং ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই। খুব অল্প সংখ্যক মহিলারা পারবে এমন নি:সঙ্গ জীবন কাটাতে। এটা জোরের সাথে বলা যেতে পারে যে কোন মহিলা এই পরিস্থিতির শিকার হলে অল্পদিনের মধ্যেই নীতি নৈতিকতার বাঁধন হারিয়ে ফেলবে, সামাজিক মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলবে।

অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে যে যখনই একজনের স্বামী মারা গেছে তখন স্ত্রী হয়ে গেছে ভাই ও সৎ সন্তানদের সম্পত্তির মত। নানা দিক থেকে তারা লাঞ্ছিত হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের কাছ থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীদের করুণ পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হয়েছিল তার দৃশ্য বর্ননাও করা যায়না। সতীদাহ প্রথা এর চূড়ান্ত উদাহরন, নারীদের প্রতি এ চরম অন্যায় অত্যাচার এক সময় স্বীকৃতি পায় পূন্য সতী হওয়ার মারপ্যাঁচে। কি অবাক কান্ড সমাজের এধরণের কাজ পাপ বলে বিবেচিত না হয়ে বিবেচিত হয় পূণ্যে। সতীদাহ প্রথার করাল গ্রাস থেকে কোনও ্ক্রমে কেউ বেঁচে গেলেও তাকে ধীরে ধীরে চিতায় পুড়তে হত আমরণ। বাস্তব জীবনে তার খাওয়া দাওয়া বসন ভূষন সব কিছুতেই এত বেড়াজাল ঘিরে দেওয়া হয় যে সে বেঁচেও মরা বলা যেতে পারে।

কিন্তু ইসলাম বিধবা বিবাহ ও বিচ্ছেদ দ্বারা এরকম মহিলাদের সব রকমের ব্যাথা বেদনা মোচন করেছে। কোন মহিলার জীবনে এরকম দৈবাৎ ঘটনা ঘটে গেলে মাত্র চার মাস দশ দিন পরেই ইসলাম তাকে আবার নতুন জীবনের আশ্বাস দেয়। এই সময়টুকু পার হয়ে গেলেই সে নিজের জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার পূর্ন সুযোগ পায়। চার মাসের এই 'ইদ্দত' কাল পরে হলেই সে বৈধ ছাড়পত্র পায় নূতন বিবাহ করার, এর পরের ব্যাপার সম্পূর্ন তার নিজের ব্যাপার।

বিবাহে মহিলাদের সম্পত্তি ও ইসলাম

যাকে বিয়ে করা হয় সেই মহিলার সম্মতি বা মতামত জানা বা নেওয়া একান্ত দরকার। কারণ সেই হল বিয়ের মূল পাত্র। তাকে এড়িয়ে বিবাহ বন্ধন বিবাহই নয়, ইসলামে বিবাহ শর্তের অবশ্যই এটি একটি প্রধান শর্ত। মহিলাটিকে তার ভাবি স্বামী সমন্ধে সার্বিক অবস্থা জ্ঞাতকরণ ও তার সম্মতি নেওয়া একান্ত দরকার। কোন মহিলাকে জোর করে বিয়ের আসরে বসানো গুরুতর অপরাধ। ইসলামের ইতিহাস দেখলে

কোথাও প্রমান মিলবে না যে নারীর সম্মতি না নিয়ে কোন বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। মুহম্মদ (সাঃ) নিজেই বলেছেন,

"........এক জন অবিবাহিত মহিলার সম্মতি ব্যাতিত বিবাহ গৃহীত হতে পারেনা।"

আব্বাস পুত্র আব্দুল্লাহ নবী (সাঃ) এর প্রিয় সাথি ছিলেন এবং কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখাকার ছিলেন, তিনি বর্ণনা করে বলেছেন যে নবী (সাঃ) এর কাছে একজন মহিলা অভিযোগ নিয়ে এসে বলেছিলেন যে তার অনিচ্ছা স্বত্বেও তার পিতা তাকে একজনের সাথে বিবাহ দিয়েছে। নবী (সাঃ) তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা বহাল যা তার ইচ্ছে তাই করতে বলেছিলেন।

অন্য এক ঘটনা, এটাও আব্বাস পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ননা করেছিল,এই সময় নবী (সাঃ) এর কাছে কুরাইয়া নামে মহিলা এবং তার স্বামী মুগীতের মধ্যে ঘটেছিল। আব্বাস (রাঃ) এমনভাবে এটা বর্ণনা করেছিল যেন ঘটনা তখনও তার চেখের সামনে ঘটেছে।

মুগীত বুরাইয়ার পিছনে পিছনে অশ্রুস্বজল নয়নে মদিনার পথে হেঁটে চলেছেন এমন কি তার অশ্রু দাড়ি টপকে পড়ছে। আর এ দৃশ্য দেখে নবী (সাঃ) বললেন"ওহে! আব্বাস তুমি কি অবাক হচ্ছনা বুরাইয়ার জন্য মুগীতের ভালোবাসায় আর মুগীতের উপর বুরাইয়ার ঘৃণায়," তার পর নবী (সাঃ) বুরাইয়াকে বলল "আমি ইচ্ছা করছি তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও" বুরাইয়া নবী (সাঃ) কে প্রশ্ন করলেন "এটা কি আল্লাহর আদেশ" নবী সাঃ বললেন "না এটা কেবল সুপারিশ " তখন বুরাইয়া ভদ্রভাবে নবী (সাঃ) কে এই বলে ক্ষান্ত করলেন" "আমার জন্য এ সুপারিশের প্রয়োজন নেই।"

এই হল ইসলামে নারী স্বাধীনতার রূপরেখা, কি ব্যাখ্যা দেবে ইসলামের সমালোচকরা?

খলিফা উমারের (রা:) সময় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা জানা যায়। উম্মে আবান নামে এক বিধবা মহিলার পুন বিবাহের জন্য চারজনের নাম প্রস্তাব আকারে আসে, এরা সবাই ছিলেন বিবাহিত, এরা হলেন উমার, আলি, যুবাইর ও তালহা (রাঃ), উম্মে আবান চার জনের মধ্যে তালাহা কে বিয়ে করতে রাজি হলেন অন্যান্যদেরকে প্রত্যাহার করলেন। তার পর তাদের বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহের প্রস্তাবে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উমার (রাঃ) নিজেই ছিলেন আর তখন তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাই ছিলেন। তিনি তো কেবল চোখ ঘোরালেই তার এই প্রস্তাবকে কার্যকরি করতে পারতেন, কিন্তু এই রকম তো হলনা। ইসলামের গায়ে কাদা ছুঁড়তে গেলে এ সব ইতিহাস একটু জানা দরকার। প্রজা সাধারণও ঐ মহিলার এরকম আচরনে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেননি, তারা এতে বিস্ময় বোধ ও করেননি, কারন ততদিন তারা

ইসলামের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা এটা ভালোভাবে জানত যে ইসলাম নারীকে এই উচ্চ সম্মানই দিয়েছে। এই মহিলার প্রতি যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের মনে উদ্রেক হত তাহলে তা মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে হত। এটা তার অধিকার ছিল যা কেউ কেড়ে নিতে পারেনা এবং তা স্বয়ং দেশের রাজা হলেও। এমনকি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া রসূলও তাদের এই অধিকার কেড়ে নেননি।

এসব আলোচনা থেকে এটাই পরিস্কার যে ইসলাম চারটি বিবাহের অধিকার দিয়েছে মানে এই নয় যে জোর জবরদস্তি করে চারটে মেয়েকে ঘরে এনে হাজির করা যেতে পারে, কক্ষনই নয়। বিবাহ তো সম্পূর্ন এক মানসিক বন্ধন যা পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন। কেউ ইচ্ছা করলেই দুই তিন কিংবা চারটে স্ত্রী পেতে পারেনা। বরং একবারে উল্টো কথা, কোন মহিলা যদি চায় যে সে দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্ত্রী হবে তাহলে পুরুষটির জন্য এ ভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে নচেৎ নয়। যেমনটি পূর্বের বর্ননায় উমার, আলি ও যুবাইর (রাঃ)-র ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তাই এটা যখন মহিলাদের সম্মতির উপর ঝুলে থাকলে তা হলে এ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন ? এটা কি কোন বিবেক সম্পন্ন সমালোচকদের কাজ ?

বিবাহে নারীদের সম্মতি সমন্ধে যেন আজকে আমরা প্রথম শুনছি। এবং বর্তমানে এটা খুবই গুরুত্ব লাভ করেছে, কিন্তু এটা তো ইসলাম আমাদেরকে বহু দিন আগেই শুনিয়েছিল। ইসলামতো মহিলাদের এই অধিকার ভোগের পূর্ণ সমর্থক। কিন্তু তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে ইসলাম পছন্দ করে না, সেখানেও টেনে দেয় কল্যাণকর সীমারেখা।

24

নবী (সাঃ)এর স্ত্রীগণ

নবী (সাঃ)এর আলোচনা প্রসঙ্গ যখন আসে তখন সমালোচকদের সামনে একটা ভাবমূর্তি এসে দাঁড়ায় আর তা হল তার একাধিক স্ত্রী ছিল। এমনকি এ কারণে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ ও শিক্ষা বুঝে নিতে অনেক অমুসলিম ভাই ইতস্ততা বোধ করেন। তাঁরা হোঁচট খান তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বুঝে উঠতে। নবী (সাঃ)এর বহু বিবাহর উপর যে সমালোচনার কুৎসা আগে থেকে তাদের মনে চেপে বসে তা তারা সহজেই তুলে ফেলতে পারেনা। ফলে মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের কোন মাহাত্মই তাদের কাছে সহজে ধরা পড়েনা। নিচে আমরা কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করতে চাইছি।

● ইসলামে বিবাহ ব্যবস্থাকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। সমাজকে সুস্থ নীতিশীল রূপে গড়ে তোলার জন্য বিবাহ ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটা সমাজকে নানা টানা পোড়েনের মধ্যে টিকে থাকতে হলে বিবাহ ব্যবস্থা একান্তভাবে থাকা দরকার।

● পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত নবী (সাঃ) কোন নারী স্পর্শ করেননি। যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে পৌছলেন তখন তিনি প্রথম বিয়ে করলেন। এতে তিনি অতি সম্মান অর্জন করলেন। মক্কার অধিবাসীরা তাঁকে তখন আল আমীন নামে অভিহিত করেছিল। সবাই তাঁকে একেবারে কাছের বন্ধু হিসাবে দেখত। সবাইয়ের প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা ছিল। তাকেও সবাই বিশ্বস্ত অনুগত সমাজ সংস্কারক হিসাবে দেখতেন, ব্যবসায়ী হিসাবে তার নাম যশের তুলনা ছিলনা তখন। তিনি ছিলেন দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের সাহায্যের আশ্রয় স্থল।

খাদিজা (রাঃ)

নবী (সাঃ) এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল খাদিজা (রাঃ) র সাথে। তাঁর তখন বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। আর নবী (সাঃ)–ছিলেন পঁচিশ বছরের সৌম্য সুশ্রী যুবক। খাদিজা (রাঃ)এ সময়ে ছিলেন বিধবা। তাঁর চরিত্র এতই উন্নত ছিল যে লোকেদের কাছে তিনি

'তাহিরা' নামে পরিচিত ছিলেন। খাদিজা (রাঃ) তাঁর থেকে পনেরো বছরের বড় ছিলেন বয়সে। তিনি তাঁর কাছে আগে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। নবী (সাঃ) তাঁর বিধবা ও বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই সময় তিনি অবশ্য অনেক সুন্দর সুন্দর বালিকাদের বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু এটা তিনি করতে পারেননি, কারণ তিনি কেবল দৈহিক চাহিদা বা সৌন্দর্যকে চাননি বরং আধ্যাত্মিকতাকে বেশি করে মেনে নিয়েছিলেন। খাদিজা (রাঃ)-র মধ্যে তিনি দেখেছিলেন নৈতিক চরিএ ও আধ্যত্মিকতার সমাবেশ । তাই তিনি তার প্রস্তাব গ্রহন করতে দ্বিধা করেন নি।

নবী (সাঃ) খুব সুখ ও তৃপ্তির সাথে খাদিজার (রাঃ) সাথে প্রায় পঁচিশটি বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিলেন। এ সময় একজন ছাড়া তাঁর সমস্ত সন্তানই খাদিজা (রাঃ) এর গর্ভে হয়েছিল। যত দিন খাদিজা (রাঃ) বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি অন্য কোন বিবাহ করেননি। খাদিজা (রাঃ) এর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা। খাদিজা (রাঃ)র মৃত্যুর পর শোকে অনুতপ্ত হৃদয় যখন তার ভারাক্রান্ত তখন তাকে কোন এক বন্ধু পুনঃ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এতে তিনি আরোও ব্যাথা ভারাক্রান্ত হয়ে বলেছিলেন,

"খাদিজা (রাঃ)র পর কে আবার বিয়ের কথা ভাবতে পারে? আমি তার স্মৃতি বহন করি কারণ সে আমার প্রতি খুবই অনুগত ছিল। যখন লোকেরা আমাকে বিশ্বাস করত না, সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। যখন লোকেরা আমাকে সাহায্য করতেও ভয় পেত তখন সে পাথরের মত আমার পাশে দাঁড়িয়েছে' সে ছিল আমার সবচেয়ে ভাল সাথি। আর সেই আমার সন্তানদের প্রসব করেছিল।"

কুরাইশরা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাথিদের উপর যে সামাজিক বয়কট চাপিয়ে ছিল তা ভীষন কষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল মুসলমানদের জীবনে। সকল প্রকার সমাজিক যোগাযোগ থেকে একে বারে বিছিন্ন ছিল মুসলমানেরা। তিন বছর ধরে চলেছিল এরকম সংকটপূর্ণ অবস্থা। এই সময় না খেতে পাওয়া, না পরতে পাওয়া খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের জন্য। বিশেষ করে এই সংকটপূর্ন অবস্থার শোচনীয় প্রভাব পড়েছিল নারী ও শিশুদের জীবনে। তাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। কুরাইশদের চাপানো এই বয়কটে খাদিজা (রাঃ) একেবারে দুঃখ কষ্টের চরম শিকার হয়ে পড়ে ছিলেন। এমন কি তিনি অসুস্থই হয়েছিলেন। আর এরই পরিনামে তিন দিন তিনি অসুস্থতায় কাটালেন। নবী (সাঃ) তাঁর এই প্রিয় সাথির বিয়োগান্তে খুবই মর্মাহত হয়ে ছিলেন।

এই সময় নবী (সাঃ) কুরাইশদের দ্বারা আরোও তিক্তভাবে নির্যাতিত

হয়েছিলেন। আর তার সন্তান গুলোকে দেখাশোনার কেউ ছিলনা। নবী (সাঃ) পড়ে গেলেন এক কঠিন পরিস্থিতিতে। নবী (সাঃ) এর এ দুঃখ অনুধাবন করে বন্ধুরা তাকে নতুন বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন, তারা বোঝালেন এতে করে ছোট ছোট সন্তানেরা আপাতত স্নেহ যত্ন পাবে এবং তাঁর জীবনেও এই দুঃখ মোচন হবে। এই রকম পরিস্থিতিতে তিনি সাওদা ও আয়েশা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুরা। এতে করে তিনি তাঁর সন্তানদের দেখভালের লোক পেলেন সেই সঙ্গে নিজের জীবনের স্বান্তনাও পেলেন তাদের কাছ থেকে। এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা থাকতে পারেনা। সময়ের পরিস্থিতিতে এ অবস্থা তার কাছে উত্থাপিত হয়েছিল, তিনি কেবল এটা গ্রহন করে ছিলেন। যা ছিল পরিস্থিতির একান্ত চাহিদা।

সওদা (রাঃ)

সওদা (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ) এর দ্বিতীয়া স্ত্রী। তিনিও ছিলেন একজন বিধবা মহিলা , তিনি ও তার স্বামী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকটতম সাথিদের দুজন তারা উভয়েই নবী (সাঃ) এর আদেশে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে ফেরার পথে সওদা (রাঃ)এর পূর্ব স্বামী মারা যান। তিনি সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন, তারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটা আশ্রয়ের। একেবারে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের মত তিনি নবী (সাঃ) এর জীবনে আশ্রয় খুঁজে পেলেন। নবী (সাঃ) তাকে বিয়ে করে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিলেন। কারণ তার স্বামীতো ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন। সওদা (রাঃ)র সাথে নবী (সাঃ) এর যখন বিবাহ হয় তখন তারও বয়স চল্লিশ অতিক্রম করেছিল , নবী (সাঃ) তাকে তার ছোট ছোট কন্যা সন্তানদের দেখাশোনার জন্য বিবাহ করেছিলেন। সওদা (রাঃ)-র পূর্ব স্বামীর একজন সন্তান ছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে কোন সন্তান পাননি।

আয়েশা (রাঃ)

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ) এর তৃতীয়া স্ত্রী। পিতা ছিলেন আবুবকর (রাঃ) নবী (সাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় বাল্য বন্ধু। তিনি আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহ করেছিলেন যাতে করে আবুবকরের সাথে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তা যেন আরোও বেশি সুদৃঢ় হয়। কারণ এতে ইসলামী আন্দোলন আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা একশভাগ বেড়ে গিয়েছিল। কারণ প্রতিরক্ষক হিসাবে আবুবকর (রাঃ)র ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। শত্রুরা সবাই তাকে ভয় করে চলত। তাছাড়া বংশগত ভাবে আয়েশা (রাঃ) র বুদ্ধি ছিল প্রখর যা ইসলামী আন্দোলনে খুবই কাজে লেগেছিল। বিয়ের সময় তার বয়স কত ছিল তা নিয়ে বিতর্ক

রয়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষনায় পনের'র পরিবর্তে এগারো বলে বেশি মত প্রকাশ করা হয়।

নবী (সাঃ) এর সাথে আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কটা অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে আলাদা ধরণের ছিল। এর কারণও ছিল ভিন্ন, তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী মহিলা। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি নবী (সাঃ) এর সাথে গভীর আলোচনায় অংশ নিতেন, সে কারণে অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে আয়েশা (রাঃ) ইর্ষার পাত্র হয়ে ছিলেন। মদিনা অবস্থান কালে কুরানের অবর্তীন অহীর জন্য তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ সকল অহীকে তিনি একেবারে আল্লাহর বিশেষ অবদান বলে ভাবতেন। নবী (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে অন্যভাবে চিনেছিলেন, নানান ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) যে যুক্তিবাদী চিন্তা বহন করে এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন । আর এর দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের অনেক কল্যাণ হবে তাও তিনি মনে করতেন, বিশেষ কারণে পারিবারিক ও সামাজিক নানান বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। তাই নবী (সাঃ) তার সাথিদের ইসলামকে জানার জন্য আয়েশা (রাঃ) র কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বলতেন ,নবী (সাঃ) এর এই দূরদর্শিতা প্রমানিত হয়েছিল। নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) আরোও পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। ইসলামের বহু বিষয়ে জানার জন্য আয়েশা (রাঃ)ই উৎস হয়েছিলেন। আয়েশা (রাঃ)র কাছে থেকে আমারা এ উৎস না পেলে ইসলামের বহু অংশই আমরা হারিয়ে ফেলতাম। নবী (সাঃ)এর উম্মতেরা তাঁর কাছ থেকে ২২১০ টির বেশী হাদিস সংগ্রহ করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, শবীয়তি ও আইন বিষয়ক নানান বিষয় নিয়ে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে তাত্বিক আলোচনা পর্যন্ত করতেন। নবী (সাঃ) ছাপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত দুজন স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) ও সওদা (রাঃ) কে নিয়ে কাটিয়ে ছিলেন। এর পর ছাপ্পান্ন থেকে ষাট বছর বয়স অর্থাৎ চার বছরের মধ্যে নবী (সাঃ)কে পরবর্তী ন'টি বিবাহ সম্পন্ন করতে হয়। এর নানাবিধ কারণও রয়েছে, যেগুলোর ছিল ঐতিহাসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। শেষের তিন বৎসর তিনি কোন বিবাহ করেননি।

হাফসা (রাঃ)

নবী (সাঃ) চতুর্থ বিবাহ করেন হাফসা (রাঃ)কে। ইনি ছিলেন উমার (রাঃ)র বিধবা কন্যা। আর উমার (রাঃ) ছিলেন সাহাবাদের মধ্যে একজন অন্যতম সাহাবী। বদর যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন হাফসা (রাঃ) -র প্রাক্তণ স্বামী , বিধবা কন্যাকে নিয়ে উমার (রাঃ) খুবই চিন্তিত ছিলেন, তার একটা বিয়ের ব্যবস্থার জন্য তিনি খুবই প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এমন কি তিনি এক সময় উসমান গনি (রাঃ)-কে নিজের কন্যার সাথে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু উসমান গনি (রাঃ) তাতে রাজি হননি, এমন কি

আবুবকর (রাঃ) কেও হাফসা (রাঃ) কে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনিও রাজি হননি। সম্ভবতঃ এর কারন ছিল হাফসা (রাঃ) একটু কড়া মেজাজের মহিলা ছিলেন উমার (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে খুবই বিচলিত ছিলেন,নবী (সাঃ) উমার (রাঃ)র এই বিচলিত অবস্থা অনুধাবন করার পর নিজেই হাফসা (রাঃ)কে স্ত্রী রূপে গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। হাফসা (রাঃ) যুক্তিবাদী দৃঢ় মেজাজের মহিলা ছিলেন, তাই তিনি রসূলের সাথেও যুক্তিতর্ক করতেন। এ ব্যাপারে তার পিতা উমার (রাঃ)র কাছ থেকে জানা যায়।

"এক সময় আমার স্ত্রী কোন এক বিষয়ে আমাকে যুক্তি পেশ করার সাহস দেখায়, আমি তাকে বললাম 'তুমি যুক্তি দেখানোর সাহস পেলে কোথা থেকে ?' সে উত্তরে বলল 'তুমি আমাকে এটা করতে না বলছ অথচ তোমরা কন্যা হাফসা নবী (সাঃ)এর সাথে যুক্তি তর্ক ও কথা কাটাকাটি করে' আমি তখনই উঠে বসলাম এবং সোজা হাফসার কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম' এটা কি সত্য তুমি নবী (সাঃ)এর সাথে রেগে কথা বল'। তিনি উত্তরে বললেন " হ্যাঁ আমি এটা করি" আমি তাকে বললাম- আমি তোমাকে সাবধান করে বলছি, আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন।"

জয়নাব (রাঃ)

নবী (সাঃ)এর পঞ্চম স্ত্রী ছিলেন জয়নাব (রাঃ) তিনি বিখ্যাত হাওয়াজিন গোত্রের খুজাইমার কন্যা ছিলেন। হাওয়াজিন গোত্রটি ছিল খুবই শক্তিশালী গোত্র। জয়নাব (রাঃ) এক জন বিধবা ছিলেন। নবী (সাঃ) তাকে যখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স ছিল ষাট। তিনি খুব হৃদয়বাণ মহিলা ছিলেন। দানের কাজে তিনি সবসময় মুক্তহস্ত ছিলেন। সব সময় তিনি দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের দুঃখ মোচন করার জন্য তৎপর ছিলেন। এ কাজে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে লোকেরা তাকে দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের মাতা বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় নবী (সাঃ) এর সাথে তার বৈবাহিক জীবন কেটে ছিল মাত্র তিনমাস। বিয়ের মাত্র তিনমাস পর তিনি মারা যান।

উম্মে সালমা (রাঃ)

আরব গোত্রগুলির মধ্যে বনু ফিরাস গোত্রও বিখ্যাত গোত্র ছিল। এই বংশের কন্যা উম্মে সালমা (রাঃ)কে নবী (সাঃ) ষষ্ট স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। তিনিও বিধবা মহিলা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মদিনায় যখন হিজরত করেছিলেন তিনি তার স্বামীর সাথে আসতে পারেননি। কারণ নিষ্ঠুর কুরাইশরা তার সন্তানকে নিয়ে মদিনায় আসতে দেয়নি। তাই তিনি মদিনায় থেকে গিয়েছিলেন। এটাও এক ধরনের

নির্যাতেনের শিকার হওয়া। যাই হোক পরবর্তীতে অবশ্য উম্মে সালমা (রাঃ) মদিনায় পালিয়ে আসতে পেরে ছিলেন চারটি সন্তান নিয়ে। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি স্বামীকে হারালেন। ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছিলেন তার স্বামী। এসময় তিনি খুবই দুরাবস্থায় পতিত হলেন। চার চারটি শিশু সন্তান তাছাড়া তিনি পঞ্চম সন্তানের গর্ভবতী ও ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে উম্মে সালমা অতি দুর্দশাপীড়িত অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন , কোন দিক থেকে কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ রকম অবস্থাতে নবী (সাঃ) এগিয়ে এলেন তার সাহায্যের জন্য। তিনি প্রস্তাব পাঠালেন বিবাহের জন্য। প্রথমত উম্মে সালমা (রাঃ) এতে রাজি হলেন না তার সন্তানদের জন্য। কিন্তু নবী (সাঃ) সন্তানদের নিজের সন্তানদের মত লালন পালনের দায়িত্ব নেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। তখন তিনি বিবাহে রাজি হন। প্রথমত তিনি রাজি না হলেও পরে বাস্তব পরিস্থিতি ও নবী (সাঃ) এর দয়াদ্র হৃদয় সম্বন্ধে বুঝতে পেরে ছিলেন। ছাপান্ন বৎসরের একজন বিধবা মহিলা যার চারটি সন্তান রয়েছে, সমস্ত কিছু জেনে তাদের ভরনপোষনের দায়িত্ব নিয়ে কেইবা বিয়ে করতে চায়? একান্ত হৃদয়ের ভালবাসা দয়া, সহানুভূতি না থাকলে কেউই এটা করতে এগিয়ে আসতে পারেনা। আর একটি সত্য ঘটনা যে উম্মে সালমা (রাঃ) ছিলেন মাখযুম গোত্রের কন্যা। আর মাখযুম গোত্রও বেশী নামী গোত্র হিসাবে তৎকালীন সময় পরিচিত ছিল। আবার এই গোত্রই ইসলামের প্রধান শত্রু ভূমিকায় অবস্থান করেছিল। কোন সময় এই শক্তিশালী গোত্র ইসলাম মেনে নিয়েছিলেন ইসলাম প্রসারের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এটাও বাস্তববাদী রসূল অনুমান করেছিলেন। সেজন্য এই গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তিনি আন্তরিক ভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) খুবই ধার্মিক মহিলা ছিলেন। প্রতিমাসে তিনটি রোজা তিনি সবসময় রাখতেন। রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন, নবীর আদেশ নিষেধ তিনি খুব ভক্তি ভরে শুনতেন ও পালন করতেন।

জয়নাব (রাঃ)

জয়নাব (রাঃ) বিধবা হিসাবেই মদিনায় হিজতর করেছিলেন এই সময় নবী (সাঃ) তাকে পালক পুত্র যায়েদের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হারিস পুত্র যায়েদ জয়নাবকে তালাকই দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলা জয়নাবকে নবী (সাঃ) সপ্তম স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। রসূলের এই বিবাহ নিয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বহু সমালোচনা সমান ভাবে হয়েছে ও হয়ে আসছে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ নিজেই অহী অবতীর্ন করে এ সমালোচনার মুখ বন্ধ করেছেন। দুটি বড় বড় কারণ দর্শানো হয়েছে এ সমালোচনায়, প্রথমত নবী (সাঃ) যায়েদ (রাঃ) কে পালক পুত্র হিসাবে রেখেছিলেন, যেহেতু জয়নাব তার স্ত্রী ছিল তাই তিনি রসূলের সাথে

পুত্রবধু কন্যা সমতুল্য হয়ে যায় তাই এই বিবাহকে সমাজ বহির্ভূত অন্যায় কাজ বলে মনে করা হয়। যা স্বয়ং রসূলের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আরোও একটা আভিযোগ তোলা হয় তাহল নবী (সাঃ) নাকি যায়েদকে (রাঃ)কে তালাক দেবার জন্য বাধ্য করিয়েছিলেন যাতে করে তিনি পরবর্তী সময়ে জয়নাবকে বিবাহ করতে পারেন। এর জবাব খুব যৌক্তিকতার সাথে পেশ করা হয়েছে। আর এতে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সকল অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।

নবী (সাঃ)এর কাছে যায়েদ এসেছিলে দাস হিসাবে, তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। এবং সেই সাথে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি যায়েদকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি তার খুড়তুতো বোন জয়নাবের সাথে তার বিবাহও দিয়েছিলেন। জয়নাবের পিতা ছিলেন অবুতালিব কিন্তু পরবর্তীতে জয়নাব ও যায়েদের সাথে বিবাহ জীবনে কলহ দেখা দেয়। জয়নাব (রাঃ) তাই সুখী জীবন ভোগ করতে পারেননি, কারণ সামাজিক মর্যাদায় এটা জয়নাব (বাঃ)র পক্ষে অবমাননাকর ছিল। উভয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার কারণ হিসাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সমালোচকরা দায়ী করেন। কিন্তু আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্রমূলক কথা বার্তা। জয়নাব কোন অপরিচিত মহিলা ছিলেন না বরং ছোট বেলা থেকে তিনি তার রূপ সৌন্দর্য সব কিছুই জানতেন। তিনি যদি তার রূপেই মুগ্ধ হয়ে থাকতেন তাহলে যায়েদের সাথে তার বিবাহ দিতেন না। প্রকৃত পক্ষে জয়নাব যায়েদকে নিয়ে সুখি হলেন না। কারন তিনি সবসময় এই হীনমন্যতায় ভুগতেন যে যায়েদ একজন দাস আর তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক মহিলা, এজন্য যায়েদ সব সময় নবী (সাঃ)-এর কাছে জয়নাবের ব্যাপারে অভিযোগ জানাতেন, কিন্তু নবী (সাঃ) তাকে ধৈর্য্য ধরে সব কিছু সহ্য করতে বলতেন, কিন্তু যায়েদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। তিনি তার ধৈর্য্য হারিয়ে একদিন জয়নাবকে তালাকই দিয়ে দিলেন।

এই পরিস্থিতিতে জয়নাবকে বিবাহ করার জন্য তার আত্মীয়েরা নবী (সাঃ)কে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু নবী (সাঃ) এতে অসম্মতি জানালেন। তিনি জয়নাবের আত্মীয় স্বজনদের বোঝালেন যে তাদের মধ্যে শ্বশুর বৌমার সম্পর্ক, ঠিক এই সময় কুরআন মানুষের সম্পর্ক কোথায় কেমন হতে পারে তা পরিষ্কার করে ঘোষনা করল,

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয় বরং আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী।" (কুরআন ৩৩ ঃ ৪০)

এইভাবে নবী (সাঃ)কে সমস্ত রকম জড়তা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ জয়নাবকে বিবাহ করার অনুমোদন দিলেন। তার এই বিবাহের মধ্যে থেকে আরবের বহু প্রাচীন প্রথা দত্তক ব্যবস্থা কে ভেঙ্গে দেওয়া হল। দত্তক পুত্রেরা যে নিজের রক্ত সম্পর্কের

পুত্রের মত নয় তা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হল সবাইকে । তাই নবী (সাঃ)-এর জয়নাবের সাথে বিবাহ কোন গর্হিত কাজ ছিলনা বরং তা সমাজ সংস্কারের পথ খুলে দেওয়ার জন্য এক বাস্তব ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, নবী (সাঃ)এর বৈধতা পেশ করে কুরআন ঘোষনা করেছে,

"পরে যায়েদ যখন তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ন করে নিল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যেন নিজেদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে যখন তারা তাদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ন করে নিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশই তো পালিত হওয়া উচিত ছিল।"

(কুরআন ৩৩ ঃ ৩৭)।

এ আয়াত যখন অবতীর্ন হল তখন জয়নাব (রাঃ) আল্লাহর কাছে সিজদায় লুটিয়ে দোওয়া করেছিলেন 'হে আল্লাহ আমি যদি তার যোগ্য হই তাহলে তার সাথে আমার বিয়ে দিন"-এটা তিনি তখন বলেছিলেন যখন আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর নবী (সাঃ) তার কাছে বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আর একাজ তিনি করতে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় এটাও তিনি তাকে জানিয়েছিলেন। এ সংবাদ শোনার পর থেকে জয়নাব আনন্দে উচ্ছাসে তার সমস্ত গহনা খবর বহনকারী দাসীকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এবং আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলেন এবং টানা দু মাস রোজা রাখার নিয়্যাত করেছিলেন। নবী (সাঃ) তাঁর এই বিয়েতে আরবের গন্যমান্য তিনশত সাথিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তারা সবাই আনন্দ সহকারে এই ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

জুয়াইরিয়া (রাঃ)

নবী (সাঃ) জুয়াইরিয়া নামে এক মহিলাকে অষ্টম স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করেছিলেন হারিসের কন্যা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বনু মুসতালিক গোত্রের নেতা। এটি ছিল শক্তিশালি এক গোত্র। পূর্বে জুরাইয়ার বিবাহ হয়েছিল ঐ বংশেরই এক যুবকের সাথে এবং তারা স্বামী ও পিতা উভয়েই নবী (সাঃ)-এর চরম শত্রু ছিলেন। যুদ্ধ বন্দী হিসাবে তিনি ধৃত হয়েছিলেন। এই সময় চরম শত্রু হারিস নবী(সাঃ)-এর কাছে গিয়ে খুব ইতস্ততার সাথে আবেদন করলেন যে তার কন্যাকে যেন দাসী না বনানো হয় কারণ গোত্র নেতার মেয়ের এই ভাবে দাসী হওয়াটা খুবই অবমাননার। সে জন্য তিনি খুব অনুরোধ করলেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তিনি মুক্তিপনও মিটিয়ে দিতে চাইলেন। উত্তরে নবী (সাঃ) হারিসকে বোঝালেন যে ব্যাপারটা তার কন্যা জুয়াইরিয়ার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। হারিস কন্যার কাছে গিয়ে জানালেন যে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তার ইচ্ছার উপর। জুয়াইরিয়া পিতাকে জানালেন যে তিনি এখানে থেকে যেতেই চান মুহাম্মদ (সাঃ) এর সেবা করার জন্য। আর বললেন নবী (সাঃ) যদি তাকে বিয়ে করেন

তাহলে সেটা খুবই উত্তম হয়। হারিস তার কন্যার বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হলেন। এই অবস্থাতে নবী (সাঃ) জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করলেন।

এই বিয়েতে শত্রুপক্ষের লোকেরাও নবী (সাঃ) এর প্রতি খুশি হয়েছিলেন। অন্যান্য যত বন্দী ছিল এই বিবাহের ফলে তাদের মুক্তি দেওয়া হল। তাছাড়া এই বিবাহ শত্রু মিত্রের মধ্যে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। আয়েশা (রাঃ) জুয়াইরিয়াকে খুব ভালবাসত। শীঘ্রই তিনি ইসলামের নানান বিষয়ে জুয়াইরিয়াকে শেখালেন। অল্প দিনের মধ্যে জুয়াইরিয়া ইসলামি জ্ঞানে পন্ডিত হয়ে উঠলেন। নতুন ইসলামি বিশ্বাসে তিনি বড় জ্ঞানী হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেন। তার ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য দুটোই অতি চমৎকার বলে আয়েশা (রাঃ) বর্ননা করেন। যেটা অন্যান্যদের মধ্যে ছিলনা।

উম্মে হাবিবা (রাঃ)

উম্মে হাবিবা (রাঃ) ছিলেন নবী (সাঃ) এর নবম স্ত্রী। ইসলামের চরম শত্রু আবু সুফিয়ান ও হিন্দার কন্যা ছিলেন উম্মে হাবিবা। উম্মে হাবিবা ও তার প্রাক্তন স্বামী আবু সুফিয়ান ও হিন্দার কথা অমান্য করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতার ও অন্যান্য কুরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এই দম্পত্তি আবি সিনিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য উম্মে হাবিবার এই স্বামী আবি সিনিয়ায় খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। অপর দিকে উম্মে হাবিবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে চাইলেন না তিনি মুসলিম হিসাবে থেকে গেলেন। স্বামী খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার পর আয়েশ আরামের জীবনে ঝুকে পড়লেন। শীঘ্রই নেশায় অভ্যস্থ হয়ে পড়লো এই হত্যভাগ্য স্বামী, এমন কি নেশা তাকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিল। উম্মে হাবিবা যখন মক্কায় ফিরে এলেন তখন তিনি সত্যই খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লেন। এই পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) তাকে বিবাহ করলেন। অন্যান্য বিবাহের মত নবী (সাঃ)এর এই বিবাহ ও তার পরিবারের অনেকেই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করল। এমনকি 'বনু আবদল আস সামস' গোত্রটি পুরোটাই ইসলাম গ্রহন করে নিল। উম্মে হাবিবা (রাঃ)-র সাথে নবী (সাঃ) এর বিবাহের প্রভাব খুব সুদূর প্রসারী হল। খালিদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পিছনে এই বিবাহের প্রভাব খুবই ছিল। অপরপক্ষে নবী (সাঃ)ও ইসলামের সাথে আবুসুফিয়ানের যে চরম শত্রুতা তা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছিল এই বিবাহের ফলে, এখন থেকে কুরাইশরা ভাবতে শিখল মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের শত্রু নয় বরং তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার, তাই তার সাথে বিরোধে আগানো মোটেই সমুচিত হবে না কারণ তিনি তাদেরই একেবারে নিকট আত্নীয়। এই সময় উম্মে হাবিবার বয়স হয়েছিল আটত্রিশ বছর। তিনি নবী (সাঃ)এর সেবায় প্রায় সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, পূর্ব স্বামীর দুটি সন্তান তার থাকলেও নবী (সাঃ)এর কোন সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করেননি।

সাফিয়া (রাঃ)

দশম স্ত্রী হিসাবে মুহাম্মদ (সাঃ) সাফিয়া (রাঃ)কে বিবাহ করেছিলেন। ইনি খায়বার যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিলেন, তার মাতা পিতা দুই বিখ্যাত ইহুদি গোত্রের ছিলেন। ইহুদি পরিবারের এক বিখ্যাত কবির সাথে তার বিবাহ হয়েছিল।এই কবির নাম ছিল মিসকাম। কিন্তু তাদের এ বৈবাহিক জীবন বেশীদিন টেকেনি, মিসকাম তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়েছিলেন, পরে অপর এক ইহুদি যোদ্ধার সাথে সাফিয়ার বিবাহ হয়েছিল, এই স্বামীও এই যুদ্ধে প্রাণ হারাণ। সেই সঙ্গে তার পিতা ও অন্যরাও নিহত হয় খায়বার যুদ্ধে , তখন তিনি বন্দী হয়ে মুসলিমদের এক জন দাসী হয়ে যান, এতে অন্যান্য সাহাবারা অভিযোগ তোলেন যেহেতু সাফিয়া (রাঃ) এক জন প্রখ্যাত গোত্রপতির কন্যা তাই তাকে রসূল (সাঃ) এর দাসী হওয়া মানায় না। সাফিয়া (রাঃ) নিজেই মুসলিম হওয়া ও মুসলিমদের নেতার সাথে বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আর এও তিনি প্রকাশ করলেন যে তার পূর্ব কালীন সামাজিক মর্যাদা কেবল এতেই টিকে থাকতে পারে। এক সময় নবী (সাঃ) সাফিয়ার চোখের নীচে গালে একটা কালসিটে দাগ দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাফিয়া (রাঃ) উত্তরে বললেন,

"একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা চাঁদ মদিনা থেকে উঠে আমার কোলে পতিত হল। আমি আমার স্বামী খানানাহকে এই স্বপ্নটা বলেছিলাম, সে এটা শোনার পর বলল, 'তুমি কি মদিনা থেকে যে রাজা এসেছে তার সাথে তোমার বিবাহ হওয়ার কথা বলছ?' তারপর সে আমার গালে চপটাঘাত করে এই দাগ ফেলে দিয়েছিল।"

সাফিয়া (রাঃ) খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তার উদারতা, বিচক্ষনতা সত্যবাদিতা সব কিছু ছিল প্রশংসার। সত্য আন্দোলনের জন্য এগুলো সবই ছিল উপযোগী তিনি ইসলাম গ্রহন করেছিলেন। ইসলাম যে মানবিক ধর্ম তা তিনি অতি গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করেছিলেন। ইসলামের প্রতি তিনি এতই অনুগত হয়েছিলেন যে সব সময় তিনি এর সেবায় সময় কাটাতেন। ইসলামের সমস্ত রীতিনীতি যথাযতভাবে তিনি পালন করতেন ইসলাম গ্রহন করতে পেরে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করতেন। নবী (সাঃ) বেঁচে থাকা অবস্থায় উমার (রাঃ) এক সময় সফিয়া (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ইহুদীদের সাথে তার সম্পর্ক আছে কিনা, তিনি তীব্রভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। "আমি শুক্রবারই পালন করি শনিবার নয়, আমি আমার ইহুদী আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ভালোবাসা চালিয়ে রেখেছি, ইসলাম এটাতে বাধা দেয়না।"

একথা শোনার পর উমার (রাঃ) একেবারে চুপ করে গেলেন। ষাট বছর বয়েসে তিনি মারা যান। তাঁর কোন সন্তান ছিলনা।

মারিয়া (রাঃ)

মারিয়াকে আলোকজান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপ নবী (সাঃ)কে দাসী হিসাবে উপহার দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাকে একাদশ স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। নবী (সাঃ) এর কাছে দাসী হিসাবে জীবন কাটাবে এটা অবমাননাকর। এই মারিয়ার গর্ভে নবী (সাঃ) এক পুত্র সন্তান পেয়েছিলেন। খাদিজা (রাঃ) ও এই মারিয়া ছাড়া কেউ নবী (সাঃ)কে সন্তান উপহার দিতে পারেননি। মারিয়া (রাঃ)র গর্ভের সন্তানটির নাম ছিল আবদুল্লাহ। মাত্র দু বছর বয়সে আবদুল্লাহ মারা গিয়েছিল। এ ব্যাথা বহন না করতে পেরে কয়েক বছর পরে মারিয়াও মারা গিয়েছিলেন।

মায়মুনা (রাঃ)

মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ পরিণয় সম্পন্ন হয় আর একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা মায়মুনা (রাঃ)-র সাথে। তাঁর দু'বার বিবাহ হয়েছিল। তিনি ছিলেন পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধা। এই বিবাহের পিছনে ছিল নবী (সাঃ) এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-র পরামর্শ। মায়মুনা (রাঃ) এর গোত্র ছিল খুবই প্রভাবশালী। এই বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর পুরো গোত্র ইসলাম কবুল করে।

উপরোক্ত আলোচনাগুলিতে আমরা দেখলাম সবক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সাঃ) নিজস্বইচ্ছায়বিবাহ করেননি। বরং তাঁর মিশনের প্রয়োজনে মহান আল্লাহর নির্দেশেই তিনি বিবাহগুলি করেছিলেন। মায়মুনা (রাঃ) এর বিবাহের পর আল্লাহর নির্দেশ আসে "আর বিবাহ নয়" (কুরআন ৩৩ ঃ ৫২) কারণ তাঁর নবুয়্যতী জীবন সাফল্যে পথে।

তাঁর স্ত্রীগণ শারীরিক দিক দিয়ে খুবই আকর্ষণীয় ছিলেনতা নয়। বেশিরভাগের বয়স হয়েছিল চল্লিশের উপর। তাঁরা বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন। সকলের সঙ্গে ছিল পূর্ব স্বামীর সন্তান-সন্ততি। একমাত্র খাদিজা (রাঃ) ও মারিয়া (রাঃ) ছিলেন ব্যাতিক্রমী।

তাই এ কথা বলাই যায় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু বিবাহের পিছনে ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, মানবিকতাবোধের তাড়না।

সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে অনর্থকবিতর্ক করার কোন যুক্তি নেই। শত্রু হোক বা মিত্র কোন মানুষ যদি উম্মুক্ত অনাবিল মন নিয়ে তাঁর বিবাহ জীবনের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করেন তাহলে তিনি একমত হতে বাধ্য হবেন যে, তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে সমালোচনা করা হয় তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও হীন মানসিকতার ফসল।

কেন তিনি প্রথম বিবাহ করছেন এক চল্লিশ বছরে বিধবাকে? যখন তাঁর বয় পঁচিশ? দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। খাদিজা (রাঃ)-র মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। কেন তিনি তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবাদের বিবাহ করলেন? তাঁর সামনে যখন অফুরন্ত বৈভবের হাতছানি ছিল তখন তিনি কেন এক কষ্টের জীবনকে বেছে নিলেন? তাঁর জীবনের ব্যস্ততম যে পাঁচটি বছর সেই পাঁচ বছরেই তো তিনি বেশিরভাগ বিবাহগুলি করেন। কোন কোন সমালোচক সমালোচনা করতে গিয়ে 'হারেম' জীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তাহলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় থাকেনা যে, নারীদেহ ভোগ করার জন্য নয় বরং এক কঠিন মুহূর্তে কঠোর বাস্তবতার মুখে তাঁকে এ ধরণের সিদ্ধান্তগুলি নিতে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক কারেন আর্মস্ট্রং তাঁর গ্রন্থ "Mohammad a Prophet of our time" এর উদ্ধৃত এখানে পেশ করা যেতে পারে। "বহু-বিবাহ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ একটি অমোঘ সামাজিক বিধান। পুরুষের যৌন চাহিদা নিবৃত্তের জন্য এটা করা হয়নি বরং বিধবা, এতিম, অন্যান্য অসহায় মহিলাদের প্রতি ে সামাজিক অবিচার হচ্ছিল তাকে উৎখাত করতেই এ বিধান দেওয়া হয়েছে। দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা সবসময় পরিবারের দুর্বলদেরকে বঞ্চিত করে। বিধবা মহিলাদের বিবাহের সুযোগ করে দিয়ে সেই অবস্থা পরিবর্তন করা হয়েছে। তোমরা চারটি করো কিন্তু সকলের প্রতি সুবিচার বাধ্যতামূলক। এই বিধানের মাধ্যমে কুরআন বিধবা মহিলাদের যে সামাজিক মর্যাদা ও আইনগত নিরাপত্তা দিয়েছে এখনো পর্যন্ত পশ্চিমী দেশগুলি তা প্রদান করতে পারেনি।"

নবী (সাঃ) এর বহু বিবাহের কারণ সমূহ

এটা খুব দুঃখের বিষয় ইসলামের কিছু শত্রু সমালোচক নবী (সাঃ) এর একাধিক বিবাহকে নিয়ে নানারকম কুরুচিপূর্ন মন্তব্য করেছেন। তারা নবী (সাঃ)কে যৌনতার বিচারে বিচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ এটা ভেবে দেখেননি নবী (সাঃ) কোন কোন পরিস্থিতিতে এই সকল বিবাহ করেছিলেন এবং এর গুরুত্ব বা কতখানি ছিল তা ভাববার অবকাশও তারা পাননি। নবী (সাঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের সাথে তার এই সকল বৈবাহিক সম্পর্ক কত গভীর প্রভাব রেখেছিল তা সমালোচকরা ভেবে দেখেন নি। বিবাহের আগে নবী (সাঃ) একেবারে যুবক বয়সে কেমন ধরণের নজির পেশ করেছেন তাও তারা ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন নি।

মদিনায় এসে তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহন করেছিলেন, এর অনেক ব্যক্তিগত, গোত্রীয় ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ঘর সংসার পাতা শুরু করেছিলেন, আর তারা সবাই প্রায় বিধবা অথবা বিবাহ বিচ্ছিন্না ছিলেন। আবার

দু'জন ছাড়া সবাইয়ের বয়স ছত্রিশেরও অধিক ছিল। কেউ কি এটা বিশ্বাস করবে তিনি নারী নিয়ে মজা লুটছিলেন এই রকম ভয়ংকর যুদ্ধ পরিস্থিতির সময়গুলোতে? যখন চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল শত্রুরা? একদিক থেকে যেমন বিভিন্ন গোত্র তাঁকে আক্রমন করতে উদ্যত হয়েছিলেন তেমনি উদ্যত হয়েছিল মুনাফিক কপটরাও। কুরাইশরা একের পর এক আক্রমনের থাবা বাড়িয়ে রেখেছিল তাঁর দিকে। এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে শান্তির নিদ্রা সত্যিই বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সকল খুঁত খুঁতে মানুষেরা নবী (সাঃ)এর বিবাহ নিয়ে সমালোচনা করেন তারা মূলত: নিজেদের দুর্বল নৈতিকতা দিয়েই রসূলের (সাঃ) বিচার করতে চান। তাদের অন্তরের ভিতরে যে দুর্বলতা আছে তা তারা তাদের সমালোচনায় ঢেলে দিয়েছেন।

নবী (সাঃ) খুব স্বাভাবিক জীবন জাপন করতেন। আসবাব পত্র বলতে তাঁর ছিল একটি মাদুর খন্ড, জাগ, কম্বল আর অনুরূপ কয়েকটি জিনিস। কিন্তু ব্যস্ততায় তিনি ছিলেন রাজা, সম্রাট, প্রধান বিচারপতি, রাষ্টপতি, কমান্ডর ইন চিপ বরং তার চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সময় দেশের সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যার ফলে তার কাজ আর ব্যস্ততার শেষ ছিল না। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও তিনি রাতে একজন তাপস মানুষ, আল্লাহর কাছে সিজদায় অবনত এক ক্ষমা প্রার্থী। আল্লাহর কাছে দয়ার ভিখারী । কুরআনই তার স্বাক্ষী বহন করে।

"*হে নবী! তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনও রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ সময়, আর কখনও অর্ধেক রাত্রি এবং কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্রি ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমার সঙ্গী সাথীদের মধ্য হতেও কিছু সংখ্যক লোক এই কাজ করে। রাত্র ও দিনের হিসাব আল্লাহই রাখছেন।" (কুরআন ৭৩ ঃ ২০)*

মদিনার শেষ বছরগুলোতে তিনি সমস্ত জায়গা থেকে সম্পদ পাচ্ছিলেন এমন কি সম্পদের স্তুপ তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল বলা যেতে পারে। নবী (সাঃ)এর সমস্ত স্ত্রীরা প্রায় ছিলেন অভিজাত পরিবারের। তারা তাদের পিতৃ গৃহে আয়েশ আরামেই কাটাতেন। কিন্তু নবী (সাঃ) এর সাথে সংসার জীবনে তারা বড়ই অভাবে কাটিয়ে ছিলেন। কোন রকম আয়েশ আরাম জীবন বলতে তাদের কিছুই ছিলনা। নবী (সাঃ) নিজেই অনেক সময় অভূক্ত থাকতেন, এক টুকরো রুটিও জুটতনা। সম্পদ চারিদিক থেকে এলেও তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। নিজের জন্য সামান্য বা কোন কোন সময় কিছুই থাকত না। এক সময় বাধ্য হয়ে স্ত্রীরা একটু বেশী চাওয়ার জন্য জড়ো হয়ে আলোচনা করেছিলেন, এতে কুরআন অবর্তীন হল।

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলঃ যদি তোমরা এই পৃথিবীর জীবন ও এর চাকচিক্য চাও তাহলে এস আমি তোমাদের আনন্দ সামগ্রী দেব এবং ভদ্রভাবে তোমাদের বিদায় দেব।"

কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর নবী (সাঃ) এর স্ত্রীরা সতর্ক হয়ে যান। তারা নবী (সাঃ) এর সাথে জীবন অতিবাহিত করতে চাইছিলেন। নবী (সাঃ)এর সাথে সুখ দুঃখের সমস্ত রকম ভাগীদার হয়ে তাদের জীবন চলুক এটাই তাদের কাম্য হল। যারা সমালোচক তারা এর কি ব্যাখ্যা দেবেন? যারা সমালোচনা করেন তারা প্রথমে নিজেদের জীবন নিয়ে আলোচনা করে দেখুক যে তারা কতটা এ পরীক্ষায় উৎরে যেতে পারেন। তার পর তারা নবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবন নিয়ে সমালোচনার অধিকার পেতে পারে। ইতিহাসের এই রকম বাস্তব পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) যে একাধিক বিয়ে করে সঠিক পথ গ্রহন করেছিলেন তা জোর গলায় বলা যেতে পারে।

উহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলিম সৈন্য নিহত হন। তারা পিছনে রেখে গিয়েছিলেন তাদের স্ত্রীদের, তাদের বোনদের অনাথ বালক বালিকাদের, আর তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব অবশ্য মুসলমানদের উপর পড়েছিল।এই সকল বিধবাদের জীবন নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তাদের বিবাহ করাই ছিল যথপোযুক্ত ব্যবস্থা। শুধু নবী (সাঃ) নয় বরং তার অনেক সাথিরাও এ রকম বিধবাদের বিবাহ করে তাদের মনে সান্তনা এনেছিলেন, আর নবী (সাঃ) সব সময় বিয়ে করেছেন এরকম দুদর্শাগস্ত নারীদেরকেই।

এমন অনেক যুদ্ধ ঘটেছিল যেখানে অসংখ্য নারী বন্দী অবস্থায় মুসলমানদের হস্তগত হয়। তাদের হত্যাও করা যাবেনা, আবার তাদের মানসিক সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা,তা দৈহিক হোক কিংবা মানসিক যাই হোকনা অধিকার অধিকারিই এরকম পরিস্থিতিতে তাদের পুনঃ বিবাহ দিয়ে তাদের স্থায়িত্ব স্থাপন করাই ছিল সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। নবী (সাঃ) ও তার সাথিরা এ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করে অসংখ্য দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের উদ্ধার করেছিলেন অবমাননার হাত থেকে। যদি নবী (সাঃ)ও তাঁর সাথিরা এব্যবস্থা না নিতেন তাহলে ঐ সকল অসহায় নারী ও অনাথ শিশুদের পথে পড়ে মরতে হত পশুর মত।

যারা সমালোচনা করেন তারা কি বলতে চান সকল নারীদের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল? আমরা জানি কোন বিচক্ষন ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের বোকামী প্রস্তাব দিতে পারেনা। কারণ এতে অল্প সময়ের মধ্যে সমাজে নৈতিকতার ভাঙ্গন দেখা দিত ও সমাজ শীঘ্রই পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হত। কিন্তু নবী (সাঃ) যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা ছিল অতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। এর দ্বারাই তিনি সমাজকে নানা রকম জটিলতা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। নবী (সাঃ) ও তার সাথিরা এই সকল নারীদের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ না করে হারেমে ভোগ করার জন্য অনায়াসেই ব্যবস্থা নিতে পারতেন, কিন্তু তা তারা করেননি বরং বিবাহ করে স্ত্রীর সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে নিজেদের ঘরে তুলেছিলেন। কোন সমালোচক কি বলবেন তাদের বিয়ে না করে হারেমে স্থান দেওয়া উপযুক্ত ছিল ? আর সত্যিই রসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথিরা যদি এরকম হেরেমে রাখার

ব্যবস্থা করতেন তাহলে কি সমালোচকেরা মেনে নিতেন? কখনই নয়। কুরআন এই পরিস্থিতি সমাধানের জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। যা চিরকালের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে সমস্ত মানব জাতির জন্য। আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি কর্তা, তিনিই তো বেশি জানবেন এই মানুষের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কোথায় রয়েছে। কুরআনের ঘোষণা,

"তোমরা যদি এতিমদের (অনাথ) প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য হতে দুই দুই , তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ করে নাও আর তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবেনা তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহন কর।" (কুরআন ৪ ঃ ৩)

নবী (সাঃ)এর একাধিক বিবাহের কারণ হিসাবে আর একটি দিক হল নবী (সাঃ)এর সমস্ত কথা ও কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পরবর্তী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নবী (সাঃ) এর এই সকল স্ত্রীদের কাছ থেকে বহু হাদীস সংগৃহীত হয়েছে। হাদীস গ্রন্থের বিরাট অংশই আয়েশা (রাঃ)-র দ্বারা সংগৃহীত। একজন ব্যক্তির কাছে যত নিকটবর্তী থাকা যাবে তার কাছ থেকে তত বেশি জানা যাবে এবং তা বেশি সঠিক হবে। এটা অনস্বীকার্য যে স্ত্রীদের চেয়ে আর কেউ কারোর নিকটতম হতে পারেনা। আর একজনের চেয়ে একাধিক জন বেশি রিপোর্ট পেশ করতে পারবেন। আর এই যদি বাস্তব হয় তাহলে আল্লাহ ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নবী (সাঃ) এর একাধিক বিবাহ ঘটিয়েছিলেন।

নারীরা মানব জাতির অর্ধেক তাই নারীদের জন্য ইসলাম প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদেরই প্রয়োজন ছিল। এই সকল নারীদের প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্য নবী (সাঃ) কি স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীদের কাছে রাখতে পারেন? না, রাখলে সেটা ভাল দেখাত? জানি সমালোচকদের কাছে এর জবাব নেই।

নবী (সাঃ) প্রতিদিন তাঁর কাজ কারবার ও উপদেশ দ্বারা ইসলামের কিছু না কিছু শিক্ষা দিতেন, লোকেরা সেগুলো অন্যদের কাছে তৎক্ষনাৎ দায়িত্বের সাথে পৌঁছে দিতেন। এভাবে মহিলাদেরও শিক্ষা দানের দরকার ছিল কিন্তু তাদের শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত মহিলাদের একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। আর সেটা নবী (সাঃ)এর স্ত্রীরা ছাড়া কেউ করতে পারত না। নবী (সাঃ)-এর বেডরুম থেকে শুরু করে বাথরুম পর্যন্ত পরিবারিক চলাফেরা, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, বসার ঘর থেকে রান্নাঘর সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর সমস্ত জগৎবাসীর অনুসরনীয় ও অনুকরনীয় ব্যাপার ছিল আর তা কেবল তার স্ত্রীদের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং তা বাইরের জগতেও এসেছিল তাদের দ্বারাই। নবী (সাঃ)এর স্ত্রীরা ইসলামী জ্ঞানকে খুবই সততা ও বিশ্বস্ত তার সাথে বাইরের মানুষদের কাছে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। বলতে গেলে নবী (সাঃ)এর সাথে বর্তমান জগতের একঝাঁক ঘিরে ধরা রিপোর্টার বলা যেতে পারে তার

স্ত্রীদের। নবী (সাঃ) যেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের কছে অনুসরনীয় ও অনুকরনীয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাই তাঁর পিছনে রিপোর্টার তো থাকতে হবে। তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে সব সময় আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক প্রশ্নোত্তর পর্ব ইত্যাদি চালাত। এক কথায় সাংবাদিক বৈঠক চলত বলা যেতে পারে। এই দৃষ্টিতে আলোচনা করলে নবী (সাঃ) এর বহু বিবাহকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে মনে হবে।

নবী (সাঃ)এর বিবাহের পিছনে অন্যান্য কারণও ছিল-

ক) আন্ত:গোত্রীয় সম্পর্কের উন্নয়ন।

খ) বিধবাদের পুনর্বিবাহ।

গ) তালাকপ্রাপ্তদের পুনর্বিবাহ।

ক) প্রথম কারণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়- গোত্রীয় নানা রকম বাধা, নানা রকম কুসংস্কার বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজকে একেবারে চেপে ধরে রেখেছিল। এ সকল অযৌক্তিক নিয়ম নীতি ভেঙ্গে বিবাহ করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলনা। তাই স্বাভাবিকভাবে নারীদের প্রতি অনেক অবিচার নেমে আসত। নবী (সাঃ) এর বিবাহগুলি বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে তিনি এ সকল গোত্রীয় সংস্কার ভাঙ্গতে পেরেছিলেন। আর দীর্ঘদিনের পুষে রাখা এই সকল সংস্কারগুলোকে ভাঙ্গার জন্য নিজেকেই উদাহরণ হতে হয়েছিল। কারণ এরকম সংস্কারমূলক কাজে নিজে না এগিয়ে আসতে পারলে কাকে দিয়ে উদাহরণ পেশ করা যেত। এটা বলা যেতে পারে সংস্কারের নানান বুলি সমালোচকেরা আওড়ালেও তার উদাহরণ পেশ করার অভাবে তা মাঠে মার খায়। আর নবী (সাঃ) এর বাস্তব উদাহরন পেশ করার জন্য সমাজের মধ্যে বংশীয় ভাবাবেগকে দূরে সরিয়ে অনেক সংস্কার করতে পেরেছিলেন। সাফিয়া ছিলেন একজন ইহুদি মহিলা তাকে তিনি বিবাহ করে বুঝিয়েছিলেন যে পূর্বে ধারণা যাই থাকনা কেন তাতে কোন আসে যায় না। যে কোন মুসলিম যে কোন মহিলাকে বিয়ে করতেই পারে। আল্লাহর সাথে শিরক্ না করলে এরকম মহিলার সাথে বিবাহ করায় ইসলাম কোন বাধা আরোপ করেনা। মারিয়াকে বিবাহ করেও নবী (সাঃ) এরকম উদাহরণ পেশ করেছিলেন।

খ) বিধবা বিবাহ আজও সমাজে বিরাট সমস্যা। বিধবাদের হয়ে আমরা অনেক কথা বলে থাকলেও আমরা কেউ এই কাজে নজির সৃষ্টি করতে পারিনি। কিন্তু নবী (সাঃ) তৎকালীন বর্বর যুগে সমাজ সংস্কারক হিসাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই একাজ করে দেখিয়েছেন কিভাবে বিধবাদের পাশে দাঁড়ানো যায়। কেবলমাত্র একজন কুমারী আর একজন বিবাহ বিচ্ছিন্না ছাড়া নবী (সাঃ) এর সমস্ত স্ত্রীই ছিলেন বিধবা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি কেবল বিবাহকে যৌন ক্রিয়া কলাপ হিসাবে না দেখে সামাজিক অনেক সমস্যার সমাধান বলে ভাবতেন এবং তা নিজের জীবনে করে দেখিয়ে গেছেন।

গ) বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলাদের খুবই খারাপ চোখে দেখা হত। কেউ এদের দিকে সুনজরে দেখত না। কিন্তু গোপন প্রেমে এদের সাথে সমাজের নিচুস্তর থেকে অভিজাতরাও জড়িয়ে থাকত। নবী (সাঃ) প্রমাণ দিলেন বিবাহ বিচ্ছিন্না নারীদের ঘৃনার চোখে সরিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। একজনের সাথে তাদের জীবনের খাপ না খেলেও অন্য জনের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন চলতে পারে। জয়নাবকে বিয়ে করে তিনি এ নজীর সৃষ্টি করেছিলেন।

একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে নবী (সাঃ) এর বিয়েগুলোর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক কারণ লুকিয়ে রয়েছে। নবী (সাঃ) এই বিয়েগুলো রাজনৈতিকভাবে আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোকে অনেক কাছে এনে দিতে পেরেছিল। বিভিন্ন গোত্রগুলি নবী (সাঃ) এর সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এই সকল বিয়ের মাধ্যমে। নবী (সাঃ) এইরকম বৈবাহিক নীতি ছাড়া কিছুতেই এই বন্ধন সম্ভব হতনা। ভৌগলিকভাবে সারা আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এই সকল গোত্রগুলি কিন্তু নবী (সাঃ) গোত্রীয় বাঁধনের মধ্যে দিয়ে সকলকে এক করতে পেরেছিলেন। আর এর ফলে পরস্পর গোত্রীয় যে বিবাহ কলহ ছিল তা আনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। পরিবারগুলোও শান্তি পেয়েছিল নানা রকম কলহের হাত থেকে। আর এইভাবে সারা আরব উপদ্বীপে এসেছিল এক ঐক্যপূর্ন শান্তি ও ন্যায় বিচার।

● তৎকালীন সময়ে সারা আরবে দত্তক গ্রহণ ব্যবস্থা ছিল এবং তা একেবারে রক্তসম্পর্কের পিতা পুত্রের মত বলবৎ ছিল সমাজে। কিন্তু আল্লাহ এ ধরণের সম্পর্ককে বাতিল করে দিয়েছে। পূর্বেই এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত পেশ করা হয়েছে, যায়েদ ছিলেন নবী (সাঃ) এর পালক পুত্র, সমাজের প্রতিটি মানুষ নবী (সাঃ) এর সাথে তার সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের পিতা পুত্রের মত দেখে আসছিল। কিন্তু আসলে এটা মোটেই সঠিক নয়। কিন্তু এ কথা বললেও কেউ শুনতনা। এক মাত্র অহীই এর সমাধান। তাই আল্লাহ অহী অবতীর্ণ করে সমগ্র আরবের এই কুপ্রথা রোধ করলেন এবং মুহাম্মদ (সাঃ)কে প্রথা ভাঙ্গার উদাহরণ হিসাবে পেশ করলেন। তাই নবী (সাঃ) তার পালক পুত্রের বিচ্ছিন্না স্ত্রীকে বিবাহ করে এটা প্রমান করলেন সমাজে এই ধারণা ঠিক নয় যে, পালক পুত্র ও পিতা সম্পর্ক একবারে রক্তসম্পর্কের পিতা পুত্রের মত।

● জয়নাব তো নবী (সাঃ) এর চাচার মেয়ে ছিলেন। তিনি তার কৈশোর থেকে কৈশর সব কিছু জানতেন, এমনকি তাঁর সাথে তার বিবাহের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি তাকে বিয়ে করেন নি। ইচ্ছা করলে তিনি তখনই স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে পারতেন। জয়নাবকে নিয়ে নবী (সাঃ) এর উপর হীন মন্তব্য চাপিয়ে বলা হয় যে, যায়েদ ও জয়নাবের মধ্যে বিচ্ছেদের জন্য নবী (সাঃ) পূর্ব পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। সম্ভবত সমলোচকেরা জানেন না যে জয়নাবের সাথে রসূলের বিয়ের প্রস্তাব অনেক

আগেই পেশ করা হয়েছিল। জয়নাবকে পাওয়ার জন্য রসূলের কোন হীন পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিলনা।

নবী (সাঃ) এর জীবনের এই একাধিক বিবাহকে নিয়ে সমালোচকরা তাঁকে আয়েশ আরামের মানুষদের চরিত্রের সাথে গুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আদৌ নবী (সাঃ) ভোগবাদী মানুষ ছিলেন না। পৃথিবীর মজা লুটতে তিনি মোটেই আসেননি। বিখ্যাত খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক Philip k. Hitty তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে নবী (সাঃ)এর সারা জীবনের সহজ সরল দিক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

“Even in the height of his glory Prophet Muhammad led, as in his days of obscurity or darkness, an unpretentious like and modest life. He was often seen mending his own clothes and was at all times within the reach of his people when did he have the time for pleasure?”

> “এমন কি এ রকম অন্ধকার অদ্ভুদ যুগেও সমাজে নবী (সাঃ) বহন করেছিলেন উচ্চ মর্যাদার শিরোপা কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অতি সহজ সরল মানুষ। প্রায় বড় বড় ধনীদের সাথে তাকে নিজের কাপড় চোপড় সেলাই করে পড়তে দেখা গেছে। তা হলে তখন কি তিনি আয়েশ আরামে জীবন কাটানোর সময় পেয়েছিলেন?”

নবী (সাঃ) এর স্ত্রীদের সকল দিক আলোচনা করে দেখেছি যে তারা প্রকৃত পক্ষে ছিলেন অতি ভদ্র বিনয়ী রুচিশীল। রুচিশীল ভদ্র বাড়ির মহিলারা ছিলেন তাঁরা। এমন কি নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পরও তাঁরা অতি শালীন জীবন যাপন করেছিলেন। কোন সমালোচক তাদের বিরুদ্ধে কোন দুর্নাম ছড়ানোর দু:সাহস করতে পারেনি। শত চেষ্টাতে সমালোচকরা ব্যর্থ হয়েছিলেন রসূলের স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুন্ন করতে। নবীর সাথিরা রসূল পত্নীদের মাতা হিসাবে গ্রহন করেছিলেন।

নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর দু'শতাব্দীরও পরে কয়েকটি জাল হাদিসকে ঘীরে নবী (সাঃ) এর উপর দৈহিক আবেগকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এটা আমরা কখনই বলতে পারিনা যে নবী (সাঃ) নিজ স্ত্রীগন ব্যতিত অন্য কোন মহিলাদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক গড়ে ছিলেন। বরং এটাই বাস্তব ঘটনা কিছু মুসলিম শাসক ইচ্ছে মতো জীবনকে ভোগ করেছে। তারা স্ত্রী ছাড়াও অনেক উপপত্নী রেখেছিল আর তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য কিছু হাদীস সৃষ্টি করে নবী (সাঃ)এর বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে করে নিজেদের কুকীর্তি

আর কুকীর্তি বলে মানুষের কাছে ধরা না পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যারা শত্রু ও সমালোচক তারা এ সকল হাদীসকে হাতিয়ার করে নবী (সাঃ) এর নামে নানান গল্প ফেঁদেছেন এবং নবী (সাঃ)কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এমন কি তারা এর মধ্যে অনেক ধর্মীয় কল্পকাহিনী জুড়ে বসিয়ে পরিবেশন করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এ সকল জাল হাদীসগুলোর সাথে নবী (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের চরিত্রে কোন প্রকার মিলই ছিলনা। আর এর ফলে পশ্চাত্যবাদী সমালোচকরা নবী (সাঃ)কে নিয়ে বিদ্রুপ করছে। এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছে।

একজন বিখ্যাত ইসলামী পন্ডিত দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে ঐ হাদীসগুলো জাল যা নবী (সাঃ) এর সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে ওই সকল হাদীস মান্য করা মানেই বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হওয়া। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে কুরআনের আয়াত পেশ করেছেন।

"আর আমি তো এভাবেই চিরদিন শয়তান-মানুষ আর শয়তান জ্বিনকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি। এরা পরস্পরের কাছে মনোহরী কথা, ধোকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবেনা এটা যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তবে তারা এরূপ কখনও করতনা। অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও– তারা মিথ্যা কথা বলতে ও মিথ্যা চর্চা করতে থাকুক।"

আমাদের কখনই ভুললে চলবেনা যে কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন তা একটা বোঝাপড়া মৌলিক নীতির উপর কাজ করছিল। আর এই প্রভাবটা নবী (সাঃ) এর বহু বিবাহকে সমর্থন করে। তখনকার পরিবেশটাই ছিল এরকম ধরনের। সময়ের দাবীই ছিল এরকম।

ব্রিটিশ জীবনিকার R.V.C Bodley তার গ্রন্থ **The Messenger, The life of Muhammad** এ লিখেছেন,

"Prophet Muhammad's married life must not be looked at from an occidental point of view or from that set by christians. They were living at a period and in a country where the only known ethical standards were theirs."

> "প্রাচ্য দৃষ্টি কোন থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) বৈবাহিক জীবনের বিচার বিশ্লেষণ করলে হবে না অথবা খ্রীষ্টান দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেও নয়। কারণ তারাতো এমন এক সময় ও এমন এক দেশে বাস করছিল তা কেবল তাদেরই নৈতিক মানদন্ডের পরিমাপে।"

নবী (সাঃ)কে নিয়ে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের নাম তালিকা বিশাল এমনকি তাদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামাদের নামও রয়েছে। কিন্তু তাদের এই এত আক্রমণের পরেও নবী (সাঃ), ইসলাম ও কুরআন আজও দেড় হাজার বছর পরে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। হাজার হাজার মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের ছায়া তলে আসছে। যতই ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হচ্ছে ততই ইসলাম গ্রহনের হিড়িক পড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। একথা পৃথিবীর নানান পরিসংখ্যান বলছে। যত ইসলামকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে ততই ইসলাম শক্তিশালী হচ্ছে সর্বত্র।

25

আদর্শ শহর মদিনা

সর্বপ্রথমে নবী (সাঃ) মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পূর্বের কোন সরকারী পদ্ধতি গ্রহন করলেন না। তিনি সমস্ত সমাজটাকে পুন:সংস্কারে সাজানোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সারা আরবজুড়ে তখন চলছিল গোত্র প্রথার রমরমা। যা কিছু হত গোত্রকে নিয়ে। যা কিছু ঘটত গোত্রের নির্দেশানুসারে। অসংখ্য গোত্রব্যবস্থা পুরো সমাজটাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে রেখেছিল। সরকারী কোন নিয়ম কানুনই ছিল না। সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান যেমন বিচারালয়, সৈন্য, কোষাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি- কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না এখানে। তাই নবী (সাঃ)কে ভাবতে হয়েছিল একবারে প্রথম থেকে।

এ এক এমন সমাজ ছিল যেখানে প্রশাসনিক কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না, আর এমনই সমাজে নবী (সাঃ) সমাজ গঠনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। তাই নবী (সাঃ)কে সমাজ গঠনের প্রতিটি স্তরে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল। এটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না যেখানে নবী (সাঃ) নতুন করে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাছাড়া পুারানো নিয়মনীতি তুলে ফেলা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। এখানে পুরানোকে উপড়ে নূতন চারা পোঁতা মোটেই সুখের ছিল না। এই রকম অবস্থাতে নবী (সাঃ) এমন রাষ্ট্রগড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যার আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্ধকারে নিমজ্জিত সারা আরব উপদ্বীপের মানুষগুলোর উপর। এমনকি সামান্য দৃষ্টিপাত করলেও আমরা অবাক না হয়ে পারি না যে তিনি আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এ ধরনের কাজে– নিশ্চয় সময়ের চেয়ে বেশি বড় অগ্রদূত হয়েছিলেন। তিনি এমন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করেছিলেন যেখানে ইসলামী সভ্যতা মধ্যেপ্রাচ্যে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে।

প্রথমেই যে প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেছিলেন তা হল 'মসজিদে নব্বী' বা নবীর মসজিদ। শহরের মধ্যে কাজকারবার চালনার এটা ছিল মূল কেন্দ্র। আর নবী (সাঃ) গৃহ নির্মান করেছিলেন এই মসজিদের সাথে সংযুক্তি রেখে। এখানে যেমন নামায আদায় করা হত তেমনি সমস্ত মানুষের সংযোগ স্থানও হয়েছিল এটা। আর সেই সাথে সাথে সব রকম সামাজিক রাজনৈতিক কাজ কারবার পরিচালনা করা হত

এখান থেকেই। যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে যেমন এখানে রাখা হত তেমনি এখান থেকে বিতরণও করা হত। আবার এখান থেকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার কাজও হত। নবী (সাঃ) কোন অভিযানে সেনা পাঠানোর দরকার হলে এখান থেকেই পাঠাতেন। দুঃখী মানুষেরা এখানেই জড়ো হতেন। আর নবী (সাঃ) এখান থেকে সাহয্যের ব্যবস্থা করতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের সমস্তরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত এই মসজিদ থেকেই। শিশু তথা সমাজের প্রতিটি স্তরের লোকেদের শিক্ষা ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এখান থেকেই।

এখানে বিভিন্ন গোত্রের বর্ণের মানুষেরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেল, তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও অখণ্ডতার এক মহামিলন পরিলক্ষিত হল মদিনার এই মসজিদকে ঘিরে। দূর দূর থেকে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা আসতে থাকলেন এখানে। তাদের খাওয়া দাওয়া ও থাকার সমস্তরকম ব্যবস্থা মসজিদেই হত। মানুষ কোন কিছু দান করতে বা দান নিতে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যেতেন না।

রাষ্ট্র ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান

নবী (সাঃ) মদিনা যাওয়ার পরেই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও এই রাষ্ট্র যাতে সুচারুভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য এক লিখিত সংবিধান চালু করেছিলেন। এই সংবিধানে সমস্ত নাগরিকদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্র ইতিহাসে এটা ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান। যদিও এটা মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু এর মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিমদের অধিকার ও কর্তব্য কি তাও আলাদা আলাদা করে লিখিত ছিল। বিশেষ করে ইহুদিদের ব্যাপারে।

জ্ঞানের উন্নতি

নবী (সাঃ) জ্ঞান অর্জনের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কোন ব্যক্তি, কোন সমাজ বা কোন রাষ্ট্রের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা না থাকলে তা মৃত জড় বস্তু ছাড়া কিছুই নয়। নবী (সাঃ) এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। জ্ঞান অর্জন করার জন্য নানান তৎপরমূলক কর্মসূচী নিয়েছিলেন তিনি। তিনি ঘোষনা করেন,

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ।"
"অল্প পরিমান জ্ঞান অর্জন দীর্ঘ প্রার্থনার চেয়েও উত্তম।"
"বিদ্বান ব্যক্তি ধার্মিক ব্যক্তির উপর তেমনই প্রভাবশীল যেমন তারাদের উপর

চাঁদের প্রভাব থাকে।"
"ফেরেশ্‌তারা জ্ঞান অন্বেষনকারীদের উপর ডানা বিস্তার করে।"

এছাড়া জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি যে কত তৎপর ছিলেন তা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন। তিনি যে জ্ঞানের কথা বলেছিলেন তা কেবল ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল তেমনটি নয়। মানব কল্যাণকর সমস্ত রকম জ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা জানাতেন। কোন এক সময় তিনি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তিপন হিসাবে তাদের শিক্ষাদানকে নির্ধারন করেছিলেন। অবশ্যই তারা মদিনার শিশুদের ভাষা শিক্ষা ও অন্যান্য বৈষয়িক জ্ঞান দান করেছিলেন।

আল সুফফা
ইসলামি জগতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ (সাঃ) শিক্ষা বিস্তারে খুবই তৎপর ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সার্বিক শিক্ষা। সবাই যাতে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন তিনি সে ব্যাপারে খুবই চিন্তা ভাবনা করতেন। আর এ কাজকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আল সুফফা এরকম বিদ্যালয় ভবন বলা যেতে পারে। এটি ছিল একটি আয়তকার হল ঘর। এখানে স্থান পেয়েছিল সেই সব ব্যক্তিরা যারা হিজরত করে এসেছিলেন কিন্তু তাদের পরিবার বা সংসার বলে কিছু ছিল না। তাদের প্রয়োজনে দেখভাল করারও কেউ আপনজন ছিল না।

নবী (সাঃ) এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের ডেকে নিয়ে ছিলেন মদিনাবাসী নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এইভাবে এরা সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং এদের অনেকজনকে নিয়োগ করেছিলেন যারা নুতন ইসলাম গ্রহন করছে তাদের নানারকম প্রশিক্ষনের জন্য। তাছাড়াও প্রতিদিন যে সকল লোকেরা ইসলাম গ্রহন করে চলেছিলেন তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এই সকল লোকেদের দ্বারা।

এইভাবে সুফ্‌ফা একদিকে দিনের বেলায় পাঠভবন ও রাত্রিতে ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার হত। এভাবে বলা যেতে পারে মুসলমানদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল এই সুফফা। বহু দূর দূরান্তের মানুষেরা এখানে শিক্ষা এবং থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তাই একে বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া হয়। জাবাল পুত্র মুয়ায রাঃ ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি এর অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুয়ায (রাঃ) সারাটা জীবন ধরে এখানে অবৈতনিক শ্রম, মেধা সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন এবং এতে তিনি অনেক

ঋণগ্রস্তও হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তা শোধ করার জন্য তার বাড়িঘর পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়েছিল।

নবী (সাঃ) নিজে মাঝে মাঝে এখানে ভাষণ প্রদান করতেন। তিনি এখানকার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। সাধারণভাবে অনেক সাহাবারাও এখানে জড়ো হতেন নবী (সাঃ)এর ভাষণ শোনার জন্য।

নবী (সাঃ) শিক্ষার প্রতি কতটা মর্যাদা প্রদান করতেন তা একটি বিশেষ ঘটনা থেকে বোঝা যায়। এক সময় তিনি তার বাড়ি থেকে আল সুফ্ফায় এলেন। এখানে এসে তিনি দেখলেন কিছু মানুষ আল্লাহর যিকির (স্মরণ) করছেন। অন্য দিকে কিছু মানুষ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করছেন। এ দেখে নবী (সাঃ) মন্তব্য করলেন "উভয়পক্ষই ভাল কাজ করছে কিন্তু তবুও যারা শিক্ষার কাজে আছে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল"-এ কথা বলার পর তিনি জ্ঞান চর্চাকারীদের দলে বসে গেলেন। নবী (সাঃ) জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে বলেন,

"রাত্রিতে এক ঘন্টা জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যয় করা সারা রাত্রি নিদ্রাহীন হয়ে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।"

আল সুফ্ফা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এটিকে ঘিরেই মদিনার আসেপাশে আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অনেক পণ্ডিত বালাজুরী মদিনার এই আল সুফফা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি রেখে শিক্ষার প্রসার ঘটান। মদিনার এই মসজিদের সাথে আরোও ন'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে থাকে।

নবী (সাঃ) অবশ্য শিক্ষার কাজকে কেবলমাত্র মদিনায় সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিনি বিখ্যাত বিখ্যাত সাহাবাদের মদিনার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠালেন। এই সব অঞ্চলের লোকেরা ক্রমাগত ইসলামের শীতল ছায়ায় স্থান নিচ্ছিলেন। তাই তাদের ইসলামী প্রশিক্ষণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এর উদাহরণ হিসাবে হামজা পুত্র আমরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি কেবল ইয়েমেনে গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন না। তিনি সেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের সাথে শিক্ষা প্রসারের কাজেও নিযুক্ত ছিলেন।

নারী শিক্ষার ব্যবস্থা

নবী (সাঃ) শিক্ষার প্রতি ছিলেন খুবই সজাগ। আবার এ শিক্ষানীতিতে ছিলেন উদার মনোভাবের। তিনি জানতেন শিক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি জানতেন তা প্রথমে কোথায় হওয়া দরকার বা কাদের মধ্যে হওয়া দরকার। সমাজে ব্যাধি থাকলে সমাজ উন্নত হতে পারে না তা তিনি জানতেন, তাই যথা স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করতে তিনি

ভোলেননি। তিনি নারী শিক্ষার কথা গুরুত্বের সাথে প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেন,

> "যদি তুমি একজন পুরুষকে শিক্ষা দাও তাহলে একজন শিক্ষা লাভ করল। আর যদি একজন মহিলাকে শিক্ষা দাও তাহলে তুমি একটি পরিবারের সকলকে শিক্ষা দিলে।"

শিক্ষাদানের ব্যাপারে নবী (সাঃ) নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেননি। জ্ঞানার্জনের গুরুত্বকে তিনি সমানভাবে নারী পুরুষদের মধ্যে বিলিয়ে ছিলেন। কুরআনের আয়াত নবী (সাঃ) এর উপর যখন অবতীর্ণ হত তখন নবী (সাঃ) তা প্রথমে পুরুষ জনসভায় পেশ করতেন পরে মহিলাদের সভাতেও তা জানিয়ে দিতেন। তিনি সপ্তাহে বিশেষ একদিনে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। এখানে মহিলারা নানান বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, আর নবী (সাঃ) তাদের কথা ধীরস্থিরভাবে শোনার পর উত্তর দিতেন খুব ধৈর্য্যের সাথে। তারাও তার উত্তর শুনে যথেষ্ট খুশি হতেন।

আয়েশা (রাঃ)-র বর্ণনা থেকে জানা যায় আনসার মহিলারা এরকম শিক্ষা পাওয়ার জন্য খুবই আনন্দিত হতেন। তারা এর জন্য নবী (সাঃ) এর প্রশংসাও করতেন। মহিলারা শিক্ষার ব্যাপারে এতটা এগিয়ে গিয়েছিলেন যে নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবী কুরআন সম্পূর্ণরূপে মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। কিছু মহিলা সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যাকার হিসাবেও খ্যাতিলাভ করেন। অনেকেও হাদীস বর্ণনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এমনকি অনেক মহিলাকে ইসলামী নানান বিষয়ে ফতওয়া প্রদানকারী রূপে দেখা যায়। উম্মে আল ফাজল করিমা নামে এক মহিলা নিজ বাড়িতেই পাঠভবন খুলেছিলেন। নবী (সাঃ)এর আমলে কমপক্ষে পাঁচ মহিলা পড়া এবং লেখায় শৈল্পিক পরিচয় দিয়েছিলেন।

সচিবালয়

ঐতিহাসিক নথিপত্রে মুহাম্মদ (সাঃ)এর আমলে সচিব ও সচিবালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে সচিব পদে পঞ্চাশজন সাহাবী কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সাহাবী কুরআন অনুলিখনের কাজ করেছেন। এবং তা তারা অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে পালন করেছিলেন। অন্যরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটদের কাছে প্রতিনিয়ত চিঠি পত্র আদান প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন, যেগুলো নবী (সাঃ)এর দ্বারা প্রেরিত হত। তাছাড়াও যাকাতের হিসাব নিকাশ ও অন্যান্য কর সংগ্রহ ও তার যথাযথ বিলি-বন্টনের হিসাব নিকাশ দেখার জন্য বেশ কিছু সাহাবী সচিবপদের কাজ করতেন।

সরকারি চিঠিপত্র ও শীলমোহর

নবী (সাঃ) এর আমলের প্রায় সরকারী নথিপত্র, দলীল, চার্টারস, রেকডর্স, লোক গণনার রিপোর্ট – সব কিছু নিয়ে চারশ'রও অধিক প্রামাণ্য জিনিস পাওয়া গেছে। এতে পাওয়া যায় নবী (সাঃ) কোন কোন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকে কি লিখেছিলেন বা তাদের কাছ থেকে কি প্রতুত্তর পেয়েছিলেন সেগুলোর বিস্তৃত বিবরণ। এমনকি তিনি যে তাদেরকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন তারও প্রমাণ মেলে এসব নথিপত্র ঘেঁটে। সাধারণত যে সকল পত্র তিনি বহি:রাষ্ট্রে সম্রাটদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত তিনি পত্রগুলোর উপরে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নাম নিতেন, তারপর প্রেরক ও প্রাপকের নাম উল্লেখ করতেন। তারপর তিনি পত্রের মূল বিষয়বস্তু অবগত করাতেন। সবশেষে সরকারী শীল ব্যবহার করতেন। এই সীল হিসাবে তিনি তাঁর নিজের রৌপ্য আংটিকে ব্যবহার করতেন যাতে খোদিতভাবে লিখিত ছিল "আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ"।

বিদেশী ভাষা ও অহি পরিষদ

উমার পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন নবী (সাঃ) এর বিশেষ সেক্রেটারী। তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। সাবিতপুত্র যায়েদ ছিলেন নবী (সাঃ)এর প্রধান সেক্রেটারীর পদে দায়িত্বশীল। তিনিও অতিবুদ্ধিমান সাহাবী ছিলেন। নবী (সাঃ) যায়েদকে হিব্রুভাষা শিক্ষার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। যায়েদ রা: অতি অল্প সময়ের মধ্যে হিব্রু ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। হিব্রু ভাষায় চিঠিপত্র লেখা ও বোঝার জন্য তাকে নবী (সাঃ)এর খুবই প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি তাকে হিব্রুভাষায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত পারদর্শী হিসাবে জানতেন। তাই তিনি যখনই বহির্দেশে সম্রাটদের কাছে হিব্রুভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন তখন যায়েদ (রাঃ)-র সাহায্য নিতেন। নবী (সাঃ) চিঠির বিষয়বস্তু বলে দিতেন আর যায়েদ (রাঃ) তা শুনে শুনে হিব্রুভাষায় ভাষান্তর করে লিখে দিতেন। পরে নবী (সাঃ) যায়েদকে সিরিয় ভাষা শেখার কথা বলেন। তিনি নবী (সাঃ)এর আদেশ পালন করে সিরিয় ভাষার উপরও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) এতটাই স্মৃতিধর ছিলেন যে তিনি কুরআনের আয়াত সমূহ অক্ষরে অক্ষরে বলে দিতে পারতেন একবার শোনার পরই। পরবর্তীকালে তিনি কুরআন লেখক সমিতি 'কাতিব -ই-অহী'-র একজন সদস্য মনোনীত হন। পরে নবী (সাঃ) কুরআন সংকলন করার জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন তার সভাপতি হিসাবে যায়েদকে মনোনীত করেছিলেন। আর এই কমিটির সদস্য হিসাবে আবুবকর, উমার, উসমান ও আলি (রাঃ) ছিলেন।

গণ মানচিত্র ও লোক গণনা

মদিনায় পৌঁছানোর পরই তিনি মদিনার লোক সংখ্যা গণনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সারা বিশ্বে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে লোকগণনার মত আধুনিক প্রয়াস ভাবতেও পারা যায় না। সেই সময় মুসলিম সহ মদিনার লোক সংখ্যা হয়েছিল সাড়ে দশ হাজার।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই সময় মদিনার ইহুদীরা লোক গণনাকে একটি পাপ বলে মনে করতেন। কারণ তারা ভাবত লোক গণনা মানে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজ। একাজ করা যাবে না কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় মানুষের হস্তক্ষেপ মোটেই ভাল জিনিস নয়।

শহর ও সড়ক পরিকল্পনা

নবী (সাঃ) রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা সব সময় ভাবতেন। তিনি মদিনাকে পৌর শাসনের অধিনে চালাতেন। এটি 'বালাদীয়া' নামে পরিচিত ছিল। 'বালাদীয়া' শব্দটি আরবী বালাদ শব্দ থেকে এসেছে। এই বালাদীয়া বা পৌরসভা মদিনা শহরের সমস্তরকম দেখভাল করার দায়িত্বে থাকত।

নবী (সাঃ) নগর পরিকল্পনায় যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার মধ্যে জল নিকাশি ব্যবস্থায়ও প্রভুত উন্নতি সাধন করেছিলেন। প্রতিটি বাড়ির ব্যবহৃত জল যাতে নর্দমা দিয়ে ভালভাবে বেরিয়ে যেতে পারে তিনি তার ব্যবস্থায় অনেক নালাকে বড় নর্দমার সাথে সংযোগ করে জল নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। মদিনা মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি যে সকল বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন তিনি সেগুলোকে বিশেষ আকারে নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া সেগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। নবী (সাঃ) এর নগর পরিকল্পনায় রাস্ত াঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে গবেষক হামেদুল্লাহ বলেন যে রাস্তাঘাটগুলো এতটাই প্রসস্থ ছিল যে রাস্তার পাশে দুটি উট মাল বোঝাই করে পাশাপাশি ভালভাবে হেঁটে যেতে পারত। বলা যেতে পারে আজকের রাস্তাঘাট পরিকল্পনায় যথেষ্ট গাইড লাইন পাওয়া যেতে পারে নবী (সাঃ) এর রাস্তাঘাট পরিকল্পনায়। তাছাড়া নবী (সাঃ) পথের কিনারায় ছায়াদানকারী গাছ লাগাতে উৎসাহ দিয়েছিলেন যাতে করে পথিকরা ক্লান্ত অবস্থায় গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে পারে।

গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা

মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর তিনি অনেক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পরিবারের জন্য তিনি নিজেই গৃহ বন্টন করেছিলেন। তিনি সাধারণতঃ পারিবারিক বাড়িগুলির চতুরদিকে প্রাচীর তুলে ঘিরে নিতে বলেছিলেন যাতে করে বাড়ির গোপনীয়তা বজায় থাকে। তাছাড়া বাড়িতে যাতে ভালভাবে আলো বাতাস পৌছাতে পারে তারও দিকে নজর দিতে বলেছিলেন সবাইকে। ইসলামী চিন্তায় ছোট পরিবারই ভাল। এতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। এতে পরস্পরের দায়-দায়িত্ব পূর্ণভাবে লক্ষ্য দিতে পারত। তাছাড়া উঁকি ঝুঁকি মেরে কেউ কারোর গোপনীয়তা নষ্ট করতে পারতনা। নবী (সাঃ)এর হাদীস থেকে জানা যায় আলাদা বাড়ি ও আলাদা পশু বা যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত তার পছন্দ ছিল। যৌথ বড় পরিবার তিনি পছন্দ করতেন না।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা

সকলের জন্য জল সরবরাহের কথা তখন কারোর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু নবী (সাঃ) যখন মদিনায় পৌছালেন তখন যাতে করে সবাই জল-কষ্ট থেকে রেহাই পান তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করলেন। নবী (সাঃ) দেখলেন যে একটি মাত্র কূপ রয়েছে যার নাম ‘রুমা’। তিনি ভাবলেন একটিমাত্র কূপ এত মানুষের জল-সমস্যা মিটবে না। তাই তিনি একাধিক কূপের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি ঘোষনা দিলেন যদি কেউ একটি কূপ খনন করে তা সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন তাহলে তার বিনিময় জান্নাত প্রদান করা হবে ঐ ব্যক্তিকে। এই কথা শোনার পর নবী (সাঃ)এর প্রিয় সাহাবা উসমান গনি (রাঃ) একটি কূপ খনন করে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। জন সাধারণ সবাই এই কূপ থেকে নিজেদের জন্য পানীয় জল নিতেন।

উবাদা পুত্র সাদ (রাঃ)-র মা যখন মারা গেলেন তখন তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে এলেন এবং তার মায়ের জন্য সবচেয়ে ভাল কিছু করতে চাইলেন। নবী (সাঃ) তাকে উপদেশ দিলেন একটি কূপ খোঁড়ার জন্য এবং তা জন সাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে বললেন। তিনি নবী (সাঃ)এর কথা মত কাজ করলেন এবং তিনি নবী (সাঃ) এর আশির্বাদ পেলেন।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

নবী (সাঃ) ছিলেন আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক। কিয়ামত পর্যন্ত তার মতপথ সমস্ত মানবজাতির জন্য স্মরণীয় ও বরণীয়। তিনি কোন নিদিষ্ট জন গোষ্ঠীর নয় বা কোন দেশের নয় বরং তিনি সারা বিশ্বের সকল মানুষের। তাই তাঁর চিন্তা ভাবনাও ছিল যথেষ্ট সুদূরপ্রসারি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ নিয়ে মাথা ব্যাথা বিংশ কিংবা একবিংশ শতকের মানুষ করে থাকলেও আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে ষষ্ঠ শতাব্দীর মানুষদের ভাবা খুবই কঠিন ছিল। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার আজকের দিনের মত ছিল না। কিন্তু নবী (সাঃ) ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের মানুষ। তাই তিনি ইতিহাস ঐতিহ্যের সংরক্ষণ খুব সতর্কতার সাথে ভেবেছিলেন। মদিনায় তিনি ইতিহাস ঐতিহ্যের উভয়দিক তা প্রাকৃতিক ও প্রত্নতাত্বিক উভয় বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। তিনি পূরানো দুর্গ কেল্লা ভেঙ্গে ফেলতে নিষেধ করেছিলেন। এমনকি ঘরের পূরানো দেওয়ালও তিনি সংরক্ষিত করেছিলেন বরং তিনি এগুলি যতটা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি তাঁর সাথিদের গাছপালা কেটে উজাড় করতেও নিষেধ করেছিলেন। বাইহাকীর বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি কোন পূরানো স্মৃতি ও গাছপালা ধ্বংসের ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন। মদিনাবাসীদের তিনি বাড়ির চারধারে চারাগাছ রোপন করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অতিথিশালা

মদিনা যখন রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র ভূমি হল তখন এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়তে থাকল, দেশ বিদেশ থেকে নানান ধরণের মানুষ আসা যাওয়া শুরু করল এখানে, কখনও রাষ্ট্রদূত, কখনও ব্যবসায়ী কখনও আইনজ্ঞ কিংবা বিদেশী পর্যটক কেউ না কেউ এখানে আসতেন। তাছাড়া মদিনা শহরটি এমন এক স্থানে অবস্থিত ছিল উত্তরের সিরিয়া এবং ইয়েমেন ঘুরে মক্কার সাথে এর সংযোগস্থল মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। স্বাভাবিকভাবে ভ্রমনকারীরা এখানে হল্ট করতেন তাদের বিশ্রামের জন্য। তাছাড়া তাদের কাফেলা-পশুদের খাবারও প্রয়োজন হত। এ সব কিছুই তারা মদিনা থেকে সংগ্রহ করত। ব্যবসায়ী পন্য সামগ্রীও তারা মদিনা থেকে সংগ্রহ করত। নবী (সাঃ) তাদের সুবিধার্থে এখানে সরাইখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। আর এখানে নানারকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হল আগত বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষদের জন্য। আর স্বাভাবিক কারণেই দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এখানে আসার কারণে নবী (সাঃ) এর সাথে তাদের একের পর এক পরিচিতি ঘটতে লাগল। প্রথমে এই সকল প্রতিনীধি নবী (সাঃ) এর মসজিদ সংলগ্ন যে সকল ব্যক্তিগত বাড়ি ছিল সেখানে আশ্রয় নিত। কিন্তু যেহেতু দিন দিন ইসলাম নূতন নূতন এলাকা জয় করল তাই মদিনায় প্রচুর লোকজন আসা শুরু করল এবং এতে এই সকল লোকেদের এখানে থাকার খুব অসুবিধা দেখা

দিয়েছিল। কিন্তু নবী (সাঃ) যখন নূতন করে সরাইখানাসমূহ স্থাপন করেছিলেন তখন এ সমস্যা দূরীভূত হয়েছিল। ঐতিহাসিক নূরুদ্দিন সামুদীর বর্ণনা থেকে জানা যায় আব্দুর রহমান বিন আউফ নবী (সাঃ) এর একজন বিখ্যাত সাহাবী ও খুব বড় ধরনের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একটি বড় অতিথিশালা নির্মান করেছিলেন যেখানে এক সঙ্গে দুশ'রও বেশি অতিথি থাকতে পারতেন। তিনি তাদের দেখভালের সমস্ত ব্যবস্থা নিতেন। অনেক সময় অতিথিদের চাপ বাড়লে বড় বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হত।

চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন

ইসলামপূর্ব আরবে চিকিৎসা যে যার ব্যক্তিগতভাবে করতেন, কোন পাবলিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল না। তাই জনসাধারণ সকলের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন ছিল। মদিনার মসজিদে নব্বীর পাশেই রাফিদা নামে একজন সাহাবী তাঁবু খাটিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। সেখানেই আহত সৈন্যদের সেবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হত। খন্দকের যুদ্ধে মাযপুত্র সাদ আহত হন। নবী (সাঃ) তাকে রাফিদার কাছে ক্যাম্পে পাঠালেন চিকিৎসার জন্য। নবী (সাঃ) এর এও উদ্দেশ্য ছিল মসজিদের কাছাকাছি জায়গায় থাকলে তিনি ঘন ঘন তাকে দেখতে যেতে পারবেন। তাই ইসলামে হাসপাতাল স্থাপনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। নবী (সাঃ) এর দু'জন মহিলা সাহাবান যুদ্ধস্থলে পানি সরবরাহ করতেন ও আহত ব্যক্তিদের সেবা করতেন। এদের নাম হল সুলাইম ও নুসাইবা।

এইভাবে নবী (সাঃ) তখন হাসপাতাল ব্যবস্থার স্থাপন করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে তিনি চালু করেছিলেন।

বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা

নবী (সাঃ) এর আমলে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। যারা শল্য চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। এক সময় নবী (সাঃ) এর এক সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। নবী (সাঃ) তার খোঁজ খবর নিলেন। তিনি জানতে চাইলেন তার চিকিৎসক আছে কিনা। লোকেরা তাকে দুজনের নাম জানালেন। তিনি জানালেন দুজনের চেয়ে অন্য একজন ভাল চিকিৎসক আছেন তার কাছেই পাঠানো উচিৎ হবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যেখানে সেখানে চিকিৎসা করানোর দরকার নেই বরং ভাল বিশেষজ্ঞের কাছেই চিকিৎসা করা দরকার।

এইভাবে হাদীসের দ্বারা জানা যায় নবী (সাঃ) যথাসাধ্য যথোপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করতেন। নবী (সাঃ) চিকিৎসার জন্য তার সাহাবীদের যে সকল চিকিৎসা

বিধান দিতেন তা আজও প্রশংসার। এমনকি সেই সকল উপাদানে বৈজ্ঞানিকভাবে চিকিৎসার উপকরণ বিদ্যমান আছে তা প্রমানতি। নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে গিয়ে সাহাবারা যে সকল জিনিস নিয়ে চিকিৎসা করতেন তাতে প্রচুর ফল পাওয়া যেত। এইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে নবী (সাঃ)এর ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়।

মদিনার বাজার পরিকল্পনা

'আসওয়াক' নামে মদিনায় নবী (সাঃ) এক উন্নত বাজার বসিয়েছিলেন। এটা সব সময় গমগম করত লোকারণ্যে। মসজিদে নব্বীর উত্তর-পশ্চিম কোনে ছিল এর অবস্থান। মসজিদ থেকেই একটু দূরেই। পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও একশ' মিটার চওড়া ছিল এই বাজার। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সময়ে যে রকম বাজারের প্রয়োজন ছিল এটা তার চেয়েও অনেক বেশি বড় ছিল। এটা দেখে বোঝা যেত মদিনা কত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করেছে। বহু দেশের মানুষের আনাগোনায় এটি বেশ পরিচিত লাভ করেছিল সেই সঙ্গে ইসলামের পরিচিতিও দিন দিন করে বিস্তার লাভ করেছিল দিকে দিকে। পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলিও এখানে ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়েছিল কারণ তাদেরও একটা পরিচিতির বিস্তার ঘটেছিল এই বাজারের মাধ্যমে।

অবৈধ ও পাপ কাজের সাথে জড়িত ব্যবসা নিষিদ্ধ

মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন বিশ্ব সংস্কারক। মানুষের মানবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর ছিল সার্বিক প্রচেষ্টা। সারা বিশ্বের মানুষের মানবিকতার উত্তরনের জন্য তাকে গাইডম্যান হিসাবে কুরআন দিয়ে পাঠান হয়েছিল। তিনি যেমন মানুষের জৈবিক চাহিদাকে দমন করেননি তেমনি মানুষের নৈতিকতাকে বর্জন করে কোন কাজ করার নির্দেশ দেননি। মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন মানুষের জীবনের সর্বস্তরে। তিনি এক বিশ্বজনীন আদর্শ মানব সভ্যতা দান করেছিলেন। নিচে উত্থাপিত তাঁর গাইড লাইনগুলো থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারব যে আজকে পূর্ন যৌবনপ্রাপ্ত এক-বিংশ শতক কিভাবে মুহাম্মদ (সাঃ)এর আদর্শের কাছে ঋণী। এক কথায় বলতে পারি আজকের একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ আইনশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যা ভাবতে পারেনি আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে নবী (সাঃ) তা ভাবতে পেরেছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যে যে সকল মৌলিক নীতি নবী (সাঃ) অবলম্বন করেছিলেন তা হল-

- বাজারের পণ্য দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।
- একচেটিয়া ব্যবসার কোন রকম প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি।
- মজুতদারী করে অতিরিক্ত মুনাফার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল।
- সূদের সাথে জড়িয়ে থাকা সমস্ত কাজ কারবার বন্ধ ছিল।

- মাদক দ্রব্যের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল।
- জুয়া, লটারী কিংবা লাক ট্রাই এ ধরনের ব্যবসাও নিষিদ্ধ ছিল।
- গনিকাবৃত্তি ও সেই সাথে জড়িত থাকা অন্যান্য ব্যবসাও নিষিদ্ধ ছিল।

নবী (সাঃ) নিজেই মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে মজুতদারী ও ভেজাল পরীক্ষা করতেন। এবং এটা ছিল তার আকস্মিক আগমণ, তিনি শস্যের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখতেন তার ভেতরের অংশ ভিজা কিনা। যদি তিনি এতে ভেজাল দেখতেন তাহলে সরাসরি বলে দিতেন ধোকাবাজ লোক মুসলমান হতে পারে না। নবী (সাঃ) খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি বাড়ি যেমন পরিস্কার রাখতে বলেছিলেন তেমনি বাজার হাটও পরিস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পথের মাঝে বসে গল্প করাকেও তিনি খারাপ ভাবতেন।

পুরুষ তদন্দকারী নিয়োগ

সরকারী নানান কাজে যেমন কর আদায়, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করলে তার শাস্তি প্রদান প্রভৃতি কাজে তিনি অনেক পুরুষকে নিয়োগ করেছিলেন। এই সকল কাজে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল, আলআসের পুত্র যায়েদ, যায়েদ পুত্র আবদুল্লাহ এবং উমার (রাঃ) প্রমুখ।

মহিলা তদন্তকারী

নবী (সাঃ) কেবলমাত্র পুরুষদের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তা নয় বরং তিনি অনেক বড় বড় অফিসিয়াল পদে নিয়োগ করেছিলেন মহিলাদেরকেও। ইসলামী যুগে প্রথম শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন আব্দুল্লাহ কন্যা শিফা। তিনি ছিলেন মদিনা মার্কেটের কাস্টম অফিসার। তিনি বাজারে পন্য সামগ্রীর উপর তদারকি করতেন। তিনি ছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন মহিলা অফিসার পদে কাজ করতেন। তাঁরা হলেন মাহারাবা কন্যা সামরা ও অন্যান্য।

পুরুষ ব্যবসায়ীগণ

নবী (সাঃ) এর যুগে ব্যবসার উপর নির্ভর করত সমস্ত অর্থনীতি। তিনি নিজেই বড় ধরনের ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশবে তিনি চাচার সাথে ব্যবসায় গিয়েছিলেন। বিয়ের আগে তিনি খাদিজা (রাঃ) বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বহির্দেশে গিয়েছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবুবকর (রাঃ) বড় ধরনের বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। খালিফা পদে নিযুক্ত হয়েও তিনি তার ব্যবসা ছেড়ে দেননি। উমার (রাঃ) যব ভুট্টার বড় ব্যবসায়ী

ছিলেন। উসমান (রাঃ) খুব বড় ধরনের ব্যবসায়ী ছিলেন। তার বাণিজ্য কাফেলায় শত শত উট থাকত। তাছাড়া আব্দুর রহমান বিন আউফও ছিলেন বড় ধরনের বস্ত্র ব্যবসায়ী।

মহিলা ব্যবসায়ী

নবী (সাঃ) মহিলাদেরও ব্যবসা বাণিজ্য করে পয়সা উপার্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন। নবী (সাঃ)এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ছিলেন আরব ধনীদের অন্যতম একজন। তিনিও ব্যবসায়ী ছিলেন। এছাড়া মারহাবা কন্যা 'আসমা', সুয়াইব কন্যা খাওলা এবং মালিকা উম্মে সাইব ছিলেন মহিলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম।

ব্যবসা

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

> *"পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।"*
> (কুরআন ৪৬ ঃ ১০)
>
> "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম।"
> (কুরআন ২ ঃ ২৭৫)

ব্যবসায়ী

একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে সৎ হওয়া খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু নবী (সাঃ) এই কঠিন কাজেও যাতে সততা রক্ষা করা যায় তার জন্য বার বার বলেছেন, নবী (সাঃ) সকল যুগের ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করার মত কিছু নির্দেশ দিয়েছেন।

> "অন্যান্য ফরজ কাজের মতো সদ্ভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টাও ফরজ কাজ।"
>
> ঞ"সত্যবাদী ও বিশস্ত বণিকরা নবী, সৎপন্থী ও শহীদদের সাথি।"
>
> ঞ"আল্লাহ সেই লোকের প্রতি করুনা দেখান যিনি বেচা কেনায় দয়ালু এবং নিজের দোষ বলে দেয়।"
>
> ঞ"একটা দেশ অস্ত্র দ্বারা যতটা না উন্নতি লাভ করে তার চেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে ব্যবসার মধ্য দিয়ে।"
>
> ঞ"অসৎ ব্যবসায়ীর নিশ্চয় পতন ঘটবে এবং সৎ ব্যবসায়ী নিশ্চয় সফলকাম হবে।"

ব্যবসায়ী চুক্তিপত্র

নবী (সাঃ)এর আগমনের আগে আরবে বড় বড় ব্যবসা চলত। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বাণিজ্য কাফেলা চলাচল করত। কিন্তু ব্যবসায়ে পরস্পরের প্রতি মোটেই আস্থা থাকত না। পরস্পর পরস্পরের কোন রকম চুক্তিপত্রে আবদ্ধ না থাকার ফলে যখন তখন যে কেউ অপরকে ঠকাতে পারত। তৎকালীন ব্যবসায় এ ছিল বড় ধরনের ঝুঁকি। নবী (সাঃ) বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে লেনদেনের ব্যাপারে যথাযথ লিখিত সাক্ষীসহ চুক্তিপত্র চালু করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনেই নবী (সাঃ) কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কুরআনের ঘোষনা,

> *"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর তবে তা লিখে নাও। ...পুরুষদের মধ্য হতে দুজনকে উহার সাক্ষী বানিয়ে নাও।"*
> *(কুরআন ২ ঃ ২৮২)*

ইসলামে চুক্তি নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। বিবাহ-চুক্তি থেকে বাণিজ্য-চুক্তি আবার বিচার সালিসীয় সামাজিক চুক্তি রাষ্ট্রীয় চুক্তি সব কিছুতেই বড় গুরুত্ব আরোপ করে ইসলাম। কুরআন এই চুক্তির দায়িত্ব সম্বন্ধে বলে,

> "........ ওয়াদা প্রতিশ্রুতি তোমরা রক্ষা করবে। ওয়াদা প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।" (কুরআন ১৭ ঃ ৩৪)

নবী (সাঃ) বলেন,

> "মুসলমানদের চুক্তি সম্বন্ধে আসামী করা হবে।"

বিদেশী বাণিজ্য

নবী (সাঃ) এর ব্যবসায়ী লেনদেন যেমন দেশের মধ্যে চলছিল তেমনি দেশের বাইরেও চলছিল, তাই বাইরের লেনদেনের জন্য তিনি অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে 'সাক্কা' চালু করেছিলেন যা বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ন ব্যবস্থা। বর্তমানে 'চেক' কথাটি ইউরোপীয়রা আরবি 'সাককা' থেকে পেয়েছে। ভাবতে পারা যায় অত পুরাণ দিনে চেকের মাধ্যমে লেন দেন। কত সহজ ব্যবস্থা সে যুগের, যা অকল্পনীয় ছিল।

সামরিক প্রশাসন

জীবন যাপনের জন্য নানরকম কাজ কারবারের প্রয়োজন। একটা দেশের নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্বের জন্য সামরিক দিক খুবই তাৎপর্যপূর্ন। নবী (সাঃ) এ দিকটিও উপেক্ষা করেননি। তিনি সামরিক ব্যবস্থাকে তৎকালীন সময়ে আধুনিকতা দান করেছিলেন। বিভিন্ন সামরিক অভিযানে তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করতেন। প্রথমে মুসলিম সৈন্যদের কোনরকম আর্থিক আনুকূল্য না দিয়েই সৈন্য বিভাগে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, পরে অবশ্য এই বাহিনীতে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তারা সকলেই স্থায়ী সৈন্য হিসাবে গন্য হয়।

প্রশিক্ষণ

নবী (সাঃ) সৈন্যদের শারীরিক কুশলতার দিকে খুবই নজর রেখেছিলেন এমনকি তিনি সৈন্যদের শক্তিশালী করার জন্য সার্বিকভাবে শরীর চর্চার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তীর ছোঁড়া, বক্সিং, কুস্তি সকল প্রতিযোগীতায় মাঠে তিনি উপস্থিত থাকতেন। 'আলসিবাক' নামে বিশাল এক মাঠে এ সকল প্রতিযোগীতা হত। উটের দৌড়ও হত। এমনকি সাঁতার প্রতিযোগীতাও হত। প্রতিযোগীতা শেষে নবী (সাঃ) উপহার প্রদান করতেন বিজয়ীদের। সাধারণত পঞ্চম স্থান পর্যন্ত বিজয়ী স্থান নির্ধারন করা হত। মদিনার উত্তর গেটে আজও 'মসজিদ আল সিবাক' টিকে রয়েছে। 'আল সিবাক' কথাটার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা। এই সকল ঘোড় দৌড়গুলো যখন হত নবী (সাঃ) পাহাড়ের পাশে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতেন প্রথম তিন প্রতিদ্বন্দ্বিকে চিহ্নিত করার জন্য। এছাড়াও সরাসরি তত্ত্বাবধানে অস্ত্র বিদ্যাও শেখানো হত। তখন সরকারি খরচে সমস্তরকম সাজ সরঞ্জাম কেনা হত এই প্রশিক্ষনকারীদের জন্য।

গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা

নবী (সাঃ) বিচক্ষণ প্রহরী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যারা নানারকম ইংগিত কিংবা কোড ব্যবহার করতেন। কারণ নবী (সাঃ) জানতেন তাঁর চতুর্দিকে শত্রুরা রয়েছে। নবী (সাঃ) তাদের গতিবিধি, তাদের অবস্থান, তাদের অস্ত্র সম্ভার ইত্যাদি অবগত হওয়ার জন্য বিচক্ষন দক্ষ লোকেদের নিয়ে টহলদার প্রহরী বিভাগ গঠন করেছিলেন। এই সকল টহলদার প্রহরীরা একে অপরকে তথ্য সরবরাহ করতেন। তাছাড়া নবী (সাঃ) পর্যবেক্ষন পদ সৃষ্টি করে বহু লোককে একাজে নিয়োগ করেছিলেন। এরা মদিনার সীমানা পাহারা দিত এবং সকল প্রকার প্রতিরক্ষার দিকে সর্তক নজর রাখতেন। আর এই সকল পদ অর্জনের জন্য নবী (সাঃ) নানারকম ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে মদিনা হয়েছিল শত্রু আক্রমন থেকে অনেক নিরাপদ স্থান। হঠাৎ হঠাৎ আক্রমন যা সারা আরব ধরে বিরাজ করছিল তা প্রশমিত হয়েছিল নবী (সাঃ)এর নব নব পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ফলে।

অর্থনৈতিক দপ্তর

বাইতুলমাল বা জাতীয় কোষাগার

কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল থাকলে পুরো রাষ্ট্র কাঠামোটা শীঘ্রই ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা একশভাগ থেকেই যায়। সে কারণে নবী (সাঃ) অর্থনৈতিক পরিকাঠামো চাঙ্গা করে তোলার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অবশ্য এজন্য তিনি কুরআনের যাকাত নীতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছিলেন। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মুসলিমরা নিয়মিত যাকাত আদায় করত এবং তা বায়তুলমালে নিয়মিত একত্রিত হত। আর এই বাইতুল মাল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ, এর আসল উদ্দেশ্য ছিল গরীব ও অভাবীদের সব রকমের সাহায্যদান।

ইসলামের এই যাকাত ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে বড় কর আদায়ের উৎস এবং তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে ফরজ অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কাজ। তাই দেশের সমস্ত স্বচ্ছল নাগরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ, যাকাত হিসাবে বাইতুল মালে জমা দিতে বাধ্য থাকতেন। যাকাতের বিভিন্ন রকম অংশ আলাদা আলাদা নির্ধারিত ছিল। যেমন যমিনের যাকাত যা 'ওশর' নামে আদায় হত। এছাড়া নগদ অর্থ সোনা রূপার যাকাত আদায় হত। এমনকি গবাদি পশুর ও বিভন্ন পর্যায়ে যাকাত আদায় করা হত। খনিজ পদার্থ ও খণির উপর যাকাত নির্ধারিত ছিল। যাকাত আদায়কারীগণ মদিনা থেকে যেমন যাকাত আদায় করতেন তেমনি মদিনার বাইরেও যাকাত আদায়ে বের হতেন অথবা ঐ সব এলাকায় নিযুক্ত থাকতেন। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট এলাকায় এলাকায় যাকাত আদায়কারীদের স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অনেক সময় বিভিন্ন কারণে অগ্রিম যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হত। যেমন যুদ্ধের সময়, তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী (সাঃ) সাহাবাদের কাছ থেকে অগ্রিম যাকাত সংগ্রহ করেছিলেন।

নবী (সাঃ) এই যাকাত ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সংগ্রহকারী কর্মীই নিয়োগ করেননি বরং যাতে করে এগুলি সম্পূর্নরূপে বিলিবন্টন হয় এবং তার হিসাব যথাযথ থাকে তার জন্য তিনি করণিক নিয়োগ করেছিলেন। তারা জাতীয় কোষাগার বাইতুলমালের দেখাশোনা করতেন। বায়তুল মালের আয় সার্বিকভাবে দেখাশোনার জন্য বিলাল (রাঃ) দায়িত্ব পেয়েছিলেন, বিলাল (রাঃ) যেমনভাবে আযানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তেমনিভাবে অর্থমন্ত্রী হিসাবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন। মসজিদ নব্বীর একটি কোয়ার্টারই বাইতুলমালের সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার হত। যেখানে সমস্ত কিছুর হিসাব নিকাশের কাগজপত্র জমা থাকত এবং এটি তালাচাবি দ্বারা সংরক্ষিত রাখা হত।

পেনশান ও ক্ষতিপূরণ প্রথা

নবী (সাঃ) পেনশন প্রথাও চালু করেছিলেন। দুস্থ অসহায় মানুষেরা যাতে এই পেনশান যথাযথভাবে পায় তিনি সেদিক থেকে ছিলেন সতর্ক। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এ সুযোগ প্রদান করা হত। মদিনা ইসলামি রাষ্ট্র হলেও নবী (সাঃ) এখানে বসবাসকারী ইহুদী গোত্রের জন্য পেনশান বরাদ্দ করেছিলেন, যারা বলে "তরবারির জোরেই ইসলাম প্রচার করা হয়েছে" তাদের এ বিষয়ে ভাবা দরকার।

নবী (সাঃ) এর এত বড়বড় কাজের জন্য পাশাপাশি সমস্ত গোত্র এমনকি ইহুদী গোত্রের লোকেরাও নবী (সাঃ) এর উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তারা একত্রে মিলে মদিনা রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। রাজা, গোত্রপতি, নেতা ও রাষ্ট্রদূত সব মিলিয়ে আটত্রিশজন নবী (সাঃ) এর সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন। এছাড়াও এই চুক্তিতে খ্রীষ্টান ও ইহুদী গোত্রের মানুষও ছিল। তারা সবাই সবাইকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

ন্যায় বিচার সকলের জন্য

মদিনা রাষ্ট্র ছিল এক সার্বভৌম রাষ্ট্র আর নবী (সাঃ) ছিলেন রাষ্ট্রের মহান প্রশাসক। নবী (সাঃ) এ রাষ্ট্রের বসবাসকারী সকল জাতি ধর্ম বর্ণের মানুষদের সমান চোখে দেখতেন। এমনকি শত্রু মিত্র সবাই ন্যায় বিচার পেতেন রসূল (সাঃ) এর কাছে। তাই দেশের সমস্ত মানুষও নবী (সাঃ) এর ন্যায়বিচারের উপর পরিপূর্ন আস্থা রাখতেন। তাই কুরআন ঘোষণা করেছে,

> "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও ! তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়দের উপর পড়ুক না কেন আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন।" (কুরআন ৪ ঃ ১৩৫)

নবী (সাঃ) কোন বিষয়ের উপর যথাযথ তদন্ত না চালিয়ে তার উপর রায় দিতেন না। প্রথমে তিনি বিষয়টার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নিতেন তারপর তা নানান দিক থেকে বাদীবিবাদীর কথা পর্যালোচনা করতেন। একেবারে তাদের কথা যাচাই পরখ করার পর তবেই সিদ্ধান্ত নিতেন। এ ব্যাপারে নিচের ঘটনাগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

- সাক্ষী না উপস্থিত করাতে পারলে সেখানে বিচার ব্যবস্থাই যে অচল তা এই ঘটনা

দ্বারা জানা যায় । শেহী পুত্র আবদুল্লাহকে খায়বারে প্রেরণ করা হয়েছিল ইহুদীদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহের জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে খুন হন। তার খুড়তুত ভাই মুহিসা তার দেহ দেখতে পান। তখনই তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে গেলেন এবং এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি একশ ভাগ সন্দেহ করেছিলেন ইহুদিদের প্রতি, নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি কি সাক্ষ্য দিতে পারবে যে সে ইহুদিদের দ্বারা খুন হয়েছিল" কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন যে তিনি নিজের চোখে এটা দেখেননি তবে এটা সত্য ইহুদীরাই এ কাজ করেছে। কিন্তু নবী (সাঃ) তার কথায় একমত হতে পারলেন না। তিনি মুহিসাকে ডাকলেন এবং বললেন ইহুদীদের ডেকে তাদের শপথ নেওয়া হোক এ ব্যাপারে। কিন্তু মুহিসা নবী (সাঃ) কে বললেন " কিভাবে আমরা ইহুদীদের শপথ বিশ্বাস করে নেব। তারাতো শতবার মিথ্যা শপথ করছে" –কিন্তু খায়বারের আব্দুল্লাহ খুনের ঘটনায় ইহুদী ছাড়া অন্য কোন সাক্ষ নেওয়ার মত ছিল না যেখানে স্বচক্ষে কেউ আব্দুল্লাহর খুনকে দেখেছিল। অথচ একেবারে সত্য যে একাজ ইহুদীদের দ্বারাই হয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) ইহুদীদের প্রতি কোন শাস্তি আরোপ করলেন না। বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে রক্তপণ (হত্যার ক্ষতিপূরণ) দিয়ে বিচার নিষ্পত্তি করলেন।

● মাকসুমা গোত্রের এক মহিলা চুরির অভিযোগে ধৃত হলেন এবং কুরাইশরা ভালভাবে বুঝল যে প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাটা এই চুরির কাজে যুক্ত এবং ইসলামী দন্ডবিধি তার উপর অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু তাদের নিজের গোত্রের মেয়ে, তার যদি শাস্তি হয় তবে তাতে তাদের নিজেদেরই অপমান। তাই তারা মুহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝিয়ে ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালালেন। ওসামাকে দিয়ে ব্যাপারটা নবী (সাঃ) এর কাছে উত্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হল। ওসামা সাত পাঁচ না ভেবে নবী (সাঃ) এর কাছে প্রস্তাবটি দিলেন। নবী (সাঃ) এটা শোনার পর খুবই রেগে গেলেন। তার মুখমণ্ডলে প্রচন্ড রাগ দেখা গেল। তিনি রেগে লোকদের বলে দিলেন-

> "কেমন করে তোমরা আল্লাহর ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করার সাহস দেখাও। তোমাদের আগে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এই কারণে যে তারা তাদের গরীব দোষী ব্যক্তিদের উপর শাস্তি আরোপ করত। কিন্তু ধনী লোকদের তারা ছেড়ে দিত। যার হাতে আমার প্রাণ (আল্লাহর) তার শপথ করে বলছি আমার কন্যা ফাতিমাও যদি এই দোষ করত তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।"

● তারিক মুহারাবির বর্ণনায় জানা যায়, নবী (সাঃ) এক সময় এক জায়গায় ভাষন দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে বনু সালাবাহ গোত্রের লোকেরা উপস্থিত ছিল। তাদেরকে উল্লেখ করে একজন আনসার উঠে দাঁড়ালেন এবং নবী (সাঃ) কে বললেন,

> "ওগো আল্লাহর নবী এই লোকগুলো বনু সামামা গোত্রের লোক,

> এদের পূর্বপুরুষ আমাদের পরিবারের একজনকে হত্যা করেছিল। তাই আমরা আপনার কাছে এদের একজনের উপর প্রতিশোধ নিতে বলছি।”

উত্তরে নবী (সাঃ) বললেন,

> *“পিতার উপর আরোপিত প্রতিশোধ পুত্রের উপর চাপানো যায় না।”*

এর দ্বারা নবী (সাঃ) শিক্ষা দিলেন যে কোন ব্যক্তির দায় কোন সময় অন্য কোন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যায় না। বিচার বিচারই, ন্যায় বিচার কোন সময় যাতে লঙ্ঘন না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। কোন ব্যক্তি যতই প্রিয় ও কাছের হোক না কেন তাকে ন্যায় বিচারের আলোকে বিচার করতে হবে। নবী (সাঃ) এর কাছে যখন কোন অভিযোগ আসত তা তিনি খুবই গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। তিনি কখনই গরীব বা ধনী কারোরই বিচারকে ন্যায় বিচারের উর্দ্ধে রাখতেন না। সবাইকে তিনি আইনের চোখে সমান দেখতেন। শত্রুর উপরেও তার বিচার ছিল ন্যায়ের ভিত্তিতে। তার কাছে মুসলিমরা যেমন বিচার প্রার্থী হয়ে আসতেন তেমনি অমুসলিমরাও দলে দলে আসতেন বিচার প্রার্থী হয়ে। তাদের উভয়েরই বিশ্বাস ছিল, নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে ন্যায় বিচার তারা পাবে। সেজন্য তারা কোন প্রকার ইতস্ততও করতেন না নবী (সাঃ) এর কাছে বিচার প্রার্থী হতে।

- বনু কুরাইজা ও বনু নাজির দুটি গোত্রই ছিল ইহুদী গোত্র। একসময় বনু কুরাইজার এক ব্যক্তি বনু নাজির গোত্রের দ্বারা খুন হন। এই সমস্যার বিচার নবী (সাঃ) এর উপর আরোপিত হয়। নবী (সাঃ) তাদের বিচার করে দিলেন তওরাতের নিয়মানুযায়ী, তওরাতে (Old Testament) বলা হয়েছে,

‘And when the Lord your God gives it into your hand you shall put all its makes at the sword else in the city, all its spoil, you shall take as booty for yourselves’.(The Old Testament Denteronomy -20:13-14)

এইভাবে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদও অন্যান্য জাতির নানারকম বিবাদ হাজির হত নবী (সাঃ) এর কাছেই। নবী (সাঃ) সেগুলোর বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে। নবী (সাঃ) বিচারকদের সম্বন্ধে বলেন,

> “বিচারক তিন ধরনের, তার মধ্যে এক ধরনের বিচারক জান্নাত যাবে অপর দু ধরনের যাবে জাহান্নামে, যারা বিচারে সত্য বুঝবে এবং সেই ধরনের রায় দেবে তারা জান্নাতে যাবে। এবং যারা সত্য বুঝবে কিন্তু রায় দেবে অন্যায়ভাবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ

> করবে। আর যারা সত্য না বুঝে রায় দেবে তারাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”

তিনি আরোও বলেন, *“একজন বিচারক রেগে গিয়ে বিচারের রায় দিতে পারে না।”*

ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক ও জনগণ সমমর্যাদা সম্পন্ন

ইসলামী আইনে ইসলামী শাসনকর্তাও রেহাই পেতে পারে না, খলিফা এবং শাসক যেইহোক না কেন ইসলামী শাসনের কাছে উভয়েই সমান। এক সময় জানা গেল খলিফা আলি (রাঃ)-র একটি বর্ম হারিয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন পরে এটি একজন খ্রীষ্টানের কাছে পাওয়া গেল। আলি (রাঃ) তখনই তার বিচার ভার তারই নিয়োজিত বিচারক শুরিয়ার কাছে আনলেন, বিচারক খ্রীষ্টান ব্যক্তিটিকে ডাক করালেন। বর্ম সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে খ্রীষ্টান ব্যক্তিটি জানান যে এটি তার নিজেরই বর্ম। তখন বিচারক আলি (রাঃ)-র কাছে তার অভিযোগের কোন সাক্ষী আছে কিনা জানতে চাইলেন। কিন্তু আলি (রাঃ) কোন জবাব দিতে এবং কোন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলেন না, তখন সুহরিয়া খ্রীষ্টানটির পক্ষে রায় দিয়ে বিচার নিষ্পত্তি করলেন। এরকম বিচার দেখে খ্রীষ্টানটি অবাক হয়ে গেলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহন করলেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষনা করলেন,

> “এ বিচার তো নবী (সাঃ) এর বিচারের মত, একজন শাসক আমাদের সামনে একজন বিচারক নিয়োগ করেছেন যিনি নিজ নিয়োগকারী শাসকের বিরুদ্ধে রায় দেবে।”

ইসলামী সমাজে সম্পূর্ন বিচার ব্যবস্থাটাই শাসক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। বিচারক সব সময় লক্ষ রাখবে আল্লাহর ভয়কে। সে কখনো দেখে না শাসকবর্গ কি বলবে আর কি বলবে না। কারণ সে জানে সব ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই পরম প্রভু আল্লাহকে সন্তুষ্ট না করে অন্য কারোর সন্তুষ্টি কিভাবে প্রদান করা করা যেতে পারে? প্রকৃতপক্ষে বিচার ব্যবস্থা যখন এভাবে সব কিছুর প্রভাব মুক্ত হবে তখনই কেবল বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসতে পারে নচেত নয়। তাহলেই সাধারণ মানুষের বিচার ন্যায় সঙ্গত হতে পারবে।

● হজরত উমার (রাঃ) তখন খলিফা, এই সময় জাবালা আল গাস্‌সানী সিরিয়ায় এক গোত্রে ছিলেন। তিনি হজ উপলক্ষে এসেছিলেন মক্কায়। হজযাত্রীদের ভিড়ে স্বাভাবিক ভাবে তার আলখিল্লায় পা লেগে যায় এক সাধারণ আরবের। জাবালা আল গাস্‌সানী আরবটির গালে করে এক চড় বসালেন। আরবটি খলিফা উমার (রাঃ) এর কাছে বিষয়টি অবগত করিয়ে বিচার চাইলেন। উমার (রাঃ) জাবালা আল গাস্‌সানীকে হাজির করালেন এবং ঐ আরব বেদুইনটিকে বদলার আঘাত নিতে বললেন। জাবালা আল

গাস্‌সানীতো এরকম ঘটনার শিকার হয়ে অবাক। তিনি বললেন, “এটা কি করে হয় ও একজন সাধারণ মানুষ আর আমি একজন রাজা”। উমার (রাঃ) উত্তরে বললেন “ইসলাম তোমাকে তার মতই এক করেছে, কেবল মাত্র ধার্মিকতা ও ভাল কাজ সম্পাদন ছাড়া তার উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে না।”

পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত নবী (সাঃ)

সময়টা ছিল দশম হিজরী, নবী (সাঃ)এর জীবনের একেবারে শেষের দিকের কথা। ইসলামী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সারা আরব জুড়ে। আল্লাহর একত্ববাদ সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে পৌঁছে গেছে। নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে শত্রুতাও কমে গিয়েছিল অনেকটাই। অপরপক্ষে দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহন করছিল। এক কথায় বলা যেতে পারে ইসলামী আন্দোলনে এসেছিল তখন পূর্ন জোয়ার।

নবী (সাঃ) এর স্ত্রী মারিয়া এই সময় তাকে এক পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। পুত্র সন্তানটি ছিল দেখতে খুব সুন্দর। তার নাম ছিল ইব্রাহিম। প্রকৃতপক্ষে এই পুত্রের জন্য তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। এ আনন্দে তিনি ভোজ সভার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এই শিশু সন্তানকে তিনি ভালবেশে কোলে পিঠে করে নিয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেড় বছর বয়সে পুত্র ইব্রাহিম মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এমনকি নবী (সাঃ) বুঝতেই পারলেন না শীঘ্রই তার সন্তান তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই তিনি সব সময় তার মাথার কাছে বসে থাকতেন। কিন্তু অবশেষে সন্তানটি মারা গেল। নবী (সাঃ) এ সময় বেদনায় এত কাতর হলেন যে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ঝরনার মতো। তিনি তাকে বাহুতে জড়িয়ে বুকে নিয়ে শিশুর মত কেঁদেই চললেন। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি অন্তরে কত ব্যথা পেয়েছেন।

নবী (সাঃ) এর প্রিয় সাথি আবদুর রহমান নবী (সাঃ)এর এ ধরনের কষ্ট দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন যে কোন দুঃখ প্রকাশ করতে কোন রকম চেঁচিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করা উচিৎ নয়। কিন্তু নবী (সাঃ) এর এ কথা দ্বারা তিনি ভুল বুঝেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন হয়ত দুঃখে কোন রকম শোক প্রকাশ যেন না হয়। কিন্তু আসল কথা নবী (সাঃ) যা বলেছিলেন তার মর্ম কথা হল মানুষের ব্যাথা বেদনা খুবই স্বাভাবিক আর তা প্রকাশ হয়ে পড়া কোন দোষের নয়। কারণ দয়া-করুণা মানুষের হৃদয়ের একটা নরম অনুভূতি, তা কোন দিন চেপে রাখা যায় না। আর আল্লাহ তার বান্দাহর প্রতি করুণাশীল। নবী (সাঃ) নিজেই বলেছেন তার প্রতি করুণা দেখানো হয় না যে করুণা দেখায় না।

বিশেষ কঠিন পরিস্থিতিতে দয়া, করুণা প্রভৃতি প্রকাশ ও প্রদান দ্বারা মানুষ মানুষের কাছাকাছি হয়। মানুষ মানুষের সমব্যাথি হয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে আল্লাহ

মানুষের কাছাকাছি হন। আল্লাহ এও দেখতে চান তার কোন বান্দাহর বিপদে কষ্টে অন্য কোন বান্দাহ উপস্থিত আছে কিনা।

তাই নবী (সাঃ) ব্যাথায় ফেটে পড়েছিলেন। পুত্রের শোকে তিনি শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'ওগো ইব্রাহিম ! চোখ ফেটে অশ্রু পড়ছে, হৃদয় বিদীর্ন হচ্ছে কিন্তু একজন কেবল তাই উচ্চারণ করতে পারে যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়'।

আল্লাহ নবী (সাঃ)কে অনেক দিক থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, তার এই ইসলামী আন্দোলনের যাত্রাপথে বহুপ্রিয় সাথিদের হারিয়েছিলেন। নিজের চাচা আবুতালিব, হামজা, খাদিজা, তিন কন্যা তিন সন্তান আরোও অনেককে তিনি হারিয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন আল্লাহর কাছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় ও আল্লাহ নির্ভরশীল, কোন সময় তিনি আল্লাহকে ভুলে জাননি। সব সময় তিনি আল্লাহকে স্মরণ রেখেছিলেন। কোন সময় তিনি এ সব দুঃখে কাতর হয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেননি।

গ্রহণ হয়ে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মেই

নবী (সাঃ) প্রিয়পুত্র ইব্রাহিমকে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সমাধিস্থ করে কবর স্থান থেকে ফিরে এসেছেন। এমন সময় এক প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটল, সবাই অনুভব করলেন সূর্যগ্রহন ঘটছে। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। মুসলিমরা ঝট করে এই সিদ্ধান্ত নিল যে এ ঘটনা নবী (সাঃ)এর পুত্রের মৃত্যুর কারণেই হয়েছে। আর এটা আল্লাহর তরফ থেকে নবী (সাঃ) এর কাছে একটা বার্তা। নবী (সাঃ)এর কাছে এ সংবাদ পৌছাল, কিন্তু নবী (সাঃ) সাহাবাদের কথায় একমত হতে পারলেন না। অবশ্য তিনি একাজ নিজের ব্যক্তিগত শোকের সাথে জুড়ে দিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে নিজের গৌরব বাড়াতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু সত্যবাদী নবীর জীবনে এতটুকু মিথ্যা তো ঢুকতে পারে না। সে যাই হোক তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের জড়ো করলেন এবং তাদের ভুল ভেঙ্গে দিলেন তীব্র প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তিনি ঘোষনা করলেন "সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর দুটি নিদর্শন মাত্র। তাদের আলো কারো মৃত্যুতে অন্ধকার হয়ে যায় না।" নবী (সাঃ) একথা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিপর্যয়ই। যা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে থাকে তা পরিবর্তন করার কোন রকম হাত আল্লাহ কাউকে অর্পন করেননি। এইভাবে নবী (সাঃ) পৃথিবীর বুক থেকে কুসংস্কারের পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এটি তখনই সাহাবাদের দৃঢ়তার সাথে সাবধান করে না দিতেন তাহলে এই ভুল ধারণা বিস্তার লাভ করতে করতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত। প্রাকৃতিক নিদর্শন আল্লাহর আইনানুসারে প্রবর্তিত হয় এখানে মানুষের অলৌকিকতার কিছু নেই। এরকম কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে মানুষের কাজের সাথে জুড়ে দেওয়াও আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানের অভাব।

26

বিদায় হজ্ব

দশম হিজরীর রমজান মাসে নবী (সাঃ) অন্য ধরনের এক নিদর্শন আল্লাহর কাছ থেকে পেলেন। এটি ছিল অনেকটা ব্যতিক্রম ধর্মী নিদর্শন। নবী (সাঃ) তার প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে একথাটি বলেছিলেন,

> "প্রতি বছর জিব্রাইল (আঃ) কুরআন আমার কাছে একবার আবৃত্তি করে শোনান। কিন্তু এবছর আমার কাছে তিনি দুবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। আমি মনে করছি এটা আমার মৃত্যুর ঘোষণা"

আরবি শেষ মাসে অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসে ইসলামে হজ্ব পালন করার নিয়ম রয়েছে, এটি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি যা প্রতিটি সামর্থশীল মুসলমানের উপর ফরজ। জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট কয়েক দিন মক্কায় গিয়ে এটি পালণ করতে হয়। কিন্তু নবী (সাঃ) এর এ ফরজ কাজটি এখনও পালন করা হয়নি। এখন নবী (সাঃ) এর কাছে তা পালনের সময় দিন দিন করে এগিয়ে আসছিল। তাই এটা বড়ো করে প্রচার হয়ে পড়েছিল যে নবী (সাঃ) আগামী জিলহজ্ব মাসে হজ্বের কাজ সমাধান করার জন্য মক্কায় যাবেন, এরপর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি মদিনার ত্রিশ হাজার সাথিকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে হজ্বে বেরিয়ে পড়লেন। পথে মদিনার বাইরে থেকে সারা আরব উপদ্বীপ জুড়ে আরও প্রায় তিন গুন মুসলিম হজ্বে যাওয়ার সাথি হলেন।

নবী (সাঃ)কে সারা আরবের মানুষ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন, এই হজ্ব পর্বেই ছিল তার জন্য সুবর্ন সুযোগ। যে মানুষটার প্রতি সারা আরব একদিন শত্রুতার পাথর ছুড়েছিল আজ তারা কেবল তার দর্শন পাওয়ার জন্য চাতক পাখির বারি প্রার্থনার মত আগ্রহী, এ কোন নেতা যে সারা আরবকে একই ছাতার নিচে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাজার হাজার বছর ধরে যে গোত্রীয় বিভাজনে সারা আরব শতাধিক খন্ডে খন্ডিত ছিল তা আজ মহা মিলনের এক ঐক্যতান তুলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। মানুষ দেখল ইসলামের মহা ভ্রাতৃত্বের মহা নিদর্শন। মাত্র দু

এক দশক আগে সমাজ কি ছিল আর আজই বা তার কি রূপ। আজ সবাই বুঝতে চায় তাদের নেতা, তাদের রসূলকে একেবারে কাছ থেকে।

বর্তমান যুগে যে কোন জায়গায় হয়ত এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটানো তেমন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে এতগুলো মানুষের সমাবেশ ঘটানো মোটেই সহজ কথা নয়। আবার এত মানুষ একত্রিত হলেও তাদের খাদ্য দ্রব্য অন্য কাউকে করতে হয়নি। যে যার সঙ্গে নিজেদের খাদ্য-দ্রব্য, সাজ সরঞ্জাম সব কিছুই নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এমনকি নবী (সাঃ) তাঁর সাথে স্ত্রীদেরও নিয়ে এসেছিলেন। নবী (সাঃ) এর মত বাস্তববাদী মানুষ আর দুনিয়াতে কেউ ছিলনা। তাই তিনি সব কিছু বাস্তববাদী চিন্তা দিয়ে দেখতেন, তিনি যদি নিজ স্ত্রীদের নিজের সাথে না আনতেন তাহলে মহিলাদের জন্য হজ্বের নিয়ম কানুন পৃথিবীর সমস্ত মহিলাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। তিনি আল্লাহর নির্দেশ কুরবানী সম্পাদন করার জন্য একশত উটও সঙ্গে নিয়ে ছিলেন।

যখন তিনি জুল-হুলাইফাতে পৌঁছালেন তখন সেখানে রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু খাঁটালেন। পরের দিন সকালে তিনি ও তাঁর সমস্ত সাথিরা দুখন্ড সাদা কাপড় পরিধান করলেন। একটি নিম্নাঙ্গে জড়ালেন অন্যটি দিয়ে শরীর ঢাকলেন। এখানে রাজা ও ফকিরের কোন পার্থক্যই রইলনা, সবাই এক পোশাকে আল্লাহর কাছে দন্ডায়মান, সাম্য ও সৌম্যের মহান আদর্শ ফুটে উঠল চতুর্দিকে। ইসলাম তার আদর্শ কেবল ধরে রাখলনা বই পুস্তকে বরং তা বাস্তবের মাটি ছুয়ে সারা বিশ্বের মানুষকে তাক লগিয়ে দিল। সকলেই পূত পবিত্র মনে রসূলের সাথে সাথে মহাবানী 'হে আল্লাহ আমি হাজির আছি' সমস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন। এর মধ্যে মানুষ যেন আল্লাহর সাথে কথা বলার অবকাশ পেল।

মদিনা থেকে যাত্রা করে উনিশ দিন পরে নবী (সাঃ) মক্কায় পৌঁছালেন। সচরাচর বারো দিনে এ-পথ অতিক্রম হত। কিন্তু এত বিশাল বাহিনী ও সেই সাথে নারী,শিশু বয়স্ক এমনকি কয়েকজন আহত সাথিরাও এতে অংশ নিয়েছিলেন সে জন্য সময় বেশী লেগেছিল।

পথিমধ্যে কুরআনের আয়াত অবর্তীন হয়ে মক্কায় কাবা ঘরের দায়দায়িত্ব কাদের হাতে অর্পিত হবে সে বিষয়ে অবগত করিয়ে দেওয়া হল সমস্থ মুসলমানদের, সেই সাথে অন্য মসজিদ দেখাশোনার দায়িত্বও।

> "আল্লাহর মসজিদগুলো কেবল তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে নিয়মিত নামায আদায় করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করেনা। সম্ভবত

তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা হবে।"(কুরআন ৯ ঃ ২৮)

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তার পুত্র ইসমাইল (আঃ) দুজন মিলে এ কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। তারা ছিলেন এক আহাদ আল্লার পূজারী। তাই এই কাবা গৃহে এক আল্লাহর ইবাদত হোক-এটা ছিল তাদের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। তারা এক আল্লাহর তৌহিদ বাদই এই কাবা গৃহে চালু করেছিলেন। কিন্তু কালের গর্ভে সে সত্য বিলীন হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কাবা গৃহে স্থান পেয়েছিল হজরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ) -এর মূর্ত্তি।

আর পুরো কা'বা তত্বাবধানে এসেছিল মুশরিকরাই কিন্তু ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ)তো দোওয়া করেছিলেন,

"হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মধ্যে হতে তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করো। যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করবে। তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়,"
(কুরআন ২ ঃ ১২৯)

আল্লাহ তাদের দোওয়া কবুল করে তাদেরই বংশে প্রেরণ করেছিলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে। আজ সেই নবীই তার পূরাতন বংশের নবী ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ)এর নির্মিত গৃহ তওয়াফ করতে এসেছেন, এ মোটেই ছোট ব্যাপার নয়। একদিন নয় দু'দিন নয় শত শত, হাজার হাজার বছরের অপেক্ষা।

নবী (সাঃ) এর সম্পূর্ণ জীবনের মত হজ ছিল এক মহা শিক্ষনীয় বিষয়। হয়তো মহাসত্যের উৎসের দিকে ফেরা। এক আল্লাহর দিকে ফেরা। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এর চলার পথে ফেরার মন্ত্র। যে ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) এই কাবা ঘর নির্মান করে আল্লাহর একত্ব বাদ এই পৃথিবীর মাটিতে প্রচার করে গিয়েছিলেন।

নবী (সাঃ) এর সাথিরা নবী (সাঃ) এর প্রতিটি কাজকে অনুসরন করে চলেছিলেন, তিনি তাদের বলে ছিলেন " তোমরা তোমাদের শরীয়তি নিয়ম আমার কাছ থেকে গ্রহন কর"। জিলহজ্ব মাসের ন'তারিখে নবী (সাঃ) 'জাবাল আর রাহাম'পর্বতে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হাজিদের সামনে মক্কা থেকে কুড়ি মাইল দূরে আরাফায় ঐতিহাসিক ভাষন দান করলেন, তিনি অল্প অল্প অংশ বলছিলেন, আর সেই অংশ চারিদিকে মানুষদের কাছে উমাইয়াবিন খালফ বার বার পুনরাবৃত্তি করে সকলের কানে পৌছে দিচ্ছিলেন। সময়টা ঠিক দুপুরের পরে ছিল। তিনি বলে চললেন।

“বিদায় হজ্জের ভাষণ”

“হে মানব মন্ডলী ! তোমরা আমার কথা গুলো মন দিয়ে শোন, কারণ এ বছরের পর আমি তোমাদের সাথে নাও মিলতে পারি।”

“হে মানব মন্ডলী, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে না মিলিত হচ্ছ তোমাদের রক্ত তোমাদের ধন সম্পদ এই দিনের মত পবিত্র।”

“নিশ্চয় তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ কারবার সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমি তোমাদের তার সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি।”

“যে ব্যক্তি অন্যের ধন সম্পদের অভিভাবক বা আমানতদার তার উচিত মালিককে তার আমানত ফিরিয়ে দেওয়া।”

“সুদ নেওয়া ও দেওয়া দুটোই বাতিল, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই, কারও প্রতি অত্যাচার করোনা বা অত্যাচারিত হয়োনা।”

“আল্লাহর সিদ্ধান্ত , সুদ বাতিল এবং আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের যে সমস্ত সুদ তা সমস্তই বাতিল।”

“অজ্ঞতার যুগে যে খুন হয়েছিল তার বিচার নিষ্পত্তি হল।”

“এরপর হে মানব মন্ডলী শয়তান এদেশে পুজিত হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। সে অন্য দেশে মান্য হবে সুতরাং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে যেন তোমাদের ভাল কাজ অন্য লোকদের দ্বারা নষ্ট না হয়ে যায়।”

“হে মানব মন্ডলী ! পবিত্র মাসের রোহিত করণ অন্ধকার যুগেরই ধারা। যারা বিশ্বাস পছন্দ করেনা তারা বিভ্রান্ত তারা বলে এক বছর পবিত্র মাস, পরের বছর অপবিত্র তারা আল্লাহ কতৃক পবিত্র মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য পবিত্র মাসকে অপবিত্র বলে। সময় ঘুরছে যে দিন থেকে আসমান সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ মাসের সংখ্যা বারো করেছেন, তাদের মধ্যে চারটি পবিত্র, তিনটি পর পর এবং জমাদিউস সানি ও সাবানের মধ্যবর্তী বছর।”

“হে মানব মন্ডলী ! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার রয়েছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি অধিকার রয়েছে। এটা তাদের কর্তব্য যে তারা সতীত্ব ও শালীনতা বজায় রাখবে।............তেমরা একে অন্যকে উপদেশ দিও যেন তারা তাদের স্ত্রীদের

সাথে ভালো ব্যবহার করে। কেননা তারা তোমাদের অংশ তাদের আল্লাহর আমানত রূপে তোমরা গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাক্য দ্বারাই তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ্য করা হয়েছে।"

"হে মানব মন্ডলী ! তোমরা আমার কথাগুলো ভালো ভাবে অনুধাবন কর, যার জন্য আমি আমার কথাগুলো তোমাদের নিকট রেখে গেলাম, যদি তোমরা এটা শক্ত ভাবে গ্রহন কর তাহলে তোমরা কোনদিনই বিপথগামী হবেনা। বিশেষ করে আল্লাহর কুরআন ও হাদীস"

"হে মানব মন্ডলী ! তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর। তোমরা শিক্ষা পেয়েছ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানদের ভাই, সকল মুসলমানই ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ, কোন মানুষের অনুমতি ছাড়া তার কোন জিনিস ব্যবহার করা বৈধ নয়। সুতরাং কেউ কারোর প্রতি অবিচার করো না।"

"এক জনের অপরাধে অন্যকে দন্ড দেওয়া যাবেনা, অতপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবেনা।"

"যদি কোন নাক কাটা কাফ্রী দাসকে তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের নেতা করে দেওয়া হয় তোমরা সর্বতভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।"

"সাবধান ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা বাড়াবাড়ি করবেনা। এই বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধংস হয়ে গেছে"

"তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া ও রক্তপাত করোনা তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই।"

"এক দেশের মানুষের উপর অন্য দেশের মানুষের প্রাধন্যের কোন কারণই নেই। সমস্ত মানুষই আদম হতে সৃষ্টি এবং আদম মাটি হতেই সৃষ্টি। মানুষের প্রাধান্য মানুষের যোগ্যতার জন্য।"

"জেনে রাখ! এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, তাই সমগ্র বিশ্ব মুসলমানদের এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ।"

"হে লোকেরা, শোন! আমার পর কোন নবী নেই আর তোমাদের পর কোন উম্মত নেই, এবছরের পর হয়ত তোমরা আমার আর সাক্ষাত পাবেনা, ইলমে অহী উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে নাও।"

"শিরক্ করোনা, অন্যায় ভাবে মানুষদের হত্যা করোনা, চুরি করোনা, ব্যাভিচার করোনা, এই চারটি কথা খেয়ালে রাখবে।"

“হে লোক সকল! কোন দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করোনা, গরীবের উপর অত্যাচার করোনা, সাবধান! কারো অসম্মতিতে কোন জিনিস গ্রহন করোনা, সাবধান! ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের মজুরী মিটিয়ে দাও।”

“যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিচয় লুকিয়ে অন্য বংশের বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেস্তা ও সকল মানুষের অভিসম্মাত।”

“মহানবী সাঃ বলেন– মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে, ঈমানদার বা বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি যার হাতে সকল মানুষের ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে।”

“আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও সংঘর্ষ করতে বের হয় তার বুকে আঘাত কর, এক সঙ্গে আহার কর, আলাদা আলাদা আহার করোনা, কেননা একত্রে খাওয়ায় বরকত আছে। যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তার স্থান জাহান্নামে।”

“যাকে আমরা শাসক নিযুক্ত করি তার ভরন পোষনের দায়িত্ব আমরা নিই, এর পরও যদি সে কিছু নেয় তাহলে তা বিশ্বাস ভঙ্গ বা ঘুস বলে বিবেচিত, এবং ঘুষ গ্রহন মহাপাপ।”

“তোমরা হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর, কেননা আগুন যেমন জ্বালানি কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে হিংসা তেমন মানুষের সৎগুণকে পুড়িয়ে ফেলে।”

“যে ব্যক্তি নিজের হাতের কাজ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে সে যদি এক গাছি দড়ি–নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বিক্রি করে আল্লাহ তার মুখ রক্ষা করেন, এটাই তার জন্য উত্তম।”

“তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, এবং নিজেদের কার্যবিবরণী পাঠ করতে হবে। এতে তোমরা সাবধান থেকো , কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবেনা।”

“ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারবেনা, যে দুবেলা উদর পূর্ণ করে খায়, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, ঐ ব্যক্তি মুসলমান হতে পারেনা যখন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তা পছন্দ করেনা, তোমার আচরণ তেমন হবে যেমন তুমি অন্যের কাছ থেকে পেয়ে থাক।”

“হে মানব মন্ডলী ! তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তোমাদের জান্নাত তোমাদের মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত ”

"হে মানব সন্তান ! সেই মানুষই শ্রেষ্ঠ যে মানুষের উপকার করে"

"যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ আহ্বান পৌঁছে দেবে হয়ত উপস্থিতদের কিছু লোকের চেয়ে অনুপস্থিতদের কিছু লোক বেশী উপকৃত হবে।"

নবী (সাঃ) এই ভাষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাষা খুবই চমৎকার ছিল, যা অন্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই আমরা যথাসাধ্য তার ভাষনের মুল্যবান অংশ তুলে ধরলাম। ভাষণের শেষের দিকে তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন "ওগো লোকেরা আমি আল্লাহর কাছ থেকে যে দায়িত্ব এনেছিলাম তা তোমাদের কাছে কি পৌঁছে দিতে পেরেছি যথাযথ ভাবে? জনতার মধ্য থেকে গুঞ্জন ধ্বনি উঠে আকাশে বাতাশে ভরিয়ে দিল "হ্যাঁ", তখন আল্লাহর রসূল বলে উঠলেন "হে আল্লাহ তুমি আমার সাক্ষী থেকো।"

প্রকৃতপক্ষে নবী (সাঃ) আধ্যাত্মিক চিন্তায় পুষ্ট মুসলমানদের কাছে সাক্ষীই ছিলেন, আর এই হজ্বের মধ্যে হৃদয়ের আধ্যাত্মিক মিলন হয়ে থাকে। হৃদয়ের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরনই জেগে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে তিনি তার ভাষনের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সব কিছু একাকার করে কেবল গুরুত্ব দিলেন মানুষের হৃদয়ের স্বচ্ছতাকে। কারণ আল্লাহর কাছে মানুষের হৃদয়ের বিচার হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদের একটি মাত্র সীমা রেখাকে আল্লাহ অনুমোদন দিয়েছেন তা হল, কে কতটা আল্লাহকে ভয় করে চলে।

কে কোথা থেকে এল, কে আরবের, কে আরবের নয়, কে ধনী, কে গরীব, কে পুরুষ, কে নারী সব কিছুই আল্লাহর কাছে বিলিন। কেবল মাত্র ইসলামী শিক্ষা, বোধের সাথে সাথে নিজের কাজের মধ্যে তার প্রয়োগের প্রমাণই হল বিচার্য বিষয়। নবী (সাঃ) লক্ষাধিক জনতাকে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে আনীত বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আর সকলেও তাঁর এ কথার পূর্ণ স্বীকৃতি দিলেন।

এরপর মাত্র কয়েক ঘন্টা কাটল, তারপর তাঁর উপর অবতীর্ণ হল কুরআনের শেষ বার্তা,

> *"আজ আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমার দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা) তোমার জন্য, তোমার উপর আমার দয়াকে পরিপূর্ণ করলাম, এবং তোমার জন্য ইসলামকে তোমার দ্বীন মনোনীত করলাম।"*
> *(কুরআন ৫ ঃ ৩)*

সমাপ্ত হল মানুষের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়ার ধারা,- সেই আদম সৃষ্টির

পর থেকে যুগে যুগে অসংখ্য নবীর মাধ্যমে আল্লাহ যে জীবন ধারণের বিধান অবতীর্ন করে চলেছিলেন তার আজ সমাপ্তি ঘটল। এর পর কোন নবীও যেমন আসবে না, তেমনি আল্লাহর তরফ থেকে কোন অহী এসে পথও দেখাবেনা মানব সমাজকে। তাই কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে রইল এই কুরআন। আর যেহেতু কোন নবী আসবেনা তাই শেষ নবীর আদর্শও কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকল, ইসলামী এই আন্দোলনের দায়িত্ব আরোপিত হল সমস্ত উম্মতের উপর। একে অপরের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে আমরা সবাই বাঁধা পড়ে গেলাম।

ওগো পরম দয়ালু প্রভু! পরিবর্তন কর আমাদের হৃদয়

সকল মানুষ সুখ শান্তি ও সত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যাঁরা এবং যাদেরকে ইসলাম বোঝানো যায়নি তাদের আরো ধৈর্য্যের সাথে বিষয়টি উপলব্ধি করা দরকার। নবী (সাঃ) তাদেরকে আল্লাহর নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলেছেন। আর আল্লাহর কাছ থেকে তাদের পথ চলার জন্য সাহায্য চাইতে বলেছেন।

নবী (সাঃ) মুসলমানদেরও সব সময় আল্লাহর স্মরন মনে রাখার উপদেশ দিতেন, কেননা সে নিজেই জানবে না কখন সে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। কারণ তার মধ্যে মানবীয় যে দুর্বলতা রয়েছে তাকে অস্বীকার করা যাবেনা। তাই আল্লাহ তাকে কুরআনের মাধ্যমে পথ দেখিয়ে এই প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছে,

> "হে আমাদের প্রভু ! তোমার পথ দেখানোর পর আমাদের হৃদয়েকে বাঁকা পথে চালিত করোনা।" (আল কুরআন)

নবী (সাঃ) তার প্রার্থনায় সব সময় বলতেন,

"হে হৃদয় পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তুমি তোমার ধর্মের প্রতি দৃঢ় করে রাখ।"

27

স্বর্গীয় জীবনে এক মহামিলন

হজ্বের মরশুম শেষ হয়ে গেল। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) হজ্বের সমস্ত নিয়মকানুন সেরে ফেললেন। সেই সাথে মদিনায় ফেরার কথা মনস্থঃ করলেন। তাই তিনি সমগ্র সঙ্গী সাথিদের নিয়ে ফিরে গেলেন। অবশেষে তারা পৌঁছালো মদিনায় এক নতুন জীবন নিয়ে। অনেক মুসলমান ইসলামের মৌলিক শিক্ষা শিখে নিল। সেই সাথে শিখল কুরআনের পঠনপাঠন রীতিনীতি। ধর্মীয় জীবনের অধ্যাবসায়ে তারা রীতিমত হল প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। সাধারণভাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হল সমাজের ধনী শ্রেনির কাছ থেকে। এবং রসূল (সাঃ) এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ন হয়েছিল তারই যেন বাস্তব নমুনা প্রতিফলিত হল সবার জীবনে।

এই ভাবে ইসলামের মুল ভিত্তি ৫টি স্তম্ভ ঈমান ,নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে সু-দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তার মধ্যে একটি স্তম্ভ হল হজ্ব। এই হজ্ব সেরেই মুসলিমরা সবেমাত্র মক্কা থেকে ফিরেছে মদিনায়। এছাড়াও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সকলের মধ্যে বাস্তবতার রূপ নিল।

নবীর (সাঃ) অসুস্থতা

১১ই হিজরীর রমজান মাস শেষ হল সবেমাত্র। কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত করার পর নবী (সাঃ) গেলেন উহুদ প্রান্তরে। এই ঐতিহাসিক প্রান্তরে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল উহুদ নামক যুদ্ধ। এখানে তিনি এক মর্মস্পর্শী দোওয়া করলেন মহান প্রভু আল্লাহর কাছে। এই যুদ্ধে যে সকল মুসলিম শাহাদত বরণ করেছিলেন তিনি তাঁদের স্মরণ করে আল্লাহর কাছে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। সেই সাথে তাঁদের জন্য জান্নাতও কামনা করলেন।

উহুদ প্রান্তর থেকে ফিরে এলেন। মদিনার মসজিদে মিম্বরের উপর বসে উপস্থিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন–

“আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি, আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকব। আমি আশঙ্কা করছি যে তোমরা আমার পরে শিরককারী হয়ে পড়বে না। কিন্তু পৃথিবীর ধন সম্পদ নিয়ে তোমরা কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে।”

একথা দ্বারা ভক্তদের কাছে এটা প্রতীয়মান হল যে তিনি এই পৃথিবীর মাটি ছেড়ে পরকালের পথে পাড়ি দিতে চলেছেন। একই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নীতি নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হয়তো মানুষের থেকে থাকবে। কিন্তু এই পৃথিবীর মায়া বড়ই জটিল। এখানে ধন সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ অহর্নিশ। তাই তিনি ভক্তদের মধ্যে সম্পদ নিয়ে হানাহানির আশংকা করছিলেন তীব্র ভাবে।

নবী (সাঃ) আশঙ্কা করেছিলেন মানুষ হয়তো নামায পড়বে, রোযা করবে , কিন্তু তাদের মধ্যে সততার অভাব দেখা দেবে তীব্রভাবে। অথবা তারা ধন সম্পদ নিয়ে এত ব্যাস্ত হয়ে পড়বে যে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন তিনি তৈরী করে দিয়ে যাচ্ছেন তা আর থাকবেনা । তারা ভুলে যাবে রসূলের ভ্রাতৃত্ব বোধের নিয়ম নীতি। হয়তো বা তারা বিভেদ নীতির শিকার হয়ে এক জাতি না থেকে খন্ড বিখন্ড জাতিতে পরিণত হবে। পরের দিন রাত্রিতে নবী (সাঃ) মদিনার নিকটবর্তী বাকি নামক কবরস্থানে গেলেন। তিনি সেখানে হৃদয় খুলে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন–

“তোমরা তো আমাদের আগে গিয়েছো আমরা তো তোমাদের পরেই যাচ্ছি।”

ফেরার পথে তিনি তীব্র মাথার যন্ত্রণা অনুভব করলেন তারপর থেকে তিনি বিছানা ছেড়ে একদম উঠতে পারলেন না। এভাবেই তিনি বন্দী হয়ে দু সপ্তাহ বিছানায় কাটালেন। সেই অবস্থাতেও তিনি নামাজ পড়ছিলেন, তীব্র জ্বর ও মাথার যন্ত্রনা উপেক্ষা করে এভাবে কেটে গেল কয়েক দিন। উপশম হলনা তাঁর অসুস্থতা।ক্রমশ তার মাথার যন্ত্রনা তীব্র হল এবং জ্বর বৃদ্ধি পেল। এসময় তিনি ছিলেন পত্নী আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে। এখানে তিনি বার বার মুর্ছা যেতে লাগলেন। যখন তিনি একটু সুস্থ হয়ে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে বললেন। কয়েক ঘন্টা পরে তিনি নিজেকে একটু সুস্থ অনুভব করলেন । মাথায় তখনও তার জলপটি বাঁধা। সেই অবস্থাতে তিনি মসজিদে গেলেন এবং মিম্বরে বসে বিশ্বস্ত সাথিদের বললেন তাঁর দাফন কাফনের কথা। আরও বললেন তারা যেন তার কবরকে ভজনালয় বানিয়ে না ফেলে। তিনি আরও বললেন তোমরা আমার কবরকে পুজ্যবেদী বানিও না। নবী (সাঃ) ছিলেন আল্লাহর বার্তাবাহক । কিন্তু তিনি মানুষ’ই ছিলেন। তিনি এটা ভাল করে

জানতেন তাঁর সাথিরা তাকে কত ভালবাসতেন, তিনি আরও জানতেন তার প্রতি এই ভক্তি শ্রদ্ধার চোরাপথ দিয়ে শিরক এর প্লাবন প্রবেশ করতে পারে স্বাভাবিকভাবে। তাই তিনি তাদেরকে সতর্ক করে জানিয়ে দিলেন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে। উম্মতদের কখনই উচিত হবেনা তাকে ঘিরে কখনও পুজা, উপাসনা করার ভিত্তি স্থাপন করা। কারণ এইভাবে তার পূর্ববর্তী নবীর অনুসারিরা তাদের নবীদের কবরকে পূজাবেদী বানিয়ে ফেলেছিল।

নবী (সাঃ) এর এই উক্তি দ্বারা এটা পরিস্কার যে, ইসলামে কোন প্রকার ছবি, মূর্ত্তি অনুমোদিত নয়। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বড় হোকনা কেন এগুলো থেকে লাভের কিছু হয়না বরং এর থেকে আসে আল্লাহর সাথে অংশীবাদ স্থাপন করার প্রবণতা। নবীর অনুসারি হিসাবে আমাদের এ সব কথা খেয়াল রাখা দরকার, নবী রসূলরা আল্লাহর কাছ থেকে সত্যের বার্তা পেয়ে থাকেন । আর তারা আমাদের কাছে সেই মহান বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর থাকেন । যে আল্লাহর কাছ থেকে তারা ঐ বার্তা পেয়ে থাকেন সেই আল্লাহকেই আমাদের মানতে হবে । কেবল তারই উপাসনা করতে হবে।

তারপর নবী (সাঃ) উঠে বসলেন কিছুক্ষণ এবং তিনি জানতে চাইলেন তার কাছে কেউ কোন ঋন পাবেন কিনা। আরও জানতে চাইলেন তিনি কাকেও কোন বিষয়ে আঘাত দিয়েছেন কিনা । এই সময় এক জন উঠে দাঁড়ালেন এবং জানলেন যে তিনি তার কাছে তিন দিরহাম পান। নবী (সাঃ) আদেশ করলেন ঐ ব্যক্তির ঐ দেনা পরিশোধ করার জন্য। নবী (সাঃ) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে কোন জানাযার নামাজ তিনি পড়তেন না যতক্ষন না ঐ ব্যক্তির ঋণ শোধ না করে দেওয়া হত। তিনিও চলে গিয়েছিলেন ঋণ হীন অবস্থাতে। তারপর তিনি মিম্বারে বসে স্বীকারোক্তি করে বললেন,

“সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ আল্লাহ তার এক বান্দাহকে দুনিয়ার নিয়ামত গ্রহন করার কিংবা আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা গ্রহন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু বান্দাহ আল্লাহর নিকটের জিনিসই গ্রহণ করে নিয়েছে।”

নবী (সাঃ) এর এই কথা শুনে হজরত আবুবকর (রাঃ) ডুকরে কেঁদে ফেললেন। কারণ তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে নবী (সাঃ) এ ধরনের উক্তি একান্ত নিজের দিকে লক্ষ্য করে করছেন। নবী (সাঃ) যে এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকে পাড়ি দিতে চলেছেন এতে কোনপ্রকার সন্দেহ রইলনা প্রিয় ভক্ত আবু বকরের (রাঃ)।

পরক্ষণে আবুবকর (রাঃ)কে শান্তনা দিলেন, এবং তার সম্বন্ধে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

> "আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ আবু বকরের ধন সম্পদ ও তার বন্ধুদের কাছে, যদি দুনিয়ায় আমার অনুসারিদের মধ্যে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহন করতে পারতাম তবে আবু বকরকে গ্রহন করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের জন্য ইসলামের বন্ধুত্বই যথেষ্ট।"

শেষ প্রস্থান

তারপর নবী (সাঃ) ফিরে গেলেন আয়েশা (বাঃ)-র ঘরে। আবার তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। তারপর তিনি পুনরায় কয়েকটি আদেশ দিলেন, ইমান, আচরণ ও কাবা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে।

তারপর তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন, কিন্তু যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পেল যে তিনি উঠতে পারলেন না। মূর্ছা গেলেন। চেতনা যখন ফিরল তিনি জানতে চাইলেন মুসলিমরা নামায সেরে ফেলেছে কিনা। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অবগত করালেন যে তারা তাঁর অপেক্ষায় রয়েছেন। শোনার পর তিনি পুনরায় মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু আবার মুর্ছা গেলেন, তারপর আবার একটু জ্ঞান পাওয়ার পর তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানালেন যে মুসলমানরা নামায আদায় করছেন, আর এ নামাযে আবুবকর (রাঃ)-ই ইমামতি করছেন। এই রকম প্রশ্ন নবী (সাঃ) পরের কয়েক দিন এভাবেই আয়েশা (রাঃ)কে করতেন এবং আয়েশা (রাঃ) একইভাবে বলতেন যে আবুবকর (রাঃ)-ই নামাজ পড়াচ্ছেন। এতে আয়েশা (রাঃ) নবী (সাঃ) এর কিরাতের পরিবর্তে পিতার কিরাত শুনতে পেয়ে মনে কষ্ট পেতেন। কিন্তু নবী (সাঃ) প্রতি বারেই আবুবকর (রাঃ)-র ইমামতিকে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন।

দুদিন পর নবী (সাঃ) একটু সুস্থ হলেন। মুসলমানরা আবুবকরের পেছনে নামায আদায় করছিলেন। তিনি অনুভব করলেন নবী (সাঃ) এই সময় মসজিদে আসতে সমর্থ হয়েছেন। আবুবকর (রাঃ) তখন নবীর জন্য ইমামতির স্থান ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসতে চাইলেন কিন্তু নবী (সাঃ) তাকে বাধা দিয়ে পেছনেই বাম দিকে বসলেন। রসুলুল্লাহ নামায আদায় করলেন। এটাই ছিল নবী (সাঃ) এর মসজিদে শেষ আগমণ। এর পরের দিনগুলোতে তিনি আর মসজিদে আসতে পারেননি। এই সময় তিনি তার সম্পদ গুলো যার যা প্রাপ্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এই ভাবে তিনি সব কিছু দেওয়ার সময় লোকেদের নানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বার বার দাস দাসী ও দরিদ্রদের সম্বন্ধে সচেতন থাকার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিলেন, পরের দিন সোমবার ফযরের নামাযের সময় নবী (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)-র ঘর থেকে পর্দা তুললেন। সমস্ত মুসল্লীরা এ দৃশ্য দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। তারা ভাবলেন নবী (সাঃ) বুঝি এরপর থেকে একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। নবী (সাঃ) যখন মুসল্লীদের

দিকে তাকিয়ে হাসলেন তাতে সমস্ত মুসলমানদের হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন আসারই তো কথা। নবী (সাঃ)কে এরকম অবস্থাতে দেখে তারা ভাবলেন নবী (সাঃ) এখনই বুঝি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু ক্ষণিক পরেই পর্দা নেমে গেল, নবী (সাঃ)কে আর দেখা গেলনা।

কয়েক ঘন্টা পরেই নবী (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) তাকে দেখতে এলেন, নবী (সাঃ) তাকে বললেন,"এই দিনের পর তোমাকে আর তোমার পিতার জন্য কষ্ট করতে হবেনা।" তার পর তিনি কন্যার কানে কানে জানালেন যে তিনি (ফাতিমা) শীঘ্রই তার সাথে সাক্ষাত করবেন। এ কথা শুনে ফাতিমা (রাঃ) আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল দু-চোখ বেয়ে।

নবী (সাঃ) এর যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়ে চলল, এমনকি তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। এ সময় আয়েশা (রাঃ) পাশে ছিলেন তিনি তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন ও মাথাটা ধরে ম্যাসেজ করে দিচ্ছিলেন যাতে করে নবী (সাঃ) এর কষ্টটা কিছুটা লাঘব হয়।

এই সময় নবী (সাঃ) এর মুখ থেকে নিচের কথা গুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্ছারিত হচ্ছিল- *"আল্লাহ যাদের অনুগৃহীত করেছেন তাদের সাথে যারা নবী রসূল, যারা বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী, যারা শহীদ, যারা সত্যবাদী তাদের সাথি হওয়া কি আনন্দের!........... হে আল্লাহ তোমারই সাথে, হে আল্লাহ তোমারই সাথে, হে আল্লাহ তোমারই সাথে।"*

এরপর নবী (সাঃ) হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়লেন এবং মাথাটা ঢলে পড়ল, আয়েশা (রাঃ)-র আর বুঝতে বাকি রইলনা যে নবী (সাঃ) পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন।

নবী (সাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন ১২ রাবিউল আউয়াল, হিজরী এগারো সালে।" অবশ্য এই মৃত্যু তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান।

যাহোক তিনি মিলিত হলেন পরম প্রভুর কাছে। তিনিই তো তাকে ডাকছিলেন নিজের কাছে। তিনিই তো তার মাধ্যমে অসীম দয়া পরবশ হয়ে মানুষের কাছে তার শেষ বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাই বলে কি আল্লাহ তার মাধ্যমে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা স্তব্ধ হয়ে গেল ? তার প্রতি শান্তি ধারা আশির্বাদ বর্ষন, তাও কি শেষ হয়ে গেল? না, তা নয়– কুরআনের ঘোষণা,

> *"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা তার উপর শান্তি বর্ষণ করেন, হে বিশ্বাসীরা তোমরা তার উপর সালাম ও সম্মান জানাও।"*
> *(কুরআন ৩৩ ঃ ৫৬)*

ভালবাসা ও শূন্যতা

নবী (সাঃ) এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, আর এ খবর ছড়িয়ে গেল মদিনার সর্বত্র। সবাই অনুভব করলেন নবী (সাঃ) এর ভালবাসার শূন্যতা। সবার মধ্যে দেখা দিল এক চরম অশ্বস্তি। সবাই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, সবার চোখে অশ্রুবিন্দু দেখা গেল। নবী (সাঃ) শোকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। কিন্তু শোকে কোন রকম মৃগী রোগাক্রান্ত আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই মদিনার সমস্ত পরিবেশ যেন নিরবতায় ডুবে গেল।

কিন্তু কিছু মানুষের জীবনে শোক বহন করার মত ক্ষমতা থাকেনা। কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেললেন নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সমস্ত নিরবতা ভেঙ্গে হজরত উমার (রাঃ) এসে হাজির হলেন, শোকে প্রায় উম্মাদ তিনি, সবাইকে শাসিয়ে বললেন “যে বলবে নবী (সাঃ) মারা গেছেন তাকে আমি হত্যা করে ফেলব।”

এই ছিল নবী (সাঃ) এর উপর উমার (রাঃ)-র ঐকান্তিক ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। তার হৃদয় ফেটে যাচ্ছিল নবীর অনুপস্থিতিতে। তাই তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। কে এর পরবর্তীতে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? কে তাদের এত ভালবাসবেন? কে তাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব নেবেন এ সব প্রশ্ন তাকে পাগল করে তুলেছিল, তিনি স্থির ভাবে থাকতে পারেননি।

“তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যে একজন, তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই সে কামনাকারী, বিশ্বাসী লোকেদের জন্য সে সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত।”

হজরত উমার (রাঃ)-র মধ্যে যখন এরকম আবেগ উন্মাদনা সবাই দেখল তখন তারা ঠিক করতে পারলেন না কি করে তারা উমার (রাঃ) কে শান্ত করবেন ? অথবা কি ভাবেই বা পরিবেশকে শান্ত করবেন ? এমন সময় সেখানে হয়রত আবুবকর (বাঃ) এসে হাজির হলেন, তিনি বসলেন নবী (সাঃ) এর পাশে, তারপর একটি কম্বল নিয়ে ঢাকা দিলেন নবী (সাঃ) দেহ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তাঁরও চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে মুখমন্ডল ভেসে যাচ্ছিল। তিনিও গভীর ভাবে নবী (সাঃ) এর শূন্যতা অনুভব করছিলেন। এই অবস্থানে তিনি উঠে গেলেন উমার (রাঃ)–এর কাছে, তিনি তাকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু উমার (রাঃ) তখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে পারেননি। আবুবকর (রাঃ) এর উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আবুবকর (রাঃ) ব্যর্থ হলেন তার প্রচেষ্টায়। পরক্ষণে তিনি জনতার মধ্যে ফিরে এলেন। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণ ছিল অতি বাস্তব ও অতি যুক্তিপূর্ণ, তার এই ভাষন ছিল ইসলামী শিক্ষার নির্যাস স্বরূপ, তিনি জনতার সামনে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

"যারা মুহম্মদ (সাঃ) এর উপাসনা করে থাকে তারা জানুক যে মুহাম্মদ (সাঃ) এখন মৃত, আর যারা আল্লাহকে উপাসনা করে তারা জানুক আল্লাহ জীবিত, তিনি কখনও মরেন না।"

এই কথা বলে তিনি জনতাকে কুরআনের শিক্ষার দিকে আহ্বান জানালেন।

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বেও অনেক রসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি উল্টোদিকে ফিরে যাবে? মনে রেখ যে বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোন লোকসান করবে না। অবশ্য যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ দাস হয়ে থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ তার প্রতিফল দান করবে।"(কুরআন ৩ ঃ ১৪৪)

হজরত উমার (রাঃ)-র কানে প্রবেশ করল কুরআনের এই জলদ গম্ভীর নির্দেশ, চেতনা ফিরে এল তার। পরবর্তীতে তিনি নিজেই বলেছেন যে যদিও তিনি এর আগে এ আয়াত শুনেছিলেন যখন এটি অবর্তীন হয়েছিল, কিন্তু তখন তিনি এর অর্থ সঠিক ভাবে অনুধাবন করেননি। এখন তিনি ও অন্যান্য মুসলিমরা সবাই বাস্ত বিকভাবে জানল নবী (সাঃ) মারা গেছেন। তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, সবাইয়ের কাছে তখন এটা খুব ভাল করে অনুভুত হল যে তারাতো আল্লাহরই ইবাদত করেন অতএব তাদের হতাশ হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? আল্লাহ তো চিরঞ্জীব, তিনি তো মরেন না। অতএব তার উপর ভরসা রেখে সব কিছু করতে হবে। মনোবল হারালে চলবেনা। সেই ইলাহকে এখন তাদের ডাকা উচিত। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাহর ডাকে সাড়া দেন, এই পরিস্থিতিতে তিনিই কেবল তাদের সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বৈধ ভাবে নবীর দেখান পথ ধরে চললে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। আল্লাহ তাদের সবচেয়ে বড় সাহায্য করবেন, তিনিতো দাতা দয়ালু, তার দয়া ঘরে বাইরে ঝরে পড়ছে। তিনি শুধু আমাদের অবিভাবক নবী, বরং তিনি আমাদের বাঁচার সব উপায় উপাদান দিয়ে থাকেন, তারই দয়ায় আমরা বেঁচে আছি তারই দেওয়া জীবিকা গ্রহর করে । আর আল্লাহর পথ পেতে গেলে নবী (সাঃ)-কে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোন অবলম্বন নেই।

২৪

আল্লাহর রসূল (সাঃ)

এক চমৎকার উদাহরণ

সাহাবাদের রাঃ মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। আর আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন এগিয়ে চলেছে তাদেরই জান প্রাণ দেওয়ার বরকতে। তাই তাদের ঈমান ইতিহাসের পাতায় আজও সমান গুরুত্ব পায়। তাদের জীবনের সুসভ্য কৃষ্টি কালচারের প্রভাব আজ সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতির জীবনে পড়ছে। কুরআনও তাদের প্রশংসা করেছে। আর এই সুসভ্য কৃষ্টি কালচার পুষ্ট হওয়া ব্যক্তিরা সবাই নবী (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেবল সাহাবাগণ নন বরং আমরা সবাই এটা এখনও অনুভব করতে পারি বিশ্ব সভ্যতায় নবী (সাঃ) এর অবদান কত বিশাল। নবী (সাঃ)এর উত্তম আদর্শ বর্ণনা করে কুরআন ঘোষণা করেছে,

> *"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমূনা বর্তমান। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করে আল্লাহর স্মরণ করে।" (কুরআন ৩৩ ঃ ২১)*

প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন মহান শিক্ষক, যার কাছ থেকে একজন শিক্ষা পেতে পারে মহান আদর্শের। তার আদর্শে আলোকিত হয়ে সে পথ চলতে পারে ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়েও। কোন মানুষের জীবনে রসূলের আদর্শ প্লাবিত হলে তা তার জীবনকে কেবল সফল করে না বরং তা সমাজের অন্যান্য মানুষকেও প্রভাবিত করে।

দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নবী (সাঃ) যে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন তা

খুঁজে চলেছিল মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও মুক্তি। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নবী (সাঃ)এর উপর ধীরে ধীরে অহী অবতীর্ন হয়। সমস্ত কুরআন এক সঙ্গে অবতীর্ন হয়নি। এর কারণ অনেক, জীবন প্রবাহের সুবিধা অসুবিধা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি অবস্থানে ঠিক একেবারে বাস্তব প্রয়োজনে অহী অবতীর্ন হয়েছে এবং সম্মুখ উদ্ভুত সমস্যাকে দূরীভূত করে সমাধানের পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মনে হয় স্বয়ং আল্লাহ তাঁর সাথে অহী মারফত কথোপকথন চালিয়ে গেছেন এক ঐতিহাসিক ধারায়। আর সে ধারা এসে থেমেছে চিরকালের চিরন্তন দোর গোড়ায়। নবী (সাঃ) আল্লাহর কথা শুনতেন তার সাথে অহীর মারফত যেন কথা বলেছেন এবং দিবা রাত্রি তার মহানত্বের ছাপ সারা বিশ্বজগতে অনুভব করেছেন। তাইতো তিনি আরব মরুভূমির মত রুক্ষ পরিবেশেও পেয়েছেন অসাধারণ গুণসম্পন্ন সাহাবাদের। যারা তাঁকে সব সময় জানিয়েছেন উষ্ণ সাদর সম্ভাষণ।

তিনি রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। নিশুতি রাত, সবাই যখন ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় অবনত। তার দিকে যে সমাজ গালাগালি বিদ্রুপ অভিশাপ ছুড়ে দিত তিনি তাদের প্রতি রাগতেন না। তাদের প্রতি কোন রকমের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসিকতাও তাঁর ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তিনি যে শত্রুদের প্রতি সদয়, ধৈর্য্যশীল ছিলেন তার অনেক প্রমাণ মেলে। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতাবোধ তাঁকে মুক্ত করেছিল সবরকম সংকীর্ণতা থেকে। কোথাও তিনি অস্বস্তি বোধ করেননি। কোথাও তিনি হতাশ হননি। তিনি সবসময় ভাবতেন আল্লাহর কথা, তিনি ভাবতেন আল্লাহ নবুয়্যতের যে দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন তা তিনি পালন করতে পারছেন কি-না।

তিনি মানুষের প্রতি ভালবাসার উচ্ছাস প্রকাশ করতে পারতেন, তা সবাইয়ের কাছে ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর ভালবাসা ছোট বড় আশেপাশের সমস্ত সাথিরা পেতেন। তাঁর সাহচর্যে ধন্য হতেন তার স্ত্রীরা। তার কাছে তারা পেত অসাধারণ গভীর ভালবাসার ছোঁয়া।

তিনি যখন মানুষের কাছে আসতেন তখন স্মিত হাসিতে তাদের হৃদয় ভরে যেত। শহরের একপ্রান্তে বসবাসকারী চাকর বাকরেরাও যদি তাকে ডাকতেন তিনি যেতেন। তাদের ভালবাসতেন। কারণ তিনি তো আল্লাহরই প্রেরিত রসূল। তাই তিনি সকলের। তার ভালবাসা কেবল কোন একজনের জন্য নয় বা কোন গোত্রের নয় বরং তিনি সবাইয়ের। তাই তিনি ভালবাসতেন সবাইকে। কারোর সাথে তিনি মুসাফা (হ্যান্ডস্যাক) করলে আগে নিজের হাত সরিয়ে নিতেন না। তিনি এটা ভালভাবে জানতেন সামান্য ছোট কথা দিয়েও মানুষের হৃদয় কিভাবে জয় করা যায়। আত্মগরিমা বলে তাঁর কিছু ছিল না। তাই তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না। তাঁর ভালবাসা থেকে কেউ বঞ্চিত হত না কারণ তিনি তো আল্লাহর রসূল।

প্রতিদিন তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি নিজেই এতভাল কাজ করা স্বত্ত্বেও ভাবতেন এর মধ্যে কিছু ক্রটি থেকে গেছে তাই এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তার কাছে যখন কোন মানুষ ভুলের বোঝা নিয়ে হাজির হতেন তখনও তিনি তাদের ভুল ক্ষমা করে দিতেন। পরম প্রভু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। তারাও স্বান্তনা পেতেন তাঁর কাছে। আল্লাহর কাছে তারা আবেদন নিবেদন পেশ করার শিক্ষা নিতেন।

কোন মানুষের কোন ভুল বা অন্যায় দেখলে তা তিনি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি সকলকে এটাও উপদেশ দিতেন যাতে করে লোকেরা অন্যের ভুল লোক সমাজে বেশী না প্রকাশ করেন। যখন কোন মানুষ তাঁকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তিনি তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তাঁর বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী তাকে উত্তর দেওয়ার, যার ফলে তারা তাদের জড়তা ও সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারতেন। তিনি কেবল নৈতিকতার ভার চাপিয়ে ক্ষান্ত হতেন না বরং সেগুলির যৌক্তিকতা খোঁজার জন্য সাহাবাদের স্বাধীনতা দান করেছিলেন।

ন্যায় বিচার শান্তির জন্য এক বড় ধরনের শর্ত, ন্যায় বিচারের অভাবে শান্তি বিঘ্নিত হয় সর্বত্র। যে ব্যক্তি সমতার স্বাদ পেতে চায় তার উচিত অপরের প্রতি উচ্চমর্যাদা দান করা। অপরের মর্যাদা হানী করার চেষ্টা করলে পক্ষান্তরে নিজেরই মর্যাদা নষ্ট হয়। তিনি নিজেই দাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন আর এ কাজের জন্য তিনি সাথিদের উৎসাহ দিতেন অনবরতঃ। তিনি এটা ভাবতেন মুসলিম সমাজের মধ্যে কেউ কারো দাস হয়ে থাকবে না।

কুরআনের অহী অবতরণ নবী (সাঃ) ও আমাদের একটা প্রসস্ত পথ দেখিয়েছে, যাতে আমরা দেখতে পাই তিনি সমাজে দরিদ্র গরীব ও অসহায় মানুষদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তিনি তাদের নিমন্ত্রণ করতেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে তাদের মর্যাদাদান। আর এর দ্বারা তিনি তাদের হৃদয়ে যে হীনমন্যতা কাজ করছে তা হঠাতে সফল হয়েছিলেন। তারা পেয়েছিল আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ। রসূল তাদের যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন তেমনি দান করেছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাও।

নবী (সাঃ)এর মিশনের অধ্যায় যখন পরিপূর্ন হতে যাচ্ছে তখন তিনি ‘জাবাল আর রাহাম’ - পাহাড়ের পাদদেশে সমতলভূমিতে সাদা, কালো, ধনী গরীব, নারী পুরুষ আরব অনারব সকল প্রকারের মানুষের সামনে যে ভাষন প্রদান করলেন তাতে এটা পরিস্কার হল কেউ কারোর চেয়ে বড় বা মহৎ হতে পারে না যতক্ষন কারোর হৃদয় বড় না হয়। সব কিছু বিচার করা হবে এই হৃদয়ের মহানত্ব অথবা নীচতা বিচার করে। তাই এটা কোন রং বর্ণ গোত্রের বিচার করে হবে না। নবী (সাঃ) এক সময় বললেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম যে লোকেদের কাছে উত্তম"। তার শেষ ভাষনে তিনি কেবল মুসলমানদের সম্বোধন করেননি বরং তিনি সমস্ত মানুষকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন 'হে মানব সকল! বলে অভিবাদন করেছেন। তারপর তিনি প্রত্যেকটি জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিকে সীমালঙ্ঘন না করার ব্যাপারে সচেতন করেছেন। তিনি জানিয়েছেন পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা কোন সময় কোন জাতির উন্নতি আনতে পারে না। উন্নতির জন্য চাই একতা, সমাজের যে স্তর থেকে মানুষ উঠে আসুক না কেন সে যদি মহৎ হৃদয়ের হয়ে থাকে তবে তাকে দিয়ে সব কাজ করানো যেতে পারে। কালো নিগ্রোও মুসলিমদের নামাজের জন্য অথবা মঙ্গলের জন্য ডাক দিতে পারে। আর দেশের খালিফা বা রাজা বাদশাও সেই ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য। আবার দাস পুত্র দেশের সেনাবাহিনীর 'কমান্ডার-ইন-চিফ'ও হতে পারে। তারই কথায় চলতে হবে তার অধীন সকল সৈন্যকে।

নবী (সাঃ) মহিলাদের সকল প্রকার আবেদন নিবেদন খুব গভীরভাবে শুনেছিলেন। তখন তারা সমাজের নানান অবস্থাতে অপদস্ত হতেন কথায় কথায়। কিন্তু নবী (সাঃ) তাদের দুঃখ ঘোঁচালেন নানা প্রকার সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে। এমন কি তাদের অভিযোগ শ্রবনে নবী (সাঃ)-এর উপর অহী অবতীর্ন হল,

> *"আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন মহিলাটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক বিতর্ক করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনেরই কথাবার্তা শুনেছেন, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (কুরআন ৫৮ ঃ ১)*

একইভাবে অপর অনেক ঘটনাও এসেছিল নবী (সাঃ)-এর কাছে। যেখানে মহিলারা তাদের স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা স্বামীদের মোটেই পছন্দ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি মহিলাদের কথা খুব মনোযোগের সাথে শুনছিলেন এবং তাদের বিবাহ জীবন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জামিলা, হাতিবা, সাবিতের স্ত্রী ও অন্যান্যরা। আব্বাস (রাঃ)-র বর্ণনা দ্বারা জানা যায় সাবিতের স্ত্রী এক সময় নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে জানালেন যে তিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুমোদনযোগ্য কোন দোষ দিতে পারছেন না। সে জন্য ইসলামকে দোষও দেওয়া যায় না, তবে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতে পারছিলেন না। নবী (সাঃ) তখন তার কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি তার স্বামীকে বাগানটা দিয়ে দিতে পারবেন কিনা। সাবিতের স্ত্রী নবী (সাঃ) কে জানালেন যে অবশ্যই তিনি স্বামীর কাছে থেকে যৌতুক স্বরূপ যে বাগান পেয়েছিলেন তা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। এরপর নবী (সাঃ) সাবিতকে ডেকে বললেন তাকে আলাদা করে দিতে।

নবী (সাঃ) এর কাছে আর এক মহিলা অভিযোগ এনেছিলেন যে তাকে তার

পিতা তার অনুমতি না নিয়েই একজনের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি এই বিবাহের বিচ্ছেদ চান। পরক্ষনেই তিনি জানালেন যে সে তার বাবার পছন্দের স্বামীকে নিজের মত পেয়েছে কিন্তু এটা জানিয়ে দিতে চায় যে কন্যার বিবাহের পাত্র বাবাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে না। তাদের এটা কিছুতেই উচিৎ হবে না কন্যাদের অনুমতি ছাড়া তাদের বিবাহ দেওয়া।

নবী (সাঃ) মহিলাদের দু'দিক থেকে তাদের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তাদের জীবনে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন তাদের নারীত্বের কিছু চাওয়া পাওয়ার। আর এগুলো যে সকল সময় সকল পুরুষের দ্বারা বুঝে ওঠা সম্ভব তা বলা যেতে পারে না।

বিভিন্ন সামাজিক কাজে মহিলাদের জন সমক্ষে আসা নবী (সাঃ) এর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এমনকি তা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক তৎপরতা পর্যন্ত পৌঁচেছে। নবী (সাঃ) এ সব কাজে বাধাতো দেননি বরং সমাজের এই সব কাজে মহিলাদের অংশ গ্রহনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। এর প্রমান বহু রয়েছে হাদীসগ্রন্থ গুলোতে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে তিনি মহিলাদের দৃঢ় প্রত্যয়ী বানিয়ে ছিলেন। যার ফলে তারা কোন কিছু দাবি তোলার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তারা তাদের হৃদয়ের কথা অকপটে সবাইয়ের সামনে পেশ করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে তারা যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তা দিয়ে তারা নৈতিকতার মূল নীতিগুলি ভালভাবে বুঝেছিলেন। নিজের আত্মা সম্বন্ধে তারা সচেতন হওয়ার পর তাদের বিকাশ ঘটাল যুক্তি বুদ্ধির। তারা সব কিছুতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখার সবক গ্রহন করেছিল নবী (সাঃ) এর কাছ থেকে।

নবী (সাঃ) শিশুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। সব সময় তিনি তাদের অত্যধিক স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি প্রথমেই চিনেছিলেন নিজ স্রষ্টা আল্লাহকে, তারপর তিনি চিনেছিলেন নিজকে। অর্থাৎ নিজের আত্মাকে। তাই তিনি তাদেরকে ভালবাসতেন যারা ছিল নিষ্পাপ মনের, নিষ্পাপ আত্মার। এ কথা সত্য যে শিশুরা সব চেয়ে বেশি নিষ্কলুষ। তাই তিনি শিশুদের চুম্বন দিতেন। তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। এমনকি নিজের কাঁধে তুলে নিতেন এবং তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। এমনকি নামাজে যোগদানকারী মহিলাদের শিশু সন্তানেরা যাতে কান্নাকাটি না করে সেই কারণে তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয় আমি নামায দীর্ঘায়িত করি কিন্তু

যখন আমি শিশুদের কান্না শুনি তখন আমি তাদের মায়েদের মর্মপীড়ার জন্যই নামাজ সংক্ষিপ্ত করি।”

bex(mt) memgq wkï‡`i wb®úvc ü`‡qi Rb¨Zv‡`i cKÖsmvKi‡Zb| Zv‡`i KvQ †_‡K wZwb Mf¨xi wk¶v wb‡Zb Zv‡`i‡K chø©e¶‡bi ga¨ †_‡K| wZwb we®§qi mt‡_ Zvi Rwivcv‡ki©†j vK¸‡jv‡K †`L‡Zb wkïi Aeq‡e| wkï‡`i g‡a¨ wZwb †h †mŠ h©Dcj wä Ki‡Zb Zv †hb Zv‡K ‡gwnZ K‡i wZ| Avi †Kvb wKQz‡K wZwb my`i †`L‡j †Ku‡` †dj‡Zb| GgbwK A‡bK mgq Gi cÖv‡e Zvi `yRPL †e‡q AkÖS‡i coZ| Zvi ü`q me mgq cb©_vKZ fyj I g½Øiv| ZvB hLb ZLb Zvi ü`q †_‡K DrmwivZ nZ Q`gq g”Qbv© †QvU †QvU K_v| A_ev, Zvi cwØ AeZxb©KizAv‡bi mi~ gG©bv| hv wQj cÖZc‡¶ me my`‡ii my`i|

একটি আলো যা আলোকিত করতে পথ দেখায়

মুহাম্মদ (সাঃ) নীতি নৈতিকতা, আশা ও বিশ্বাস নিয়ে মানবজাতির কাছে এসেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে তার উপস্থিতির আবশ্যকতা এবং শেষ দিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার ও বিচারাধীন হওয়ার কথা। নবী (সাঃ) সমগ্র মানুষের কাছে আল্লাহরই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। সারা জীবন ধরে তিনি এই বার্তা শোনালেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার কাছে। সমাজের ধনী-গরীব, নারী, পুরুষ দাসদাসী পেল এই মধুর আহ্বান। তিনি তাঁর প্রতি প্রাপ্ত অহীর বার্তাকে গোপন করলেন না কারো কাছে। রাজা থেকে ফকির সবাই তাঁর এই দয়া পেলেন সমভাবে।

প্রকৃতপক্ষে নবী (সাঃ)এর জীবনটা একটা বিষয় যা সমস্ত কিছুকে পরিবর্তন করেছিল, নবীকরণ করেছিল, প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রাণ স্পন্দন জাগিয়েছিলেন। আর এটা তিনি করতে পেরেছিলেন ছোট থেকে বড় সবকিছুতেই। মুসলিমরা সেই সাথে অন্যরাও যারা নবী (সাঃ)এর জীবন জেনেছিল তারা সবাই কমবেশী উপকৃত হয়েছিল এবং তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গ্রহন করেছিল।

নবী (সাঃ) দোওয়া করতেন নিজের পরিবর্তনের জন্য। অর্থাৎ মন্দ থেকে ভাল হওয়ার পরিবর্তন। তিনি নিজে শুধরে ছিলেন নিজেকে। আর সমাজ পরিবর্তন করার জন্যও আল্লাহর কাছে দোওয়া করতেন। আল্লাহ তাঁর এই হৃদয়ের আবেদন নিবেদন শুনেছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। আর জগতের পরিবর্তন তিনি অমনি করে ফেলতে পারেননি বরং এর জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অক্লান্ত সংগ্রামের। এটা ছিল ব্যক্তির আত্মপ্রচেষ্টা ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে এ জিহাদ

ছিল বিশ্বাসীদের জন্য একটি চরম নির্দেশিকা “মঙ্গল সাধন কর ও অন্যায় হঠাও” –নবী (সাঃ)এর জীবন এরই প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়।

মহান আল্লাহর কাছে সমস্ত কিছু চরমভাবে উৎসর্গকৃত হওয়ার চরম নিদর্শন হিসাবে দেখা গেছে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সমগ্র অধ্যায়কে। প্রত্যেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তাঁকে ভালবাসত। কারণ তাঁর আধ্যাত্মিকতা তাঁকে এ সম্মান পাইয়ে দিয়েছিল আর তিনি ছিলেন অহংকার মুক্ত একজন ব্যক্তি। তাই তিনি সকল মানুষকে দিতে পেরেছিলেন তার ভালবাসা যা ছিল শর্তবিহীন। তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন যা ছিল স্বর্গীয় প্রশস্তিতে ভরপুর। আর তিনি ছিলেন মানবীয় ভ্রমের উর্দ্ধে। আল্লাহ তাকে এইভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন,

“আমার দাস তার চরম উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমার কাছাকাছি হয়, যতক্ষন না আমি ভালবাসি এবং তখন আমি সত্যিই ভালবাসি আমি শুনি, সে যা শোনে তার মধ্য দিয়ে। আমি দেখি সে যা দেখে তার মধ্য দিয়ে। আমি ধরি যা সে হাত দিয়ে ধরে তার মাধ্যমে এবং আমি হাঁটি তার হাঁটার মাধ্যম দিয়ে।”

আল্লাহ মানুষকে স্বর্গীয় সান্নিধ্যের উপহার প্রদান করতে চায় এবং তার ব্যক্তি স্বত্তাকে উর্ধে তুলে ধরতে চায়। আল্লাহর জন্য ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে এমন ভালবাসা যা কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। এর জন্য টাকা পয়সা ধন দৌলত – কোন কিছুরই দরকার হয় না। তবে একটা জিনিসই কেবল দরকার তা হল পবিত্র হৃদয়।

এটা পাওয়ার জন্য নবী (সাঃ) এমন একটা পথ ধরেছিলেন যা ধাপে ধাপে শান্তির দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু এ পথটা ছিল চড়াই উৎরাইয়ের। প্রথমে শান্তির জন্য আহ্বান, তারপর দেশান্তর, প্রত্যাবর্তন অবশেষে শেষ আশ্রয় থেকে বিতাড়ন। তাঁর এ মিশনের শুরু থেকে আল্লাহ ছিলেন তাঁর সাথি, তিনি তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং যে সকল মানুষগুলো সামগ্রিক ভালবাসা দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তারাও আল্লাহর করুনায় এরকম কাজে সহায়তা করতে পেরেছিলেন।

নবী (সাঃ) বহন করে এনেছিলেন এক বিশ্ব শান্তি বার্তা। এ শান্তি ও ভালবাসা তার নিজের জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। সেই সঙ্গে তিনি সমগ্র মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে বিশ্ব শান্তি বার্তার সাথে জুড়ে রয়েছে মানুষের ভালমন্দ। প্রকৃতপক্ষে এটাকে স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। আর সেই স্বাধীনতার দ্বারা ন্যায়নীতি স্থাপন হতে পারে যা কোন ব্যক্তিকে বর্ণ, গোত্র, ধন দৌলত, আবেগ উচ্ছাস সমস্ত কিছুর বিপদজ্জনক হাতছানি থেকে রক্ষা করতে পারে। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে যে নৈতিক

আলো জ্বলে ওঠে তা তাকে ভাল মানুষ করে গড়ে তোলে।

নবী (সাঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ বা দাস। আর তিনি হয়েছিলেন সমগ্র মানুষের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দোওয়া করতেন, তিনি পরিতৃপ্ত হতেন, তিনি ভালবাসতেন এবং তিনি নিজেকে উৎসর্গও করতেন আল্লাহর কাছে। এক কথায় বলা যেতে পারে তিনি নিজে আলোকিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে অপরকেও আলোকিত করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েই বিশ্বাসীরা দলে দলে জীবনের মুক্তির সন্ধানে ফিরে এসেছিলেন এবং পেয়েছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তির আলো, আল্লাহর সাদর উষ্ণতা এবং তার ভালবাসা।

নবী (সাঃ) সমগ্র মানবজাতিকে ত্যাগ করতে পারতেন। তিনি না শোনাতে পারতেন আল্লাহর মহান অহী বার্তাকে। কিন্তু তিনি আমাদের কখনও বঞ্চিত করেননি বরং তিনি সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলেছিলেন, আল্লাহর কাছে চরম আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। আর সজাগ করেছিলেন যে আল্লাহ আমাদের সব বিষয়ের সাক্ষী। তিনি সকল সময় বান্দাহর নিকটতম।

আর এ সাক্ষ্য যখন ঘোষিত হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তখনই সাক্ষ্যদাতা পেয়ে গেল চরম স্বাধীনতা, যারপর অন্য কোন স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। অথবা এর চেয়ে বড় কিছু পাওয়ার থাকে না।

বিশ্ব বিখ্যাত মনিষীদের দৃষ্টিতে

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)

সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত লেখক H. Hert এর গ্রন্থটি সারা বিশ্বে খুব সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি প্রায় সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক পৃথিবীর মানব ইতিহাসের প্রাচীন যুগ থেকে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষন করে সেরাদের একটা তালিকা ও পর্যালোচনা করেছেন। এই সকল ব্যক্তিরা মানব সভ্যতা বিকাশে সমাজে কি অবদান রেখেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

H. Hert ছিলেন একজন খ্রীষ্টান পরিবারের সন্তান এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে। কিন্তু তিনি তার এই গ্রন্থে সেরা মানুষদের শীর্ষে যীশুখ্রীষ্ট অথবা নিউটনকে স্থান দেননি। বরং তিনি যাকে এই সম্মানে ভূষিত করেছেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। নবী (সাঃ)এর মত আর কেউ মানব সমাজের উপর এত বেশি সুপ্রভাব ফেলতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,

“My choice of Muhammad (pbuh) to lead the list of the world’s most influentials may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level .... it is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jessus Christ and St. Paul on Christianity......... it is this unparalleded combination of secular and religious influence which I fell entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history.”

“আমার এ তালিকায় মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানব সমাজে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্বের স্থানে স্থান দেওয়াতে অনেকে অবাক হতে পারেন আবার অনেকের কাছে প্রশ্ন জাগতেও পারে। কিন্তু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চরমভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধার্মিকতায় সফল হয়েছেন। .... নবী (সাঃ)এর প্রভাব যেমনভাবে ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে তেমনিভাবে খ্রীষ্টের অথবা পলের প্রভাব খ্রীষ্টবাদের সাথে জড়িয়ে নেই। আমি মনে করি ধার্মিকতা ও ধর্ম নিরপেক্ষতার এরকম সংমিশ্রণ কেবল মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যেই ছিল যা মানব ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না।”

জর্জ বার্নাড শ' তার **Genuine Islam** নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimillating capacity to the changing phase of existance which can make itself appeal to every age. I have studied him the wonderful man and in my opinion for from being an anti-christ, He must be called the Savior of Humanity"

> "If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe, within the next hundred years, it could be Islam"

"আমি সব সময় মুহাম্মদ (সাঃ) এর ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকি। কারণ এর চমৎকার জীবনী শক্তি বা বেঁচে থাকার উপাদান রয়েছে। এটাই একমাত্র ধর্ম যা সকল যুগের পরিবর্তনের উপস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমি তাকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি আমার মতে তিনি ছিলেন একজন চমৎকার ব্যাক্তিত্ব যিনি খ্রীষ্টানদের শত্রু ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাকে মানবতার মুক্তি দূতই বলা যেতে পারে।

> "আগামী একশ বছরের মধ্যে যদি কোন ধর্ম ইংল্যান্ড এমনকি ইউরোপকে শাসন করার সুযোগ পায় তবে তা পারবে ইসলামই।"

ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি ও ঐতিহাসিক **লা মার্টিন** বলেছেন,

"Philosopher, orator, apostle, legislator warrior, conquerer of ideas, restorer of rational dogmas of a cult without images; the founder of twenty terrestorial empires and of one spiritual empire that is Muhammad, As regards all standards, by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he ?"

"মুহাম্মদ (সাঃ)-ই ছিলেন এক আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ কুড়িটি সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক বক্তা, ধর্ম সংস্কারক, আইনজ্ঞ, যোদ্ধা, বিজেতাও। যুক্তিবাদী চিন্তার প্রর্বত্তক। মানব মহত্বের সমস্ত দিকগুলি আলোচনা করে আমরা বলতে পারি তাঁর চেয়ে মহৎ আর কেউ কি আছে ?

জাতির জনক **মহাত্মা গান্ধি** ১৯২৪ সালে Young India -তে লিখেছিলেন,

"I wanted to know the best of the life of one who holder today undisputed sway over the hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the utter self effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, this intense devotion to this friends and followers, His intrepidity, his fearlessness his absolute trust in God and in his own mission. Those and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle."

"আমি এমন একজনের জীবন সম্বন্ধে জানলাম যাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোনরকম বিতর্ক না তুলে আজ হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। আমি আরোও অবগত হলাম তলোয়ার দিয়ে ইসলাম বিজয়লাভ করেনি। ঐরকম চরম সময়ে যখন মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই উচ্ছেদ হওয়ার মুখে অবস্থান করছিলেন, যে মুহূর্তে তিনি ইসলামী আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন তাঁর সম্বল বলতে ছিল কেবলমাত্র আল্লাহর পরিপূর্ণ আস্থা, নির্ভিকতা, শত্রু মিত্র সবাইয়ের প্রতি আত্মত্যাগের চরম প্রকাশ। এগুলিই তাঁকে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল, অস্ত্র নয়।

bvi xevì xw‡L¨vZ ag©we‡ËK †j LK অ্যানি বেসান্ত The Life and Teaching of Muhammad গ্রন্থে লিখেছেন,

"It is impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived to feel anything but reverence for that mighty Prophet one of the great Prophets of the supreme and although in what I put to you I shall say many things which may be familior to many, yes I myself whenever I re-read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher."

"একজন যদি নবী (সাঃ) এর জীবনী পড়াশোনা করে জেনে থাকেন তিনি কেমনভাবে বাস করতেন, কেমন শিক্ষা দিতেন, তাহলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধেয় নবী হিসাবে জানবেন। বড় বড় নবীদের একজন বলে ভাববেন। কিন্তু আমি নিজেই অনুভব করছি যদি তাঁকে বার বার স্টাডি করা যায় তাহলে এই আরবীয় শিক্ষকের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা জন্মাবে।

ধ্যানচাঁদ শর্মা

The prophets of East নামক গ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ) প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"Muhammad was the soul of kindness, and his influence was felt and never forgotten by those around him."

"মুহাম্মদ (সাঃ) এর হৃদয় ছিল দয়ার সাগর। আর এর প্রভাব তার আশেপাশের সব সাথিরা অনুভব করত সব সময়। কখনও তারা এটা ভুলে যেত না।"

ফ্রান্সের সম্রাট Nepoleon Bonaparte ইসলাম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন,

"Moses had revealed the existance of God to his nation, Jesus Christ to the Roman world Muhammad to the old continent. Arabia was idolatrous when six centuries after Jesus, Muhammad introduced the worship of the God of Abraham, of Ismael, of Moses, and of Jesus-Muhammad declared that there was none but God, who had no father, no mother, no son and that the trinity imported the idea of idolatary............ I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and established a uniform regime based on the principles of the Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness"

"মুসা আঃ (মোজেস) তাঁর জাতির কাছে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ঈসা (আঃ) বা যীশু তাঁর রোমান জাতভাইদের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ (সাঃ) পরিচয় ঘটিয়েছিলেন পুরান মহাদেশের মানুষের কাছে আল্লাহর অস্তিত্বকে। যীশু খ্রীষ্টের ছ'শ বছর পর নবী (সাঃ) যখন এসেছিলেন আরবের বুকে তখন আরববাসীরা মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিল। মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। আব্রাহাম ইসমাইল, মুসা ও ইসা (আঃ)এর উপাস্য আল্লাহর সাথে। মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষনা করলেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং ত্রিত্ববাদের যে ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা থেকে আল্লাহ মুক্ত।

..... আমি আশা করি সে দিন আর বেশী দূরে নয় যখন আমি দেশের সমস্ত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে এমন এক ঐক্যপূর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করতে পারব যেখানে কুরআনের সার্বভৌমত্ব চলবে, যা কেবলমাত্র সত্য। আর কেবলমাত্র এটাই মানুষের শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে।"

Bibliographic References

1. Seerath – by ibn Ishaaq	Mohammed bin Ishaaq.
2. Seerath – by Ibn Khatir	Ibn Khatir.
3. Seerath-un-Nabi	Maulana Shibli Noumani.
4. Seerath-un-Nabi	Syed Sulaiman Nadvi.
5. Muhammad Encyclopedia of Seerah	Afzalur Reman.
6. The Emergence of Islam	Dr. Mohammed Hameedullah.
7. The Life of Muhammad	Haykal.
8. The Sealed Nectar *(Ar-Raheequl-Makhtum)*	Safiur-Rehman Al- Mubarakpuri.
9. Muhammad	Martine Lings.
10. The Perfect Guide for Mankind	Mohd. Rabey Hasani Nadvi.
11. Social Service in Islam	Syed Jalaluddin Umri.
12. The Messenger	Tariq Ramdan.
13. Muhammad & the Quran	Rafiq Zakaria.
14. Reading the Quran	Ziauddin Sardar
15. The Holy Quran	Abdullah Yusuf Ali.
16. The Quran	Prof. Dr. Syed Vickar Ahamed, USA.
17. The Quran	Dr. Nazeer Ahmed.